সম্প্রচারের
ভাষা ও ভঙ্গি

সম্পাদনা
ভবেশ দাশ



গাঙচিল

প্রথম প্রকাশ
২০০০

প্রকাশক
অণিমা বিশ্বাস
গাঙচিল
'মাটির বাড়ি', ওঙ্কারপার্ক, ঘোলাবাজার
কলকাতা ৭০০ ১১১
যোগাযোগ (০৩৩) ২৫৫৩ ৮৫০২
ই-মেল doyelnet@vsnl.net

পরিবেশক ও বিক্রয় কেন্দ্র
দোয়েল
৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

হরফবিন্যাস
গঙ্গা মুদ্রণ ৫৪/১বি শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক
ডি ডি অ্যান্ড কোং ৬৫ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদচিত্র ও অন্যান্য ছবি
দেবব্রত ঘোষ

কথার ভেতরে থাকে অনন্ত কৌতুক
ভাষার গভীরে খুঁজি নিরাময়-নারী
নকশিকাঁথার মতো কথার বুনন
তোমারই জন্যে যেন বুনে যেতে পারি

প্রসঙ্গত

ভাষা চলে নদীস্রোতের মতো। তার পায়ে শুধুই চলার নূপুর। কথা আসে কথা যায়, কথায় কথা মিলায়। এই রকম মিলেমিশেই হয়তো ভাষার কিছুটা সুর বদল হয়। তার ছন্দোরূপ হয়তো নতুন পথের নিশানা খোঁজে, তবু আমাদের নিত্যদিনের মুখের ভাষা অচেনা হয় না কখনো। সময় সমাজ পরিবেশ আর দিনযাপনের আন্দোলনে মুখের ভাষা দোল খায়, টোল খায়; কিন্তু ভোলটাও কি বদলে যায় তার? নিশ্চয়ই নয়। যেকোনো আ মরি মোদের ভাষার শক্তি এখানেই। এই মুখের ভাষাই যখন জনমান্যতার পথ ধরে সম্প্রচারের খাতে বয়, তখন তার প্রয়োগে সতর্ক থাকতে হয় না কি? সতর্কতা বলতে বুঝব, কোনো প্রহরীর রক্তচক্ষু নয়, ভাষা প্রকাশের অনায়াস প্রবাহকে এতটুকু আঘাত কববে না, আবার ভাষাকে বিপর্যস্ত বিধ্বস্তও করে তুলবে না— তেমন চেতনা জাগিয়ে রাখা। ভাষাকে ভালোবেসে তার সঙ্গে ঘরসংসার পেতে বসলে এ চেতনা আপনিই সমৃদ্ধ হয়।

ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে আজ কথায় পেয়েছে। প্রলয়নাচের ভঙ্গিতে কথা এখন আছড়ে পড়ছে সর্বত্র। যেমন ঘটছে মুঠোর মধ্যে সাপটে ধরা মোবাইল ফোনেও। টেলিভিশন ও রেডিয়োর সর্বাধুনিক সম্প্রচার-প্রকরণ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে: 'কথার বুলেট ছুটবে, কথার খই ফুটবে, কথার তোড়ে আকাশ ফুঁড়ে কথার ঝড় উঠবে।' কিন্তু কী কথা? শুধুই কি কথা? কী থাকে কথার শরীরে? সংযোগের জন্যই সম্প্রচার। তাই সম্প্রচারের ভাষা সংযোগেরই ভাষা। টেলিভিশন রেডিয়োর ক্ষেত্রে দর্শকশ্রোতাদের সঙ্গেই তো সংযোগ। আবার এই দুই মিডিয়ার সঙ্গে দর্শকশ্রোতাদের কথোপকথনেরও (*ফোন ইন*) মহোৎসব চলছে এখন। ফলে মুখ থেকে শুধুমাত্র কিছু শব্দ নিঃসৃত হয় না, টেলিভিশনের পর্দায় পরিবেশকের (*অ্যাংকর*) চোখ মুখ ঠোঁট হাত হাতের আঙুল, তাঁর বেশবাস সাজসজ্জা— সবই কথা বলে ওঠে। এ ছাড়া পরিবেশকের কণ্ঠস্বরধ্বনি এবং তার চিৎকৃত ঘাত-সংঘাতে বাচনিক ও অবাচনিকের এক মিশ্রণ (*প্যাকেজ*) তৈরি হয়। তাই শুধু ভাষা নয়, মিডিয়ায় ভাষা-প্রকাশের ভঙ্গিটাও একটা ভাষা। এর মধ্যে বেগ অতিবেগ আবেগ নিরুদ্‌বেগ সব কিছুই মিশে থাকে। নিভৃত নির্জনতার স্তব্ধতার ভাষাকে এখন অনুসন্ধিৎসুর মতো খুঁজতে হয়। পরিবেশনায় (*প্রেজেন্টেশন*) এমনই এক

বাধ্যতার ভূমিতে অপরিমেয় আগ্রাসী চাহিদার মুখে দাঁড়িয়ে আছেন এই সময়ের সম্প্রচারক। এই চাহিদা কীভাবে তৈরি হচ্ছে সেই আলোচনা আর এক তত্ত্বলোকের বিষয়।

ভাষার গতি আছে, সে-গতি প্রগতির পথেই চলবে— এটাই তো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়ার এই ধ্বনিঝংকার ও বাক্-বিস্ফোরণে ভাষার দুর্গতি-চিন্তায় (সম্ভবত অধোগতি নয়) অনেকেই উদ্‌বিগ্ন। বানান, শব্দের প্রয়োগ, বাক্যবিন্যাস ও ভাষার প্রকাশভঙ্গি নিয়ে মন খারাপ করেন কেউ কেউ। সম্প্রচারে উপস্থাপকদের সরসতা, সহজতা ও আন্তরিকতার নতুন সংজ্ঞা তৈরি হচ্ছে যেন। উল্লাসলাস্যে বিগলিতভাষ্যে ঝংকারে নিনাদে এক দুর্দমনীয় উত্তাল সম্প্রচারের এই সময়সন্ধিতে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ভাষার প্রয়োগ নিয়ে ভাষাভাবুকরা কী ভাবছেন, তাই নিয়েই এই গ্রন্থ।
শুধুমাত্র ভাষাবিদ বা ভাবুকরাই নন, সম্প্রচারের কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত কয়েকজনের লেখাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকেই সম্প্রচারের ভাষাকে তাঁরা দেখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, পরামর্শও রেখেছেন। অনেকের চিন্তায় সমদর্শিতাও আছে, তা অপরিবর্তিতই রাখতে চেয়েছি। সম্প্রচারের ভাষাচর্চা বা প্রয়োগে কোনো সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে এ গ্রন্থ নয়, বরং লেখকদের নানা মত নানা পথ যদি সম্প্রচারকদের ভাষা-ভাবনায় কিছুটা উদ্দীপিত করে—তবে সেখানেই এই প্রয়াসের সার্থকতা।

বছর চারেক আগে সম্প্রচারের ভাষা বিষয়ে বেতার সাংবাদিক প্রণবেশ সেনের স্মৃতিতে একটি সংকলন সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সংশ্লিষ্ট লেখকদের অনুমতিক্রমে, কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের সংযোজনী-সহ সেই লেখাগুলিও অন্তর্ভুক্ত হল। এই সুযোগে তাঁদের এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত লেখকদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বইটিকে *চারটি পর্বে* ভাগ করা হয়েছে। *প্রথম পর্বে* ভাষাভাবুক ও অভিজ্ঞ সম্প্রচারকদের ভাবনা। কলকাতা বেতার (*আকাশবাণী*) ৮০ বছরে পা দিতে চলেছে। সে-কথা মনে রেখে *বেতার জগৎ* পত্রিকার সূচনা-যুগের সম্পাদক নৃপেন মজুমদার ও বিশিষ্ট সম্প্রচারশিল্পী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের দু-টি রচনা এই পর্বে অন্তর্ভুক্ত হল। *দ্বিতীয় পর্বে* আছে বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদ পরিমল গোস্বামীর রচনা। সবই বেতারের অনুষ্ঠান বিষয়ক। বিভিন্ন সূত্র থেকে উদ্ধার করা এই লেখাগুলোর উপযোগিতা বোধ হয় আজও ফুরোয়নি।

তৃতীয় পর্বে রয়েছে প্রয়াত বেতার সাংবাদিক সংবাদ-ভাষ্যকার প্রণবেশ সেনের রচনা। সম্প্রচারের আদর্শ ভাষা নিয়ে এ-গ্রন্থে যত আলোচনা হয়েছে, তার নিরিখে হয়তো লেখাগুলি, বিশেষ করে গত শতকে বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত একগুচ্ছ *সংবাদ পরিক্রমা*, সম্প্রচারের ভাষাদর্শের একটা ধারণা গড়ে দিতে পারে। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে *সংবাদ পরিক্রমা*'র (মাত্র পাঁচ মিনিটের কথিকা) সর্বাধিক জনপ্রিয়তার যুগে (সত্তরের দশকে) কীভাবে এই লেখা একটি রাষ্ট্রের (*বাংলাদেশ*) জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল, প্রতিদিনের বেতার ভাষ্য কীভাবে হয়ে উঠেছিল সময় ও স্বপ্নের যৌথ শিল্প, তার কাহিনিও ছবির মতো শব্দপ্রতিমায় গড়ে দিয়েছেন প্রণবেশ সেন। আর আছে সংযোগ-মাধ্যম হিসেবে বেতার নিয়ে তাঁর অনুভবের কথা। *চতুর্থ পর্বে* শব্দের বানান, প্রয়োগ ও উচ্চারণের কিছু নমুনা রাখা হল, যা সম্প্রচারক বা মিডিয়ার অনুষ্ঠান পরিবেশকদের তাৎক্ষণিক সব চাহিদা পূরণ করবে তা নয়, কিন্তু তাঁদের হয়তো আরও একটু অভিধানমুখী করে তুলতে পারে। এই নমুনাপত্রটি প্রস্তুত করে দেওয়ায় ভাষাবিদ সুভাষ ভট্টাচার্যের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ভাষাভাবুক অভিধান-প্রণেতা অশোক মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর উৎসাহ ও সক্রিয় সমর্থন ছাড়া এই গ্রন্থের প্রকাশই সম্ভব ছিল না। বিশিষ্ট বন্ধু নিবন্ধকার ও সম্পাদনা-প্রকাশনা বিশেষজ্ঞ প্রভাতকুমার দাসের সাহায্য ও পরামর্শ প্রয়োজন হয়েছে সর্বক্ষণ। তাঁর কাছে আমি নানাভাবে ঋণী। প্রকাশক *গাঙচিল* যেকোনো গ্রন্থের উপস্থাপনাকর্মে ও বিষয় নির্বাচনে অত্যন্ত যত্নবান। কিন্তু এ-গ্রন্থটি প্রকাশে তাঁরা কতটা ঝুঁকি নিলেন, আমিই-বা তাদের ওপর কতটা দায় চাপিয়ে দিলাম জানি না। তাঁদের উৎসাহ আমাকে অভিভূত করেছে।

যথাসাধ্য সতর্কতা ও মনোযোগ সত্ত্বেও সম্পাদকের সংশয় ঘোচে না সহজে। এ ক্ষেত্রেও তেমনটাই মনে হচ্ছে। অনিচ্ছাকৃত যেকোনো ত্রুটি অসংগতি ও অপূর্ণতার জন্য আগাম ক্ষমাপ্রার্থী।

ভবেশ দাশ

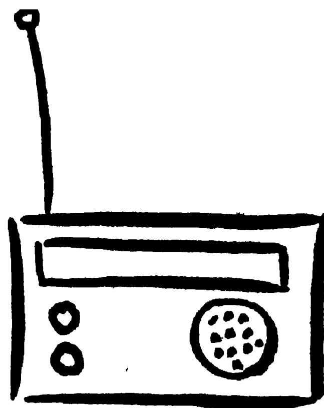
কৃতজ্ঞতা

শঙ্খ ঘোষ অশোক মুখোপাধ্যায় সুভাষ ভট্টাচার্য
প্রভাতকুমার দাস সংযুক্তা সিংহ শ্রেয়া বসু
সাধনা দাস এলা মজুমদার দাশ
সোহিনী সেনগুপ্ত সুহিতা দাশ

সূচিপত্র

১

সম্প্রচারের
ভাষা
ও
ভঙ্গি



কেমন লিখব, কেমন বলব

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সম্প্রচারের ভাষা সেটাই হওয়া উচিত, যে-ভাষা সব চাইতে বেশি সংখ্যক উদ্দিষ্ট শ্রোতার কাছে পৌঁছোতে পারে।

বাংলায় দুটো ভাষারীতি আছে। একটা হচ্ছে সাধু রীতি। আর একটা মান্য চলিত রীতি। তা ছাড়াও একটা আছে কথ্য ভাষা। যাকে বলি, কথ্য রীতির ভাষা। কথ্য রীতিতে সম্প্রচার করা যাবে না। তার কারণ কথ্য রীতিতে এক অঞ্চলের সঙ্গে আর এক অঞ্চলের ফারাক থাকে। পশ্চিমবঙ্গে এতগুলি জেলা। লক্ষ করে দেখবেন, নানা জেলায় কথ্য ভাষা আলাদা। আর তার সঙ্গে যদি বাংলাদেশকে ধরা হয়, তাহলে তো আরোই আলাদা। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

যেমন পূর্ববঙ্গে পেঁপে-কে বলে 'কমফা'। আবার সব জায়গায় তা নয়। আপনারা 'কুসুর' কথাটা জানেন? পূর্ববঙ্গে অনেক জায়গায় আখকে বলে কুসুর। এই হচ্ছে কথ্য ভাষা। আঞ্চলিক ভাষা। বলা

যায় আঞ্চলিক কথ্য ভাষা। এই ভাষায় সম্প্রচার করলে তা অনেক লোকের কাছে পৌঁছোবে না। একমাত্র যে এলাকায় সেই কথ্য ভাষা চলে, সেই এলাকার মানুষ এই ভাষা বুঝতে পারবেন। বাদবাকি এলাকার মানুষ বুঝতে পারবেন না। আবার যেমন 'ডিঙলি' মানে হল কুমড়ো। পশ্চিমবঙ্গেরই একটি আঞ্চলিক ভাষা। চালকুমড়ো নয় কিন্তু। 'ডিঙলি' কথাটা এসেছে ডিঙি লাউ থেকে। আপনারা যদি বর্ধমান, বাঁকুড়ায় যান দেখবেন ওখানে কুমড়োকে 'ডিঙলি' বলা হচ্ছে।

যদি সম্প্রচারের সময় কুমড়ো না বলে একটা বিশেষ এলাকার কথ্য ভাষায় 'ডিঙলি' বলা হয়, তাহলে শুধু সেই বিশেষ এলাকার মানুষ বুঝতে পারবেন। বাদবাকি এলাকার লোকজন বুঝতে পারবেন না। আবার সম্প্রচারের ভাষা কি সাধু রীতিতে হবে? না, তা হবে না। কারণ আমরা সাধু ভাষায় কথা বলি না। আমরা যে-ভাষায় কথা বলি তার একটা মান্য চলিত রূপ রয়েছে। এটাকে মান্য চলিত রূপ বলছি এই কারণে যে কোনো জেলায় সাহিত্য রচনা করা হয় এই ভাষায়। সব জায়গারই যারা মোটামুটি শিক্ষিত মানুষ, তারা এই ভাষা বুঝতে পারবেন। এটাকে মান্য চলিত ভাষা বলা হয়। শুধু চলিত ভাষা বলব না।

এখন প্রশ্ন হল, মান্য মানে কাদের দ্বারা মান্য? সর্বজনের মান্য। সাহিত্যের, বিশেষ করে কথাসাহিত্যের দুটো দিক থাকে। একটা হল গল্পে লেখকের নিজস্ব অংশ, এটাই লিখতে হবে, যখন তাকে দিয়ে কথা বলানো হচ্ছে। কিন্তু লেখক যখন কথা বলছেন, সে বাংলাদেশের লেখকই হোন, কি এখানকার লেখক, তাঁরা কিন্তু মান্য চলিত ভাষা ব্যবহার করবেন। মান্য চলিত ভাষাটা যেহেতু মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি সাধু রীতির বাংলার তুলনায়, তাই আমরা যখন সম্প্রচার করব, তখন এই ভাষাটাই ব্যবহার করা উচিত। আমরা জানি যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলা খবরের কাগজ, সাহিত্য পত্রিকা, এমনকী সাহিত্য কিন্তু সাধুরীতির বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে। বিদ্যাসাগর বঙ্কিম এঁরা তো সাধু ভাষাতেই লিখতেন। আর সব খবরের কাগজ কিন্তু সাধু ভাষাই ব্যবহার করত। এটা অনেকের ধারণা, খবরের কাগজের ক্ষেত্রে সাধু ভাষা থেকে মান্য চলিতে যে উত্তরণ ঘটেছিল তা ষাটের দশকের শেষে হয়েছে এবং অনেকেই ভাবেন 'যুগান্তর' প্রথম এটা

করেছে। এটা কিন্তু ভুল ধারণা। কলকাতায় হেদুয়ার উত্তরে স্কটিশ চার্চ স্কুল। যেটাকে এখন বিধান সরণি বলা হয় সেই কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের পুব দিকের ফুটপাথে সেই স্কটিশচার্চ স্কুলের ঠিক উলটো দিকে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ছিল। তার নাম *পরাগ পাবলিশার্স*। সেখান থেকে *দৈনিক প্রত্যহ* নামে একটি পত্রিকা বের হত। এই কাগজের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলি। সাধারণত, খবরের কাগজে একজন সম্পাদকের নাম থাকে। এই কাগজে দুজন সম্পাদকের নাম থাকত—অজিতশঙ্কর দে এবং আসরাফ-উদ্দিন চৌধুরী। আসরাফ-উদ্দিন সুভাষচন্দ্রের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। আর দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য, সেটা খুব চমকপ্রদ। এই কাগজটি আদ্যন্ত চলিত বাংলায় ছাপা হত। সেই ১৯৪২-৪৩ সালে এই কাগজটি চলিত বাংলায় বের হত। পরে মালিকানা পালটাবার পর যেমন সম্পাদক পালটায়, যেমন ঠিকানা পালটায়, সেই রকম এর ভাষাও পালটে যায়। ফিরে যায় সাধু বাংলায়। নতুন মালিকের বোধহয় ধারণা হয়েছিল, *দৈনিক প্রত্যহ* কাগজের সার্কুলেশন যে বাড়ছিল না, তার কারণ বুঝি চলিত বাংলা, যেটা পাবলিক খাচ্ছে না। আর সাধু বাংলায় না লিখলে জোরালো, ওজস্বিনী একটা ভাষা পাওয়া যাবে না। তখনকার কালে যারা সম্পাদক ছিলেন তাঁদের বোধহয় এরকম একটা ধারণা ছিল যে ওজস্বিনী ভাষায় সম্পাদকীয় লিখেই তাঁরা ইংরেজ তাড়িয়ে দেবেন। তার জন্য আলাদা বোধহয় কোনোরকম আন্দোলন আর দরকার হবে না। অন্য মাধ্যম বলতে আমাদের সামনে আকাশবাণী আছে, দূরদর্শন আছে। আর পাঁচটা চ্যানেল রয়েছে। যেখানে মান্য চলিতই স্বীকৃত। যাকে আমরা Standard Bengali Prose বলি, এর সব চাইতে ভালো লেখক হলেন রাজশেখর বসু। আমি এখনও বিশ্বাস করি, রাজশেখর বসু যে মান্য চলিত বাংলা লিখতেন, তার চাইতে ভালো মান্য চলিত আর হয় না। আমি ওঁর গল্পের কথা বলছি না। রামায়ণ, মহাভারতের যে অনুবাদ তিনি করেছেন, আর তার সঙ্গে ওঁর যে প্রবন্ধের বইগুলো—*লঘুগুরু* ইত্যাদি, তার চাইতে ভালো মান্য চলিত বাংলা হয় না। আর কেউ লিখেছেন বলেও আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের মুশকিল হচ্ছে গিয়ে, আমরা মান্য চলিত বলতে অনেক সময় ভুল করে সাহিত্যিকের মান্য চলিতের কথা ভাবি। তা কিন্তু নয়। এক একজন লেখক তো এক-একরকম কায়দায়

লেখেন। অতরকম কায়দার মধ্যে পড়ে কিন্তু লোকে দিশেহারা হয়। কিন্তু রাজশেখর বসু যে গদ্য ভাষা লিখতেন, তাকে যদি আমরা আদর্শ করে নিই, আমার মনে হয় সেটাই বোধহয় সমস্যা নিরসনে সবচাইতে বেশি সহায়ক হতে পারে।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমে উচ্চারণ-দোষ বড়ো কানে লাগে। একটা চ্যানেলে আমি ক্রমাগত শুনে যাচ্ছি 'আবোহাওয়া'। আবোহাওয়া হয় না। আব্ মানে হচ্ছে জল। আবহাওয়া মানে হচ্ছে জলবায়ু। এই আব্‌কে কেন আবো করা হয়? তাই যদি করা হয় তাহলে 'আবোগারি' বলা হয় না কেন? তখন আবার আবগারিতে ফিরে যাওয়া হয় কেন? 'আহ্বান' শব্দের উচ্চারণ করা হয় 'আহোবান'। আহোবান নয়। আ, হ-য়ে হসন্ত, তার পর ইংরেজি W-র যে উচ্চারণ তার সঙ্গে আ-কার, তারপর ন। এটাই উচ্চারণ হবে, 'আহ্বান'। ওরফে শব্দের উচ্চারণ করা হয় 'ওর্ফে'। দিনের পর দিন এই ভুল উচ্চারণ করা হচ্ছে। 'কালীপদ ওর্ফে ন্যাটাকালি'— এভাবে বলা হয়।

এবার আসি বাক্যের ব্যবহার সম্পর্কে। সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বড়ো বড়ো বাক্য ব্যবহার না করে ভেঙে ছোটো করে নেওয়া উচিত। আরো একটা কাজ করতে হয়, অনেক সময় অনুবাদ করে বলতে হয়। আমি যখন নিউজে কাজ করতাম, মহাত্মা গান্ধি প্রার্থনা সভায় যে বক্তৃতা দিতেন তা অনুবাদের দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আমি হিমসিম খেয়ে যেতাম। তার কারণ, মহাত্মা গান্ধির ইংরেজি এমনি শুনতে খুব সহজ সরল। কিন্তু আমার মনে হত, অনেক কথাই দ্ব্যর্থবোধক। আমার যে অর্থ মনে হচ্ছে তা হয়তো নাও হতে পারে। ভয়ঙ্কর বিপদের কাজ ছিল ওই অনুবাদ। তখন অমূল্যচন্দ্র সেন আমায় বলেছিলেন, আগে একটা sentence-এর মানে কী তা বুঝে নাও। ওই sentence-টায় কী বলা হচ্ছে তা দেখে নাও। তারপর নিজের মনে ভাবো যে এই বক্তব্যটা বাংলায় জানাতে হলে তুমি কীভাবে জানাবে। তারপর সেটাই লেখো!

বাংলা ভাষার একটা নিজস্ব বাগ্‌ধারা আছে। সব ভাষাতেই থাকে। ইংরেজি বাগ্‌ধারাটা অনুসরণ করার দরকার নেই। ইংরেজি থেকে বাংলায় যখন করা হচ্ছে তখন বাংলা বাগ্‌ধারার কথা ভাবতে হবে।

অনেকগুলি ইংরেজি শব্দগুচ্ছ, যাকে phrase বলি, সেই phrase idiom-গুলির কোনো বাংলা আছে কি না তা দেখতে হবে। নিজস্ব বাংলা। একেবারে টায়েটোয়ে মিলবে না। কিন্তু ideaটা carry করছে এরকম কোনো phrase কিংবা idiom পাওয়া যায় কি না দেখতে হবে। অমূল্যচন্দ্র সেন একদিন আমায় বলেছিলেন, এই যে আজ তুমি কাগজে 'কুম্ভীরাশ্রু' লিখেছ, এটা লিখবে কেন? বাংলায় 'মায়াকান্না' বলে একটা কথা আছে, মায়াকান্না লেখো। কুম্ভীরাশ্রু লিখবে না। যাই হোক, এগুলো যদি ঠিকমতো ক্লাস নেওয়া যায়, রোজকার রোজ ক্লাস, তাহলে ভাষার উন্নতি ঘটতে বাধ্য। *আনন্দবাজার পত্রিকায়* এই কাজটা দীর্ঘদিন ধরে আমাকে করতে হয়েছে। তাতেও ভুল হত। ভুল মানে এই না যে আমাকে অমান্য করে কেউ ভুলটা করেছে। আসলে ধরতে পারছে না। কী করা যাবে। অনেকে পুরোনো অভ্যাস থেকে বেরোতে পারে না। অনেকে English Medium School থেকে আসে বলে বাংলায় কীভাবে কথা বলতে হয় জানে না। English Medium-এর দোষ দিচ্ছি না। English Medium-এ পড়েছে, আবার একই সঙ্গে বাংলাটাও ভালো লিখতে পারেন, বলতে পারেন এমন লোকও আমি দেখেছি। যাই হোক, একটা দৃষ্টান্ত দিই। খবরের কাগজে দেখলাম— একটা পাড়ায় আগুন লেগেছে। প্রতিবেশী পাড়ার লোকজন এসে আগুন নেভায়। দমকল তখনও আসেনি। এখানে 'প্রতিবেশী পাড়া' কেন লিখব? কথাটা হবে 'পাশের পাড়া' থেকে লোকজন এসে আগুন নিভিয়ে ফেলে। আমি বুঝতে পারছি 'neighbouring area' থেকে অনুবাদ করে 'প্রতিবেশী পাড়া' করা হয়েছে। আর এক জায়গায় দেখলাম, 'স্বাধীনতা তখন করমর্দনের দূরত্বে'। কেন, করমর্দনের পরিবর্তে 'হাতের নাগালে' বললে কী হয়? এগুলোই হল গিয়ে মুশকিল। সম্প্রচারের ভাষাটা মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসতে হয়। দেখতে হবে একই রকম idea carry করছে এরকম শব্দগুচ্ছ বাংলায় আছে কি না। সেইরকম শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া বাগাড়ম্বর অর্থাৎ গালভারী, কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার না করে সহজ সরল শব্দ ব্যবহার করতে হবে। অলংকারের ব্যবহার না করাই ভালো। আর সাধু চলিতের যেন মিশ্রণ না ঘটে। সম্প্রচারের ভাষা হবে সহজ, সরল, সকলের বোধগম্য।

বাংলা ভাষার মধ্যে তৎসম, অর্ধ তৎসম, তদ্ভব, দেশজ শব্দ এবং বিদেশি শব্দ আছে। এ ছাড়াও এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোকে ঠিক বিদেশি বলা যায় না। সেগুলো ভারতবর্ষেরই অন্যান্য ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ। বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ প্রচুর রয়েছে। বিশেষ করে আরবি, ফারসি শব্দ প্রচুর রয়েছে। দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অথবা রাজনৈতিক সম্পর্কের ফলে এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় ঢুকে যায়। ভাষার একটা মজা আছে। অনেকসময় একটা শব্দ অন্য ভাষা থেকে নেওয়ার সময় তার মূল অর্থটাকে পালটে দেওয়া হয়। 'খুন' এবং 'খুব' এই দুটো আরবি শব্দের কথা বলি। আরবিতে এই কথাগুলোর যে-মানে বাংলায় সেই মানে কিন্তু নয়। আরবিতে 'খুন' শব্দের অর্থ রক্ত। বাংলায় 'খুন' মানে হত্যা। আরবিতে 'খুব' কথাটার মানে সুন্দর। আর বাংলায় 'খুব' মানে আমরা 'অত্যন্ত' অর্থে বুঝি। তবে শুধু বিদেশি শব্দ নয়। আমরা সংস্কৃত থেকেও অনেক শব্দ ব্যবহার করি। শব্দের একটা প্রবণতা হল, তার মূল অর্থের আশ্রয় পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় কোনো অর্থের আশ্রয় গ্রহণ করা। বাংলা ভাষায় এরকম অনেক তৎসম শব্দ রয়েছে, যেগুলো মূল অর্থে আমরা ব্যবহার করি না। এই রকম দুটো দৃষ্টান্ত দিই। 'সচরাচর' শব্দটা আমরা ব্যবহার করি 'সাধারণত' অর্থে। এর ইংরেজি করলে দাঁড়াবে usually, normally, more often than not ইত্যাদি। কিন্তু 'সচরাচর' শব্দের মানে তা নয়। সচরাচর মানে হল চরাচর সহ। 'চর' মানে জঙ্গম। আর 'অচর' মানে স্থাবর। চরাচর হল চর এবং অচর। এই পৃথিবীকে আমরা চরাচর বলি। আবার 'সামান্য' শব্দটা আমরা 'নগণ্য', 'তুচ্ছ' অর্থে ব্যবহার করি। 'সামান্য' শব্দটার মানে কিন্তু তা নয়। সমানতার দ্যোতক যা, তাই হচ্ছে সামান্য। ধরা যাক, তিনজন মানুষ একসাথে বসে গল্প করছে। এই তিনজনের পোশাক ভিন্ন, কারও চোখে চশমা আছে, কারও নেই। এই রকম নানা বিষয়ে তিনজনের মধ্যে অমিল রয়েছে। কিন্তু একটা বিষয়ে তিনজনের মিল রয়েছে। সেটা হল তিনজনেই বাঙালি। এই বাঙালিত্বটা হল তাদের 'সামান্য' লক্ষণ। যা সমানতার দ্যোতক। সেখানে এই তিনজন কিন্তু এক। ইংরেজিতে এটাকেই বলে common factor. দর্শনের পরিভাষায় 'সামান্য' শব্দটা কিন্তু এখনও সামান্য লক্ষণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

বিদেশি শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় আসে ঠিকই। কিন্তু দুমদাম আমি ইচ্ছা করলেই লাগাতে পারি না। কোনো কোনো বিদেশি শব্দ আসবে না, কোনোটা আসবে কিন্তু কোনোটা আবার স্থায়ী জায়গা পাবে না। অনেক শব্দ আমাদের vocabulary তে ঢুকবে কিন্তু কোনোসময়ে হয়তো তাকে কান ধরে বের করে দেব। এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি জনরুচির মাধ্যমে চোলাই হয়ে আসে। অনেক সময় আমরা master বা মালিক বা প্রভুকে খুশি করার জন্য ইংরেজি বা বিদেশি শব্দ ব্যবহার করি। যেমন নবাবি আমলে আমাদের মঙ্গলকাব্যে অনেক আরবি, ফারসি শব্দ ঢোকানো হয়েছে, যেগুলো পরে আর থাকেনি। একটা দৃষ্টান্ত দিই। 'তোক' শব্দটার মানে হল লোহার শিকল বা বেড়ি। বাংলা ভাষায় এর কোনো ব্যবহার নেই। মঙ্গলকাব্যে কিন্তু এই শব্দটা ঢুকেছে। 'হাতে দিল তোক তার পায়ে দিল বেড়ি'— মঙ্গলকাব্যের এই লাইনটায় 'তোক' শব্দটা ঢোকানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এই শব্দগুলো বের করে দেওয়া হয়। আসলে কোন শব্দটা থাকবে আর কোন শব্দটা থাকবে না তা কোনো বৈয়াকরণের মরজির ওপর নির্ভর করে না। কোনো সাহিত্যিকের মরজির ওপর নির্ভর করে না। কোনো সাংবাদিকের মরজির ওপর নির্ভর করে না। এটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে একটা দীর্ঘমেয়াদি জনরুচির ওপর। এই জনরুচির দ্বারা চোলাই হয়ে যেটা থাকবার সেটা থাকে, আর যেটা থাকার নয়, তা থাকে না। ইদানীং কতোগুলো শব্দ বাংলা ভাষায় ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে। *হাঙ্গামা* শব্দটার মানে আমরা বুঝি গণ্ডগোল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা। কিন্তু এখন *হাঙ্গামা* শব্দটা *বেশি কেনাকাটা* অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। *পুজো-হাঙ্গামা*। মানে পুজোর কেনাকাটা। 'ধামাকা' শব্দটাও কেনাকাটা অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। খবরের কাগজগুলোও দুটো টাকা বেশি পাওয়ার লোভে এই বিজ্ঞাপনগুলো নিচ্ছে, এটা নেওয়া উচিত নয়। আমি একটা বাক্য দেখেছি, বাংলা খবরের কাগজে প্রথম পাতায়। একটা বড়ো বিজ্ঞাপন: 'দেড় করোড় পাও অর মুসকুরাও।' অর্থাৎ দেড় কোটি পেয়ে হাসুন। কড়োর কথাটা সাধারণত বাংলায় ব্যবহার করি না। আমরা কোটি শব্দটা ব্যবহার করি। একমাত্র একটা প্রয়োগ আছে যখন ক্রোড়পতি বলি আমরা। কোনো অবাঙালি কোম্পানি এই বিজ্ঞাপনটা দিয়েছে। খবরের কাগজের উচিত ছিল বিজ্ঞাপনটা ফেরত দিয়ে দেওয়া। বলা উচিত ছিল ভাষাটা পালটান। না হলে আমরা বাংলা কাগজে ছাপাব না। কিন্তু পয়সার লোভে ছাপা হল। এটা ধিক্কার দেওয়ার মতো ব্যাপার।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলিতে এখন বাংলা ভাষা নিয়ে ছিনিমিনি করা হচ্ছে। আসলে বাংলা ভাষার প্রতি যাদের কোনো মায়ামমতা নেই, তারাই এই রকম করে। 'একটা কিনুন, দুটো পান'—এটা কি রকম বাংলা হল! Buy one get two—এই হচ্ছে ইংরেজি। বাংলায় বললে বলতে হবে 'একটা কিনলে দুটো পাবেন।' এছাড়া বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলিতে এখন একটা রেওয়াজ হয়েছে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি এই তিনটে ভাষা মিশিয়ে কথা বলা। তিনটে ভাষা জানা ভালো। তিনটে ভাষার নিজস্ব বাগ্‌ধারা রয়েছে। সেগুলো জানাটা আরো জরুরি। কিন্তু এই তিনটে ভাষাকে তালগোল পাকিয়ে ফেলাটা কোনো কৃতিত্বের পরিচয় নয়। দৈনন্দিন জীবনে কথা বলার মধ্যে ইংরেজি শব্দ আমরা ব্যবহার করে থাকি। কতগুলো ইংরেজি শব্দ আমাদের ব্যবহারের মধ্যে এসে যাবেই। যেমন চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। সেগুলো বলতেই হবে। কিন্তু বাংলা ভাষা বলার সময় যতোটা সম্ভব অন্য ভাষা এড়ানোই উচিত।

এখন আরো একটা প্রবণতা লক্ষ করছি। সেটা হল, খুব দ্রুত কথা বলা। যা কখনোই উচিত নয়। কারণ এইভাবে দ্রুত বললে যা জানাতে চাওয়া হচ্ছে, তা কিন্তু শ্রোতার বোধগম্য হবে না। সৈয়দ মুজতবা আলি বলতেন, যারা ভালো ইংরেজি জানে না, দেখবে তারা প্রত্যেকটা শব্দ লাথি মেরে মেরে উচ্চারণ করে। এখন এই ভাবে বাংলা বলার একটা প্রবণতা আমি দেখছি। বিশেষ করে দূরদর্শন এবং অন্যান্য চ্যানেলে এইভাবে বাংলা বলা হচ্ছে। ঝোঁক দিয়ে দিয়ে বাংলা বলা হয়। সৈয়দদা বলতেন, যে ভালো রান্না জানে না সে সেটাকে গোপন করার জন্য ঠেসে ঝাল দিয়ে দেয়। এর ফলে যারা সেই খাবারটা খাবে, বলবে বড্ড ঝাল হয়েছে। কিন্তু খারাপ হয়েছে, একথা বলবে না। বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলিতে অনর্থক ঝোঁক দিয়ে দিয়ে, বিকৃতভাবে বাংলা বলে বাংলা ভাষার সর্বনাশ করা হচ্ছে।

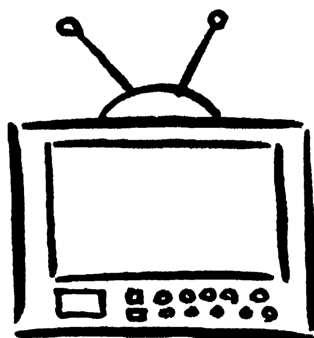
বেসরকারি চ্যানেলগুলিতে খবর পড়ার সময় নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করা হয়। দেখতে ভীষণ খারাপ লাগে। লক্ষ্য হল একটা খবর শ্রোতা বা দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গি করে বা নিজস্ব কোনো মতামত জানিয়ে খবর পরিবেশন উচিত নয়। সব সময় নিরপেক্ষভাবে, কোনোরকম মতামত না দিয়ে খবর পেশ করা উচিত। অনেক সময় বেশি চলতি ভাষায় কথা বলতে গিয়ে এমন সব শব্দ ব্যবহার করা হয় যা

শুনতে খুব খারাপ লাগে। মান্য চলিত ভাষাকে ক্রমাগত colloquial করতে হবে।

মনে রাখতে হবে একজন সম্প্রচারকের প্রধান কাজ হল:

- যত বেশি সম্ভব লোকের কাছে পৌঁছোনো।
- তাই তার ভাষা এমন হওয়া উচিত, যেটা খুব বেশি সংখ্যক লোক বুঝতে পারে।
- মান্য চলিত বাংলাকে তিনি যতটা সম্ভব কথ্য ভাষার কাছাকাছি রাখবেন। কিন্তু তাকে তিনি কখনোই কথ্য ভাষা করে তুলবেন না।
- তাঁর বলার ভঙ্গিতে এমন আভাস তিনি দেবেন না, যাতে তিনি যে ঘটনার কথা বলছেন তার বিরোধী অথবা সমর্থক বলে তাকে মনে হয়। তাঁর ভাষা ও ভঙ্গিতে কোনো পক্ষপাতের ছায়া যেন না পড়ে।

লেখক কবি, সাংবাদিক, ভাষাভাবুক. বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি। রচনাটি অনুলিখিত



মুখের বাংলা, লেখার বাংলা

শিশিরকুমার দাশ

চার্লস ফার্গুসন ১৯৫৯ সালে যখন diglossia শব্দটি ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রথম প্রয়োগ করেন তখন একটি নির্দিষ্ট অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বোধ হয় ভাবেননি যে এই পারিভাষিক শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে, এবং শিথিলভাবে ব্যবহৃত হতে থাকবে। ফার্গুসন লিখেছিলেন, অনেক ভাষা-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় একদল লোক ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে একই ভাষার দুই বা তারও বেশি বিভিন্ন রূপ ব্যবহার করে থাকেন। এর সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হল শিষ্ট ভাষা ও উপভাষা, যেমন ইতালিয়ান বা ফারসি। বাড়িতে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে লোকে কোনো একটি উপভাষা ব্যবহার করেন কিন্তু অন্য উপভাষা-ভাষীদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় কিংবা কোনো বৃহত্তর সামাজিক প্রয়োজনে ব্যবহার করেন শিষ্ট ভাষা। অনেকসময় একই ভাষা-সম্প্রদায়ের মধ্যে একই ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যবহারের

বিশিষ্ট দৃষ্টান্তও অবশ্য আছে। বাগদাদে খ্রিস্টান আরবরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার সময় ব্যবহার করেন "খ্রিস্টান আরবি", কিন্তু যখন একটি মিশ্রভাষা-সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলেন, তখন বাগদাদের শিষ্ট উপভাষা, "মুসলমানি আরবি"।

ফার্গুসন এখানে ভাষা ব্যবহারের প্রসঙ্গ তুলেছেন তা বাংলার ক্ষেত্রে অনেকটা প্রযোজ্য সন্দেহ নেই। বরিশালের কিংবা ঢাকার লোক বাড়িতে বা আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে বরিশালের বা ঢাকার উপভাষা ব্যবহার করেন, কিন্তু বাড়ির বাইরে, কিংবা যেখানেই অন্য অঞ্চলের বাঙালির সঙ্গে কথা বলেন সেখানে ব্যবহার করেন শিষ্ট উপভাষা। শিষ্ট বাংলা উপভাষা ছাড়া অন্য বাংলা উপভাষায় যাঁরা কথা বলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলার দু-টি উপভাষা ভিন্ন প্রয়োজনে ভিন্ন পরিবেশে ব্যবহার করে থাকেন এটা আমরা সকলেই জানি। তবে লেখার কথা আলাদা। শিষ্ট উপভাষা ছাড়া, অন্য উপভাষাগুলি লেখার মতো বর্ণমালা নেই (অবশ্যই উপন্যাসে এবং নাটকে অন্য উপভাষাগুলি অনেক সময়ে আংশিকভাবে লেখার চেষ্টা যে হয় না তা নয়। সাধারণত যিনি যে উপভাষাতেই কথা বলুন-না কেন, লেখার সময় তিনি শিষ্ট উপভাষাই ব্যবহার করেন।

উপভাষাগুলির মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক এবং অন্বয়গত তফাত আছে, কখনো তফাতটা খুব বেশি নয়, কখনো তফাত যথেষ্ট। উপভাষাগত বিভিন্নতা ছাড়াও বাংলাতে আরও কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন ধরা যাক, যত সামান্যই হোক, হিন্দু বাংলা ও মুসলমান বাংলার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা মূলত শব্দগত। এই শব্দগুলি পারিবারিক এবং রক্তসম্বন্ধযুক্ত পরিভাষা, ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার বিচার, কখনো কখনো খাদ্য-পানীয় কখনো কখনো সামাজিক আচার-আচরণের সঙ্গে যুক্ত। হিন্দু বলেন 'জল', মুসলমান বলেন 'পানি', কিংবা হিন্দু বলেন 'বিয়ে' মুসলমান বলেন 'শাদি'। আব্বা, আম্মা, চাচা, ফুফা আর তার পাশে পাশে বাবা, মা, কাকা, পিসে ইত্যাদি শব্দ এক-একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। আর কতকগুলি শব্দ যেমন—আন্ডা, নাস্তা, দোয়া, গোস্ত, দাবত হিন্দু কখনোই ব্যবহার করেন না এমন নয়, তাদের ব্যবহার মুসলমানদের মধ্যে অনেক বেশি। এ ছাড়া আরবি-ফারসি কিংবা উর্দু জানা বাঙালি মুসলমানদের বাংলায় এমন কোনো কোনো ধ্বনি আছে

যা হিন্দু বাঙালির উচ্চারণে নেই—বাজার, ফজর, গরিব শব্দগুলি দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। তবে এদের সংখ্যা সামান্য, তাই সাধারণভাবে বলা চলে যে মুসলমান ও হিন্দুর বাংলায় যেটুকু পার্থক্য তা মূলত শব্দগত, ধ্বনিগত নয়।

উপভাষাগত পার্থক্য ছেড়ে দিলে বাংলায় আর-একটা পার্থক্য আছে, তা হল লেখার বাংলায়। সাধারণত সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা এই নামে সেই পার্থক্য চিহ্নিত করা হয়। অবশ্যই লেখার বাংলার মতোই মুখের বাংলাতেও পার্থক্য আছে, শিষ্ট উপভাষার মধ্যেই। সেই পার্থক্য রীতিগত। বিভিন্ন পরিবেশ, বিভিন্ন প্রসঙ্গ, যাঁরা কথাবার্তা বলছেন তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে তাঁদের যে নৈকট্য অথবা দূরত্ব সৃষ্টি হয়—সেই সমস্ত কিছুর সঙ্গে সেই পার্থক্য জড়িত। কিন্তু খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাগ যদি না-ও করি, মোটামুটিভাবে তিনটি স্তর সেখানে বেশ স্পষ্টভাবেই চেনা যায়। একটাকে বলা চলে "অনতিশিক্ষিত মানুষের কথ্য ভাষা" (ভা$_{১}$) আর একটিকে বলতে পারি, "শিক্ষিত মানুষের কথ্য ভাষা" (ভা$_{২}$), আর একটিকে বলতে পারি "আনুষ্ঠানিক ভাষা" (ভা$_{৩}$)। প্রথম স্তরে "আভিধানিক শব্দ"-এর ব্যবহার সবচেয়ে কম, তা ছাড়া এর মধ্যে স্ল্যাং-এর প্রয়োগ সর্বাধিক, অন্য উপভাষার শব্দের আবির্ভাবও কিছুটা বেশি। দ্বিতীয় স্তরে "আভিধানিক শব্দ" অপেক্ষাকৃত বেশি, স্ল্যাং-এর প্রভাব কম কিংবা নেই, ইংরেজির প্রয়োগ যথেষ্ট। আর তৃতীয় স্তরে "আভিধানিক শব্দ" প্রচুর, ইংরেজি শব্দ ও শব্দগুচ্ছের অপসারণের সচেতন প্রচেষ্টাজনিত সংস্কৃত বা সংস্কৃতায়িত শব্দ ব্যবহারের আধিক্য। বলাই বাহুল্য এই লক্ষণগুলি খুব নিখুঁত নয়। কিন্তু বাঙালি মাত্রেই এই তিনটি স্তরকে সহজেই তাঁর নিজস্ব ভাষানুভূতির ফলে, আলাদা করে চিনে নিতে পারেন। শুধু শব্দগত নয়, ধ্বনিতাত্ত্বিক কিছু কিছু পার্থক্যও এই স্তরগুলির স্বাতন্ত্র্য চিনতে সাহায্য করে। যেমন মহাপ্রাণতা ভা$_{১}$ এর স্তরে শব্দের আদিতে ছাড়া অন্যত্র প্রায় অনুপস্থিত, কিন্তু ভা$_{৩}$ স্তরে, আনুষ্ঠানিক ভাষা বলেই হয়তো, শব্দের অন্তেও মহাপ্রাণতা সচেতনভাবেই ঘোষিত—আকাশবাণীর ঘোষক কিংবা সংবাদ-পাঠকদের উচ্চারণ এর দৃষ্টান্ত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গির নানা বৈচিত্র্যও এই স্তরগুলিকে বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে পারে। মুখের ভাষার এই তিনটি সাধারণ স্তরবিভাগ যেমন সম্ভব, তেমনই সম্ভব লেখার ভাষার স্তর বিভাগ।

লেখার ভাষায় সাধু ও চলিত দুটি স্তর বা দু-টি শৈলী সর্বজনস্বীকৃত এবং এই দু-টি শৈলীর প্রত্যেকটির মধ্যেই মুখের ভাষার মতোই ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

২

সাধু ও চলিত দু-টিই লেখ্য বাংলার দু-টি রূপ। চলিত রীতি অবশ্যই মুখের বাংলার কাছাকাছি তবুও তা লেখ্য রূপই। তাকে লেখ্য বাংলার সঙ্গে একাত্ম করে দেখার কোনো কারণ নেই। সাধু ও চলিতের মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক তফাত নেই, শব্দগত তফাত নেই। তফাত আছে রূপতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে, তাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। এই প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড ডিমকের একটি মন্তব্য স্মরণ করা দরকার। কারণ এই বিদেশি বাংলার পণ্ডিতের মন্তব্য কোনো কোনো অবাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক মহলে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে বা বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। তিনি লিখেছেন, "সাধুভাষা কথ্য ভাষা নয়, চলিত ভাষার সঙ্গে তার ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য (তাই) খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও লোকে যখন সাধুভাষায় লেখা পাঠ করেন তখন সাধুভাষা ভিন্ন ভাবে উচ্চারণ করেন।" তিনি উদাহরণ দিয়েছেন যে 'লক্ষ্মী' শব্দটি চলিত ভাষায় উচ্চারিত হয় 'লোক্‌খি', কিন্তু সাধু ভাষায় নাকি 'লক্‌সমী', 'স্মরণ' চলিত ভাষায় উচ্চারিত হয় 'সঁরণ', সাধুভাষায় 'স্‌মরণ'। ডিমক আরও বলেছেন যে বাংলা বর্ণমালায় তালব্য, দন্ত্য এবং মূর্ধন্য 'শ' আছে—সাধু ভাষা পড়ার সময় নাকি কোনো কোনো লোক এই তিনটির পার্থক্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন।

মার্কিন পণ্ডিতের বাংলা সাধু ভাষা সম্বন্ধে এই মন্তব্য যে নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত একথা বাঙালির কাছে বিশদভাবে বলার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সাধুভাষায় এবং চলিত ভাষায় লিখিত বাংলার উচ্চারণ বিধি এক। সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে (সাধুভাষায় ব্যবহৃত) বাঙালি কোনো স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করে না, বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যেই সেই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়।

ডিমক সাহেব ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য ছাড়াও সাধু ও চলিতের মধ্যে শব্দগত পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। অধ্যাপক গর্ডন ফেয়ারব্যাঙ্কস কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির উদ্ভবের প্রাক্-স্তরের ধ্বনি

পুনর্গঠিত করার জন্য ৫১১টি শব্দের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। ডিমক (১৯৬০) সেই তালিকার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই শব্দগুলির ৩৯.৫% সাধু ও চলিত উভয় রীতিতেই ব্যবহৃত হয়, ৫.৬% উভয় রীতিতেই ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব। অবশ্য তিনি বলেছেন যে ইদানীং সাধু ও চলিতের শব্দগত পার্থক্য ক্রমশই কমে আসছে।

শব্দগত পার্থক্য দিয়ে এই দুই রীতিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা বৃথা। যাঁরা এখনও মনে করেন যে চলিত ভাষায় আভিধানিক শব্দ বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার সাধু ভাষার চেয়ে অনেক কম তাঁরা তথ্য বিচার না করেই এমন ধারণা পোষণ করেন। এমন কোনো শব্দ-তালিকা তৈরি করা কি সম্ভব যার দ্বারা বলতে পারা যাবে যে এই শব্দগুলি সাধু ভাষার জন্য, আর এইগুলি শুধু চলিত ভাষার জন্য? রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' যে চলিত ভাষায় লেখা এটা বোধ করি সর্বস্বীকৃত, ঠিক সেইরকমই স্বীকৃত যে তাঁর 'গোরা' সাধু ভাষায় লেখা। দু-টি বই থেকে দু-টি উদাহরণ তুলছি:

> এমন সময় আষাঢ় এলো পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেলো, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েচে; এইবার ঘন বর্ষণে গিরি নির্ঝরিণীগুলোকে ক্ষেপিয়ে কূলছাড়া করবে।

> শ্রাবণ মাসের সকালবেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার বিরাম নাই, ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিযা চলিয়াছে, যাহারা আপিসে কলেজে আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায় বাসায় মাছ-তরকারির চুপড়ি আসিয়াছে...

শব্দ গুনে গুনে যদি প্রমাণ করতে চাই যে সাধু ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি আর চলিত ভাষায় কম তাহলে এই দৃষ্টান্তগুলি তার প্রতিবাদ করবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা জানি কোনো লেখকই বলবেন না যে কতকগুলি শব্দ বিশেষভাবেই চলিত ভাষার, আর কতকগুলি শব্দ বিশেষভাবেই সাধু ভাষার। আর যদি এমন কোনো শব্দ থেকেও থাকে যা একটিমাত্র রীতির

জন্যই—তাদের সংখ্যা এতই সামান্য যে তার ভিত্তিতে এই দুটি রীতির পার্থক্য রচনার প্রচেষ্টা যে দুর্বল প্রচেষ্টা মাত্র তাতে সন্দেহ নেই।

সাধু ও চলিতের পার্থক্য আসলে রূপতাত্ত্বিক পার্থক্য। কয়েকটি সর্বনামের তির্যক রূপ এবং ক্রিয়াপদের কয়েকটি কালের রূপ দুই রীতিতে পৃথক। এবং এক রীতির রূপকে অন্য রীতিতে খুব সহজেই পরিবর্তিত করা চলে। এদের যদি তালিকাবদ্ধ করা যায়, দেখা যাবে এই পার্থক্য যৎসামান্য:

সর্বনাম

সাধু	তাহা	কাহা	যাহা	ইহা	উহা
চলিত	তা	কা	যা	এ	ও

ক্রিয়াপদ

	নিত্য অতীত	নিত্যবৃত্ত অতীত	ভবিষ্যৎ	ঘটমান	অসমাপিকা
সাধু	-ইল-	-ইত	-ইব	-ইতেছ্-	-ইয়া, -ইতে, -ইলে
চলিত	-ল-	-ত-	-ব-	-ছ্-	-এ, -তে, -লে

এই তালিকা থেকে দেখা যাবে যে সর্বনামের এই পাঁচটি রূপ ছাড়া অন্য সবক্ষেত্রে সাধু ও চলিতে কোনো পার্থক্য নেই। আর ক্রিয়া পদে নিত্য বর্তমানেও দুই রীতিতে কোনো পার্থক্য নেই। সাধু থেকে চলিত রীতিতে পরিবর্তনের জন্য তিনটি নিয়ম যথেষ্ট:

১ (ব্যঞ্জন) স্বর—-হ্—স্বর→(ব্যঞ্জন) স্বর—স্বর

২ { আ, ই, উ } ←আ→ { আ, এ, ও }

৩ ই—ব্যঞ্জন→...ব্যঞ্জন

এই নিয়মগুলি শুধু একটি রূপকে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ—চলিত রীতিতে ঘটমান বর্তমান বা অতীতের -ছ- রূপটি। প্রত্যাশিত রূপ -তেছ- । কোনো কোনো উপভাষায় এই রূপটি পাওয়া যায়। কবিতাতেও একসময় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে -তেছ- রূপটি শিষ্ট উপভাষায় নেই।

সাধু ও চলিত রীতিতে আর একটি পার্থক্য আছে ১নং অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রযোজক রূপের ক্ষেত্রে--'করিয়া', 'খাইয়া' জাতীয় ক্রিয়ারূপে।

সাধু: ধাতু + প্রযোজক মর্ফিম [আ / ওয়া] + ইয়া

যেমন: কর্ + আ + ইয়া = করাইয়া
খা + ওয়া + ইয়া = খাওয়াইয়া

চলিত: বিধি অনুসারে প্রত্যাশিত রূপ কর্ + আ + এ = করায়ে, খা + ওয়া + এ = খাওয়ায়ে। এই রূপগুলি কোনো কোনো উপভাষায় প্রচলিত আছে, কবিতাতেও ব্যবহৃত হত। কিন্তু শিষ্ট উপভাষায় এদের রূপ: কর্ + ই + এ = করিয়ে, খা + ই + এ = খাইয়ে। অর্থাৎ ১ নং অসমাপিকার চলিত রীতিতে প্রযোজক 'মর্ফিম' -ই-।

সুতরাং সাধু ও চলিতের পার্থক্য শুধু এই কয়েকটি রূপ পার্থক্যের ওপর নির্ভরশীল, শব্দ ব্যবহারের ওপর নয়।

৩

এখন তাহলে ফিরে যাওয়া যেতে পারে মূল প্রশ্নে। সাধু ও চলিতের পার্থক্য যখন সামান্যই, দুটিই যখন আসলে লেখার দু-টি রীতি তখন ফার্গুসন কথিত diglossia-র প্রশ্ন আদৌ উঠছে কেন? যেমন মুখের বাংলায় তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছি, সাধু ও চলিত রীতিতে সেইরকম স্তর দেখতে পাই। ১৮৬৭ সালে য়েটস সাহেব তাঁর বাংলা ব্যাকরণে vulgar, book-style এবং pedantic তিনটি রীতির উল্লেখ করেছিলেন। এই তিনটি রীতিই লেখ্য বাংলার রীতি। মধ্যযুগের ইউরোপে যেমন—Stylus altus, medius এবং humilis অর্থাৎ উচ্চ, মধ্য, এবং নিম্ন তিনটি শৈলীর কথা বলা হত, বাংলাতেও—সাধু রীতিই হোক আর চলিত রীতিই হোক—এই তিনটি শৈলীর বা স্তরের কথা বলা সম্ভব। কিন্তু তার সঙ্গে diglossia-র সম্পর্ক

কোথায়? সিংহলি ভাষায় diglossia-র কথা বলতে গিয়ে জেমস গেয়ার বলেছেন যে সেখানে লেখ্য ও কথ্য ভাষায় প্রভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট। একটি ভাষা শুধুই কথোপকথনের জন্য, অন্যটি প্রায় সমস্তরকম লেখার জন্য। আজকের বাংলায় সাধু ও চলিতের ক্ষেত্র বিনিময় এত ব্যাপক এবং এত বিস্তৃত যে সাধু ও চলিতের function-এর বা ব্যবহারের ক্ষেত্র দেখে তাদের আলাদা করাও অনুচিত হবে। সাধুভাষায় এখনও কেউ লেখেন না একথা বলা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না—লেখেন, কোনো বিশেষ সাহিত্যিক প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ আবহাওয়া ফুটিয়ে তোলার জন্য; কখনো-বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধু ভাষার প্রয়োগ এখনও আছে প্রথানুবদ্ধতার চিহ্ন হিসেবে—পাঁজিতে, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে, বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদির নিমন্ত্রণপত্রে। Diglossia প্রসঙ্গে ফার্গুসন (১৯৫৯) বলেছিলেন, তাঁর নিজের কথাই উদ্ধার করি, diglossia হল:

> a relatively stable language situation which, in addition to the primary dialects of the language—this is a very divergent, highly codified...superimposed variety, the vehicle of a large and respected body of written literature, either of an earlier period or in another speech community, which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken purposes, but is not used by any section of the community for ordinary conversation.

সাধু ভাষাকে “very divergent” বলা চলে না চলিত ভাষা থেকে, “highly codified” বলাও সম্ভব হবে না। তবে তা যে বাংলার বিভিন্ন উপভাষার ওপরে একটি “superimposed variety” তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। তাতে একটি “respected body of written literature” গড়ে উঠেছে সে বিষয়েও কোনো তর্কের অবকাশ নেই। তা অবশ্যই “learned largely by formal education”। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একথা বলা চলে না যে তা “used for most written and formal spoken purposes”। হয়তো লেখায় কোনো কোনো বিশেষ আনুষ্ঠানিক প্রসঙ্গে তা এখনও ব্যবহৃত, কিন্তু মুখের ভাষায় তার স্থান নেই। অবশ্যই সাধু ভাষা কোনো বাঙালির ordinary conversation বা কোনো ধরনের

কথোপকথনে ব্যবহার হয় না। আধুনিক বাংলার কথা মনে রেখে তাই বলব—গত শতাব্দীতে এবং এই শতাব্দীরও মধ্যভাগ পর্যন্ত সাধু ও চলিতের যে ক্ষেত্রবিভাগ ছিল বর্তমানে তা ঐতিহাসিক স্মৃতি মাত্র। চলিত ভাষাই এখন লেখার বাংলায় প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রই অধিকার করে নিয়েছে এবং শিষ্ট উপভাষার সঙ্গে তার যোগ, যেহেতু নিকটতর শিক্ষিত বাঙালির আনুষ্ঠানিক কথোপকথনে, বিচার-বিতর্কে তার প্রয়োগই ব্যাপক। সেক্ষেত্রে আধুনিক বাংলায় কোনো diglossia-র অস্তিত্ব স্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রয়াত লেখক অধ্যাপক, কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও অনুবাদক

উ ল্লে খ প ঞ্জি

Dimock, E. C. 1960 Literary and Colloquial Bengali in Modern Bengali Prose. In : Ferguson, C. A. and J. Gumperz (eds) : Linguistic Diversity in South Asia. Indiana : Indiana University Press.

Ferguson, C. A. 1959 Diglossia. Word 15. 325-40.

Yates, W. 1847 Introduction to the Bengali Language. Vol. 1, Calcutta : Baptist Mission Press.



কথার কর্ম: বার্তাবহন

রমাপ্রসাদ দাস

কথার কী (না, কী কী) কর্ম? আবার ভান—আমরা এমন ভান করব, যেন প্রশ্নটা এই প্রথম শুনলাম। এ প্রশ্নের উত্তর কেমন হবে তা প্রথমেই বলে নিই: কোনো একটা কাজকে, যেমন তথ্যজ্ঞাপনকে, কথার মুখ্য কাজ বলে শনাক্ত করা ঠিক নয়—কথার কাজ বহুমুখী। এ প্রসঙ্গে একজন দার্শনিক দু-টি অতি চমৎকার উপমা ব্যবহার করেছেন, হাতুড়ির উপমা ও কাগজের উপমা। হাতুড়ির মুখ্য কাজ পেটানো। যেমন পেরেক ঠোকা (যেমন এবড়ো-খেবড়ো ধাতব পাতকে পিটিয়ে দুরস্ত করা)। কিন্তু হাতুড়ি দিয়ে আরও নানান কাজ হয়—যেমন কাগজ চাপার কাজে লাগানো যায়, এটাকে দরজার ঠেক হিসাবে ব্যবহার করা যায়, বাগানে মাটি খোঁড়ার কাজে লাগানো যায়, ছোটো আঁকশি হিসাবে বা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কাগজের বেলা কিন্তু ও-রকম মুখ্য কাজ (ও গৌণ কাজ) খুঁজে পাওয়া যায় না। কাগজ লাগে

লেখার কাজে, ছবি আঁকার কাজে, মুড়বার (যেমন, বই, প্যাকেট, দেয়াল ইত্যাদি মুড়বার কাজ হয় কাগজ দিয়ে), কাগজ দিয়ে ঠোঙা বা বাক্স বানানো হয়। আরও নানা কাজে আমরা কাগজ ব্যবহার করি। এ-রকম কোনো কাজকে কিন্তু মুখ্য কাজের মর্যাদা দেওয়া যায় না। এবার উপমেয়তে ফিরে আসা যাক। আমাদের সিদ্ধান্ত হবে কথা হাতুড়ির মতো নয়; কাগজের মতো—এটা একটু বহুমুখী, অনেক কার্যসাধক, মাধ্যম।

বনেদি সূত্র: লক্-এর সূত্র

যে সিদ্ধান্তের কথা বললাম তা নব্য মত। বনেদি/ধ্রুপদি, প্রাচীন বা গতানুগতিক মতের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য নেই; তা কেন, বলব প্রাচীন মত এ-মতের পরিপন্থী, বা উলটে এ-মত প্রাচীন মতের পরিপন্থী। বনেদি মতে, কথার কাজ হল চিন্তা ব্যক্তকরণ ও জ্ঞাপন—নিজের ভাবনা ভাষায় ব্যক্ত করা ও অন্যকে তা জানিয়ে দেওয়া। 'চিন্তা' বলতে বোঝায় ভাবনাধারণা—যা ভাষায় ব্যক্ত হলে নির্দেশক বাক্যের রূপ পরিগ্রহ করে, যাতে কোনো তথ্য ব্যক্ত হয়। কাজেই ওই মতটি এভাবে ব্যক্ত করতে পারতাম:

কথার (প্রাচীনরা বলবেন, ভাষার) কাজ হল চিন্তার অভিব্যক্তি, বার্তাবহন, অন্যতে সে চিন্তা সংক্রমণ, পরিবহণ বা সম্প্রচার, বা আরও সংক্ষেপে এভাবে:

কথার কাজ হল তথ্যব্যক্তকরণ ও তথ্যজ্ঞাপন।

এখানে বার্তাবহন কথাটি নিয়েছি communication-এর প্রতিশব্দ হিসাবে, নিয়েছি রবীন্দ্রনাথ থেকে

(ধ্বনিকে) করেছে পদানত
বন্য ঘোটকের মতো
মানুষ শব্দেরে তার জটিল নিয়মসূত্রজালে
বার্তাবহনের লাগি অনাগত দূর দেশে কালে।

তবে রবীন্দ্রনাথ উক্ত বনেদি মত মেনে নিতে পারেন না, কোনো কবিই পারেন না ; কেননা কবিতা বার্তাবহ নয়—কবিতার কাজ আবেগ অনুভব (প্রকাশ ও) উদ্রেক, কল্পনা উদ্দীপ্তকরণ।

যে বনেদি মতের কথা বলছিলাম তার একজন প্রধান প্রবক্তা দার্শনিক জন লক। তিনি বলেন:

> The comfort and advantage of society not being to be had without communication of thoughts, it was necessary that man should find out some external sensible signs, where of these invisible ideas which his thoughts are made of, might be made known to others.

এ বাক্যের বক্তব্য:

সমাজে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা ভোগ করি তা, এককথায় সমাজজীবন, চিন্তার সংক্রমণ ছাড়া সম্ভব হত না। এজন্য প্রয়োজন হয়েছে (ভাষার মানে) অনুভবগম্য (শ্রবণীয় ও দর্শনীয়) মনোবহিস্থ চিহ্নের (শব্দের) উদ্ভাবন। ভাবনা বা চিন্তা গঠিত হয় যে অদৃশ্য ধারণা দিয়ে এ চিহ্নগুলি সে ধারণার (সুতরাং চিন্তার) প্রতীক। ফলে এ চিহ্নগুলি দিয়ে অন্যাকে নিজের চিন্তা জানিয়ে দেওয়া যায়।

এখানে 'চিন্তা' বা 'thoughts' খুব গুরুত্বপূর্ণ—চিন্তা সংবহন (জানান দেওয়া), বার্তাবহনই, (যেন) কথার/ভাষার একমাত্র লক্ষ্য। একথা ঠিক, কথার যে অন্য কর্ম আছে, যেমন প্রশ্নকরণ, অনুজ্ঞা, তা বনেদি মতে অস্বীকার করা হয় না। তবে পূর্বোক্ত উপমা দিয়ে বলি, (পেটানো ছাড়া অন্য, নানা কাজে) যথা, কাগজ চাপা দিতে, দরজার পাল্লায় ঠেক দিতে, হাতুড়ি যেমন ব্যবহার করা যায়, এ মতে, কথার উক্ত প্রয়োগ (জিজ্ঞাসা, অনুজ্ঞা ইত্যাদি) তেমনই ফালতু, উপরিপাওয়া, গৌণ প্রয়োগ।

(একমাত্র না হলেও) ভাষার মুখ্য প্রয়োগ হল বক্তার বা লেখকের চিন্তা ব্যক্ত করা, এবং এ চিন্তা অন্যতে—শ্রোতা বা পাঠকেতে—সংক্রামিত করা।

হালের একজন দার্শনিক এ মতকে লক্-এর সূত্র বলে অভিহিত করেছেন।

'চিন্তা', 'Thought'

আমরা 'চিন্তা চিন্তা' করে গেলাম। এর অর্থ বলার বিশেষ চেষ্টা করলাম না। এখন করছি। 'চিন্তা' দু-অর্থে ব্যবহৃত হয়—সংকীর্ণ অর্থে ও ব্যাপক অর্থে। সংকীর্ণ অর্থে 'চিন্তা' বলতে বোঝায় এমন কিছু যার অভিব্যক্তি তথ্যজ্ঞাপক বাক্য—এমন বাক্য যা সত্য অথবা মিথ্যা বলে গণ্য। এ অর্থে:

এ পৃষ্ঠাটি কালো কালিতে ছাপা

লক্ একজন ইংরেজ দার্শনিক

৭+৫=১২

এসব বাক্য চিন্তা ব্যক্ত করে। (কেউ কেউ সেই বাক্য (proposition)-কেই চিন্তা বলে বর্ণনা করেন।) 'চিন্তা'র এ অর্থে অবশ্যই বলা যায় না— কথামাত্রই চিন্তার অভিব্যক্তি। প্রশ্ন, অনুজ্ঞা, যথা:

বসো

কেমন আছ?

এ বাক্যগুলির পিছনেও চিন্তা আছে? বা কী চিন্তা আছে? এ-রকম বাক্য কি কোনো ভাবনা ধারণা বিশ্বাসের অভিব্যক্তি? এ-রকম বাক্য কি তথ্যজ্ঞাপক? এ-রকম বাক্য কি সত্য, মিথ্যা বলে পরিগণিত হতে পারে? তবে বলা যায়, 'চিন্তা'র ব্যাপক অর্থে, এ-রকম বাক্যেও চিন্তা ব্যক্ত হয়। এ অর্থে বক্তা কিংবা লেখক যা কিছু জানান দিতে চায় তা-ই চিন্তা—এ অর্থে অনুভূতি, সুখ, দুঃখ, আবেগ, ইচ্ছা, অভিপ্রায় এসবই চিন্তা। 'চিন্তা' এ অর্থে নিলে লক্-এর সূত্রের বিশেষ গুরুত্ব থাকে না, বা ওটা নিয়ে আপত্তি করার কিছু নেই, লক্-এর সূত্র আর আমাদের সিদ্ধান্তের (কথার বহুমুখিতা-তত্ত্বের) মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। বলতে হয় (লক্-এর সূত্র অনুসারেও) কথার কাজ হল বক্তার মনে যা আসে তা ব্যক্ত করা—কোনো ভাবনা, ইচ্ছা, আবেগ অনুভব ব্যক্ত করা, আর অবশ্যই বার্তাবহন।

কথার কর্মের উদাহরণ

কেউ কেউ বলেন, কথার প্রধান কাজ মিথ্যা কথা বলা, নিজের মনোভাব গোপন করা, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা, নিজের লোভ, মাৎসর্য ও অন্যান্য রিপুর তীক্ষ্ণ নখ বেড়ালের মতো গুটিয়ে রাখা। আরও কাজ:

অনুনয় করা

অনুরোধ করা

অন্যাকে প্রভাবিত করা (অনুজ্ঞা ও আবেগময় কথা ব্যবহার করে)

অন্যের কাছে নিজেকে চালাক প্রতিপন্ন করা

অভিশাপ দেওয়া

অশালীন উক্তি করা

আদর করা

আবেগ প্রকাশ করা

আবেগ উদ্রেক করা

আবোল-তাবোল বকা

উপাসনা করা

জিজ্ঞাসা করা

ধিক্কার দেওয়া

ধন্যবাদ দেওয়া

নিজেকে, বা অন্যকে, উত্তেজিত করা (যেমন, রাজনীতিক বক্তৃতায়)

নিজের উপস্থিতি জানানো

নিজে নিজে কথা বলা (হয়তো সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্য)

প্রশ্ন করা

ভয় দূর করা ('বলো হরি হরি বোল' বলে মৃতদেহ শ্মশানে বয়ে নিতে নিতে)

মন্ত্র পড়া

রসিকতা করা

লব্জ (বেশ! বেশ!)

শক্তি সঞ্চার/সঞ্চয় (হাঁই মারো, টান মারো হেঁইও।)

শিষ্টাচার (ভালো তো? কেমন আছেন? বললে medical report চাওয়া হয় না)

সহানুভূতি দেখানো

সান্ত্বনা দেওয়া

শীৎকার

স্বাগত জানানো

স্বাস্থ্য কামনা

স্বীকারোক্তি

ভিটগেনস্টাইন্ (Wittgenstein)-এর *Philosophical Investigations*-এর সঙ্গে যাদের সামান্য পরিচয়ও আছে এ প্রসঙ্গে তাদের এ বিখ্যাত প্রায়শ-উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি মনে পড়ার কথা।

Review the multiplicity of language in the following examples...
Giving orders, and obeying them—
Describing the appearance of an object, or giving its measurements
Constructing an object from a description (a drawing)—
Reporting an event—
Speculating about an event—
Forming and testing a hypothesis—
Presenting the results of an experiment in tables and diagrams—
Play-acting—
Singing catches—
Guessing riddles—
Making a joke, telling it—
Solving a problem in practical arithmetic—
Translating from one language to another—
Asking, thanking, cursing, greeting, praying—

জ্ঞানবিজ্ঞান ও বনেদি সূত্র

আমরা বনেদি সূত্রের, লক্-এর সূত্রের, সংকীর্ণতার কথা বলেছি, বলেছি কথা কেবল বার্তাবহন করে না, আরও বহু কাজ করে। কিন্তু বনেদি সূত্রের গুরুত্ব বুঝে নেওয়া দরকার। আর দরকার এ প্রশ্নের উত্তর জানা: কেন সূত্রটি এ আকার ধারণ করল; কেবল বা মুখ্যত তথ্যসংবহনের উপব জোর দিল।

অনেকে বিবুধ দর্শন ও পরবর্তীকালে বিজ্ঞান নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। দার্শনিক জল্পনাকল্পনা করতে গিয়ে তাঁরা কাব্যের (ও কাব্যদর্শনের) কথা ভাবেননি, কাব্যের কথা তাঁদের মাথায় আসেনি। (এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম অ্যারিস্টটল— যিনি কাব্যাদর্শ ও নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধেও অনেক ভাবনাচিন্তা করেছেন।) এখন, জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা হল এমন ভাষা যার সম্পর্কে বলা যায় এ ভাষা (তত্ত্ব বা) তথ্যজ্ঞাপক—এ ভাষার বাক্য এমন যে তা বিশ্বাস অবিশ্বাস (বা সংশয়ের) বিষয়, যা সত্য অথবা মিথ্যা। মানুষ তার কথা অবেগ প্রকাশের কাজে লাগায়, মানুষের জীবনে একটা আবেগের দিক যে আছে,

মানুষ কাব্যে সাহিত্যে শিল্পকলায় মগ্ন হয়—এ কথা এ দার্শনিকরা ভুলে গিয়েছিলেন এবং মানবজীবনের একটা দিকের (অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ দিকের) বৌদ্ধিক দিকের উপর তাদের সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এ দিকটি, আবার বলি, খুব গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই জ্ঞানবিজ্ঞানের যে গুরুত্ব বনেদি সূত্রটিরও সে গুরুত্ব। যে বৌদ্ধিক ঝোঁকের, মননের একদেশদর্শিতার কথা বললাম তা, বলা বাহুল্য, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে, অনেক কুসংস্কার থেকে বাঁচায়, সত্যের মুখোমুখি হতে সাহায্য করে। কাজেই বলতে পারি, বার্তাবহন ছাড়াও, কথা যুক্তি তর্ক দিয়ে মূঢ়তার আক্রমণ প্রতিরোধ করে। 'মূঢ়তার আক্রমণ' কথাটি নিলাম রবীন্দ্রনাথ থেকে। মানুষের ভাষা যে বুদ্ধির প্রকাশ, বুদ্ধির আলোকে সবকিছু সে যে দেখতে চায়—এ সত্যের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেছেন:

[মানুষ, মানুষের কথন]
ব্যূহে বাঁধি শব্দ অক্ষৌহিণী
প্রতিক্ষণে মূঢ়তার আক্রমণ লইতেছে জিনি।

আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ, কোনো কবিই, বনেদি সূত্রটি মেনে নিতে পারেন না—কেননা এ সূত্রে জীবনের আবেগ অনুভবের দিক, সুতরাং নান্দনিক দিক, অগ্রাহ্য করা হয়েছে। আমরা রবীন্দ্রনাথ থেকে যে ছত্রগুলি উদ্ধার করেছি তার থেকে এ ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে, রবীন্দ্রনাথও লক্-এর মতো, কেবল কথার বার্তাবহনের দিকের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে ভাষার দু-রকম প্রয়োজনের কথা বলেছেন:

মানুষ যেমন জানবার জিনিস ভাষা দিয়ে জানায় তেমনই তাকে জানাতে হয় সুখ-দুঃখ ভালোলাগা-মন্দলাগা...

মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আনন্দে। তাই ভাষার কাজে মানুষের দুটো বিভাগ আছে—একটা তার গরজের আর-একটা তার খুশির, তার খেয়ালের...

মানুষের বুদ্ধি-সাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে।

প্রসঙ্গত তিনি আরও বলেন:

জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই। তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার। সাজ-সজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। কিন্তু ভাবের ভাষা

কিছু যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা করে না বলা হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে উপযুক্তমতো তাতেই কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ, ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা করে দিয়ে।

(*বাংলাভাষা পরিচয়*)

এ কথাটাই একজন আধুনিক কবির হাতে এ রূপ নিয়েছে :

আজকের দিনে সকলেই স্বীকার করেন যে ভাষা দুইভাবে কাজ করে। এক দিকে সে খবর দেয়, অন্যদিকে সে জাগিয়ে তোলে। তথ্য বা জ্ঞানের জগতে আমরা চাই স্পষ্ট ও সুসংলগ্ন ভাষা, যার আয়তন তার সংবাদের সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে যাবে। কিন্তু কবিতার ভাষায় আমরা খুঁজি প্রভাব, যা তার ব্যাকরণ-নির্দিষ্ট অর্থকে অতিক্রম করে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে, যার বেগে আমাদের মনের অনেক স্বপ্ন স্মৃতি, চিন্তা ও অনুষঙ্গের যেন ঘুম ভেঙে যায়, ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি অনবরত প্রহৃত হতে থাকে।

(*'কালিদাসের মেঘদূত' / বুদ্ধদেব বসু*)

এককথায়, কথার* কাজ দুটো—জানানো ও জাগানো, তথ্যবহন ও ভাববহন। আর কথা বা ভাষাও দুরকম—জানানোর ভাষা ও জাগানোর ভাষা।

তথ্য

'তথ্য', 'বার্তা'—এ কথাগুলি বলতে শুধু সংবাদপত্রে-দেওয়া খবরের মতো বস্তু [খবর] বোঝায় না, বোঝায় যেকোনো কিছু যা জানা যায়, জানানো যায় ; বোঝায় :

ঘটনা
বস্তুস্থিতি/ব্যাপার/সত্য
তত্ত্ব
প্রক্রিয়া/কৌশল
প্রবণতা
অভিপ্রায়
মানসিক অবস্থা

---

* 'কথা, দ্ব্যর্থক। এর এক মানে: যেমন এখানে, কথন; আর-এক মানে: বিবৃতি, উক্তি—যা জানা বা জানানো হয়।

ইত্যাদি; বা বলতে পারি, নিম্নোক্ত কথার উত্তরে যা বলা হয় তাই তথ্য বা বার্তা, কথাটির ব্যাপকতম অর্থে

কী ঘটেছিল/কখন ঘটেছিল বলো
ব্যাপারটা কী
রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর নাম যুক্ত করলে কেন
পিথাগোরীয় উপপাদ্যটা কী
এ কৌটোটা কী করে খুলব, বলো
আজ কত তারিখ (বলো)
মহুয়া কার লেখা
তুমি এ কাজ করতে গেলে কেন।

এককথায়

কী (ক), কেন, কবে, কে, কী করে, কোথায়
এরকম প্রশ্নের উত্তরে যা বলা হয় তাই তথ্য,
সে উত্তর সত্য হোক বা মিথ্যা হোক
(সঠিক হোক কি না হোক)

শেষ ছত্রদুটিতে যা বলা হল তার গুরুত্ব বোঝা দরকার। এ ছত্রদুটি যোগ করে আমরা বলতে চাই, informative-এর ব্যাপক অর্থে সত্য (খবর) যেমন বার্তা, মিথ্যা (খবর)-ও তেমনই বার্তা বলে গণ্য। মানে:

মিথ্যা তথ্য, মিথ্যা বার্তা, মিথ্যা খবর

—এসব কথা ('সোনার পাথরবাটি'র মতো') স্ববিরোধী কথা নয়। আমরা হামেশাই এমন কথা বলি: অমুক সংবাদপত্র জেনেশুনে মিথ্যা খবর ছাপায়, ও সম্পর্কে দেওয়া তথ্যগুলি/খবরগুলি সব মিথ্যা।

এত কথা না বলে সংক্ষেপে বলা যেত:

যা ভাষায় ব্যক্ত হলে (প্রচ্ছন্ন বা প্রকট ভাবে) নির্দেশক বাক্যের আকার ধারণ করে তা (আলোচ্য অতিব্যাপক অর্থে) তথ্য।

বা বলা যেত:

যা সত্য বা মিথ্যা, যা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস (বা সংশয়) করা যায় তা-ই তথ্য।

আমরা বলেছি, তথ্য ব্যক্ত হলে পাই নির্দেশক বাক্য। কিন্তু কেবল বাক্যের আকার দেখে সবসময় বোঝা যায় না বক্তার বক্তব্য কী। আমরা

বক্তা আর শ্রোতার কথা বলব (লেখক ও পাঠক সম্পর্কেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুরূপ কথা খাটে)। বাক্য বার্তাবাহী হতে পারে, শ্রোতাতে সংক্রমিত হতে পারে, যদি এ শর্তগুলি (এগুলি, বলে রাখি, পর্যাপ্ত শর্ত নয়) পূরণ হয়।

শ্রোতা মনে করে বক্তা সত্যবাদী, নির্ভরযোগ্য, ইয়ার্কি বা প্রতারণা করার লোক নয়, করছেও না, তার হাতে এ বিষয়ে তথ্য থাকার কথা—সে serious, উপহাস শ্লেষ বিদ্রূপ করছে না।

আর বক্তাও কোনো লোকের কাছে (শ্রোতার) উক্তি করবে না

যদি সে ধরে না নেয় যে, শ্রোতা তাকে নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী, serious, এ বিষয়ে বলার অধিকারী বলে মনে করছে।

সম্প্রচার, communication, বার্তাবহন জটিল ব্যাপার, আরও বহু শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন। তার একটি:

কোনো নিঃসঙ্গ বাক্য (শ্রুত বা পঠিত বাক্য) থেকে সবসময় বোঝা যায় না বক্তার (বা লেখকের) বক্তব্য কী—বুঝতে হলে প্রসঙ্গের সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার।

আমি ক্ষমা চাইছি

উনি তো বিরাট পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত

কেন্দ্রীয় সরকার রামরাজ্য এনে দেবে

বোঝা যায় না বক্তা শ্লেষ বিদ্রূপ করল, নাকি সত্যই সে এসব বিশ্বাস করে। এ বাক্যটি নেওয়া যাক:

আমার ছেলে, আমার ছেলে

এটা কি মৃত পুত্রের জন্য মায়ের কান্না, নাকি হারিয়ে-যাওয়া ছেলের জন্য। নাকি ছেলের জয়ে উল্লাস, নাকি হাসপাতালে প্রসবের পর মা দেখল বা তার সংশয় হল তার ছেলের জায়গায় অন্য শিশুকন্যা রেখে দেওয়া হয়েছে, এমন অবস্থায় 'আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও' বলে মায়ের আর্তনাদ।

যথাযথভাবে বার্তাবহনের জন্য দরকার পরিস্থিতিজ্ঞান, জানা দরকার:

কে বক্তা, কী তার বক্তব্য, কেন সে এ কথা বলছে, তার অভিপ্রায় কী; তার সব কথার পিছনে কী এ উদগ্র আগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা আছে যে সে মুখ্যমন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রী হতে চায়, না আর কী?

আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ দু-রকম ভাষার কথা বলছেন, বুদ্ধিসাধনার ভাষা আর হৃদয়বৃত্তি প্রকাশের ভাষা। হৃদয়বৃত্তি—সুখদুঃখ, ভালোলাগা, মন্দলাগা—তিনি বলেন, অনেকটা বোঝানো যায়:

ভাবেভঙ্গিতে, ভাষাহীন আওয়াজে, চাহনিতে, হাসিতে, চোখের জলে... হৃদয়বৃত্তি প্রকাশ সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, সার্থক বার্তাবহনের জন্যও সেরকম আকার-ইঙ্গিত দরকার হতে পারে—দরকার হতে পারে ভাবভঙ্গি, চোখটেপা, ঠোঁট বাঁকানো, নাসিকাকুঞ্চন। এসব থেকে, কেবল বাক্য থেকে নয়, শ্রোতাকে (বা দ্রষ্টাকে) বক্তার বক্তব্য উদ্ধার করতে হবে।

কবির মুখ দিয়ে আমরা বলিয়েছি ভাষা দু-রকম : জানানোর ভাষা ও জাগানোর ভাষা। কবি যা বলেন (ভাষা-) দার্শনিকরা তা এভাবে চাঁছাছোলা কথায় ব্যক্ত করেন: ভাষার/কথার কাজ দুরকম:

১) Cognitive/Informative, বার্তাবাহী, তাথ্যিক বা জ্ঞানিক কর্ম

২) Non-cognitive/Non-informative, অ-তাথ্যিক, অ-বার্তাবাহী কর্ম। এ বিভাজন অতিসংক্ষিপ্ত, কেননা আসলে দ্বিতীয়ভাগে আছে তিনরকম কথা :

Emotive, Directive ও Performative

তা হলে দাঁড়াল কথার কাজ চার রকম:

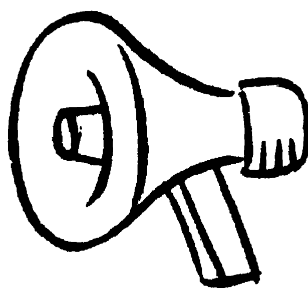
(১) Informative, তাথ্যিক

(২) Emotive, আবেগসঞ্চারী

(৩) Directive, অনুজ্ঞাবোধক ও

(৪) Performative, কৃতিসাধক

প্রয়াত লেখক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। ভাষা-দর্শন ও শব্দার্থ বিজ্ঞানের চিন্তাবিদ। রচনাটি লেখকের *কথার কর্ম ও অপকর্ম* গ্রন্থ থেকে গৃহীত



সাধারণ ভাষা ব্যবহার ও সম্প্রচারের ভাষা

পবিত্র সরকার

সাধারণ ভাষা ব্যবহারের নানা মাত্রা

মানুষ তার নিত্যদিনের কাজকর্মে যেমন, তেমনই নানা অনুষ্ঠান-উপলক্ষ্যের নৈমিত্তিক কাজকর্মেও ভাষার ব্যবহার করে, ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। বস্তুতপক্ষে ভাষা ছাড়া এই কাজগুলির অধিকাংশই তার পক্ষে করা সম্ভব হত না। দোকান-বাজার জিনিসপত্র কেনা-বেচা থেকে আরম্ভ করে ক্লাশে পড়ানো, ঝগড়া করা, নাসা থেকে মহাকাশচারীদের আদেশ-নির্দেশ পাঠানো, এমনকী কুকুর-বেড়ালকে আদর কিংবা শাসন—সবই হয় ভাষার মধ্য দিয়ে! বহু ক্ষেত্রে তার সঙ্গে মানুষের অন্যান্য শারীরিক আচরণ ও ক্রিয়া নিশ্চয়ই যুক্ত থাকে, কিন্তু ভাষা ছাড়া সেসব ক্রিয়া ও আচরণ প্রায়ই খুব দরিদ্র ও অসংলগ্ন মনে হয়। অন্য একটি প্রবন্ধে[১] আমরা ভাষার 'কাজ'-এর একটি দীর্ঘ তালিকা করেছি, কিন্তু এও বলেছি যে সে-তালিকা মোটেই সম্পূর্ণ নয়। তবু তা থেকেই কত

বিচিত্র লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে মানুষের ভাষা ব্যবহার চলে তার একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

মানুষের ভাষা ব্যবহারের সাধারণ প্রক্রিয়াটিতে ঠিক কী কী বিষয় জড়িত সে-সম্বন্ধে যেসব ভাষাবিজ্ঞানী চিন্তা করেছেন তাঁদের মধ্যে ডেল হাইম্‌জ-এর নামটি পৃথক মর্যাদার দাবি করে, এবং তাঁর 'দি এথনোগ্রাফি অফ স্পিকিং'[২] এ-বিষয়ে একটি দিকনির্দেশকারী প্রবন্ধ। আমাদের মনে হতেই পারে যে, এক জন কথা বলবে, আর এক জন শুনবে—এর মধ্যে এত জটিলতার কী আছে যে এত গবেষণা করতে হবে? এই প্রশ্ন ধরে একটু এগোলেই বোঝা যায় যে, বিষয়টা অত সরল নয়। এখানে আমরা তো শুধু মৌখিক ভাষা ব্যবহারের কথা বলছি। যদি এর সঙ্গে লিখিত ভাষা ব্যবহারকে জুড়ে নিই তবে তার জটিলতা আরও বেশ খানিকটা বেড়ে যাবে। সম্প্রচারের ভাষার ক্ষেত্রে লিখিত ভাষার বা ভাষার লিখিত রূপের প্রসঙ্গও আমাদের একটু আলোচনা করতে হবে।

যাই হোক, ভাষা হচ্ছে মানুষের এক ধরনের 'প্রকাশ'। এই 'প্রকাশ'-এর মধ্যে একটা ইচ্ছার শর্ত আছে, অর্থাৎ মানুষ কোনো একটা লক্ষ্য বা অভীপ্সা নিয়ে প্রকাশ করতে চায় বলে সে নিজেকে প্রকাশ করে, ফলে তা নিছক উদ্‌গারের মতো বা কেউ হাত মুচড়ে দিলে 'আঃ' বলার মতো নয়, প্রকাশ মাত্রেই তার শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় না। এমন হতেই পারে যে মানুষের প্রকাশের, অর্থাৎ তার কথা বলার ইচ্ছা কখনো কখনো অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—কারও ভয় দেখানো, চোখ-রাঙানি, উদ্যত দণ্ডের জন্যও সে কথা বলতে বাধ্য হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে সে চুপ করে থাকার বিকল্প পথও নিতে পারত হয়তো, কিন্তু তার অর্থ যেচে শাস্তিবরণ করা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কথা বলাতে যে মানুষের চিন্তা ও ইচ্ছা জড়িত, সে-কথা অত্যুক্তি নয়। প্রকাশের পিছনে কী আছে তা নিয়ে হাইম্‌জ কিছু বলেননি। কিন্তু এই যে প্রকাশ বিষয়টি, অর্থাৎ মানুষের কথা বলার ঘটনা, 'স্পিচ ইভন্ট্' যাকে বলেন রোমান ইয়াকবসন, তা বলতে ঠিক কী বোঝায়, কতগুলি দিক আছে তার, কী কী তাতে জড়িত? হাইম্‌জের মতে মোট সাতটি উপাদান (factor) তাতে থাকে। তাঁর দেওয়া ইংরেজি নামগুলির পাশে বাংলা নাম বসিয়ে আমরা সেগুলির তালিকা দিচ্ছি—
১. Sender প্রেরক ; ২. Receiver প্রাপক বা সম্ভাষিত ; ৩. Message

Form বার্তাশরীর ; ৪. Channel বাহন ; ৫. Code বাচন ; ৬. Topic বিষয় ; এবং ৭. Setting প্রতিবেশ, পটভূমি।

যে কোনো বার্তার একটি মানব-উৎস থাকে, সে-ই বার্তাটি পাঠাচ্ছে। হয় কথা বলছে, না হয় চিঠি লিখছে, না হয় প্রায় বাতিল হয়ে-আসা টেলিগ্রাফের যন্ত্রে টরে-টক্কা করছে। কথা বলতেই পারে সামনা-সামনি, কখনো টেলিফোনে, মাইক্রোফোনে, ভয়েস মেল-এ, টেলিভিশনের পর্দায় (মাইক্রোফোনেই বলতে হয় সেটাও) বা রেডিয়োর স্টুডিয়োতে—সেও মাইক্রোফোনে—ক্যাসেটে, সিডিতেও উচ্চারণ ধরে রাখতে পারি। 'লেখা' ব্যাপারটার মধ্যেও বিচিত্র সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। হাতে লিখতে পারি, ছাপিয়ে দিতে পারি, টাইপ করতে পারি—কম্পিউটারে ওয়ার্ডস্টারে বা টাইপযন্ত্রে, নিয়ন আলোতে বা বিজ্ঞাপনে বা পূজামণ্ডপের নানা আলোর নিশানায় লিখতে পারি বা আকাশে আতশবাজির সাহায্যে ক্ষণিক লেখাও লিখতে পারি। এই এত সমস্ত বাণীর যে-চূড়ান্ত মানব-উৎস—সেই হল প্রেরক। 'চূড়ান্ত' কথাটি বলার কারণ, অনেকসময় আমরা যেসব কথা (বা আবৃত্তি, গান, নাটক ইত্যাদি) শুনি তা সাক্ষাৎভাবে মানুষের মুখ থেকে শুনি না, শুনি ক্যাসেট, রেকর্ড বা সিডি থেকে, কখনো ভয়েস মেল থেকে। কিন্তু সেগুলি তো প্রেরক নয়, প্রেরক হল সেই মানুষটি যার কণ্ঠস্বরকেই ওসব যান্ত্রিক উপায় ধরে রেখেছে।

প্রাপক বা সম্ভাষিত হল যে প্রেরকের বলা বাচন শুনছে, পড়ছে বা অন্য কোনোভাবে গ্রহণ করছে। সে প্রেরকের সামনেই উপস্থিত এমন নাও হতে পারে—সম্প্রচারে যাঁরা কাজ করেন এ-বিষয়টা তাদের জানা। হাজার, দশ হাজার কিমি দূরেও থাকতে পারে, আবার বিশেষ করে লিখিত বা রেকর্ড-করা বার্তার ক্ষেত্রে প্রাপক হাজার, পাঁচ হাজার বছর পরের মানুষও হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে, যে বলছে সে-ই নিজে শুনছে। কথাগুলি বলছে সে নিজেকেই শোনানোর জন্য। নাটকের 'স্বগতোক্তি' অনেকটা এরকম ব্যাপার। আমরাও অনেকসময় নিজেরা বক্তা আর শ্রোতা হয়ে বাচনকর্ম সমাধা করি। আবার কেউ নিজের ঠাকুরঘরে গোপালের সঙ্গে কথা বলেন, কেউ নিজের কুকুরের সঙ্গে। কেউ-বা প্রয়াত স্বামীর ফোটোগ্রাফের সঙ্গে। ফলে আমরা খেয়াল রাখব যে, প্রেরক যেমন সবসময় একজন মানুষ হবেন চূড়ান্ত উৎসের বিবেচনায়, প্রাপক বা সম্ভাষিত সেখানে

জলজ্যান্ত মানুষ নাও হতে পারেন। হয়তো এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এগুলি স্বগতোক্তিরই একটা রূপ। কিন্তু কথাটা একেবারে আক্ষরিকভাবে বলা যাচ্ছে না। এর একটা কারণ সাধারণ প্রাপক বা শ্রোতা আবার প্রায়ই প্রেরকও বটে, তারা কথার উত্তরে কথা বলে। অর্থাৎ সাধারণ ভাষা ব্যবহারে সমস্ত প্রাপকই সম্ভাব্য প্রেরকও বটে কিন্তু এসব ক্ষেত্রে প্রাপকরা (যাদের উপলক্ষ্য বা উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে) প্রেরক নয়। তার আর একটা কারণ স্বগতোক্তিতে অন্য শ্রোতাকে সম্ভাষণ প্রায়ই থাকে না, কিন্তু আমরা দেববিগ্রহ, পাথর, মৃত স্বামীর ফোটোগ্রাফ, কুকুর-বেড়াল, গোরু-ছাগল যারই সঙ্গে কথা বলি না কেন, প্রায়ই সেই শ্রোতাকে নানাভাবে সম্ভাষণ করা হয়। 'ওগো তুমি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? দেখতে পাচ্ছ তোমার সেই ছোট্ট মেয়ে বুব্‌লি আজ কত বড়ো হয়েছে? দেখছ সে কীরকম লাল চেলি পরে, কপালে সিঁদুর-চন্দন দিয়ে তার স্বামীর ঘর করতে চলেছে?'—ইত্যাদি যে কোনো ভাবালু বাংলা চলচ্চিত্রে প্রয়াত স্বামীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বিধবা স্ত্রীর উক্তি হতেই পারে।

ভাষা ব্যবহারের তৃতীয় উপাদান হল বার্তাশরীর। সাধারণভাবে হাইম্‌জের ইঙ্গিত একটু সরল—বার্তাটা গদ্যে না পদ্যে রচিত, এই যেন তাঁর মূল বিবেচনা এখানে। কিন্তু এ-ইঙ্গিতকে আমরা নিজের মতো করে একটু ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করি। গদ্যের ব্যবহার মৌখিক আর লিখিত দু-রকম ভাষাতেই আছে। মৌখিক হোক লিখিত হোক, যখন গদ্যের মধ্যে সাহিত্য বা কবিতার গুণ এসে যায় তখন তার শরীরনির্মাণ আমাদের বিশেষ করে নজরে আসে। পদ্যে তো কথাই নেই—সাধারণ গদ্য থেকে সে আলাদা হয়ে যায় কতকগুলি শারীরিক লক্ষণের জন্য—ছন্দ যেমন, মিল যেমন, উপমা ও চিত্রকল্প যেমন।[৫] কিন্তু শুধু সাহিত্যের ভাষা কেন, বিজ্ঞাপনের ভাষা, সম্প্রচারের ভাষা, বক্তৃতার ভাষা, সাংবাদিকতার ভাষা থেকে আরম্ভ করে, বকুনির ভাষা, ঝগড়ার ভাষা, ব্যঙ্গের ভাষার শরীরনির্মাণও আলোচনা করার যোগ্য। এমন কথা আমরা বলছি না যে, যাঁরা ভাষা ব্যবহার করেন তাঁরা সবসময় তিল তিল করে বার্তার ওই শরীরনির্মাণ করেন। সাহিত্যে কিছুটা সেটা হয়, সবটা নয়। অনেকটাই তার স্বতঃস্ফূর্ত রচনা, তার পরে শব্দের অদলবদল করে, বাক্য জুড়ে বা কেটে, তার আরও আকাঙ্ক্ষিত সম্পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা নিশ্চয়ই চলে। কিন্তু লৌকিক জীবনে আমাদের

মৌখিক ভাষা ব্যবহার তো স্বতঃস্ফূর্ত। ঝগড়ায়, হল্লায়, দরদামে আমরা বার্তার শরীরনির্মাণে অতটা ভাবনাচিন্তা দিই না। অন্তত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে।

চ্যানেল বা বাহন হল আমি আমার কথাকে কীভাবে প্রাপকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি তার উপায়টা। আমি কি সামনাসামনি কথা বলছি? তাহলে আমার কথা রূপ নিচ্ছে অদৃশ্য বায়ুতরঙ্গের। সেই তরঙ্গ প্রাপকের কানের পর্দায় গিয়ে আঘাত করছে বলেই সে শুনতে পাচ্ছে। এই উচ্চারিত ধ্বনির বায়ুতরঙ্গ একটা বাহন। কোনো কোনো আদিবাসী গোষ্ঠী (পশ্চিম আফ্রিকার জাবো, মেক্সিকোর মাসাতেক্) শিস দিয়ে খবর পাঠায়—সেটা আর-একটা মাধ্যম। লিখিত/মুদ্রিত বার্তা হলে বর্ণসজ্জা বা হরফসজ্জা আর একটা বাহন।

কোড বা বাচন হল বার্তার আর-একটা শারীরিক রূপ যা তার পরিবেশ, সামাজিক উৎসস্থল বা বিষয়ের দাবির দ্বারা নির্মিত। বার্তাশরীর বিষয়টি যেমন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিটি সূক্ষ্ম অংশের—অর্থাৎ শব্দসজ্জার, অলংকার প্রয়োগের ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দেয়—বাচনে সেক্ষেত্রে দেখা হয় শুধু এইগুলি—বার্তাটি কোন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বহন করছে—এ-টি কোথাকার উপভাষা বা কোন সামাজিক স্তরের কথার লক্ষণ এর গায়ে চিহ্নিত—এ-টি কোন সমাজভাষা বা সোশিয়োলেক্ট? এ দু-টি লক্ষণই বক্তার ভাষায় একইসঙ্গে ফুটে ওঠে বলে এগুলিকে 'language according to the user' বলেছেন হ্যালিডে প্রভৃতিরা। বা এটি কোন বিষয়-আলোচনার পক্ষে অভ্যস্ত ভাষা ('language distinguished according to use') বা রেজিস্টার বাংলায় আমরা যাকে বলি 'নিরুক্তি'? এটি 'বক্তা'র ভাষায় চিহ্নিত থাকে না—বিষয়ের ভাষায় চিহ্নিত থাকে— যেমন বিজ্ঞাপনের ভাষা, আইনের ভাষা, ধর্মোপদেশের ভাষা, রাজনৈতিক বক্তৃতার ভাষা। বার্তার এই মোটা দাগের পরিচয়গুলিই হল তার কোড বা বাচনপ্রকৃতি। মোটা দাগের পরিচয় অবশ্য অনেক সূক্ষ্ম লক্ষণের যোগফলে তৈরি হয়।

ভাষা-ব্যবহারের ছ-নম্বর উপাদান হল 'বিষয়' (topic)। এ খুব সূক্ষ্ম বা জটিল কোনো ব্যাপার নয়। 'কী নিয়ে কথা হচ্ছে?' এ-প্রশ্নের যা উত্তর তা-ই কোনো বার্তার 'বিষয়' বা প্রসঙ্গ। সেটা কী জানতে হলে বার্তার মধ্যে যেসব শব্দ ব্যবহার হচ্ছে সেগুলির অর্থ জানতে হয়, তার অর্থ মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহের বিভিন্ন ক্ষেত্র নির্দেশ করে। সব

ভাষা ব্যবহারে বিষয় যে খুব সংহত থাকে তা নয়। গুছিয়ে লেখা প্রবন্ধে বিষয় হয়তো একটা সুশৃঙ্খল, পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়, কিন্তু কফি হাউসে বা অন্যত্র বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় বিষয় অত সুবিন্যস্ত হয় না। তবে ছড়িয়ে দেখি বলেই আমাদের এটা মনে হয়, নইলে সূক্ষ্মভাবে দেখলে আড্ডা আসলে অনেকগুলি প্রায় অসংলগ্ন বিষয়ের শৃঙ্খল বা পরম্পরা। আর প্রত্যেকটি বাক্যের তো একটি বিষয় আছেই, তা বাস্তবই হোক, উদ্ভটই হোক কিংবা মিথ্যাই হোক। হাইম্‌জ যেহেতু বার্তার আকার বা আয়তন নিয়ে কোনো কথা বলেননি, ফলে যা ক্ষুদ্রতম বার্তাতেও পাওয়া যায় তাও তার এক আবশ্যিক উপাদান।

কী ক্ষুদ্রতম বার্তা—তা নিয়ে অবশ্য অবান্তর তর্ক হতে পারে একটু। 'আপনি কি কখনো ব্যাংভাজা খেয়েছেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে যদি কেউ 'হুঁ' বা 'না' বলে—তাহলে ওই উত্তরগুলি পুরো বার্তা হবে না। বার্তা হবে অনুমিত পুরো উত্তর—'আমি ব্যাংভাজা খেয়েছি' বা 'আমি ব্যাংভাজা খাইনি।'

সেটিং বা পটভূমি অবশ্য কিছুটা জটিল একটা প্রসঙ্গ। হাইম্‌জ এটিকে নিয়ে একটু অস্বস্তিতে পড়েছেন, বলেছেন এর মধ্যে অনেকগুলি উপাদান জড়িয়ে থাকতে পারে। যাই হোক, আমরা এ পর্যন্ত যেমন করে হাইম্‌জের মাত্রাগুলিকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছি, এক্ষেত্রেও তাই করে বলি—এ প্রতিবেশ বাইরের যেমন হতে পারে, তেমনই প্রেরকের মানসিক প্রতিবেশও হতে পারে। বাইরে, অর্থাৎ কোথায় কী অবস্থায় বসে দু-জনের মধ্যে বার্তাটি তৈরি হচ্ছে, ঘরে বসে দু-জনের মধ্যে, না মাঠে বহু লোকের সামনে, ঠান্ডায় না গরমে—এ যেমন একটা প্রতিবেশ রচনা করে, তেমনই বক্তা খুশি না বিষণ্ণ, উদাসীন না গদগদ, শান্ত না উত্তেজিত—এসবও বার্তারচনার প্রতিবেশ বা পটভূমি রচনা করে, তা বার্তার শরীরকে প্রভাবিত করে। কেউ কেউ বলতে পারেন, প্রেরক কোন অঞ্চলের, প্রাপক কে, বার্তার বিষয় কী, বাহন কী—এগুলি কি পটভূমি নয়? আমরা বলি, না। পটভূমিটা বার্তাপ্রেরণের ওই মুহূর্তের, সময়ের, স্থায়ী কিছু নয়। বাকিগুলি বার্তার মোটামুটি স্থায়ী বা প্রত্যাশিত মাত্রা। পটভূমি অনেকটাই অস্থায়ী এবং অপ্রত্যাশিত। সেই কারণে পটভূমিকে আলাদা করে দেখানোর দরকার ছিল।

২ ভাষা ব্যবহারের নানা লক্ষ্য

আমি কোথায় কোন ভাষারূপ বা কেমন ভাষা ব্যবহার করব সেটা ঠিক করতে হলে ভাষা দিয়ে আমরা ঠিক কী করতে চাই সে সম্বন্ধেও একটু স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। ওই একই প্রবন্ধে ডেল হাইমস্ জ ভাষা ব্যবহারের নানা লক্ষ্যেরও একটি তালিকা করেছেন। এই তালিকা যে তাঁর একেবারে মৌলিক উদ্ভাবন তা নয়। প্রাহার (প্রাক্তন চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী, ইংরেজি উচ্চারণ অনুযায়ী আমরা যাকে প্রাগ্ বলে জানি) ভাষাবিজ্ঞান সমিতির সদস্যরা —রোমান ইয়াকবসন, ইয়ান মুকারোফ্স্কি প্রভৃতি, লন্ডনের ভাষাবিজ্ঞানী জন আর ফার্থ ও হ্যালিডে প্রভৃতি সকলের সূত্র মিলিয়ে ভাষার function-গুলির একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে— তাকেই হাইম্জ উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এগুলিকে আমরা 'ভাষার কাজ' বলে অনুবাদ করছি না, বরং বলছি 'ভাষার উদ্দেশ্য'। ভাষার কাজ সুনির্দিষ্টভাবে দেখি আমরা, তাতে পড়ানো, সম্প্রচার, বকুনি দেওয়া, বাগাড়ম্বর করা, গালিগালাজ—সবই এক-একটা কাজ—যেমন আমরা অন্যত্র বলেছি[৭]। কিন্তু ভাষার উদ্দেশ্য হল বার্তা বা ভাষা ব্যবহার করে আমরা ঠিক কী করতে চাই তার একটা সাধারণ পরিচয়।

সাত সংখ্যার প্রতি আনুগত্য অবিচল রেখে হাইম্জ ভাষার সাতটি মূল উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। সেগুলি ইংরেজি বিশেষণ রূপ (এবং আমাদের দেওয়া বাংলা) পরিভাষা এই ১. Expressive (Emotive) প্রকাশমুখী, আবেগভিত্তিক ; ২. Directive (Conative, Pragmatic, Rhetorical, Persuasive) প্রেরণাত্মক, প্রবর্তনামুখী, প্ররোচনামূলক ; ৩. Poetic কাব্যিক ; ৪. Contact নৈকট্যমূলক ; ৫. Metalinguistic ভাষাকেন্দ্রিক; ৬. Referential জ্ঞাপনমূলক; ৭. Contextual (Situational) অবস্থানভিত্তিক। এরও বাইরে আরও দু-একটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা। সে-বিষয়ে আমরা পরে বলছি। আগে হাইম্জ-এর দেওয়া এই উদ্দেশ্যগুলিকে ব্যাখ্যা করা যাক। মনে রাখতে হবে, কোনো ভাষা ব্যবহারেই এই উদ্দেশ্যগুলি পৃথক বা স্বতন্ত্র থাকে না, অর্থাৎ শুধু একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থেকে কথা বলা হচ্ছে এমন খুব কম ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। প্রায়ই নানা উদ্দেশ্য একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে আমাদের বাক্‌ক্রিয়ায়। যে-উদ্দেশ্যটি প্রধান, সাধারণত সেইটি দিয়েই সেই বাক্‌পাঠকে চিহ্নিত করা হয়।

প্রকাশমুখী বা আবেগভিত্তিক উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয় যখন বার্তায় (= কথায়) আবেগের একটা কম-বেশি উচ্ছ্বসিত চেহারা ফুটে উঠে বাক্য ও শব্দের শরীরকে বদলে দেয়, যেমন 'বাঃ, দুধটা পুরোটা শেষ! ল—ক্ষ্মী মেয়ে!' 'সো—না মেয়ে'! এই কথায় 'লক্ষ্মী' আর 'সোনা' কথা দু-টি টেনে বিস্তার করা হয়েছে, ওই আবেগেরই কারণে।

এই প্রকাশ শব্দটা নিয়ে একটা সমস্যা আছে। এ-প্রবন্ধের প্রথম দিকেও আমরা 'প্রকাশ' কথাটা ব্যবহার করেছি, বলেছি 'ভাষা মানুষের এক ধরনের প্রকাশ।' সেখানে 'প্রকাশ'-এর অর্থ অন্য—তার অর্থ উচ্চারণ বা অভিব্যক্তি। আবেগের সূত্রটি তাতে নেই। সেখানে কথা বলাই হল প্রকাশ। এখানে 'প্রকাশ' মানে স্পষ্ট আবেগের প্রেরণায় প্রকাশ।

দ্বিতীয় সমস্যা, প্রাহার ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার প্রকাশমুখী উদ্দেশ্যের মধ্যে সাহিত্য রচনাকেও, বিশেষত কবিতা রচনাকেও, কিংবা শুধু তাকেই গণ্য করেন। তাঁদের কাছে 'প্রকাশ' অর্থ ভাষাকে মনোহর রূপ দিয়ে প্রকাশ, যাতে 'কী বলছি' তার চেয়ে 'কীভাবে বলছি' তারও একটা আলাদা আকর্ষণ তৈরি হয়। যদিও রোমান ইয়াকবসন বলেছেন যে ভাষার অন্যান্য প্রয়োগেও এই কাব্যই ফুটে উঠতে পারে—শুধু কবিতায় নয়, ঝগড়া বা বক্তৃতাতেও। ফলে প্রাহার ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে 'প্রকাশ' মানে কাব্যিক প্রকাশ. ডেল হাইম্‌জের কাছে ঠিক তা নয়। হাইম্‌জ পোয়েটিক বা কাব্যিক উদ্দেশ্যের মধ্যে তাকে ফেলেন।

প্রেরণাত্মক, প্রবর্তনা বা প্ররোচনামূলক উদ্দেশ্য ফুটে ওঠে শ্রোতা কিংবা পাঠকদের উত্তেজিত বা প্ররোচিত করে কোনো কাজে ঠেলে দেওয়ার লক্ষ্য থেকে। 'রক্তকরবী'-র শেষে 'চল্ রে ভাই, লড়াইয়ে যাই।' দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাহো উচ্চে রণজয়গাথা' থেকে 'ওরে এক গ্লাস জল নিয়ে আয় তো!' পর্যন্ত সবই ভাষা বা বার্তার প্রেরণাত্মক উদ্দেশ্য থেকে বলা হয়। এটা সবসময়ে যে অনুরোধ আদেশ বা হুকুমের আকারেই হবে তার কোনো অর্থ নেই। তা প্রশ্ন বা অনুযোগের আকারেও আসতে পারে—'ছিঃ, এমন কাজ কি মানুষে করে?'

ভাষার কাব্যিক লক্ষ্য সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে, তার সাধনে ছন্দের (পর্ব বিভাজন করে ধ্বনি ও নৈশব্দ্যের পরিকল্পিত বিন্যাস)[৮] এবং সেইসঙ্গে মিলেরও ভূমিকা যথেষ্ট। কিন্তু শুধু ছন্দোবদ্ধ সুগঠন নয়, কথাকে সুন্দর ও

চিত্তগ্রাহী করে বলা, বলার ঢং-টিকে আলাদা করে আকর্ষক করে তোলার প্রয়াস কাব্যিক উদ্দেশ্যেরই অঙ্গ।

কনট্যাক্ট বা নৈকট্যসূচক উদ্দেশ্যকে আমরা তত গুরুত্ব দিই না। এতে, যতদূর বুঝেছি, প্রেরক ও প্রাপকের আপেক্ষিক দূরত্ব ও নৈকট্যের বিষয়টি বার্তায় প্রকাশিত হয়। হাইম্‌জের দৃষ্টান্ত 'তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' জাতীয় বাক্য—এই নৈকট্যসূচক উদ্দেশ্য বহন করছে। এমন হতেই পারে যে অনেক বার্তাই প্রেরক ও প্রাপকের আপেক্ষিক অবস্থানের বিষয়টি ধরিয়ে দেয় ; কিন্তু সেটাকে ভাষা ব্যবহারের একটা প্রধান উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করার অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

ভাষাকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যে ভাষাপ্রয়োগ হল বার্তার ভাষাগত সংগঠন সম্বন্ধে কথাবার্তা, মূলত বৈয়াকরণেরা যা করে থাকেন। 'এখানে তোমার কথাটি ঠিক লাগসই হল না'— এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি বাক্য। বা 'এই বাক্যে কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য গুলিয়ে ফেলেছ'—'তুমি রোজ ডান্ডাগুলি খেলা হচ্ছে' কি একটা কথা হল?

কিন্তু ষষ্ঠ যে-উদ্দেশ্য—referential বা জ্ঞাপনমূলক—তা ভাষার অনেকটা অংশ জুড়ে থাকে। এ-উদ্দেশ্য বার্তাকে নিছক তথ্য, সংবাদ, সম্ভাবনা জানানোর জন্য তৈরি করে। তাতে আবেগ থাকবে না, প্ররোচনা থাকবে না, সৌন্দর্য থাকবে না, বাকি সব প্রায় কিছুই থাকবে না। প্রাহার ভাষাবিজ্ঞানীরা এই লক্ষ্যের বিকল্প একটা নাম দিয়েছেন—communicative function যার কাজ communication বা জ্ঞাপন। গুরুগম্ভীর বিজ্ঞানের প্রবন্ধে এই উদ্দেশ্য ফুটে ওঠে, কখনো কখনো খবরের কাগজের প্রতিবেদনে, বা রেডিয়ো-টেলিভিশনে আবহাওয়া-বার্তায়, রেল বা প্লেনের টাইমটেবিলে, টেলিফোন ডিরেক্টরিতে। এ হল ভাষার নিছক কেজো প্রয়োগ।

সপ্তম উদ্দেশ্য হল প্রতিবেশভিত্তিক বা contextual—যা কথার প্রতিবেশকে নির্দেশ করে। 'এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি' প্রতিবেশকে আঙুল তুলে দেখায়, যেমন 'ওখানে ও-কথাটা বলা তোমার উচিত হয়নি' কথাটিও একটা বিশেষ প্রাতিবেশিক বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। প্রতিবেশ মানে স্থান, কাল ও পাত্র সবই বোঝাতে পারে। আমাদের কথার

সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক— সংগতির সম্পর্ক, অসংগতির সম্পর্ক, বিবৃতির সম্পর্ক, মিথ্যাচারের সম্পর্ক ইত্যাদি।

অবশ্য ভাষা ব্যবহারের উদ্দেশ্যের এই তালিকাই সব নয়। এ ছাড়াও আছে phatic communion বা শিষ্টাচার বিনিময়, যার কথা প্রথমে বলেন নৃবিজ্ঞানী ব্রোনিস্লাভ ম্যালিনোওস্কি, পরে যা ভাষাবিজ্ঞানী ফার্থ গ্রহণ করেন। এর নিদর্শন হচ্ছে শিষ্টাচারের ফাঁকা বুলি, যেমন, 'নমস্কার, কেমন আছেন?' 'এই চলে যাচ্ছে, নমস্কার! আপনি?' 'আমিও মোটামুটি চালিয়ে নিচ্ছি। চলি!' এতে সত্যি কে কেমন আছে তা খতিয়ে কেউ জানতে চায় না। কেউ যদি 'না, খুব দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি, স্ত্রীর আবার আরথ্রাইটিসের যন্ত্রণা'—এসব বলতে শুরু করে তো শ্রোতার মনে হবে 'কেমন আছেন জিজ্ঞেস করে মহামূর্খের কাজ করেছি।' এগুলি আসলে আমাদের সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় রাখার কিছু ভাষাগত উপায়। ভাষার অর্থপূর্ণ আক্ষরিক প্রয়োগ নয়।

৩ সম্প্রচারের ভাষা, তার বৈচিত্র্য

এই যে ভাষা ব্যবহারের নানা মাত্রা ও উপাদান এবং উদ্দেশ্য, এর মধ্যে সম্প্রচারের ভাষার বিশেষত্বকে সম্প্রচারকর্মীদের মনে রাখতে বলি।

কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্ন। সব সম্প্রচারই কি একরকম? যিনি ঘোষক বা ঘোষিকা, তাঁর সম্প্রচারের চরিত্র যা হবে, যিনি এফ এম-এ রেকর্ড চালাতে চালাতে ডিস্ক-জকি হিসেবে আলাপচারিতা বা chat programme করবেন তাঁর সম্প্রচারের চরিত্র আর-একরকম। যিনি সাক্ষাৎকার নেবেন এবং কম্পিয়ারের কাজ করবেন তাঁর সম্প্রচার-ভিত্তি আলাদা, আবার যাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে, তাঁর সম্প্রচার একটু অন্য ধরনের। সংবাদপাঠকের সম্প্রচারের মাত্রাও ভিন্ন। অন্য দিকে যিনি নিছক সম্ভাষণ করবেন শ্রোতা বা দর্শকদের—মাধ্যমিকের আগে মুখ্যমন্ত্রী যেমন করেন—তাঁর সম্প্রচার হবে ভিন্ন রকমের। ফুটবল-ক্রিকেটের ধারাবিবরণী আবার আরেক রকমের সম্প্রচার। এঁদের সকলের সম্প্রচারের মূল উপায় অবশ্যই হল ভাষা। আর যাঁরা টেলিভিশনে সম্প্রচার করবেন তাঁদের একটা শারীরভাষা থাকে, তাতে চুলের ছাঁট ও সিঁথি, শাড়ি-জামার রং ও ডিজাইন, চোখের ভুরু, লিপস্টিক—সব কিছুরই একটা ভূমিকা থাকে। রেডিয়োতে দেখানোর

সুযোগ নেই, সেখানে কণ্ঠস্বরই যে শুধু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা নয়, কোন গতিতে কথাগুলি বলা হবে তাও বিশেষ প্রাধান্য পায়। বিশেষ করে যেসব সম্প্রচার ধারাবিবরণীমূলক, বা যার সঙ্গে ভিশুয়ালস্ বা দৃশ্যবস্তু থাকে সেগুলির ক্ষেত্রে টেলিভিশনে শুধু নির্দেশক মন্তব্য করাই যথেষ্ট, কিন্তু রেডিয়োতে সেগুলির ব্যাখ্যা, ভাষ্য এবং সম্ভবক্ষেত্রে উত্তেজনাকর জমজমাট নাটক—সবই তৈরি করে দিতে হয়।

আমি ধরে নিচ্ছি যে, সম্প্রচারকর্মীরা সকলেই একই ধরনের বাংলা ভাষায়, আমাদের ক্ষেত্রে মান্য চলিত বাংলায় (Standard Colloquial Bengali) কথা বলবেন, তাঁরা তাঁদের ঘরের উপভাষায় কথা বলবেন না। কোনো কোনো অনুষ্ঠান উপভাষায় হতেই পারে অবশ্য, তা আমাদের এখানে আলোচ্য নয়। বীরভূম হোক, কোচবিহার হোক, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হোক, মেদিনীপুর-ওড়িশার সীমান্ত অঞ্চল হোক—যিনি যেখান থেকেই এসে থাকুন, তিনি নিজের গৃহভাষা-উপভাষা এবং সমাজভাষার সংকীর্ণ গণ্ডি পার হয়ে মান্য চলিত বাংলা শিখে নিয়েছেন—তার সমস্ত ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ, স্বরগ্রাম সবই তাঁদের কণ্ঠস্থ। কাজেই মান্য চলিত বাংলাই তাঁরা বলবেন, এটা ধরে নিতেই পারি। অবশ্য সবাই নিখুঁত বলবেন তা ধরে না-ও নিতে পারি। কেউ 'অব্যাহত'-কে 'ওব্যাহতো' 'আও্ভান'-কে 'আহোবান' 'মহাযুদ্ধ'-কে 'মোওয়াযুদ্ধ' বলবেন ভুল করে, কারও 'ড়্' মার্কিন গড়ানো (rolled) 'আর (r)-এর মতো হয়ে যাবে, কেউ শ-স নিয়ে মুশকিলে পড়বেন (কলকাতা বেতার কেন্দ্রের দু-একজন সংবাদপাঠক যেমন পড়েন)—এইসব ঘটবে।[৯]

তা ছাড়া, আমরা জানি, বিশেষত সংবাদপাঠে শুধু বাংলা নয়, অন্য ভাষার নানা শব্দের ও নামের উচ্চারণ করতে হয়। সেখানে দূরদর্শন-বেতারের অনেক সংবাদ পাঠক-পাঠিকা বেশ অসুবিধেয় পড়েন, ঠেকে যান, ভুল উচ্চারণ করেন, এসব সম্ভাবনাকেও আমরা হিসেবের মধ্যে রাখছি। বিদেশি ব্যক্তি ও স্থানের নামের মধ্যে নানা ফাঁদ পাতা আছে। মার্কিন দেশে যা Tucsan নামে শহর তার উচ্চারণ যে 'টুসান', Connecticut যে 'খানেটিখাট্', ইংল্যান্ডের Cirencester যে 'সিসিস্টার', কিংবা নাট্যকার Synge-এর উচ্চারণ যে 'সিং', শিল্পী Giotto যে 'জোত্তো', খাদ্য pizza যে 'পিৎসা', lasagna যে 'লাসানিয়া'—এ-বিষয়গুলি সংবাদপাঠক দূরে

থাকুন, অনেকসময় সংবাদ-লেখকদেরও গোচরে থাকে না, ফলে সংবাদে নানা বিদেশি শব্দের কিম্ভূত বানান-আদিষ্ট উচ্চারণ শুনি। সম্প্রচারের ভাষা নিয়ে যাঁদের ভাবনা, তাঁদের সেই কারণে শুধু নিজের ভাষার মান্য রূপ নিয়ে নয়, অন্যান্য দেশি আর বিদেশি ভাষার নানা নাম ও শব্দের উচ্চারণ নিয়ে বেশ মাথা ঘামাবার দরকার হয়ে পড়ে।

এখানেই সমস্যার শেষ নয়। মান্য চলিত ভাষার (আসলে উপভাষার—কারণ তা ভাষার একটা অংশ, পুরোটা নয়) মধ্যেই গড়ে ওঠে নানা নিরুক্তি বা রেজিস্টার, অর্থাৎ বিষয়-নির্ধারিত ভাষারূপ। আগে যেমন বলেছি, ধর্মোপদেশের ভাষা, আইনের ভাষা, মুদ্রিত সাংবাদিকতার ভাষা, বিজ্ঞাপনের ভাষা—ইত্যাদি বিচিত্র বিভাগ। আবার হিন্দু ধর্মের উপদেশের ভাষা আর ইসলাম ধর্মের উপদেশের ভাষাও আলাদা হয়ে যায়। প্রথমটিতে তৎসম শব্দ আর দ্বিতীয়টিতে আরবি-ফারসি শব্দের যথেচ্ছ স্বীকৃতির কারণে—উদ্দেশ্য ধর্মোপদেশ হলেও এ দুই ভাষারূপের বদলাবদলি করা সম্ভব নয়। এই প্রয়োগযোগ্যতার বিষয়টি সম্প্রচারকদের বিশেষভাবে খেয়াল করতে হয়। অর্থাৎ নিরুক্তির বিষয়টি তাঁদের মনোযোগে রাখতে হয়, বিষয় অনুযায়ী নিরুক্তির নিয়ন্ত্রণ তাঁদের মেনে নিতে হয়। খেলার ধারাবিবরণী তাঁরা যে-ভাষায় দেবেন তা মান্য চলিতেরই একটা নিরুক্তি, কিন্তু তা সংবাদপাঠের নিরুক্তি থেকে আলাদা। খেলার কমেন্টারিতে উচ্ছ্বাস, বিরক্তি, অলংকরণ, হালকা রসিকতা, দুই বিবরণদাতার মধ্যে পরামর্শ ও ঠাট্টা বিনিময়—সব কিছুরই জায়গা আছে, কিন্তু সংবাদপাঠক যদি ডেস্কে দু-জনও থাকেন তবু এর সমস্ত লক্ষণ তাঁদের ভাষায় তাঁরা গ্রহণ করতে পারবেন না

সম্প্রচারের ভাষার খুব গুরুত্বপূর্ণ যে-বৈশিষ্ট্যটির কথা সকলকে খেয়াল রাখতে হয় তা হল এ-ভাষা মুহূর্তমাত্রে উচ্চারিত হয়ে নৈঃশব্দ্যে অন্তর্ধান করে। বেতারে তা দৃশ্যবস্তুর সাহায্যও পায় না। লিখিত-মুদ্রিত বাহনের সঙ্গে এখানে তার তফাত। এ-সম্বন্ধে আমরা পরে বলছি, তাই এখানে তার বিস্তার করছি না।

কিন্তু আরও নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ তাঁদের উপরে থাকে। তার একটি মজার দৃষ্টান্ত পেলাম নিউজিল্যান্ডের এক গবেষক অ্যালান বেলের[১০] একটি পেপার থেকে, তার কথা একটু বলি।

নিউজিল্যান্ডের দু-রকম বেতার-বিস্তার আছে। একটা হল জাতীয় স্তরের বিস্তার, যার সংক্ষিপ্ত চিহ্ন YA; আর-একটা হল স্থানীয় স্তরের বিস্তার, যার প্রতীক ZB। অনেকটা আমাদের জাতীয় ও আঞ্চলিক বিস্তারের মতো, কিন্তু তফাতও প্রচুর, কারণ আমাদের দেশে জাতীয় ও আঞ্চলিক ভাষায় যে-বিপুল পার্থক্য আছে নিউজিল্যান্ডে তা নেই। একই স্টুডিয়ো থেকে এ দু-টির সম্প্রচার ঘটে, এবং অনেকসময় একই ঘোষক ও ঘোষিকারা YA এবং ZB উভয় বিস্তারেই ঘোষণা সংবাদপাঠ ইত্যাদি করেন। কখনো একই টেক্সট পড়েন।

নিউজিল্যান্ডের ইংরেজিতে দুটো স্পষ্ট রীতি বা স্টাইল আছে। একটা একটু শিক্ষিত মানুষদের নিয়মবদ্ধ (ফর্ম্যাল) ইংরেজি, আর-একটা একটু হালকা চালের সহজ (ইনফর্ম্যাল) ইংরেজি। দুয়ের মধ্যে একটা তফাত হল উচ্চারণগত—তার একটা লক্ষণ—প্রথমটাতে দুটো স্বরধ্বনির মাঝখানে 't' ধ্বনিটা [t]-ই উচ্চারিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টার ঠিক একই জায়গায় ওই একই ধ্বনি [d] হয়ে যেতে চায়।

বেল্ কিছুদিন এইসব ঘোষক-ঘোষিকা আর সংবাদ পাঠক-পাঠিকাদের উচ্চারণ লক্ষ করে দেখলেন যে, ZB স্টেশনটিতে ওই 't' -এর [d] হয়ে যাওয়ার পরিমাণ অনেক বেশি। অথচ বলছেন অনেকসময় একই লোকেরা, এবং যে-পাঠ বা টেক্সট্ বলছেন তাও অনেকসময় একই। তা সত্ত্বেও যেখানে YA-তে 't' দুটো স্বরের মাঝখানে অক্ষত থাকছে সেখানে ZB-তে তা এত ঘন ঘন [d] হয়ে যাচ্ছে কেন?

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে বেল্ দেখলেন, আসলে YA শোনেন একটু শিক্ষিত শ্রোতারা, যাঁরা সারা দেশের খবর রাখতে চান। আর ZB স্টেশনটার লক্ষ্য স্থানীয় বা আঞ্চলিক শ্রোতা, যাঁরা একটু গল্পগুজবের ঢঙে বিষয়গুলি শুনতে ভালোবাসেন। অনেকটা আমাদের এফ.এম. সম্প্রচারের মতো। ফলে একই ঘোষক হয়তো YA-র শ্রোতাদের জন্য যে 't'-কে [t] উচ্চারণ করেছিলেন তিনিই ZB-র শ্রোতাদের কথা খেয়াল করে একই পাঠে ওই 't'-কে [d] করে নেন।

এখানে যে প্রাপক, রিসিভার, সে প্রভাবিত করছে প্রেরকের ভাষা ব্যবহারকে, বিশেষত তার উচ্চারণকে। আমাদের সম্প্রচারে এই ধরনের

তফাত কতটা হয় বা আদৌ হয় কি না, তার জন্য গবেষণা দরকার। কিন্তু আমাদের কাছে এর একটা ধারণাযোগ্য দৃষ্টান্ত হল বড়োদের আর ছোটোদের জন্য প্রচারে আমাদের ভাষাভঙ্গির তফাত—দুটোর রীতি এক হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়।

আর যেটা সম্প্রচারের ভাষার তৃতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য, তা হল প্রাপকেরা কেউ সেই মুহূর্তে প্রত্যক্ষভাবে প্রেরকের সামনে নেই, মুখোমুখি কোনো আদান-প্রদান নেই তাঁদের মধ্যে। আজকাল অবশ্য দূরদর্শন বেতার দু-জায়গাতেই নানা 'ফোন-ইন' অনুষ্ঠান চালু হয়েছে। কলকাতা বেতারে এফ. এম.-এও টেলিফোনে প্রচুর কথাবার্তা হয়। তা নিশ্চয়ই অনুষ্ঠানগুলির আকার ও চরিত্রকে নানাভাবে প্রভাবিত করে, তার ভাষাকে খুব-একটা করে কি না জানি না। করে, যদি টেলিফোন করে কোনো বালক বা বালিকা, বা নারী, বা স্বল্পস্বাক্ষর বা নিরক্ষর মানুষ। তখন প্রাপকের কথা ভেবে ঘোষক বা ঘোষিকাকে তাঁর ভাষারও খানিকটা উপযুক্ত অভিযোজন করে নিতে হয়, একই ভাষায় বা ভঙ্গিতে তিনি সকলের সঙ্গে কথা বলেন না।

এদিক থেকে লেখকের কাজের সঙ্গে তাঁদের কাজের বেশ তফাত আছে। লেখক বই ছাপছেন লিখিত-মুদ্রিত ভাষায়: পাঠক-পাঠিকা তাঁর থেকে দূরে শুধু নয়, বইটি লেখার মুহূর্তেই তা পাঠকদের কাছে পৌঁছোচ্ছে না, ফলে পাঠক বা গ্রাহকরা তাঁর লেখাকে অন্তত লেখার সময় কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারছেন না। হয়তো পরে, বইটি পড়বার পর পাঠক-পাঠিকারা ফোনে বা চিঠিতে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন, সেকথা লেখক পরবর্তী বই লেখার সময় হয়তো মনেও রাখছেন—কিন্তু সম্প্রচারের ক্ষেত্রে প্রেরক-গ্রাহকের আদান-প্রদানের যাও-বা সুযোগ আছে, মুদ্রিত বইয়ের ক্ষেত্রে তা নেই। লেখককে একজন অদৃশ্য, অশরীরী, নির্মুখ, লিঙ্গনির্বিচারে গড় পাঠকসত্তার কথা ভেবে লিখতে হয়। সকলের ক্ষেত্রে এই পাঠকসত্তা একরকম নয়। যিনি বিশেষজ্ঞ হয়ে তাঁর সংকীর্ণ ক্ষেত্রে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখবেন গড় পাঠকের ধারণা এক রকম আবার যিনি ছোটোদের লেখা লিখবেন তাঁর পাঠকের ধারণা আর-এক রকম। শুধু তাই নয়, ছয় থেকে দশ-বারো বছরের ছোটো পাঠক, আর বারো থেকে আঠারো বছরের ছোটো পাঠকদের গড় ভাবমূর্তি দু-রকম হবে।

৪ সম্প্রচারের নানা পর্যায়: নিয়মবদ্ধতা থেকে স্বতঃস্ফূর্ততায়

সম্প্রচারের ভাষা সম্বন্ধে সম্প্রচারের ব্যবস্থাপকদের নানারকম সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমাদের জ্ঞানবিশ্বাসমতে এই সিদ্ধান্তের প্রধান স্কেল বা মাপকাঠি হল নিয়মবদ্ধতা থেকে সহজতার দিকে—ফর্ম্যালিটি থেকে ইনফর্ম্যালিটির পথ ধরে। আরও নানা মাত্রা আছে—কিন্তু এটিই বড়ো। আমরা এবার উল্লম্বভাবে (উপরে-নীচে) এই নিয়মবদ্ধ ভাষা থেকে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় কী কী সম্প্রচার হতে পারে তার একটা তালিকা করি:

১ বিশেষজ্ঞের গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ; সংবাদ, বিশেষত জাতীয় স্তরের সংবাদ ;
প্রশাসনিক বক্তৃতা ও ঘোষণা ; অনুষ্ঠান-ঘোষণা ; আবহাওয়া-বিজ্ঞপ্তি ;
ম্যানেজার কিংবা ডাক্তারদের অনুষ্ঠান।

২ সংবাদ সমীক্ষা ; সংবাদের বিষয়ে মন্তব্য ; বিচিত্র সংবাদ ; সাধারণ শ্রোতার জন্য প্রচারিত বক্তৃতা বা প্রবন্ধ ; 'উজ্জীবন' জাতীয় অনুষ্ঠান ;

৩ হালকা রম্য প্রবন্ধ ; সাক্ষাৎকার ; আলাপচারিতার নানা অনুষ্ঠান ; চিঠিপত্রের উত্তর ;

৪ রস-রসিকতার অনুষ্ঠান ; ছোটোদের জন্য অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

সম্প্রচারে যুক্ত বন্ধুরা হয়তো এ-তালিকা তিনভাবে সংশোধন করবেন। প্রথমত, আমার চারটিমাত্র স্তরকে তাঁরা আরও বাড়াতে পারেন, বলতে পারেন যে, আরও দু-একটা স্তর ভেবে নেওয়াই যায়। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি স্তরে আরও নানা অনুষ্ঠান যোগ করতে পারেন এবং তিন নম্বর, কোনো কোনো অনুষ্ঠানের স্তর-বদল ঘটাতে পারেন! এ সংশোধন হওয়াই কাম্য, কারণ আমি বেতার ও দূরদর্শনের খুব বিশ্বস্ত শ্রোতা বা দর্শক নই, আমার পক্ষে সমস্ত প্রচারিত বা সম্ভাব্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়।

প্রথম স্তরটি নিয়মবদ্ধ, নিরপেক্ষ এবং আবেগহীন ভাষাব উপর বেশি নির্ভর করে, তাতে আবেগ বা রসরসিকতার সুযোগ কম। যদিও মাঝে মধ্যে শেষ সংবাদটিতে একটু কৌতুককর তথ্য জানানো হয়, বেসরকারি চ্যানেলে নানা অভিযোগ, খোঁচা এবং ব্যঙ্গও থাকে। সরকারি চ্যানেলে ততটা রাখা স্বাভাবিক কারণেই সম্ভব নয়। ফলে বেসরকারি চ্যানেলে সরকারি চ্যানেলের

তুলনায় স্বতঃস্ফূর্ত, এবং তার নিয়মবদ্ধতা-সহজতার ক্রম একটু আলাদা অবশ্যই হবে। আবার সরকারি মাধ্যমেও বেতারে এখন এফ. এম. দু-টি ভিন্ন চ্যানেল হয়েছে, এফ. এম.-এ মূলত বিনোদন সরবরাহ করা হয় এবং সেখানে ঘোষকদের বা ঘোষক-সঞ্চালকদের সঙ্গে শ্রোতাদের সম্পর্ক তুলনায় সহজ। তাতে সঞ্চালক ও শ্রোতাদের মিথস্ক্রিয়া বা আদান-প্রদানে একটা স্বতঃস্ফূর্ততা আসে, কখনো কখনো বাচালতা এবং নিজের জ্ঞান দেখানোর ইচ্ছের প্রবেশ ঘটলেও।

কিন্তু আমাদের তালিকায় প্রথম স্তরটি সবচেয়ে ফর্ম্যাল স্তর এবং এ-স্তরে সম্প্রচারের ভাষায় লঘুতা, বাচালতা বা অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতার জায়গা খুব একটা নেই। নিয়মবদ্ধতার আরও একটা কারণ, প্রবন্ধ, সংবাদ ইত্যাদির আগে থেকেই প্রস্তুত লিখিত পাঠ থাকে, এবং এগুলিতে কোনো শরীরী শ্রোতা বা দর্শকের কথা সম্প্রচারকদের মনে থাকে না। তবে যাঁরা কুশলী সম্প্রচারক, তাঁরা ওই পাঠের মধ্যেই স্পষ্ট উচ্চারণ করে বাক্যের যথাস্থানে ঝোঁক দিয়ে, প্রত্যাশিত গতি এনে—নিছক পাঠের চেয়ে কথা বলার একটা ভঙ্গি নিয়ে আসেন, সেখানে নবিশ বা অদক্ষ সম্প্রচারক (প্রথম বেতারে বক্তৃতা পড়ছেন বা/এবং আদৌ এ-বিষয়ে সচেতন নন) একঘেয়ে সুরে সবটা পড়ে যান, বাক্যের শেষের শব্দটা ('না' কিংবা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বেশি করে) পড়ে যায়—নাটকের ভাষায় যাকে বলে tail-dropping বা 'ল্যাজ খসানো'।

বস্তুতপক্ষে এই পর্যায়ে যাঁরা প্রবন্ধ পড়েন (রেডিয়োতে যদিও সেটা কথন বা talk প্রোগ্রামেরই অন্তর্গত), তাঁরা অনেকে পত্রিকার জন্য লেখা আর বেতারের জন্য লেখাতে আদৌ তফাত করেন না। হাইম্‌জের মাত্রাগুলি থেকে আমরা জানি যে, পত্রিকা আর বেতার (বা দূরদর্শন) দু-টি ভিন্ন বাহন বা চ্যানেল। ফলে আমাদের ভাষাকেও এই বাহনের ভিন্নতার কথা খেয়ালে রেখে যে আলাদা করতে হবে তা আমরা অনেকেই মাথায় রাখি না। আগেই বলেছি, দৃশ্য-শ্রাব্য বাহনে এক কথা দু-বার বলার সুযোগ নেই, কথার পর কথা উচ্চারিত হয়ে বাতাসে ধ্বনিতরঙ্গের রূপ ধরে মিলিয়ে যাচ্ছে, শ্রোতার স্মৃতি থেকে দ্রুত হারিয়ে যেতে চাইছে, পরের কথা এসে আগের কথার স্মৃতিকে মুছে দিচ্ছে। পাঠক যেমন বইয়ের একটা বাক্য না বুঝলে দ্বিতীয় বার পড়ে সেটা বুঝে নেবার চেষ্টা করেন, শ্রোতা বা দর্শকের সে-সুযোগ

নেই। ফলে সম্প্রচারকারীর—তিনি প্রফেশন্যাল হোন কিংবা নবিশ হোন—উচ্চারণ স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী না হলে তাঁর সম্প্রচারের কোনো স্থায়ী স্মৃতি শ্রোতা ও দর্শকদের মধ্যে থাকবে না। এই বাহনের তফাতটাই সঞ্চালকের উপর একটা বাড়তি দায়িত্ব চাপায়—কথাকে স্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক করে শ্রোতার কানে এবং মনে পৌঁছে দিতে হবে—তা কথা যত নিয়মবদ্ধই হোক। যাঁরা লিখে পড়বেন তাঁদের লেখাকেও মুখে বলা কথার মতো করে সাজাতে হবে। খুব কঠিন শব্দ ও প্রচুর পরিভাষা ব্যবহার করা চলবে না, বাক্য খুব জটিল ও দীর্ঘ করা চলবে না। বেতারে ভিশুয়াল্‌স বা দৃশ্যবস্তু থাকে না বলে কথাকে অনেক বেশি জীবন্ত হতে হয়, কথা দিয়েই দৃশ্য বা নাটক তৈরি করতে হয়। যাঁরা বেতারে ফুটবলের ধারাবিবরণী শোনেন তাঁদের ভাষিক অভিজ্ঞতা আর যাঁরা টেলিভিশনে দেখেন তাঁদের অভিজ্ঞতা এক রকমের নয়। টেলিভিশন দৃশ্য নিবিয়ে দিয়ে শুধু তার ধারাবিবরণীর অংশ আর রেডিয়োর ধারাবিবরণী পাশাপাশি শুনলে টেলিভিশনের ধারাবিবরণীকে অত্যন্ত জোলো ও অসংলগ্ন মনে হবে। তার কারণ টেলিভিশনে দৃশ্যই কথার সঙ্গে জুড়ে ঘটনার ধারাবাহিকতা তৈরি করে, আবার দৃশ্যেই থাকে উত্তেজনাপূর্ণ নাটক। বেতারে এসব কিছু নেই বলে কথা দিয়েই ধারাবাহিক আখ্যান ও নাটক তৈরি করতে হয়।

এসব কথা কুশলী সম্প্রচারকেরা জানেন। কিন্তু যে-সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন তা হল, তাঁদের প্রচারের পাঠে এই নিয়মবদ্ধতা আর স্বতঃস্ফূর্ততার বা অন্তরঙ্গতার কোন ধাপে তাঁরা দাঁড়াবেন। এক্ষেত্রে লিখিত সংগঠিত পাঠ আর মৌখিক, উপস্থিত প্রয়োজনে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করা পাঠের মধ্যে যে প্রভেদ থাকবে তা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয় পাঠটি তৈরি হয় সাক্ষাৎকারে, আলাপচারিতায়, ধারাবিবরণে। আমরা আগেই বলেছি, এগুলির ভাষা অনাসক্ত, নিরপেক্ষ ও ব্যক্তিত্ববর্জিত হবে না, প্রথম লিখিত বা পূর্বপ্রস্তুত পাঠগুলির ভাষা তা হবে।

যেকোনো পাঠেই সম্প্রচারককে নিতে হয় কিছু শব্দগত (lexical) সিদ্ধান্ত। কোন শব্দগুলি আমার পাঠের যোগ্য, আমার উদ্দিষ্ট ফর্ম্যাল স্তরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। খবরের ভাষার একটা গাম্ভীর্য আছে, ফলে তাতে আরও লৌকিক স্তরের 'মোকাবেলা করা' 'মদত দেওয়া' 'ল্যাজেগোবরে হওয়া' 'ধ্যাড়ানো' 'পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেওয়া' ইত্যাদি ধরনের প্রয়োগ যে

চলবে না সে-সম্বন্ধে ধারণা সম্প্রচারকদের আছে, অর্থাৎ কোন ধরনের প্রচারে কোন ভাষাশৈলী ব্যবহার করবেন এবং কোন ধরনের শব্দ সে-শৈলীর উপযুক্ত এবং কোন ধরনের শব্দ উপযুক্ত নয় তাও তাঁরা জানেন। এমনকী ভাষা যদি আলাপচারিতার নানা প্রোগ্রামে স্বতঃস্ফূর্ততাও দাবি করে তাতেও কিছু কিছু সাধারণ আড্ডার শব্দ—বদকথা (স্ল্যাং), রকের শব্দ (কেস কিচাইন, কেস বিলা, ঘ্যাম পার্টি) ইত্যাদি যে চলবে না এও তাঁরা অবশ্যই জানেন, যদি না ওই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা চলে, এবং শব্দগুলি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখের দরকার হয়, এবং রসিকতার সূত্রে সেগুলির পুনরাবৃত্তির কথা কেউ ভাবেন।

ইংরেজি অভিধানে সাধারণভাবে শব্দের এই শৈলীগত স্তর সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত থাকে, থিসোরাসেও থাকে। কোনটা ফর্ম্যাল, কোনটা ইনফর্ম্যাল, কোনটা মৌখিক, কোনটা ঔপভাষিক (আঞ্চলিক, প্রাদেশিক), কোনটা পারিভাষিক এবং কোন বিষয়ে তার কী মানে, কোনটা জীবিকা-বিশেষে চালু বুলি বা cant, কোনটা বদকথা—তা শব্দের পাশে বন্ধনীর মধ্যে জানানো থাকে। যেমন রোজে-র থিসোরাসে[১১] Avoidance-এর ক্রিয়ারূপে মার্কিন স্ল্যাং প্রতিশব্দ হিসেবে দেওয়া হয়েছে pass up, give the run around, ditch এ-তিনটি শব্দকে, বদকথা হিসেবে তালিকায় এসেছে shake, skip, skip bail আর লৌকিক কথ্য শব্দ হিসেবে পাচ্ছি get around। যেসব ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা মালিকের টাকা খেয়ে মত উলটে ফেলে তাদের যে ট্রেড ইউনিয়নের বুলিতে rat, scab, black-leg বলা হয়, তাও জানতে পারছি। বাংলা অভিধানে এত বিস্তারিত খবর এখনও কেউ দিয়ে উঠতে পারেননি, তবে 'অশিষ্ট' প্রয়োগ বা প্রতিশব্দ অনেকেই দেখিয়েছেন। বাঙালি হিসেবে আমাদের সম্প্রচারকেরা স্বাভাবিক ঘ্রাণশক্তি শুধু নয়, নিজস্ব ভাষা-চৈতন্য থেকেই শব্দের এই জাতিভেদ বিষয়ে খেয়াল রাখেন। বেতার বা টেলিভিশন যেহেতু পাবলিক মিডিয়া বা প্রকাশ্য মাধ্যম, সেখানে ভাষার কতটা গাম্ভীর্য কখন রক্ষা করতে হবে তা সম্প্রচারকদের জানতেই হয় এবং তাঁরা এও জানেন যে, কোনো কোনো অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্ততা কাম্য হলেও তাঁরা কখনোই অশিষ্টতা বা ছ্যাবলামির স্তরে নামতে পারেন না।

বরং আমি লক্ষ করি, কোনো কোনো সম্প্রচারক, বিশেষত সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে একটু বেশি বইগন্ধি ভাষা ব্যবহার করেন। যেমন রেডিয়োর 'উত্তরণ' অনুষ্ঠানে কখনো কখনো শুনি—'আপনার অনুপ্রেরক কারা ছিলেন?' বা 'আপনার সাহায্যকারীদের নাম বলুন'- -বা ওই-জাতীয় প্রয়োগ। অনেকসময় বড়ো বড়ো সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দ তাঁরা উচ্চারণ করেন, খেয়াল করেন না প্রাপকের শিক্ষার স্তর কতটা, তাঁর কাছে এ-শব্দটার অর্থ স্পষ্ট কি না। সাক্ষাৎকার যাঁরা নেন তাঁদের হয়তো ধারণা এ ধরনের ভারী ভারী শব্দ দিলে তাঁদের প্রশ্ন খুব গাম্ভীর্যপূর্ণ হয়। তাঁরা আগে থেকে প্রশ্নগুলি লিখে রাখেন, এমনও হতে পারে, এবং লেখার চাপে ওইরকম ভারী শব্দ এসে যায়। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে লেখার ভাষার শব্দ আর কথার ভাষার শব্দ ও প্রয়োগ এক নয়। বড়ো তৎসম শব্দের সমাসকে ভেঙে বলাই ভালো—সাহায্যকারী বা 'সাহায্যদাতা' না বলে,— 'আচ্ছা, অনেকেই তো প্রথমে এই কাজে এগিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলেন, তাই না? তাঁদের কথা আপনি বলবেন একটু?'

সাক্ষাৎকার নেওয়া প্রসঙ্গে, একটু ভিন্ন কথায় গিয়ে, দুটো কথা বলি। একটা হল, সোজাসুজি 'বলুন'—এই অনুরোধ বা নির্দেশের চেয়ে, 'যদি একটু বলেন', 'যদি সে-কথা আমাদের শোনান একটু', কিংবা 'আপনার কি এসব কথা বলতে ইচ্ছে করছে একটু?' ইত্যাদি প্রয়োগে প্রশ্নের চেহারাটা মোলায়েম করে দেওয়া অনেক ভালো। সাক্ষাৎকার নেওয়াটা যেন কাঠগড়ায় আসামিকে জেরা করার মতো ঘটনা না হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্যই এক ধরনের অনুষ্ঠান আছে 'মুখোমুখি' ধরনের যাতে যিনি সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তিনি সাক্ষাৎকারদাতার উপরে গুরুগিরি করবার চেষ্টা করেন, তাঁকে নানাভাবে নাস্তানাবুদ করে, ধমকে-ধামকে, যিনি সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তিনি যে কত বেশি জ্ঞানী, কত বেশি ঠিক, কত বেশি সত্য আর ন্যায়ের পক্ষে তা সব্বাইকে (এবং তাঁর 'শিকার'-কে) বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। সে ধরনের প্রোগ্রামেরও জায়গা আছে, সেক্ষেত্রে দু-পক্ষকেই তৈরি থাকতে হয়। কখনো কখনো তা অসভ্যতার জায়গায় গিয়ে পৌঁছোয়। কিন্তু সুখের কথা, এ ধরনের অনুষ্ঠান খুব বেশি হয় না। যাঁরা চালিয়াতি করতে চান তাঁরা যে খুব-একটা জনপ্রিয় বা সার্থক হন তা নয়। সংগতভাবেই দর্শক শ্রোতার কাছে তাঁদের বিশেষ মর্যাদা তৈরি হয় না।

এ-সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথাটা হল, অনেক সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী বা সঞ্চালক নিজেরাই এত বেশি কথা বলেন যে, তাতে যাঁদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তাঁদের কথা শোনবার সুযোগ কমে যায়। অনেক সেমিনারে-টেমিনারেও এমন ঘটে। অনেকে প্রশ্ন করতে গিয়ে একটা আস্ত বক্তৃতা দিয়ে ফেলেন যাতে প্রশ্নটা ঠিক কী দাঁড়াল তা বোঝা যায় না। অনেকে আবার কখনো নিজেরাই কবিতা বা উদ্ধৃতি কাগজে টুকে এনে বা মুখস্থ বলে প্রশ্নকে অকারণে বিস্ফারিত করেন। ফলে সাক্ষাৎকারটা অনেকসময় সঞ্চালকের আত্মসাক্ষাৎকারে পর্যবসিত হয়। অনেক ঘোষক-ঘোষিকাও এই বিরক্তিকর ব্যসন গ্রহণ করছেন। নানা অনুষ্ঠানে তাদের আত্মপ্রদর্শন ও বাহাদুরির চেষ্টা অকারণে সময়ের অপব্যয় ঘটায়। এ দুটো প্রসঙ্গ ভাষার নয়, কাণ্ডজ্ঞানের, তবু এই সূত্রে এ কথা-দুটো বলা উচিত মনে হল, আশা করি সম্প্রচারক বন্ধুরা অপরাধ নেবেন না।

কঠিন বা বইগন্ধি শব্দের সমস্যার পাশাপাশি আর-একটা বিপদ হল ভুল বা অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ। ভুল অনেক রকমের হয়—শৈলীগত ভুলের কথা আগে বলেছি, শিষ্ট শব্দের জায়গায় অশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ বা সহজ শব্দের জায়গায় কঠিন শব্দ ব্যবহার শৈলীগত ভুল। কিন্তু ব্যাকরণগতভাবে ভুল শব্দের প্রয়োগও প্রচুর হয়। আজই (১৩.১০.০১) সন্ধ্যাবেলার 'খাস খবর'-এ সংবাদপাঠিকা বললেন 'উৎকর্ষতা'। এ ধরনের 'তা' লাগিয়ে অনেক ভুল শব্দ আমাদের মুখে মুখে ঘোরে—'সখ্যতা', 'উৎকর্ষতা', 'প্রসারতা', 'সামঞ্জস্যতা', 'সামর্থ্যতা' ইত্যাদি যেগুলি হবে 'সখ্য', 'উৎকর্ষ', 'প্রসার', 'সামঞ্জস্য' ও 'সামর্থ্য'। এই ভুল এড়ানো যায় যদি ব্যাকরণের একটা সাধারণ সূত্র আমরা মনে রাখি—'তা' কেবল বিশেষণ শব্দের পরে জুড়তে হবে, ফলে উৎকৃষ্টতা, সমর্থতা, সুন্দরতা, বিষণ্ণতা, মধুরতা, সম্ভাব্যতা ইত্যাদি হবে। কিন্তু হবে সখ্য, সামঞ্জস্য অথবা সমঞ্জসতা ; হবে না সৌন্দর্যতা, বিষাদতা, মাধুর্যতা। এইরকম আর একটা ভুল কথা 'সমৃদ্ধশালী', আসলে কথাটা হবে 'সমৃদ্ধিশালী'। ঠিক কথাটা 'সুষ্ঠু', কিন্তু অনেকেই বলেন 'সুষ্ঠ'—দেয়াললিখনেও তাই দেখা যায়। 'ওনার' কথাটা পূর্ববঙ্গীয়, 'ওঁর'-টাই মান্য, কিন্তু এখন প্রায় সকলেই 'ওনার' বলেন, সত্যজিৎ রায়ের লেখাতেও তা ঢুকে পড়েছে।

সাক্ষাৎকারগুলিতে বিশেষ করে, কেউ কেউ প্রচুর ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন, বোঝেন না যে, গ্রামের নিরক্ষর বা অল্প লেখাপড়ার মানুষ এ কথাগুলির অর্থ ধরতে নাও পারেন। বিশেষজ্ঞদের এ-ত্রুটি ক্ষমার্হ, কারণ তাঁদের অনেক পরিভাষা হয় তৈরি হয়নি, না হয় যা হয়েছে তার খোঁজ তারা রাখেন না, কিন্তু সাধারণ বক্তারা এবং রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা যখন ফুলঝুরির মতো ইংরেজি শব্দ (তা প্রায়ই ভুল) ছিটিয়ে দেন তখন লোকে হয়তো তাঁদের বচনমহিমায় ঘাবড়ে যায়, কিন্তু কিছু লোক হাসবারও উপলক্ষ্য পায়।

শেষে বলি, সম্প্রচার যাঁরা করবেন তাঁদের অনেক রকমের নিয়ন্ত্রণ মানতে হয়। কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ, প্রথার নিয়ন্ত্রণ, বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ, প্রাপকের, বাহনের এবং ভাষার নানা স্তর, উদ্দেশ্য মাত্রা ও ব্যাকরণের নিয়ন্ত্রণ, এমনকী কাণ্ডজ্ঞানেরও নিয়ন্ত্রণ। এ ব্যাপারটা বাধা নয়, বরং এর মধ্যেই যাঁরা উৎকর্ষ (কিছুতেই উৎকর্ষতা নয়) দেখাতে পারবেন তাঁরাই জিতে যাবেন, জিতে যান। মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব অসংখ্যবন্ধনময়, এবং তাই আবার মানুষের স্বাধীনতার অন্যতম উৎস। ভাষাবিজ্ঞানী চম্‌স্কি একটি সাক্ষাৎকারে ভাষাকে একইসঙ্গে যে limiting এবং liberating[১২] বলেছেন তা এই প্রজ্ঞা থেকেই। সম্প্রচারক বন্ধুদের সে কথাটা সব সময় মনে রাখতে হবে।[১৩]

৫ কিছু প্রসঙ্গের সুনির্দিষ্ট আলোচনা

আমরা জানি বেতারে হোক, দূরদর্শনে হোক, সংবাদে বাক্য একবারই উচ্চারিত হয়। তাতে সংবাদ পাঠকের বোঝানোর এবং শ্রোতার বোঝবার—এ দুটো পরস্পরনির্ভর কাজ একসঙ্গে কয়েক মুহূর্তে সেরে নিতে হয়—তারপরে আর সুযোগ পাওয়া যায় না, কারণ একটার পর একটা খবর, তার মাঝখানে হয়তো-বা বিজ্ঞাপন—এসে যাচ্ছে, আগের কথা বা খবরটার স্মৃতি ভুলিয়ে দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, সংবাদপাঠক উচ্চশিক্ষিত অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিজীবীর জন্য যেমন খবর পড়ছেন, তেমনই পড়ছেন নিরক্ষর চাষি বা শ্রমিকের জন্যও। কোন শ্রোতা হবে তাঁর লক্ষ্য? কিন্তু এখানে তাঁর কোনো নির্বাচনের সুযোগ নেই—দু-জনকেই বা দুয়ের মাঝামাঝি এক কল্পিত শ্রোতাকে তাঁকে লক্ষ্য হিসাবে ধরতে হবে।

কাজেই সাধারণ পথের শিষ্ট আলাপে আমরা যে ধরনের বাক্য ব্যবহার করি—খুব দীর্ঘ নয়, খুব জটিল নয়, অথচ ব্যাকরণের নিয়মে সুসংবদ্ধ—এমনই গঠনের বাক্য থাকবে সংবাদে।

আর সংবাদ যেহেতু মূলত প্রতিবেদন বা বিবরণ, তাতে প্রশ্নবাক্য বা বিস্ময়সূচক বাক্য বেশি ব্যবহার করা যাবে না।

অবশ্যই সংবাদের শব্দও বেশির ভাগ চেনা, কিন্তু সহজ ও শিষ্ট শব্দ থাকবে—একটা রুচিগত মান রক্ষা খুবই জরুরি। নাম, পরিভাষা ও পটভূমিকার উপর পাঠকের হাত নেই, তা শ্রোতার চেনা নাও হতে পারে। কিন্তু বাক্য নাতিদীর্ঘ হলে সেসব অপরিচয়ের ভার একটু সুসহ হয়।

অনেকের ধারণা জটিল বাক্য এড়ানো উচিত। কিন্তু মনে রাখা দরকার সব জটিল ও যৌগিক বাক্য দুর্বোধ্য নয়। এড়াতে হবে অতি জটিল ও (অতি) দীর্ঘ বাক্য। খুব জটিল আর দীর্ঘ বাক্যও অনেক সময় উপযুক্ত যতি দিয়ে অর্থের স্পষ্ট ভাগ অনুযায়ী পড়লে বুঝতে অসুবিধে হয় না। আবার একঘেয়েভাবে পড়ে গেলে সরল বাক্যও অর্থহীন শোনায়—রোবোটের বলা বাক্যের মতো। সংবাদপাঠক ও লেখকের আক্কেলই বলে দেবে কত জটিল বা দীর্ঘ বাক্য শ্রোতা সহ্য করবে। 'যে-মেয়েটা যে-হারটা পরে যে-বিয়েবাড়িতে গিয়েছিল সে-মেয়েটা সে-হারটা সে-বিয়েবাড়িতে ফেলে এসেছে'—এ ধরনের বাক্য শুনলে আমাদের মাথা ঝিমঝিম করে ; আবার 'রাম আর সীতা আর লক্ষ্মণ পঞ্চবটীতে গিয়ে, গাছের ফলমূল খেয়ে, গোদাবরীতে চান করে দুপুরবেলায় ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে বিকেলে তিন জনে মিলে সাপ-লুডো খেলে, সন্ধে সাতটার আগেই মোটা মোটা বাজরার রুটি আর ছোলার ডাল খেয়ে, সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ত'—এ-বাক্যও ধাঁধা লাগায়। কিন্তু লক্ষ করুন, এ-যৌগিক বাক্য ঠিকমতো বিরতি দিয়ে পড়লে শ্রোতার কৌতূহল জিইয়ে রাখা কঠিন নয়। কাজেই এককথায় বলা যাবে না যে জটিল বাক্য (বা যৌগিক বাক্য) এড়িয়ে যেতেই হবে।

তৎসম শব্দের ব্যবহার নিয়েও অনেকরকম বিভ্রান্তি আছে। 'আকাশ'ও তৎসম শব্দ। যেমন তৎসম 'ফল' 'জল' 'কারণ' 'মুখ'; আবার 'অনুপদীনা', 'স্যন্দন' 'বৃংহণ' ইত্যাদিও তৎসম শব্দ। বারণ করার লক্ষ্য নিশ্চয়ই

অপরিচিত ও দুর্বোধ্য তৎসম শব্দ। কারণটা ওই—নিরক্ষর শ্রোতাকেও খবরটা শোনাতে এবং বোঝাতে হবে।

তার অর্থ কিন্তু এ নয় যে, রাস্তাঘাটের স্ল্যাং, আমাদের ইয়ার্কি-ফাজলামির নানা হালকা শব্দ ব্যবহার করতে হবে। এগুলোই কথ্য স্তরের শব্দ। 'বিরোধীপক্ষের অভিযোগের উপযুক্ত উত্তর খুঁজে না পেয়ে মাননীয় মন্ত্রী অসহায়বোধ করলেন'—এতে নীচে দাগ দেওয়া শব্দগুলি সবই তৎসম, কিন্তু তাতে সম্ভবত কোনো শ্রোতারই বুঝতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু এমন নিশ্চয়ই বলা হচ্ছে না যে ওসব শব্দ না বলে বলো 'বিরোধী ব্যাটাদের নালিশের লাগসই জবাব না পেয়ে মাননীয় মন্ত্রী ধেড়িয়ে গেলেন।'

যে-তৎসম শব্দগুলি সুবোধ্য এবং যে-তদ্ভব, অর্ধতৎসম, বিদেশি ইত্যাদি শব্দগুলি শিষ্ট সংলাপে বা বিবৃতিতে চলে, সেগুলোর ব্যবহারে আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

'কথ্য' আর 'চলিত' ভাষার মধ্যে তফাত করতে হবে। কথাটা আপনা থেকেই আয়ত্ত হয়, কারণ ওটা মুখের খাস জবান, আমরা জন্মের পরে ওটাই শিখি। ওটা আমাদের dialect বা home language।

কিন্তু 'চলিতটা' হল মান্য বা স্ট্যান্ডার্ড— যেটা সকলে সৌজন্যের উপলক্ষ্যে বা শিষ্ট সংলাপে বলে। ঢাকাই বা সিলেটি কথ্য, মান্য চলিত বাংলা হল স্ট্যান্ডার্ড।

সহজ চলিত ভাষা লিখতে হবে, বলতে হবে। তার জন্য প্রথমেই বলতে ইচ্ছে হয় খবরের কাগজ পড়বেন না, সস্তা ও নাটুকে রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনবেন না। কিন্তু 'না' 'না'-র দিকে না গিয়ে বলি—এসব লেখকের এসব লেখা ভালো করে পড়ুন (এলোমেলো অসম্পূর্ণ তালিকা)—

রবীন্দ্রনাথ—ছিন্নপত্রাবলী

শরৎচন্দ্র—ছেলেবেলার গল্প

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—চলিত ভাষার যে-বই পাবেন

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—যে-বই পাবেন

রাজশেখর বসু—যে-বই পাবেন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে, শকুন্তলা, রাজকাহিনী, নালক

সুকুমার রায়—গদ্য

প্রবোধচন্দ্র সেন—যে-বই পাবেন

ভবতোষ দত্ত (অর্থনীতিবিদ)—যে-বই পাবেন

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (পদার্থবিজ্ঞানী)—যে-বই পাবেন

অমিয় বাগচী (অর্থনীতিবিদ)—যে-বই পাবেন

সৌরীন ভট্টাচার্য (অর্থনীতিবিদ)—যে-বই পাবেন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—যে-বই পাবেন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়—যে বই পাবেন

এ ছাড়া নানা লেখক—তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, মানিক, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির শৈলী সহজ কথাবার্তার কাছাকাছি থেকেছে। সেগুলি অবশ্যই পড়বেন। হয়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ নাম বাদ পড়ে রইল, তবে আপাতত এতেই চলবে। সাধু ভাষাতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিবেকানন্দ (তাঁর 'চলিত' রচনাও) পড়বেন।

ভাববাচ্য হল কাজটাকে কর্তা করে তোলার প্রক্রিয়া। তাতে আসল কর্তা যে, অর্থাৎ যে করছে, তার গুরুত্ব কমিয়ে আনা হয়, কখনো কখনো তাকে লুকিয়ে ফেলা হয়। ফলে তাতে ব্যক্তির ছোঁওয়া থাকে না; 'আপনি' 'তুমি'-র ধাঁধায় পড়লে আমরা যেমন বলি 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

সংবাদের রচনায় সংবাদপাঠকের ব্যক্তিগত ভূমিকা কম। কিছু সংবাদ 'অমুকে বলেছেন, তমুকে বলেছেন' বলে তো দিতেই হয়—সেখানে ওই ব্যক্তিটির ভূমিকা থাকে। কেউ এসেছেন, বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে—এগুলোতেও ব্যক্তির গুরুত্ব দিতেই হয়। কিন্তু কোনো 'আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে'—এতে কর্তৃবাচ্য ('অমুকে আলোচনা ব্যর্থ করেছেন') প্রয়োগ বিপজ্জনক। কাজেই সংবাদের বিষয়ই বাক্য নির্ধারণ করে দেয়—সেইটা সংবাদ রচয়িতাকে বুঝতে হবে। এ-বিষয়ে তাঁর নিয়ন্ত্রণ কম। শ্রাব্য সংবাদের রেজিস্টার (আমি যাকে নিরুক্তি বলি) বা বিশেষ শৈলীই বাচ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। খেলার ধারাবিবরণীর রেজিস্টার আবার প্রায় উলটো। সেখানে কর্তৃবাচ্যই বেশি আসবে। সংবাদপাঠকের বা রচয়িতার

(বিশেষত সরকারি গণমাধ্যমে) 'আন্তরিকতা'র বিশেষ সুযোগ আছে বলে মনে হয় না—কণ্ঠস্বরে ছাড়া।

ভাষার একটা রূপ সব মানুষের আছে—সেটা তার ঘরের 'কথ্য' ভাষা, তার অঞ্চলের বা শ্রেণির কথ্য ভাষা। আমরা তাকে উপভাষা বলি, সমাজভাষা বলি, কিন্তু তা আসলে ঘরের ভাষা।

আর একটা ভাষা আমরা স্কুলে শিখি, সাহিত্যে পাই, খবরের কাগজে পত্রপত্রিকায় পড়ি, ক্লাসে, বক্তৃতায়, রেডিয়ো, টেলিভিশনে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাটকে, চলচ্চিত্রে শুনি। সেটা হল মান্য চলিত বা স্ট্যান্ডার্ড ভাষা। গরিব-বড়লোক, সাক্ষর-নিরক্ষর—সকলেই এই মান্য চলিত ভাষাটা ঘরের বাইরে ব্যাপক আদান-প্রদানে ব্যবহার করে। সেটা বুঝতেও তাদের অসুবিধা হয় না, যদি-না কমলকুমার মজুমদার কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যভাষার মুখোমুখি হয় তারা।

এটা শুধু লেখাপড়া শেখার ব্যাপারও নয়। মান্য চলিত ভাষা আজকাল তারা কানেও শুনছে অনেক বেশি। ষাটের বছরগুলোতে ট্রানজিস্টার রেডিয়োর বিশেষ বিস্তারে, পরে টেলিভিশন এসে যাওয়ায়। তা ছাড়া নাটকে সিনেমায়। এতে মান্য চলিত ভাষার আদর্শটি ঠিক কী, কোথায় তা তার ঘরের ভাষা থেকে আলাদা, তা তারা জানে, দরকারমতো ঘরের ভাষা থেকে মান্য ভাষায় যাতায়াত করতে তাদের অনেকেরই অসুবিধে হয় না।

অনেক ইংরেজি শব্দ বাংলা করতে গেলে মুশকিল হয়, যেমন dumping, internet, e-governance! সব শব্দের বাংলা করা কি প্রয়োজন? ইংরেজি বা বিদেশি শব্দগুলো বিশেষজ্ঞদের কাছেই আগে আসে—যাঁরা ইংরেজি ভাষা জানেন এবং বিষয়টাও জানেন তাঁরা তো বিশেষজ্ঞই। ফলে তাঁদেরই উপর দায় বর্তায় কথাটা সাধারণ মানুষের মতো করে ব্যাখ্যা করে তার একটা দেশি চেহারা বা নাম দেওয়া। একে বলি পরিভাষা-নির্মাণ। দুঃখের বিষয়, অনেক বিশেষজ্ঞই শুধু তাঁদের নিজেদের গোষ্ঠীর কথা ভেবে খটোমটো তৎসম পরিভাষা তৈরি করেন, সাধারণ মানুষের কাছে সেটা বোধগম্য হচ্ছে কি না ভাবেন না।

Dumping-এর পরিভাষা বাংলা অর্থনীতির বইয়ে আছে, সেটা দেখে নিলেই হয়। Internet অন্তর্জাল চলছে, e-governance-কে বৈ-প্রশাসন করাই যায়। কিন্তু সব বিদেশি কথার বাংলা পরিভাষা করার দরকার কী? অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন তো চলছে।

নানা ধরনের পরিভাষা থাকে। প্রথমত উঁচু বিদ্যার পরিভাষা—যেগুলো বিশেষজ্ঞদের এক্তিয়ারে, তাঁরাই সেগুলো নিয়ে কাজ করেন। কিন্তু সেগুলো ছাত্রদেরও বুঝে নিতে হয়, তাই তাকেও বেশি খটোমটো না করাই উচিত। তবু ব্যবহারে ব্যবহারে সেগুলো চেনা হয়ে যায়।

অন্য দিকে সরকারি কাজকর্মের পরিভাষা। সেগুলোর সঙ্গে জনসাধারণের প্রায় রোজকার যোগাযোগ হয়, ফলে সেগুলোও খুব কঠিন হওয়া উচিত নয়।

তৃতীয়ত বিদেশি জিনিসপত্র যা আমরা ব্যবহার করছি তার পরিভাষা। এতে বিদেশি শব্দই বেশি চলে—চেয়ার, টেবিল, বাল্ব, ফ্যান, সুইচ, জেনারেটর, পাম্প সেট। একেবারে তলার মানুষেরা উচ্চারণ কষ্টকর দেখলে কিছু শব্দ নিজেরা তৈরি করে নেন, যেমন 'কলের গান', 'ঠান্ডা মেশিন', 'হাওয়া-গাড়ি', 'দমকল' ইত্যাদি। এগুলো বিশেষজ্ঞদের নয় এবং এগুলোর দাম আছে। আমরা অনেকে ইংরেজি শিক্ষিতের অভিমানে ইংরেজি শব্দই ব্যবহার করি বলে এগুলোকে পাত্তা দিই না। কিন্তু এসব পরিভাষা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং যথাসম্ভব ব্যবহার করা উচিত।

ভাষাকে সরল করতে গিয়ে তরল করে ফেলার একটা প্রবণতা ইদানীং লক্ষ করা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে খুব জনপ্রিয় খবরের কাগজ না পড়াই ভালো। কারণ তাদের কারও কারও নীতি হচ্ছে পথে-ঘাটে চালু 'জনতা'-র ভাষায় কথা বলা, খবর লেখা। তাতে ঠাট্টা-ইয়ারকিরও একটা জায়গা আছে।

কিন্তু আবার ওই 'না'-এর জায়গা থেকে সরে এসে বলি—সরকারি মাধ্যমের সম্প্রচারে একটা গাম্ভীর্য থাকা দরকার—তার সঙ্গে আন্তরিকতার কোনো বিরোধ নেই। কোন শব্দগুলো সেই গাম্ভীর্য বা সম্ভ্রম বজায় রাখার সহায়ক, কোনগুলো নয়, তা সংবাদ-প্রচারকেরা নিজেরাই বুঝতে পারবেন। এখানে কাণ্ডজ্ঞানের একটা বড়ো ভূমিকা আছে।

ইংরেজি অভিধানে অনেক ক্ষেত্রে শব্দের সৌজন্য বা formality-র স্তর অনুযায়ী চিহ্ন দিয়ে বলা হয় যে এ-শব্দটা colloquial, এটা informal, এটা slang, এটা impolite ইত্যাদি। বাংলা অভিধানে এখনও এত বিস্তারিত খবর নেই। কিন্তু আমাদের মাথায় যে অভিধান আছে তাতে এ-চিহ্নগুলো আছে—একটু খেয়াল রাখলেই বেরিয়ে আসবে।

নামের আগে শ্রী শ্রীমতী মিস্টার জনাব—এগুলো তুলে দিলে ক্ষতি কী? অবশ্য এই সিদ্ধান্তটা একটা ব্যাপক সামাজিক সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো একটা পক্ষ এ-সিদ্ধান্ত সকলের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। কোনো জনপ্রিয় সংবাদপত্র এ নিয়ে বিতর্ক তুললে সমাজের ইচ্ছেটা কিছুটা প্রকাশিত হতে পারে।

আমরা অনেকে নিজেরা নামের আগে শ্রী বসাই না, স্বাক্ষরেও না। অনেক গবেষক নিজের নামের আগে ড. বসান—সেটা হাস্যকর। মুখেও অনেকসময় বলেন, 'আমার নাম ডক্টর অমুক!' সে আরও হাস্যকর। এ উপমহাদেশে ছাড়া সম্ভবত সারা পৃথিবীতে কেউ সই-এ হোক, বই-এর লেখক হিসেবে হোক, প্রথম পরিচয় হোক—নিজের নামের আগে 'ড.' লাগায় না।

প্রশ্নটা অবশ্য নিজের ব্যবহারের নয়, অন্যে আমাদের কী বলে উল্লেখ করবে—তার! আমার মতে—

১. প্রথমে পুরো নামটা বলা।

২. তার পরে পবিত্রবাবু বলা/শ্রী সরকার বলা [হিন্দুর ক্ষেত্রে]

মুসলমানদের ক্ষেত্রে জনাব বলে পদবি বলার রেওয়াজ আছে—কিন্তু সেটা কী হওয়া উচিত তা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজরাই বলুন। বিদেশি নামের ক্ষেত্রে মিস্টার + পদবি রাখলে ক্ষতি কী?

এ ব্যাপারে আমি একটু রক্ষণশীল।

প্রয়াত কিংবা সদ্যপ্রয়াত কোনো ব্যক্তির বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পদবি-সহ পুরো নাম বার বার উচ্চারণের একঘেয়েমি কাটানোব জন্য কী বলা উচিত তা ভেবে দেখা দরকার। আমার মতে কী

বলা উচিত নয় তা বলি। 'স্বর্গীয়', 'স্বর্গত', 'ঈশ্বর' ইত্যাদি কথা আমি আর শুনতে চাই না। এগুলো শুনলেই আমার নাস্তিকতা শিউরে ওঠে। লোকটা স্বর্গে গেছে কে বলল? স্বর্গটা এই মহাকাশে ঠিক কোন জায়গায়, নাসা (NASA) কি তা বের করতে পেরেছে? আর ঈশ্বর ভদ্রলোকই-বা কে যে একটা লোক মরে গিয়ে তার সঙ্গে এক হয়ে গেল?

আমার মতে প্রয়াত মাধবরাও, প্রয়াত শ্যামল, প্রয়াত হরভূষণ বললেই হয়। আমার প্রয়াত শ্রীসিন্ধিয়া, শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় শুনতেও আপত্তি নেই। মৃত্যু হলেই মানুষ শ্রী-হীন হবে কেন?

লেখক বিশিষ্ট ভাষাবিদ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য

টী কা ও সূ ত্র নি র্দে শ

১ দ্র. বর্তমান লেখকের 'কাজের ভাষা বাংলা : কীভাবে হবে' অশোক দাশগুপ্ত (সম্পা.), ১৪০৮, 'আজকাল', শারদ সংখ্যা।

২ দ্র. Fishman, Joshua A. (সম্পা.) 1970, *Readings in the Sociology of Language. The Hague, Mouton,* পৃ. 99-138.

৩ সাহিত্যের ভাষার শৈলী সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের গদ্যরীতি পদ্যরীতি (২য় সংস্করণ, ২০০১, সাহিত্যলোক) দ্রষ্টব্য।

৪ দ্র.

'The Users and Uses of Language', ফিশম্যান সম্পাদিত উল্লিখিত সূত্র, পৃ. 139-169, উপভাষা-সমাজভাষা সম্বন্ধে তাঁদের সংজ্ঞা 'The variety according to users.' পৃ. 141.

৫ ওই, পৃ. 149.

৬ নিরুক্তি সম্বন্ধে এই লেখকের *গদ্যরীতি পদ্যরীতি* বইয়ের 'শৈলীবিজ্ঞানের গোড়ার কথা' ও 'বাংলা গদ্য শৈলী : পর্যালোচনা' প্রবন্ধ দু-টি দ্র.

৭ ১-এর পাদটীকা দ্র.

৮ এই লেখকের 'ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ' (১৯৯৮, চিরায়ত প্রকাশন) বইটিতে ছন্দবাহিত সৌন্দর্য সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আছে।

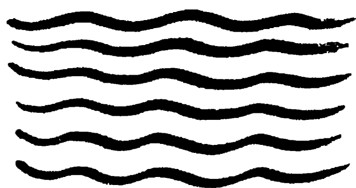
৯ বাংলা শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের 'বাংলা বলো' [প্রমা প্রকাশনী], বইটি দেখা যেতে পারে। একই ব্যক্তির একটি উচ্চারণ অভিধানও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশ করতে চলেছে।

১০ Bell, Allan, 1997, 'Language Style and Audience Design ; Copland, Nicolas এবং Adam Jaworski (সম্পা), ১৯৯৭, *Sociolinguistics*, Hampshire London, Macmillan Press Ltd., পৃ. 240-250

১১ *Roget's International Thesaurus*, 1962 সং, নিউইয়র্কের Thomas Y. Crowell Company প্রকাশিত।

১২ Red and Black Revolution পত্রিকার ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে, http:/flag. blackened. net/revolt/rbr / noamrbr2. html থেকে ইন্টারনেটে প্রাপ্ত, 6 পৃষ্ঠা। এই সূত্রটির জন্য আমি শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী।

১৩ এই প্রবন্ধের প্রাথমিক ভাবনাগুলি সাজানো হয়েছিল প্রয়াত পাপিয়া চক্রবর্তীর স্মৃতিতে দ্বিতীয় স্মারক বক্তৃতা (১৯৯৭) হিসেবে। এখানে তা বিস্তারিত হয়েছে প্রণবেশ সেন স্মারকগ্রন্থের জন্য। এই লেখাটি লিখিয়ে নেওয়ার জন্য আমি শ্রীভবেশ দাশের কাছে কৃতজ্ঞ।



সম্প্রচার বিষয়ে অণুচিন্তন

অমিয় দেব

খবর আমরা হয় শুনি, নয় পড়ি। যতদিন শুধু বেতার আর খবরের কাগজ ছিল, টেলিভিশন হয়নি, ততদিন হয় শুনেছি, নয় পড়েছি, যুগপৎ শোনা ও পড়া হয়নি. সম্প্রতি এক টেলিভিশন চ্যানেলে 'শিরোনাম' শুনে-পড়ে চমকে উঠেছিলাম: শিরোনাম তো স্পষ্টতই 'হেডলাইন্স'-এর বাংলা, তা পড়া যায়, কিন্তু শোনা যায় কি? কী বলব একে, বিপর্যাস না মাধ্যমশিল্পের গুরুচণ্ডাল? আকাশবাণী একসময় বলত 'বিশেষ বিশেষ খবর', দিল্লি দূরদর্শন বলত-লিখত 'মুখ্য সমাচার'। সম্প্রচারে কি উন্নয়ন হচ্ছে, নাকি এ নিতান্তই অভিনবত্বের চেষ্টা? 'সঙ্গে থাকুন'-এর দো-আঁশলামো এখনও কানে লাগে ; নাকি এও অভ্যাস হয়ে যাবে, 'চলন্তিকা'-র ওই 'অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত'-র মতোই হবে এদের অবস্থান? পাঁচ দশক আগে শুনেছিলাম বিজ্ঞাপনের এক নিজের ভাষা আছে যার ভ্রমসংশোধন চলে না, কারণ সে ভ্রম দিয়েই কখনো কখনো নজর

কাড়ে। 'এমন সংশোধনবাদ জিন্দাবাদ' বলে 'কলকাতা' পত্রিকা হয়তো তার পুলিনবিহারী সেন সংখ্যায় একদা কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘার প্রয়াস পেয়েছিল, কিন্তু খেয়াল করেনি যে ওই স্লোগানে খানিক বিজ্ঞাপনও ঢুকে পড়েছে। অথচ নেহাত বেচার তাগিদ সম্ভবত ওই পত্রিকার ছিল না। বাজার ও বিজ্ঞাপন কতটা হরিহর তা অনুমেয়, হয়তো অতর্ক্যও। কিন্তু খবরের যে এক বাজার-ব্যতিরেকী ভূমিকা আছে তাও তো অতর্ক্য। আজ পর্যন্ত কোনো ভুল থাকলে তার সংশোধন ছাপে খবরের কাগজ, কোনো তাৎক্ষণিক ভুল হলে টেলিভিশনও তা শুধরে নেয়। অর্থাৎ সম্প্রচারিত তথ্যের কোনো ব্যত্যয় না ঘটুক, এই উদ্দেশ্য। এই যে কিছুদিন আগে পাঁচ দফায় ভোট হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গে তার সমুদয় তথ্য আমরা ঠিকঠাক পেয়েছি; হয়তো পরিবেশনে কোথাও এই তথ্যে কোথাও ওই তথ্যে জোর পড়েছে আর সেই অনুযায়ী বিশ্লেষণের ইতি-উতি ঘটেছে। তা ঘটুক-না, গণতন্ত্রে সবাই এক রা কাড়বে তা কেন হবে!

কিন্তু প্রশ্ন সম্প্রচারের ভাষা নিয়ে। সম্প্রচার যেহেতু আশুশ্রব্য কিংবা —পাঠ্য কিংবা আশুশ্রব্যপাঠ্য, এবং আশুবোধ্য, তাই তার ভাষার হয়তো আছে এক বিশেষ দায়িত্ব: যেন তা প্রাঞ্জল হয়, কোনো দ্ব্যর্থ তাতে না থাকে, যেন বক্রোক্তির মাত্রা তাতে হয় ন্যূন; যেন বিবৃত বিষয়ের অনুবর্তী ভাবাবেগ বিষয়কে ছাপিয়ে না ওঠে, যেন মাত্রাতিরিক্ত হর্ষে-বিষাদে আচ্ছন্ন না হয়ে পড়ে অনুপুঙ্খ, যেন বাক্য জানে সে খবর বইছে, সে হর্ষ অথবা বিষাদ ছড়াচ্ছে না—ইত্যাদি ইত্যাদি যত সংযমনির্ধারক সংকল্প। তিন-চার দশক আগে যখন জাপান এয়ারলাইন্স তার কলকাতা দপ্তর তুলে দিল তখন যদি কোনো খবরের কাগজ লিখত, 'জাল (JAL) তার জাল গুটোল' তখন খবর নয়, শ্লেষটাই হয়ে উঠত মুখ্য। এই অলংকারপ্রবণতা নিয়ে ফোঁড়ন কাটতে কাটতে নাকি তৎকালীন তিন ফাজিল এক কৃতী বান্ধব কানাইয়ের মৃত্যুসংবাদ ফেঁদে রেখেছিল, 'নাই, নাই রে সে কানাই'। বস্তুত, যে-মায়াজাল বিছিয়ে রেখেছে ভাষা চারদিকে তাতে অনেক রাঘববোয়ালই ধরা পড়ে যাব, তুচ্ছ সংবাদলেখক কোন ছার! তবু ব্যঙ্গোক্তির মাত্রা আছে আর তুচ্ছ সংবাদলেখকেরও তা জানতে হয়।

বলা বাহুল্য, বেতারে সম্প্রচার শুধু শব্দবিন্যাসে নয়, তার উচ্চারণেও, অর্থাৎ স্বরের প্রক্ষেপণে, উচ্চাবচতায় এবং ওজোগুণে তথা তেজে ও দীপ্তিতে। কিন্তু সংবাদপত্রের সম্প্রচারের যেমন শুধু লেখক নন, অদৃশ্য

পাঠকও আছেন, তেমনি বেতারবর্তী সম্প্রচারের কেবল বক্তা নন, আছেন অনুপস্থিত শ্রোতাও। যে-দূরবর্তী শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণ তারই যেন প্রতিনিধি তিনি নিজে। এই বাচন-শ্রবণে সামঞ্জস্য অভ্যাস করতে করতেই তিনি অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। তবে অবিশ্বাসীর কানে মাঝে মাঝেই তাঁকে আবেগ-আধিক্যে দুষ্ট শোনাতে পারে। কোনো কোনো শ্রোতার আবার আগেকার কারও কারও 'খবর পড়ছি—'-র স্মৃতি এতই জাগ্রত যে অন্য কোনো কণ্ঠকে আমল দিতে চান না। সেইসঙ্গে আবার একদল প্রবীণের আছে এক সার্বিক অধঃপাতের ধারণা। সম্প্রচারক না হয় তাদের কথা না-ই ভাবলেন, তিনি যেমন বর্তমান তাঁর শ্রোতারাও তেমনই বর্তমান। শব্দবিন্যাস ও স্বরক্ষেপ সেই বর্তমানের জন্যই না হয় হল, কিন্তু সেখানেও তো এ-দুয়ের সাযুজ্য চাই। আর যখন তিনি ঘটমান বর্তমানের সম্প্রচার করছেন তখন তো তাঁকে বিশেষ যত্নবতী বা যত্নবান হতে হয়, যাতে 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ' না হয়েও সমানুকম্পনে আন্দোলিত হতে পারেন। গলা কাঠ হয়ে থাকবে না, আবার একেবারে বুজেও যাবে না। 'বলটা ঝুলিয়ে দিলেন'-এর ক্লাসিক তো প্রেরণাও হতে পারে।

অবশ্য ঘটমান বর্তমানের সম্প্রচার অনেক বেশি ব্যাপক দূরদর্শনে। রুদ্ধদ্বার স্টুডিয়োতে আর আটকে নেই খবর, তার উৎসে ধাবিত হচ্ছি আমরা ; বিবরণ পাচ্ছি প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে ; কুশীলবকেও হয়তো স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি তাদের কথাও। অর্থাৎ বর্তমানের ঘটমানতার সাক্ষী হয়ে উঠছি আমরা, কোনো অবকাশ থাকছে না সন্দেহের বা প্রশ্নের। ডাক্তারির ছেলেমেয়েদের সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলনের সর্বৈব চেহারা আমরা এই সেদিন দেখেছি দুইবেলা—খবরের কাগজ বা বেতারের চাইতে বেশি প্রত্যক্ষ এই সন্দর্শন। আর টেলিভিশনকে যদি মায়াবাস্তব রচনার দায়ে কাঠগড়ায় তুলতে হয়, তাহলে অন্য দুই সম্প্রচারমাধ্যমকেও তুলতে হবে, কেননা খবর মানেই তো আমার নয়, অন্য কারও বার্তা। তবে হ্যাঁ, টেলিভিশন যেভাবে আমাদের চোখকান টেনে নেয় তাতে কল্পনেত্রের কিঞ্চিৎ ঘাটতি ঘটে যেতে পারে। অথচ বানানো হলেও এটা বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হবে না যে ৯/১১-র প্রথম সৌধের অগ্নিকাণ্ড টিভির পর্দায় ঘটতে দেখে জনৈক হাতিবাগানবাসী তাঁর দ্বিতীয় সৌধে কর্মরত আত্মীয়কে তাৎক্ষণিক দূরভাষে সজাগ করে দিয়ে বাঁচিয়ে দেন। খালি 'ভার্চুয়েল রিয়ালিটি' আর 'সিমুলাক্রা'-র তত্ত্বকথায় মজে থাকলে কি ইত্যাকার

'ডায়াস্পরা'-র ভালোমন্দ পুরো মানুষ হয়! আর চারদশক আগের সেই কেনেডি হত্যা-মামলায় জ্যাক রুবির হাতে লী হার্ভি অসওয়ার্ল্ডের খুন তো মার্কিনমুলুক পর্দাতেই দেখেছিল—তা পুরাঘটিত ছিল না, ছিল ঘটমান বর্তমান। মার্শাল ম্যাকলুহান কথিত 'গ্লোবেল ভিলেজ' বুঝি তখন থেকেই রূপ নিতে শুরু করেছে।

খবরের কাগজে যিনি সম্প্রচার করেন তাঁর লেখাই মাত্র আমরা পড়ি, তাঁকে চোখে দেখি না। লেখা পড়ে যে চেহারা ভাবলে ভুল হতে পারে তার এক মস্ত উদাহরণ 'বন্দীর বন্দনা'-র কবি বুদ্ধদেব বসু বিষয়ে সমর সেনের ধারণা : তিনি ভেবেছিলেন 'বন্দীর বন্দনা' যিনি লিখেছেন তিনি হবেন এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ ; বুদ্ধদেব বসু তো দীর্ঘকায় ছিলেনই না, শারীরিক বলিষ্ঠতাও তাঁর তেমন ছিল বলে জানি না। বেতারে স্বরগ্রাম শুনি, কারও গলা ভারী, কারো মিহি, সেই অনুপাতে ভারী অথবা মিহি চেহারার তাঁরা হয়তো একেবারেই নন। কিন্তু দূরদর্শনে আমাদের চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন তো হয়ই, সেইসঙ্গে বাচনেরও অন্বয় ঘটে। শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যে নাচ-গান-নাটকের সমন্বয় দেখেছিলেন—এক অনুরূপ সমন্বয় বোধ করি দূরদর্শনেও ঘটছে। আমরা কথা শুনছি, আর যিনি কথা বলছেন তাঁকে দেখছিও। তিনি কী পোশাক পরে আছেন, কীভাবে কথা বলছেন, এবং যা বলছেন তার দ্বারা কতটা আন্দোলিত হচ্ছেন—নাকি আদৌ আন্দোলিত হচ্ছেন না—ইত্যাদি আমাদের চোখে এসে ধরা দিচ্ছে। টেলি-সম্প্রচারকের পোশাক-আশাক নিয়ে শুনেছি কিঞ্চিৎ সমীক্ষাও হয়। টেলি-বিজ্ঞাপনে কোথাও কোথাও ভাঁড়ামোটাই ভাষা—তা অত্যুক্তিরই রকমফের—টেলি-সম্প্রচারে যে তাদৃশ অত্যুক্তির অবকাশ নেই তা বলা বাহুল্য। তবে বাঙালি সম্প্রচারকের সাহেবি পোশাক সব ক্ষেত্রে দৃষ্টিনন্দন কি না সে-প্রশ্ন বোধকরি অবান্তর নয়। টাই-জ্যাকেট ও স্কার্ট-ব্লাউজ হয়তো সর্বত্র সুখেরও নয়। আর তার অন্তর্বর্তী অসামীপ্যও হয়তো নয় অভিপ্রেত। পোশাক-আশাকের প্রশ্নটা কোনো 'কোড'-এর প্রশ্ন নয়, চলচ্চিত্রপ্রতিমতার প্রশ্ন—কোন পোশাকে কে কত স্বচ্ছন্দ তা-ই হয়তো বেশি জরুরি।

বিষ্ণু দে-র একটি বইয়ের নাম 'সংবাদ মূলত কাব্য'। সংবাদের এই কাব্যমূল নিশ্চয়ই সম্প্রচারপদ্ধতিতে নেই, আছে সম্প্রচারিত বস্তুতে। সেই বস্তু যদি মিথ্যা হয়, হয় অলীক বা কপোলকল্পিত, তাতে 'কাব্যি' থাকলেও কাব্যমূল থাকবে না। কাব্যমূল থাকতে পারে তখনই যখন তা সত্য, নির্জলা

সত্য। কারণ শ্রুতিমধুর শব্দবন্ধ হলেও কাব্যের অন্তঃসার অভিজ্ঞতা। আর সেই অভিজ্ঞতার দিশা দিতে পারে সংবাদও। ঘটমান ও পুরাঘটিত বর্তমানে বাস্তব ক্রমেই মথিত হয়ে চলেছে, এবং অভিজ্ঞতা দানা বাঁধে ওই বাস্তবেই। সুতরাং কবিতায়-সাংবাদিকতায় শেষ পর্যন্ত কোনো বিরোধ নেই, যদি সে-সাংবাদিকতা হয় সত্যনিষ্ঠ। সত্যকল্প সাংবাদিকতায় যাঁরা ব্রতী, সত্যের সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত যাঁরা অনুসন্ধান চালিয়ে যান, যাঁরা আপাতবাস্তবকে উলটেপালটে তার ভেতরে ঢুকতে থাকেন, তাঁরা হয়ে উঠতে পারেন কবিতার পরোক্ষ অগ্রদূত। কবি সংবাদ দেবেন না, কিন্তু যে-সংবাদ তিনি শুষে নিয়েছেন, বাসা বাঁধতে দিয়েছেন তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে, তা-ই তার উপমা-উৎপ্রেক্ষার খোরাক হয়ে উঠবে।

ফাসিস্ট-শিরোমণি গোয়েবল্‌ই বোধহয় বলেছিলেন পুনঃপুন প্রচার করতে পারলে মিথ্যাও সত্য হয়ে ওঠে। গোয়েবেল্‌সের দলে নাম না লিখিয়েও বিজ্ঞাপননির্মাতারা কিন্তু কথাটা অনেকদূর মানবেন। তাঁরা পণ্যকে ঘিরে যে-মায়া তৈরি করেন তার সত্যাসত্যবিনিশ্চয় খুব সহজ নয়। আর তা না করেই আমরা অনেকসময় বঁড়শিতে আটকে যাই। তবে খবর বিজ্ঞাপন নয়, কোনো পণ্যের চার মেখে সে আসে না। অন্তত তার আসার কথা নয়। কিন্তু যদি কোনো গুজবের ঘোর নিয়ে সে আসে? সেই যে একবার এক হুল্লোড় হয়েছিল রবীন্দ্রসরোবরে, চারদশক মতো আগে, এক বলিউডি আমোদসন্ধ্যায়—ঢের বস্ত্রহরণের গল্প শোনা গিয়েছিল পরের দিন সকালে—তার কতটা ছিল সত্য আর কতটা গুজব? সত্য ও গুজবের মিশেল দেখে এক লেখক-সাংবাদিক মনে আছে 'সরোবরে অগ্নিকাণ্ড' নামে এক প্রায়-ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা লিখেছিলেন এক ছোটো পত্রিকায়। ডাক্তারদের যেমন হিপোক্রেটিসের শপথ নিতে হয় তেমনি কি কিছু আছে সাংবাদিকদের? 'গুজবে কান দেবেন না' যে মাঝে মাঝে খুব জরুরি হয়ে ওঠে আমাদের সমাজে, তাতে তো সাংবাদিকদের উপরও এক মস্ত দায়িত্ব এসে বর্তায়—গুজবের রহস্য উন্মোচন, এমনকী যারা গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের পশ্চাদ্ধাবন; পক্ষান্তরে যাকে গুজব বিকৃত করে ফিরছে সেই সত্যের অনুসন্ধান। সেই সত্য তা-ই যা মিথ্যা নয়; অর্থাৎ সাংবাদিকদের কাছে সত্য স্বপ্রকাশ নয়, সন্ধানসাপেক্ষ। আমেরিকার ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি উদ্ঘাটন করেছিলেন যে-দুই সাংবাদিক তাঁরা তো এক মিথ্যার লড়াই করছিলেন। তেমনি আমাদের গ্রামীণ দারিদ্র একবার

উন্মোচন করেছিলেন সাংবাদিক সাইনাথ আমাদের সকল ভ্রান্তি ও অজ্ঞতার নির্মোক সরিয়ে। তাঁর এক প্রতিবেদন (ইংরেজি থেকে বাংলা তরজমায়) এইভাবে শুরু হচ্ছে: শিরোনাম 'নামে কী এসে যায়? জিজ্ঞেস করো ধুরুয়াদের':

মালকানগিরি (উড়িষ্যা): এইমাত্র এক অদ্ভুত করণিক সত্য জানল মাঝি ধুরুয়া। 'হ্যাঁ,' যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সেই অধস্তন আধিকারিকটি বললেন, 'কাগজপত্রে আছে তুই আদিবাসী। কিন্তু তোর ভাই আদিবাসী নয়।'

মালকানগিরির ধুরুয়া-জনজাতিভুক্ত মাঝির পক্ষে তা বুঝে ওঠা শক্ত হল। সে বলতে লাগল, যে যদি আদিবাসী হয় তাহলে তার ভাইও আদিবাসী। 'কী করে বোঝাই তোকে? লিখতে-পড়তে তো শিখলি না,' বিরক্ত হয়ে বললেন আধিকারিকটি।

আদিবাসীদের প্রাপ্য সুযোগসুবিধা থেকে এই অঞ্চলের ধুরুয়া-জনজাতি বঞ্চিত। তার কারণ সরকারি তপশিলি-আদিবাসী তালিকায় লেখা এক ভুল বানান। হয় তাই, আর নয়তো ওই জনজাতির নামের কী বানান হবে তা নিয়ে মতভেদ।

একথা যখন মাঝি ধুরুয়ার কাছে আমি প্রথম শুনি, আমার মনে হয়েছিল অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভব ছিল না।

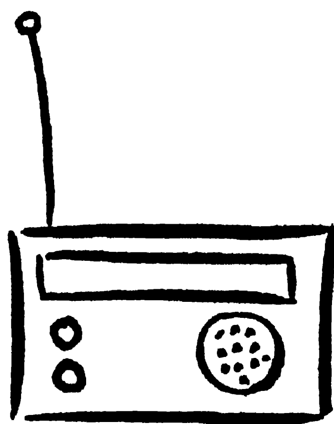
দুটো নথি দেখলাম। প্রথমটি দিল্লি থেকে ছাপা তপশিলি জনজাতির সরকারি তালিকা। আর দ্বিতীয়টি ভুবনেশ্বরের 'উড়িষ্যায় তপশিলী বর্ণ ও জনজাতিবিষয়ক মূল তথ্য'। দুটোতেই গোষ্ঠীটির নাম 'ধারুয়া'। তারা অবশ্য নিজেদের 'ধুরুয়া' বলে জানে। (স্থানীয় নথিতেও তারা 'ধুরুয়া'।) 'উ'-র বদলে 'আ'—উচ্চপর্যায়ের ওই করণিক ভ্রান্তি গোষ্ঠীটিকে সব সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।...

পড়তে পড়তে মহাশ্বেতা দেবীর কোনো গল্পের কথা মনে পড়ে যেতে পারে। 'সংবাদ মূলত কাব্য' কথাটিরই যে শুধু বিস্তর তাৎপর্য আছে তা নয়, সংবাদ বস্তুটিরই বিস্তর তাৎপর্য আছে। তার সম্প্রচারে যারা ব্রতী হয়েছি তাদের তাই অনেক দায়িত্ব। আমরা কথার ফুলঝুরি বানাব না, চেষ্টা করব স্বচ্ছতার। যেখানে বাচন যুক্ত হচ্ছে, সেখানে হব স্বাভাবিক—উচ্ছ্বাস নয়, নয় উচ্ছ্রিত আবেগ, আবার বিশুষ্ক নিরাসক্তিও নয়। কিঞ্চিৎ ব্রেশ্‌টীয় বাচনভঙ্গি, নিজে না দুলে, শ্রোতাকে না দুলিয়ে, ভাবানো। আর যেখানে

তৃতীয় মাত্রা যোগ হচ্ছে, সম্প্রচারক যখন ছবি হয়েও উঠছি, তখন কাজ আরও শক্ত। যা বলছি, যে-স্বরে বলছি তার সঙ্গে আমার অবয়বগত সংগতি যেন থাকে। অভিনয়, আবার অভিনয় নয়ও। মুখই আছে, মুখোশ নেই। আমি পাত্র-পাত্রী নই, উপস্থাপক মাত্র, সূত্রধার। নাটক হয়তো অন্তরালবর্তী, হয়তো দৃশ্য, কিন্তু আমি না থাকলে নেই। তবে প্রস্তাবটা অহংকারের নয়, বিনয়ের, কারণ দর্শক-শ্রোতা না থাকলে আমিও নেই। এমন সংযোগসূত্র আর কোথায়! বোতাম টেপা চাই, বোতাম ঘোরানো চাই, খবরের কাগজের ভাঁজ খোলা চাই। অন্যদিকে রাস্তায় নেমে ঢোল পেটানো, লাউড-স্পিকার সবই শ্রোতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কোনো কিশোর তো তার মফস্বলে বসে গান্ধীহত্যার খবর এভাবেই পেয়ে থাকতে পারে। এমনকী, মুখে মুখেও যখন খবর ছড়ায়—গুজবের কান ঘেঁষে হলেও—তখনও চলতে থাকে ঈদৃশ সেতুরচনা। শুনেছি মার্কিনদেশে পাঠরত এক ভারতীয় যুবক কেনেডি-হত্যার খবর পেয়েছিল সহপাঠীর মুখে ; আর সেই সন্ধেয় যখন অস্থিরচিত্তে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল শোকার্ত মানুষজনের উদ্দেশে, তখন সব শুনশান দেখে সেই প্রথম বুঝতে পেরেছিল টেলিভিশনের মর্ম। কারণ সেই মুহূর্তে সারা আমেরিকা টিভির পর্দায় সেঁটে বসে ছিল। আর এক প্রৌঢ়ের কথা জানি যে ইন্দিরা গান্ধির হত্যাসংবাদ প্রথমে পেয়েছিল নিউ জলপাইগুড়ি নেমে এক অস্পষ্ট গুজবের মতো যা শেষ পর্যন্ত খবর হয় প্রায় মধ্যরাত্রে দার্জিলিং পৌঁছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের খবরও সে পেয়েছিল আরেক ভ্রমণশেষে, অমনি গুজবতুল্য যা সন্ধে নাগাদ গিয়ে খবর হয়। আর সে-ই যখন তার টেলিভিশন-পূর্ব জীবনে রেডিয়ো শোনা তো দূরের কথা খবরের কাগজও পড়ত না, তখন মানুষের চাঁদে পৌঁছোনোর খবর পেয়েছিল এক বন্ধুর শিশুপুত্রের কাছে।

অর্থাৎ খবর যেমন কেউ দেবে তেমনি কেউ নেবেও। এই দেওয়া-নেওয়াই সম্প্রচারের মূল কথা। সম্প্রচার এক সামাজিক কর্ম।

লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য



সম্প্রচার প্রসঙ্গে

জ্যোতিভূষণ চাকী

এখন 'সম্প্রচার' শব্দটি পারিভাষিক। বেতার দূরদর্শনের বাক্-প্রচার বোঝাতেই শব্দটির প্রয়োগ। 'সম্প্রচার' শব্দের 'সম্' উপসর্গটি গুরুত্বপূর্ণ। সম্ মানে সম্যক বা সুষ্ঠু। এই 'সুষ্ঠু' অর্থে সম্ উপসর্গটি বলে দিচ্ছে উচ্চারিত বাঙ্‌নিক্ষেপটিকে যথাযথ হতে হবে। বাঙ্‌নিক্ষেপের ক্ষেত্রে 'যথাযথ' শব্দটির ইঙ্গিত সঠিক উচ্চারণ. স্পষ্টতা। আর ভাষাটি ঠিক যেমন হওয়া উচিত তেমনি হওয়া।

প্রথমে উচ্চারণের কথা বলা যাক। বাংলা উচ্চারণ বানানভিত্তিক নয় বলে উচ্চারণে দ্বৈবিধ্য আসা স্বাভাবিক, কেবল বলব, না ক্যাবল বলব? একটি না অ্যাকটি, এই ধরনের উচ্চারণ মীমাংসার জন্য আমরা বাংলা উচ্চারণকোষ দেখতে পারি। আর বিকৃত উচ্চারণ নানা ধরনেরই হতে পারে যুক্তাক্ষরতার জন্য। লোকশ্রুতি অনুযায়ী কালিদাস উষ্ট্রকে একবার বলেছিলেন উট্র,

রাজকন্যা অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললেন—কিমিতি কিমিতি? কালিদাস এবারে বললেন, উষ্ট। একবার য লোপ আর একবার র-লোপ। রাজকন্যা সজোরে বললেন:

উষ্ট্রে লুম্পতি রং বা ষং বা,
তস্মৈ দত্তা নিবিড়-নিতম্বা।

তাৎপর্য, যে উষ্ট্র উচ্চারণে একবার 'র' একবার 'ষ' লোপ যার, তার হাতেই পড়েছে আমার মতো সুন্দরী।

এই রকমের লোপ সম্প্রচারেও ঘটে:

কতৃপক্ষ এ-বিষয়ে তখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। এখানে রেফ্-এর উচ্চারণ বর্জিত হল। আবহাওয়ার খবরে আর্দ্রতা উচ্চারণে প্রায়ই বিভ্রান্তি ঘটে—**আদ্রতা**, নয়তো **আর্দতা**। আবহাওয়া উচ্চারিত হয় **আবোহাওয়া** যদিও মূল শব্দটি আবব্‌হাওয়া উর্দুতে আবোহাওয়া উচ্চারণ কিন্তু বাংলায় আব্‌হাওয়া। 'হ্ব' বাংলার একটি সমস্যা। কেউ বলেন *'আহবান'*: নেতৃবর্গ সম্প্রীতির আহবান জানিয়েছেন। স্বীকৃত উচ্চারণ 'আওভান'।

অন্ত্য বর্ণে অকারণে 'অ' লোপ-ও সম্প্রচারে শুনি:

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে এই নিম্নচাপ কবে সরে যাবে তা **নিশ্চিৎ** করে বলা যাচ্ছে না। **নিশ্চিতই** বাঞ্ছনীয়। আলোচনা আপাতত **স্থগিৎ** রাখা হয়েছে। উচ্চারণ **স্থগিতো** হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সমাসবদ্ধ শব্দে পূর্বপদের স্বর অনেকেই লোপ করেন: **দূর্‌দর্শন**, **লোক্‌গীত**, **বন্‌সৃজন**, তেমনই **বাস্‌ভবন**। **'আইনানুগ'** না বলে **আইনানুগো** বলাই সমীচীন।

'অ্যা' উচ্চারণকে অকারণে 'আ' বলা হচ্ছে—সরকার বলছেন এক্ষেত্রে অনুদান **দাওয়া** বন্ধ করতে চান। আদ্য যুক্তাক্ষর উচ্চারণে শিথিলতা লক্ষণীয়, প্রোগ্রাম > পোগ্রাম। হৃদয়পুর > রিদয়পুর। 'ক্ষ' এর বাংলা উচ্চারণ ক্‌খ। তাই অন্ত্যাক্ষরী উচ্চারণ স্বাভাবিক নয়। আঞ্চলিকতার প্রভাবেও উচ্চারণবিকৃতি ঘটে। বিশেষ অঞ্চলে উচ্চারণ প্রভাবে স > শ হয়ে যায়, তেমনি আবার শ > স হয়ে যায়। Bus হয়ে যায় 'বাশ' congress হয়ে যায় কংগ্রেশ (sh)। তেমনি handshake > হ্যান্ডসেক। পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে ঁ চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ লুপ্ত হয়, পাঁচমুড়া > পাচমুড়া, বাঁশদ্রোণী > বাশদ্রোণী—অ্যা হয়ে যায় এ: একচল্লিশ, একান্ন। যাঁরা সংবাদাদি পড়বেন তাঁদের বর্ণের উচ্চারণস্থান বিষয়ে ধারণা থাকা উচিত। অর্থাৎ বর্ণটির উচ্চারণে জিভের

অবস্থান কোথায়, মুখগহ্বরের বাতাস কীভাবে বেরোচ্ছে এসব জানলে উচ্চারণবিকৃতি এড়ানো যায়।

'ফুল' এর 'ফ' উচ্চারণ ইং f এর মতো নয়, বায়ু বেরোবে না। দুটো ঠোঁট এক হবে। দন্ত্য-স্ এর উচ্চারণে- জিভটা দন্তমূলে ঠেকে, তালব্য-শ এর উচ্চারণে জিভটা তালুতে ঠেকে। তা যাদের 'সসিবাবু' বলার সম্ভাবনা তারা জিভটাকে দাঁতের পিছনে না ঠেকিয়ে তালুতে তুলবেন। এইভাবে বিকৃতি এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। ঋ-কারান্ত বর্ণের দ্বিত্বটা বার বার একক উচ্চারণের অনুশীলনে দূর করতে হবে, আব্বৃত্তি নয়, আবৃত্তি, (abritti) অম্মৃত নয়, অমৃত (amrito) তেমনি 'অদদৃষ্ট' নয়, 'অদৃষ্ট'।

উচ্চারণ শুদ্ধ হয়েও অস্পষ্ট হতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। শেষ সিলেবলের level অনেক সময় ঠিক থাকে না, বর্ণটা dropped হয়ে যায়, চলিত বাংলায় যাকে বলে ঝুলে পড়া।

এবারে পুজো মহালয়ার এক মাস পরে। 'প' পর্যন্ত স্পষ্ট শোনা গেল, 'রে' ঝুলে পড়ল, সমউচ্চতা অনুশীলনে আয়ত্ত করতে হবে।

Intonation হচ্ছে কথা বলার একটা সুর। নানা অঞ্চলের কথার সুর মনে আসতে আসতে আমাদের উচ্চারণে যেন কোনো বিশেষ অঞ্চলের সুর না আসে সে-বিষয়ে সতর্ক হতে হয়। Stress বা ঝোঁক ঠিক জায়গায় অনেকসময় পড়ে না। যেমন : বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা এই বিদ্যুৎ-এর 'বি' সম্ভাবনার 'স'-এ ঝোঁক আসার কোনো হেতু নেই। কিন্তু, এ-রকমের ভুল ঝোঁক আমাদের কানে আসে।

ঝোঁকের হেরফেরে অর্থের হেরফের হয় বলাই বাহুল্য:

আজকে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই। আমি যদি 'আজকে'তে ঝোঁক দিই, তাহলে বোঝাবে কাল বা কিছুদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল। আজ বৃষ্টি হবে না।

শেষ স্বরটা ঝুলে না যায় তার জন্যে শেষে অকারণে একটা ঝাঁকি এল আজ বৃষ্টি হয়নি।

অকারণে নাটকীয়তা নিষ্প্রয়োজন—প্রয়াণ সংবাদে গলাটাকে ভারী করে দুঃখ প্রকাশের প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক ঘোষণা হিসেবেই বলা ভালো—সম্প্রচারের ভাষা সহজ সরল হবে, যাতে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছোনো যায় এমন। তার জন্যে অবশ্য বেশি তরল হবার দরকার নেই।

পরিস্থিতি বিশেষে ভাষার শব্দপ্রয়োগ বদলাতে হতে পারে—মৃত্যু বোঝাতে কারও ক্ষেত্রে তিরোধান, কারও ক্ষেত্রে দেহ রেখেছেন, কারও ক্ষেত্রে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ সবরকমই হতে পারে। কোনো আনন্দের বা গৌরবের সংবাদ ঘোষণায় ঈষৎ উচ্ছ্বাস থাকতেই পারে। অনুপ্রাসে বা যমকের আশ্রয়ে কোনো serious বিষয় উপস্থাপন না করাই ভালো। এ-বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞানই একমাত্র অবলম্বনীয়।

আমরা জানি অনেকরকম যান্ত্রিকতা ও দ্রুততার মধ্যে সংবাদ পড়তে হয়। হঠাৎ কোনো প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্তির জন্য পাঠের লয়টাকে আচমকাই দ্রুত করতে হয়। এসব কারণে পাঠের কিছু ত্রুটি ঘটতেই পারে, তবে যাঁরা ওইভাবেই অভ্যস্ত তাঁদের ক্ষেত্রে বেশি বিচ্যুতি আদৌ সমর্থনীয় নয়। কর্তৃপক্ষ যদি সম্প্রচারে নিযুক্ত পাঠক বা ঘোষকের কোনো ত্রুটি দেখেন তাঁরা নিশ্চয় তাঁকে সতর্ক করে দেবেন, তবে, বলা বাহুল্য তিরস্কারের সুরে নয়। যিনি ভুল করে ফেলেন তিনি তো নিজেই মরমে মরে থাকেন।

তবে সম্প্রচারে নিযুক্ত সকলকেই ত্রুটিমুক্ত হবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

শব্দকে শ্রদ্ধার চোখে দেখলে শব্দপ্রয়োগেও সতর্কতা আসবে। ঋগ্‌বেদের ঋষির কণ্ঠে শুনি, 'সুসজ্জিতা সালংকারা বধূ যেমন পতির কাছে আসে বাক্ তেমনি করেই আমাদের কাছে আসে, অথচ আমরা তেমন করে তাকে বরণ করি না।' আরও শুনি, 'একটি সুপরিজ্ঞাত সু-উচ্চারিত ও সুপ্রযুক্ত শব্দ স্বর্গ ও মর্ত্যে আমাদের অভীষ্ট দোহন করে।'

ঋষিরা যখন সমবেত শ্রোতাদের সম্বোধন করে কিছু বলতেন, তাঁরা আগেই বলে নিতেন 'শং শব্দৈঃ'। যে-শব্দসমূহ উচ্চারিত হবে তা সকলের কল্যাণ বয়ে আনুক।

সম্প্রচারে যাঁরা আছেন তাঁরা তাঁদের যে কোনো ভাষণ বা পাঠকে যেন শ্রোতাদের কল্যাণবহ করে তুলতে পারেন।

শ্রোতাদের কল্যাণ কথাটা খুব স্বচ্ছ নয় হয়তো। তা কল্যাণ শব্দটাকে একটু ব্যাখ্যা করি। সম্প্রচারকে জনসাধারণ এতটাই গুরুত্ব দেয় যে ভুলকে তারা শুদ্ধ বলে মনে করে। আমি মুষ্টি ও মুষ্ঠি নিয়ে সুস্পষ্ট যুদ্ধ দেখেছি। একজন তর্কের সময় বলছেন আমি দূরদর্শনে একজন ঘোষককে 'মুষ্ঠিযুদ্ধ' বলতে শুনেছি। প্রতিপক্ষমশাই বোঝাতে চাইছেন উনি ভুল উচ্চারণ

করেছেন, হঠাৎই 'ট' 'ঠ' হয়ে যেতে পারে, আসল উচ্চারণ মুষ্টি। তেমনি জনসাধারণের মধ্যে 'আবোহাওয়া' ও 'সরোবরাহে'র প্রভাব পড়ছে। তাই জনসাধারণের কল্যাণেই যথাযথ উচ্চারণ করা উচিত।

একই কারণে দূরদর্শনে ঘরের মধ্যে অতি নিকট দর্শনে ছোটো-বড়ো সকলেই এত ভুল বানান দেখে যে আসল বানান ভুলেই যায়, পরীক্ষার খাতায় আমরা ওই ভুল বানানগুলোই দেখি—যেমন প্রতিযোগীতা বা সহযোগীতা, শুদ্ধস্বত্ব, সারথী, মুরারী, বন্দোপাধ্যায়, দূর্গাপদ, আরতী, প্রোজ্বল, অভীজিৎ, অরীজিৎ, ভগিরথ, সান্তনা, সান্তনু ইত্যাদি। 'ঐকতান' নামে একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল, যেখানে বানানটি দাঁড়িয়েছিল 'ঐক্যতান'। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। বড়ো দুঃখেই ছড়া কেটেছিলাম:

বানান মানেই হল বানানো
বানানে মিথ্যে মাথা ঘামানো
হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ই
যা আসে তাই সই
বানানে যা চার তাই চার-শো
সব কিছু আর্ষ॥

একথা একদিন প্রকাশ্য সভায় বলেছিলাম দূরদর্শনের বানান ভুল নিয়ে একটা মেগাসিরিয়াল হয় না কেন? একথা বলেছিলাম দূরদর্শনকে ভালোবেসেই।

পরিহাস বিজল্পিতং সখে
পরমার্থতো ন গৃহ্যতাম্।

চলিতভাষায় অ-তৎসম শব্দের বানানের প্রসঙ্গ আর তুললামই না। অ-তৎসম শব্দের সমতা আনার ব্যবহারে যে-প্রচেষ্টা হল দূরদর্শনের পর্দায় তার কোনো ছাপই পড়ল না। 'জানুয়ারি' সেই 'জানুয়ারীই' থেকে গেল। অনেকসময় সংবাদ বিবরণে কিছু জটিলতা থাকে। এক-আধবার 'মাপ করবেন' মাপ করা যায়। কিন্তু 'মাপ করবেন'এর পুনরাবৃত্তি ঘটলে তা অনেকেই মাপ করতে চাইবেন না।

সংবাদপাঠ বেশ ভালোই চলছে, হঠাৎ ঘোষক বা ঘোষিকা একটু হকচকিয়ে গেলেন যেন। না, এটা তাঁর দোষ নয়, দৃশ্যপ্রক্ষেপে দেরি হওয়াটাই তাঁর এই হঠাৎ বিরতি ও মনিটরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপই এর কারণ।

তাই যন্ত্র যেন যন্ত্রণা না হয়ে ওঠে সেদিকে সম্প্রচার পরিচালকদের লক্ষ রাখতে হবে।

সম্প্রচারে প্রয়োজন মিতভাষণ। অকারণে বিশেষণবাহুল্য না ঘটে সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার। সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বনামধন্য দেশব্রতী পরপর এই তিনটি বিশেষণ বিশেষিত ব্যক্তির গৌরব বরং কিছু শোষণই করবে। শুধু দু-টি বিশেষণ বা একটিই যথেষ্ট—বিশিষ্ট অভিনেতা, বা বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ইত্যাদি। আবার প্রসঙ্গ দেখেই বোঝা যায় এমন চেনাবামুনেরও পইতের দরকার নেই। গ্রুপ থিয়েটার প্রসঙ্গে শ্রীবিভাস চক্রবর্তী বলেন এমন বললে বিভাসের বিভা আদৌ ক্ষুণ্ণ হবে না।

প্রয়াণে আলংকারিক প্রয়োগ যথাসম্ভব বর্জন করাই ভালো। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর উল্লেখ শুধুমাত্র প্রয়াত হয়েছেন বললেই হয়, কোনো সাধকের মৃত্যুতেও প্রয়াত হয়েছেন চলতে পারে, বড়োজোর 'দেহ রক্ষা করেছেন'। অমরধামে যাত্রা করেছেন না বলাই ভালো। মুসলিম ব্যক্তির প্রয়াণেও প্রয়াত হয়েছেন বলা চলে। 'এন্তেকাল' শব্দটা অনেকসময় প্রযুক্ত হয়। শব্দটি বড়ো সুন্দর, মূল অর্থ transplantation হিন্দিতে 'নিধন হোগায়া'ই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। ইংরেজিতেও passed away না বলে 'died' এর বেশি ব্যবহার দেখছি।

সংবাদপাঠটি সম-লয়ে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ক্রমাগত সংবাদে কিছু অংশ সংযোজিত হবে ধরে নিয়েই বাচন-গতি ঠিক করে নিতে পারলে ভালো হয়। অনেকসময় সূচনায় বা প্রথমাংশে প্রয়োজনের বেশি ধীরগতির জন্যে সংযোজিত সংবাদে দ্রুতগতির আশ্রয় নিতে হয়। শ্রোতার কানে তা খুব সুখকর হয় না। কণ্ঠে আবেগের দরকার নেই আগে একথা বলেছি। এখন বলছি কণ্ঠ যেন একেবারে নিরাবেগ বা নিরুত্তাপ না হয়। এ-ব্যাপারে কারও কারও অভিনয়-আঙ্গিকে কান বিদ্রোহ করে।

অনেকসময় প্রয়াতদের নিয়ে স্মরণানুষ্ঠানে তার জীবনকথা বলতে গিয়ে প্রয়াতকে কীভাবে উল্লেখ করা হবে তাই নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। আমার মনে হয় 'বাবু' বলে উল্লেখ করলে অমুকবাবু যে শুধু বিশিষ্ট সেতারশিল্পী তা নয়, সাহিত্যচর্চাতেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।

আপনি তুমি তুই-এর ঝামেলা ইংরেজিতে নেই বাংলায় আছে। সাধারণত 'আপনি'ই বিধেয়। তবে পরিচিত বা বন্ধুস্থানীয় কেউ হলে তাঁকে

'তুমি' সম্বোধন অবশ্যই করা চলে, কিন্তু কখনো 'তুই' নয়। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে বয়স্ক এক মহিলাকে এক জন 'তুই' বলে সম্বোধন করেছিলেন। মাসি-পিসি বা দিদি স্থানীয় কাউকে 'তুই' সম্বোধন বাড়িতে বিধেয় হলেও বেতার বা দূবদর্শনে তা সমর্থন করা যায় না। এক্ষেত্রে দিদি বা মাসি সম্বোধনের পর 'তুমি' চলবে, 'তুই' নয়।

সংবাদপত্রে অনেকসময় বিষয়ে অবতরণের আগে এক ধরনের বাচালতা করা হয়। যেমন, গিয়ে দেখলাম তিনি (বিশেষ্যের আগেই সর্বনাম!) দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছেন। জিন্‌সের উপর আলো পড়ে তা চকচক করছে। মুখে সিগারেট। কখনো অর্ধবলয় কখনো পূর্ণবলয় ইত্যাদি। একথা না বললেও চলে সম্প্রচারে এমনটা কেউ করেন না। তবু সাধু সাবধান। সংবাদমাধ্যমের প্রভাব এ দু-টি মাধ্যমেও অলক্ষ্যে পড়ে।

সংবাদপত্রে একটি আশ্চর্য রঙ্গ দেখা যায়। শিরোনামের সঙ্গে পরিবেশিত সংবাদের মিল অণুবীক্ষণেও ধরা পড়ে না। বেতার বা দূরদর্শনে সংবাদ পরিবেশনে প্রধান প্রধান খবরের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়ার ব্যাপারটি সংবাদপত্রের সংবাদ শিরোনামের সঙ্গে তুলনীয়। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিস্তারিত বিবরণের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে এমন কিন্তু বলা যায় না, দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখেই একথা বলছি।

বেতার দূরদর্শন গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের ধর্মই হবে যত মানুষের কাছাকাছি পৌঁছোনো যায় ততই ভালো। তাই শব্দ ব্যবহারে সাবধান হতে হবে। 'অনীহা' 'পূর্বসূরি' ইত্যাদি শব্দ সবার বোধগম্য নয়, অথচ এ দু-টি শব্দ বহু সম্প্রচারিত।

বাক্যবিন্যাসের শৃঙ্খলার অভাবে বক্তব্যে অস্পষ্টতা আসতে পারে। সরল বাক্যও দীর্ঘায়িত হলে জটিল হয়ে উঠতে পারে, জটিল বাক্য তো জটিলতর হতেই পারে, যেমন: 'যাঁরা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চান তাঁদের জানানো হচ্ছে তাঁরা যদি ২০শে মার্চের মধ্যে নির্দিষ্ট ফর্ম জমা না দিয়ে পরে জমা দেন তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, এই বাক্যটিকে অনেক স্বল্প পরিসরে স্পষ্টতর করে বলা যেত। পদ বিন্যাসের দিকেও নজর দিতে হবে। একজন সংবাদপাঠিকা বললেন, 'এক জেনারেলের সঙ্গেও কথা তাঁর হয়।' 'তাঁর কথা হয়' এই বিন্যাসই কি ঈপ্সিত নয়?

দ্ব্যর্থকতাও বর্জনীয়। এখনকার সন্ত্রাস সম্পর্কিত সংবাদে যদি বলা যায়, 'এ-বছর কড়া হাতে সন্ত্রাসবাদী দমনের প্রচেষ্টা হবে।'—কে প্রচেষ্টা নেবেন? ভারত না পাকিস্তান? কর্মবাচ্যে কর্তৃপদ উল্লিখিত না হওয়ায় এ ধরনের বিভ্রান্তি হতেই পারে। শুধু বিশুদ্ধতা নয়, বাক্যের শ্রীর দিকেও নজর দিতে হবে। উপনিষদের 'শ্রিয়া দেয়ম্' সম্প্রচারেও প্রযোজ্য। সাক্ষাৎকার সম্প্রচারে সাক্ষাৎকার যিনি নিচ্ছেন তাঁকে একটু মিতবাক হতেই হবে। শুধু যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তাঁর কাছ থেকে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো জেনে নেবার জন্যে যতটুকু দরকার ততটুকুই, তবে আলোচনাটা নিষ্প্রভ না হয়ে পড়ে তার জন্যে কিছু বাড়তি কথার দরকার হতেই পারে, কিন্তু কোনোমতেই সাক্ষাৎকার যিনি নিচ্ছেন তিনি যে আলোচ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সেটা যেন তিনি জাহির করতে না চান। বিশেষজ্ঞতা তো সব সময়ই ভালো, কিন্তু জানতে দেওয়াটা না ঘটলে আরও ভালো। 'দেখভাল' 'লাগাতার' ইত্যাদি শব্দও বর্জনীয়।

সবশেষে বলি সম্প্রচারের জন্য একটি ব্যবহারবিধি রচনার কথা ভাবতে পারেন সম্প্রচারের সঙ্গে জড়িত যাঁরা। তা যদি না-ও হয় মাঝে মাঝে বা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে আত্মসমীক্ষা করার জন্যে তাঁরা মিলিত হতে পারেন। এই মিলনমেলায় বিশেষজ্ঞরাও আহূত হতে পারেন, তাঁদের সঙ্গে আকাশবাণীর মাধ্যমেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশয়ের নিরসন ঘটতে পারে।

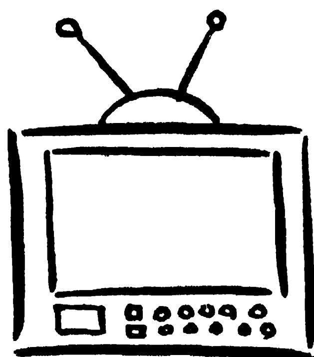
তবে সে-নিরসন কতটা ঘটবে তাতে সন্দেহ আছে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা নাকি বলেন, 'সরকার এবং ভাষার গতিই হচ্ছে অবনতির দিকে।' সম্প্রচারকে যে এক ধরনের প্রচার বলাই যেতে পারে, এ-বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমতের অবকাশ নেই। জ্ঞাপন ক্রমশ যেন বিজ্ঞাপন হয়ে উঠছে। বিজ্ঞাপনে ভাষার যে-'দুষ্টা সরস্বতী' তাকে সবচাইতে বেশি কী করে আকর্ষক বা চটকদার করে তোলা যায়, বিজ্ঞাপনদাতার মাথায় সেটা থাকে। এজন্যে তারা কুশলী লেখক ও শিল্পীদের ব্যবহার করে। আর্ট এবং ইন্ডাস্ট্রি কতটা হাত ধরে চলবে তা ঠিক করা বড়ো মুশকিল। বিজ্ঞাপনের ভাষায় অনেকক্ষেত্রেই শিল্পিতা রক্ষিত হয়। কিন্তু তাতে বিশেষ এক ধরনের ভঙ্গি আনবার জন্য যেসব চেষ্টা করা হয় সেগুলো সুস্থ সম্প্রচারের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে।

যখন বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে, বিশেষ একটি বিস্কুট খেতে খেতে আপনি চা খেতেই না ভুলে যান তখন উপস্থাপনাটিকে আমরা সাধুবাদ দিতেও পারি। কিন্তু এটা তো বাংলা ভাষা। হিন্দি উচ্চারণের ঢঙ (intonation) এখানে ভাষাটিকে আর স্বাভাবিক রাখতে পারছে না। বিশেষ কোনো দন্তমাজনই হোক বা বিশেষ কোনো পানীয়ই হোক সেটা যতক্ষণ সবচেয়ে best ততক্ষণ witty। কিন্তু যেই তা বাংলার স্বভাবধর্মকে পরিত্যাগ করে ভঙ্গিসর্বস্ব হয়ে উঠল তখন আমাদের অন্তর বলে, ধরণি দ্বিধা হও। যখন প্রচার নিজেই বলছে, It's hot তখন তার heat সহ্য করা বাঙালির পক্ষে কঠিন। 'মির্চ মসালা' এমনিতে সুস্বাদু হলেও তা যে স্বাস্থ্যপরিপন্থী একথা অস্বীকার করি কী করে? মসলা খাবার আসুক ক্ষতি নেই কিন্তু ভাষায় এলেই তা হজম করা শক্ত। বাংলা বাক্য উচ্চারণের একটা স্বাভাবিক speed আছে। সেইটি তার স্বীকৃত লয়। এই লয় বাড়ানোর অনেক সময় প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন কথা ছিল না, কিন্তু হঠাৎই কিছু কথা সংবাদে যোজনা করবার প্রয়োজনে সংবাদপাঠকের তখন লয় একটু বাড়াতেই হবে। এই বাড়ানোটায় কোনো অসুন্দরতা নেই। কিন্তু অকারণে স্মার্ট হওয়ার জন্যে কোনো সংলাপ বা কোনো ঘোষণায় যদি চটকের জন্য অত্যন্ত দ্রুততা আনা হয়, তা হলে বাংলা উচ্চারণের স্বভাবধর্ম থেকে আমরা ভ্রষ্ট হব। সংলাপে আমরা প্রশ্নাত্মকতা রাখি অথবা বিস্ময় প্রকাশ করি, তাতে একটা যতি থাকে। সেই যতি ভঙ্গ হলেই শব্দের রসভঙ্গ হয়, যা শুনে বোঝার, তা লিখে বোঝানো যাবে না, তবে আভাস দেওয়ার জন্যে পুরামুদ্রণে সমস্ত শব্দগুলোকে যেমন গায়ে গায়ে লাগিয়ে লেখা হত সেরকম একটা বাক্য ব্যবহার করা যেতে পারে: 'স্বদেশেরযথার্থহিতসাধনসমাজসংস্করণপত্রিকারউদ্দেশ্য'। অথবা টেপ উলটো ঘোরানোর সময়ে যে শব্দে-শব্দে ঠাসাঠাসি একরকম জান্তব আওয়াজ চমক সৃষ্টির জন্যে যদি করা হয় খুব সুখকর হবে না, অথচ এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করেই সত্যজিৎ রায় 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিতে ভূতের নৃত্যে ভৌতিক কণ্ঠ সৃষ্টি করে কী অপূর্বতাই না এনেছিলেন। চটক সৃষ্টির জন্যে উত্তাপ সঞ্চারিত করতে এই ভৌতিক কণ্ঠ সম্প্রচারে চলে না।

যুবজন আসুন সম্প্রচারে, কিন্তু তাঁদের বিশেষ লাইসেন্স দিয়ে দ্রুতচালে বাংলার সঙ্গে ইংরেজি ও হিন্দি মিশিয়ে কখনও ইংরেজি কখনও বা হিন্দি

intonation-এ জারিত করে বাক্‌চতুর প্রক্ষেপণে মনোরঞ্জনের এই আক্রমণ কলালক্ষ্মীর দরবারে সমাদৃত হবে? দেশটা যেমন শিক্ষিতদের, অতি-আধুনিকদের, তেমনই তো হাসিম শেখ রামা কৈবর্তদেরও। ভাষা ও ভাষা-ব্যবহারের একটা এথিক্স মেনে চলতেই হয় সম্প্রচারে।

লেখক ভাষাবিদ। তাঁর নিবন্ধের বিষয় বহুমাত্রিক, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সঙ্গে যুক্ত



বেতারবাহিত বাংলা ভাষা

অশোক মুখোপাধ্যায়

না, এটা টেপ রেকর্ডারে ধরে রেখে তার পর লেখা নয়, স্রেফ বানিয়ে লেখা; বানানো কিন্তু একেবারে ভিত্তিহীন নয়। বরং ভিত্তিটা দৃঢ়ই হবে। মিলিয়ে নিন। সাক্ষাৎকার কিংবা খোলাখুলি কিংবা সমানে-সমানে কিংবা সহজ-কথা কিংবা ওই ধরনের নামের অনুষ্ঠান হচ্ছে কোনো চ্যানেলে। যাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে তিনি, ধরা যাক, একজন সংগীতশিল্পী। আর স্টেজ-স্মার্ট কম্পিয়ারও পরিচিত মুখ। (মনে পড়ল, কম্পিয়ার শব্দটা এখন আর শোনা যায় না তেমন, বদলে এসেছে অ্যাংকর)। তা ইন্টারভিউটা শুরু হবে এইভাবে।

সারা দুনিয়াতে মানুষ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি, সে সবার, মানে জীবজগতের অন্য প্রাণীদের থেকে অনেক অনেক অন্যরকম মানে আলাদা, পৃথক, স্বতন্ত্র। একেবারে যেন অন্য গ্রহের জীব। শুধু খাওয়া-পবা, আর যাকে বলে গিয়ে এই জীবনধারণের জন্য

প্রয়োজনীয়, তা মিটলেই মানুষের চলে না, চলতেই পারে না। আমাদের দরকার হয় অনেক অন্য কিছুর, যেমন ধরুন গান মানে সংগীত, তা সে যেমন সংগীতই হোক, কণ্ঠসংগীত বা যাকে বলে গিয়ে সাধারণভাবেই সংগীত, তা তো আছেই, এ ছাড়াও আছে আরও নানান শিল্পকর্ম, ছবি আঁকা, ভাস্কর্য আর এইসবের জন্যই তো মানুষ হয়ে উঠেছে যাকে বলে গিয়ে মানুষ। তো আজকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি, এমন একজনকে যাকে সবাই একডাকে চেনেন। শিল্পী হিসেবে তিনি আপনাদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসাও পান। আর বেশি কিছু বলার দরকার নেই তাঁর বিষয়ে, কারণ আপনারা তো তাঁর কথাই শুনতে চান, তাঁরই মুখ থেকে। আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হলেন সংগীতশিল্পী প্রবাহিণী সরকার। নমস্কার, প্রবাহিণীদি, আপনি যে অনেক কাজ অনেক অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও এসেছেন, মানে আসতে পেরেছেন, তার জন্য রাশি রাশি ধন্যবাদ, আমাদের তরফ থেকে, এবং অবশ্যই অগণিত দর্শক-শ্রোতাদের তরফ থেকে। আচ্ছা প্রবাহিণীদি, আপনি এই গানের জগতে কেমন করে এলেন, মানে গানের প্রতি আপনার টান কি অনেকদিনের পুরোনো কোনো কিছু?

—না, মানে গিয়ে, আমরা কিন্তু বরাবর কলকাতায় থাকতাম না। বাবার তো ট্রান্সফারের চাকরি ছিল, তাই মানে, আমরা অনেক জায়গায় ঘুরেছি, যেমন কুচবিহার, তার পর, কী যেন জায়গাটা, ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, মুঙ্গের, কেষ্টনগর, শিলং ও আরও কত জায়গা...।

—ওরে বাপরে, আপনি তো দেখছি একেবারে যাকে বলে গিয়ে গ্লোবট্রটার।

—হ্যাঁ, খানিকটা তো বটেই। তবে যখন বড়ো হলাম, উঁচু ক্লাসে উঠলাম, তখন তো আর বার বার স্কুল বদল করা যায় না তাই...।

—তখনই আপনারা, ওর নাম কী, কলকাতায় এলেন?

—না, না, আমরা গিয়ে থাকতাম সাঁইথিয়ায়, আমার মামা থাকতেন সেখানে...।

—মানে আপনি আপনার মামাবাড়িতে চলে এলেন। তখনই আপনার গানের হাতেখড়ি?

—না, না, কোথায় গান? তখন তো আমরা, মানে আমি, আমার বোন স্রোতস্বিনী, আর ভাই বসুভদ্র ঘুরে বেড়াই ময়ূরাক্ষীর বালুর চরে।

—ওঃ, সে কী দারুণ মজা। তো আমরা একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি নেব, তার পর আবার ফিরে আসব প্রবাহিণীর সংগীতের জগতে।

বিজ্ঞাপন শুরু হল। মস্তি, ধামাকা, একটা কিনুন—দুটো ফ্রি, ওয়ান মোর প্লিজ, এসব যখন হচ্ছে, এবং ওপরের কথাবার্তা থেকে যখন দর্শক-শ্রোতারা প্রবাহিণীর সাংগীতিক জীবন বিষয়ে অনেকটাই জেনে গেছেন, তখন দর্শক শ্রোতা টিপে দিলেন তাঁর 'রিমোট'। ওখানে এক মন্ত্রী মহাশয় উত্তর দিচ্ছেন অনেকের নানা প্রশ্নের। তিনি খুবই মানবদরদি। মানুষের উপকারই যদি না করলাম, তবে এই জন্ম একেবারেই বৃথা। তিনি বললেন, উদ্ধৃতি দিতে পারব না, তবে মর্মার্থ উদ্ধার করাই যায়। —কুচবিহারের কোনো চাষির তামাকের খেতে পোকা লাগলে আমরা মেক্সিকো থেকে তার সমাধান এনে দেব। (খুবই আশার কথা)। বলা হয়,—শুধু শহরে নয়, গ্রামবাংলার যেসব জায়গায়, যেখানে ভাঙা টালির মাঝখান দিয়ে চাঁদের আলো ঢোকে, এবং সেখানে যেসব সোনার টুকরো ছেলে-মেয়েরা আছে তাদের কাছেও পৌঁছে যাবে আই টি।

আশ্চর্য, চালের ভাঙা টালির ফাঁক দিয়ে কেবল চাঁদের আলোই ঢোকে, বৈশাখের রোদ, শ্রাবণের বৃষ্টি একেবারেই না। তাই চালের ভাঙা টালি যেমন আছে তেমনই থাক, আর চাঁদের আলোর সঙ্গে আই টি-র মাখামাখি হোক। অতএব আবারও টেপা হল 'রিমোট'।

এখানে চলছে সিরিয়াল। রাতের জামা পরে এক ভদ্রমহিলা চুল সামনে এনে পাট করছেন। ফোন বাজল। হেঁটে অন্য ঘরে গিয়ে ফোন তুললেন তিনি। 'হ্যালো'। অন্য প্রান্তের শব্দ প্রায়শই শোনানো হয় সিনেমায়, সিরিয়ালে। কিন্তু এখানে সেটা হচ্ছে না। তাহলে ভদ্রমহিলার কথাই পর পর শুনে যেতে হবে। 'হ্যাঁ'। 'এমন অপ্রত্যাশিত অবসরে ফোন'। 'আমার নম্বরের বাটন টিপলে আমার ফোন রিং করবে, এবং সেটা নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়।' 'প্রত্যাশা? দেখো, কোনো অকারণ প্রত্যাশার বিশ্বাসে ভর দিয়ে চলা অথবা তার স্বপ্নে বিভোর হওয়ার বিলাসিতা আমার স্বভাবধর্ম নয়, এটা যদি এতদিনেও বোঝাতে না পেরে থাকি তবে সেটা আমারই ব্যর্থতা বলেই ধরতে হবে, তবে তোমার

ভূমিকাটাকেও সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখা যাবে কেমন করে। আচ্ছা।' 'আবার কী'? 'না দেখো, তোমার স্বপ্নবিলাস শুধু কল্পনাই থেকে যাবে। প্লিজ, ডোন্ট ডিসটার্ব মি এনি মোর, প্লিজ প্লিজ প্লিজ'। এর পর কী হয়েছিল, বলা যাবে না। কারণ আবার রিমোটে চাপ দিতেই একটা সংবাদ এসে গেল। ওটা হচ্ছিল আগে থেকেই, শোনা গেল একটা বাক্যের শেষাংশ।

'বাছাধন এখন হাজতে'। সংবাদ চলল, '—কাল সন্ধ্যায় বাসবপুরে দু-পক্ষের লড়াইতে তিন জন মৃত। ঘায়েল আরও পনেরো। তৃণমূল ও সিপিএম এর জন্য দায়ী করলেন পরস্পরকে। আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন—'। এর পর প্রতিনিধির প্রতিবেদন। 'কাল শুক্রবার সন্ধ্যায় তুমুল মারামারি দু-পক্ষে। পুলিশ আসে, অবস্থা আয়ত্তে আনতে গুলি চালাতে হয় চার রাউন্ড। গুলিতে মারা যান এক জন, কানাই বোড়াল। স্থানীয় মানুষেরা জানান,—মাঝেমধ্যেই গোলমাল হয় এখানে। আপনি কী বলেন? —মাঝমধ্যি ঝগড়া লাগে। আমরা ভয় ভয় থাকে। —তা কে গোলমাল করে, তৃণমূল না সিপিএম? —সবে করে বটে। এর পর আরেক জন। —আপনি তো এই অঞ্চলের প্রধান, আপনার কী মনে হয়? —আমরা আগেও বলেছি, আজও বলছি সিপিএম কোনোরকমভাবেই এর সঙ্গে জড়িত নয়। ওই ওরা, ওদের উদ্দেশ্যই হল ল অ্যান্ড অর্ডার ব্রেক করা। ওটা ওদের নিজেদেরই ঝগড়া। তারপরে তৃণমূল নেতা জানালেন —আমরা কেবল শান্তি চাই, আর ওরা ভোট রিগিং করে, মানুষ খুন করে, হামলা করে। দিদি বলেছেন, মাথা ঠান্ডা রাখতে, সে তো আমরা রাখি'। ওদিকে দেখানো হল কানাইয়ের পরিবারে হাহাকারের এক ঝলক। স্থানীয় পুলিশের কর্তা, রামকুমার—'তা প্রবলেম কিছু হোয়ে তো ছিল। আমরা ফোর্স ভেজেছি, এরিয়া মধ্যে পিকেট আসে, আমরা অ্যাকশন টেক কোরছি, ফুল রিপোর্ট মিললে সিচয়েশন কিলিয়ার হবে। বাট এখোন সবহি কিছু অন্ডার কান্ট্রোল। —আলপনা পাল, ম্যাক্সি টিভি, বাসবপুর'। এর পর দেহের সৌন্দর্য বাড়ানো, চুল কালো করা, ইয়ে অন্দর কা বাত হায়, এইসব পার করে সংবাদ এগিয়ে চলে।

'ঘুঘুর বাসাটা যে ঘরের মধ্যেই ছিল, তা জানতেই পারেননি অফিসের বড়োকর্তা। ঝুলি থেকে বেড়ালটা বার হল গতকাল যখন জানা গেল, ওই অফিসেরই এক করণিক চৌপট করেছেন কম করেও তিন লক্ষ টাকা।

কিন্তু ধরা যায়নি ওই ধুরন্ধরকে। ব্যাপারটা নিয়ে থানা-পুলিশ হবে মালুম করেই তিনি আগেই হয়েছেন হাওয়া। খোঁজ চলছে। এ-বিষয়ে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার রিপোর্ট'।

না, এই রিপোর্ট নিয়ে আমরা আর বাড়াব না। যাওয়া যাক আর একটি চ্যানেলে, যেখানে আমরা পাব কিছু ক্রিয়েটিভ মানুষের সন্ধান। কবি, লেখক, নাট্যকার, সিনেমার পরিচালক, আর ওইরকম আরও অনেকে হলেন ক্রিয়েটিভ মানুষ। চ্যানেল ঘুরিয়ে (এই 'ঘুরিয়ে' কথাটা রেডিয়োর কাঁটা ঘোরানো থেকে এসেছে। অন্য অর্থে ব্যবহার করতে অসুবিধে নেই। প্রায় সব টেলিফোনই এখন বোতাম-টেপা, তবুও ডায়ালিং শব্দটা চলে যায়নি, যাওয়ানোর কোনো কারণও নেই) পাওয়া গেল এক নাট্যাভিনেতাকে। তাঁকে ইন্টারভিউ করছেন আরেক জন নাট্যবিশারদ।
—আচ্ছা, আপনার নতুন প্রোডাকশন, 'শরীরে সোঁদা গন্ধ' দেখে আমাদের মনে হল যে ফর্মের দিক থেকে আপনারা যেন প্রথার মধ্যে থেকেও, তার থেকে বাইরে আসার চেষ্টা করছেন। আমাদের মনে হল যেন মঞ্চ অর্থাৎ স্টেজটাকে খানিকটা যেন ওপন হাউস হিসেবেও ব্যবহার করতে চাইছেন। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের এই ব্যবহার ......। প্রশ্নটা একটু ছোটো হয়ে গেল। সাধারণত বিশারদরা আরও বিশদে যেতে চান। কিন্তু নাটকের পরিচালকই প্রশ্নটাকে ছেঁটে দিলেন।
—দেখুন, নাটকটা তো সত্যিই কোনো বাস্তব ব্যাপার নয়, আই মিন, কোনোদিন তা ছিলও না। আমরা কিছু কিছু বাস্তব বিষয়, আই মিন ফ্র্যাগমেন্টস অব রিয়ালিটিকে সিমুলেট করি, শুধু আমরা কেন, সবাই করে। আই মিন, করতেই হয়। আবার উই হ্যাভ টু ডিপেন্ড ওন দি ইমাজিনেটিভ কেপেবিলিটি অব দি অডিয়েন্স। আর, আই মিন, এই পরস্পরনির্ভরতাই, মানে এই ইন্টারডিপেন্ডেন্সটাই হল গিয়ে, দি প্রাইম ফ্যাক্টর ওব টু ওয়ে কমিউনিকেশন। আর সেখানেই থাকে যাকে বলে গিয়ে দা ক্রাক্স অব দি এলিমেন্টল প্রিন্সিপ্‌ল অব ড্রামাটিক প্রেজেন্টেশন। আপনার যদি মনে হয়, ফ্রম দা স্টেজ, আপনি চলে যাচ্ছেন টু অ্যান ওপ্‌ন হাউস, অথচ, আই মিন, আপনি তো ফিজিক্যালি যাচ্ছেন না, বসেই তো আছেন রাইট দেয়ার, অথচ আপনি যাচ্ছেন, আর এই যে ফিলিংটা ট্রান্সমিটেড হল কীভাবে, কোন

সাইকো মেটেরিয়াল এর মধ্যে ইমবাইবড, আর তাতে আমাদের ভূমিকাটা, আই মিন রোলটা কী। ইন শর্ট, আওয়ার রোল হল দর্শকদের স্টিমুলেট করা। তার ইমাজিনেটিভ ইনস্টিংকটটাকে একটা অল পারভেডিং ইনফ্লুয়েন্সে ঢেকে ফেলা।

এতক্ষণ যা বলা হল, তার মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা খুব বেশি নয়। আর একটা বিষয় প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার কাউকে কোনো ব্যঙ্গ করার জন্য এ-লেখা নয়। অনেক গুণীজ্ঞানী মানুষ অনেক ভালো ভালো বিষয় টিভি চ্যানেলগুলির মাধ্যমে উপহার দিচ্ছেন আমাদের। নিয়মিত দেখলে তা আমাদের সমৃদ্ধই করে এবং করবে। আবার অন্যরকম অনেককিছু এসেই যায়। এ ছাড়া ব্যক্তিভেদে বাচনভঙ্গি বদলায়। শব্দের ওপর সবার সমান দখল থাকে না। আলোচ্য বিষয়টাও ভাষা ব্যবহারের চরিত্র পালটে দেয়। বাচনিক মুদ্রাদোষ থাকে অনেকেরই। কাদের জন্য বলা হচ্ছে তা-ও মনে রাখতে হয়, আর তারজন্য ভাষা, ভঙ্গি, কথার সুর বদলায়, কথা বলার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাড়াচাড়ার পরিবর্তন হয় আর এ-রকম হওয়াই তো উচিত। সবাই যদি একসুরে একইরকমভাবে কথা বলত, তাহলে খুবই বাজে হত। বড্ড একঘেয়ে হয়ে উঠত ব্যাপারটা। তবে এই যে নানা আবশ্যিক বৈচিত্র্য, তার মধ্যে একটা সীমাবোধ থাকা জরুরি।

ভাষার ব্যবহারের মধ্যেও ভাষকের উদ্দেশ্য ফুটে ওঠে। যেমন ভারত ও কাশ্মীর প্রসঙ্গে নানান গরম কথা বলছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুশারফ। আমাদের খবরের কাগজে যদি লেখা হয়, 'পাক প্রেসিডেন্টের ডম্ফাই', তাহলে কাগজটি যে 'প্রো-ইন্ডিয়া' তা সহজেই বোঝা যাবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী তার জবাবও দিচ্ছেন নিয়মিত। তখন হয়তো আমরা লিখি, 'উপযুক্ত জবাব দিলেন বাজপেয়ী'। কখনো লিখব না কিংবা বলব না 'বাজপেয়ীর আস্ফালন'। কট্টর রাজনীতির লোক কী বলবেন, তিনি সেটা নিজেও জানেন না। তবে আমরা সবসময়ে যে ভেবেচিন্তে করি তা কিন্তু নয়, অথচ শব্দের ব্যবহার থেকে মনোভাবটা বিলক্ষণ প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

যে-উদাহরণগুলো দেওয়া হয়েছে তার প্রথমটা নেওয়া যাক। আমরা এটাকে বলব, 'অনাবশ্যক আতিশয্য'। এই 'অনাবশ্যক আতিশয্য' বাক্যাংশটাও মিডিয়া থেকে শেখা। শুধু আতিশয্য বললেই তো হয়। মূল বিষয়ে আসতে অতিরিক্ত কালক্ষেপ। এবং একই কথার পুনরাবৃত্তি। এটা নতুন কোনো বিষয় নয়। বাঙালিরা এ-রকম করে আসছেন অনেকদিন থেকেই। সুকুমার রায়ের চলচিত্তচঞ্চরি-তে আমরা পাই 'দেখুন, আমি মর্মান্তিকভাবে অনুভব করছি, আজ আমাদের প্রাণে-প্রাণে দিকবিদিকে কত না আকুতি-বিকুতি অল্পে-অল্পে ধীরে-ধীরে—।' পণ্ডিতকে তাড়ানোর জন্য ঝালাপালায়ও সুকুমার রায় কেদারের মুখে বসিয়েছিলেন এক 'প্রবন্ধ'। 'সমুদ্রের ফেনিলাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে নৃত্য করিতে করিতে নিত্য নবোৎসাহে সেই একই সুর, সেই একই ছন্দ, সেই একই সংগীতকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে—তাহার শেষ নাই, অন্ত নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্ষান্তি নাই, বিচ্ছেদ নাই—'। এটা কেন হয় তা বলা যাবে না। বিশেষণের বাহুল্য আমাদের কথাবার্তার এক স্বাভাবিক অসুখ। বস্তুত, সুকুমার রায়ও নিশ্চয়ই অনেক মানুষজনকে ও-রকমভাবে কথা বলতে শুনেছিলেন বলেই ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন। কোনো বিষয়ের মূল জায়গাতে আসার আগে যথেষ্ট ধানাইপানাই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যেও নতুন কিছু নয়। বেশ কিছু বড়ো লেখকের রচনাতেও এর উদাহরণ দুর্লভ নয়। তবে এখন অবস্থাটা একটু বদলেছে। প্রথম বাক্য থেকেই মূল বিষয়ে চলে আসছেন অনেকেই। আমার এক বন্ধু, নামকরা ভাষাতাত্ত্বিক ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা রচনা দেখার আগেই বলতেন, 'প্রথম প্যারাগ্রাফটা কেটে দাও'। ফল ভালোই হত তাতে। পর পর কতগুলো কাছাকাছি অর্থের শব্দকে সাজিয়ে বাক্যকে বাড়ানো এক প্রাচীন অভ্যাস। সুকুমার রায়ের লেখাটার বয়স সত্তর বছর পেরিয়ে গেছে এবং এত দিনেও তাঁর ঠাট্টাটা আমরা ধরতে পারিনি। আর এই শতাব্দী-প্রাচীন অভ্যাস আর কোনোদিন যাবে বলে মনে হয় না। অতএব ওটা যাদের ভালো লাগে না, তাদের সহ্য করে যেতেই হবে, আর যাঁদের ভালো লাগে তাঁরা ভাগ্যবান।

আর এই যে ভাঙা টালির ঘরের ঠাট্টাটা বোঝা খুবই দুরূহ। এ-বিষয়ে একটা দু-লাইনের পদ্য শুনেছিলাম মণীশ ঘটকের কাছ থেকে। সেটা তিনি

শোনেন বোধ হয় ১৯১৯ সালে। তিনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। পদ্যটা হল, 'ভাঙ্গা ঘরে চান্দের আলো, নেটের মশারি, তারি মইদ্যে শুইয়া আছে নবীন কিশোরী।' ওই নবীন কিশোরীর ঘরটা আজও শুনছি ভাঙাই রয়ে গেছে। তবে সেও এখন আর পার পাবে না, হানা দেবে আই টি নামক সর্বার্থসাধক এক 'গড নোজ হোয়াট' বস্তু। শোনা অবধি সই, ভয়ে ভয়ে রই। কেননা এই আই টি নামক ঢক্কানিনাদ ও আমাদের মতো 'দারিদ্রলাঞ্ছিত' দেশে তার অগ্রাধিকার বিষয়ে বর্তমান লেখক কম-বেশি ওয়াকিবহাল। অবশ্য বেশিটা কম, কমটাই বেশি। দেশের বর্তমান অবস্থায় এক গেলাস পানীয় জল অথবা আই টি, কোনটির প্রয়োজন বেশি, সে-প্রশ্ন অবান্তর। দুটো কারণে। মন্ত্রী মহাশয়ের 'বডি ল্যাংগোয়েজে' দারুণ কনফিডেন্স ছিল। আর দুই, মন্ত্রী মহাশয়ের প্রতিশ্রুতি বিষয়ে নানান কথা শোনা যায়। বুঝতে শিখেছি যে রাশি রাশি প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই যে শোনা কথা, তারজন্য তাঁরা দায়ী নন। অন্য কোনো আননোন ফ্যাক্টর কাজ করে। ভাগ্যিস, নইলে যা উন্নতি হত, তা জনগণ সহ্যই করতে পারত না। আর জনগণ যা সহ্য করতে পারবে না, তা করা একেবারেই ঠিক নয়। তবে কৌতূহল একটা তো থেকেই যায়। কোচবিহারের কোন চাষি মেক্সিকোর দাওয়াই পেয়েছেন, তার কি কোনো লেখাজোকা আছে? জানি না।

এর পরেই আসে একটা সিরিয়াল। যেখানে আমরা শুনতে পাই একতরফা সংলাপ। কিন্তু খাতের জামা কেন? টু রেকর্ড দা অ্যামবিয়েন্স? সেমব্লেন্স অব রিয়ালিটি? তা ছাড়া ওই একটু ইয়ে আর কী। আজকালকার নায়িকারাও ওই একটু ইয়ে প্রদর্শনে খুশিও হন। তাঁদের তো কোনো ট্যাবু নেই। প্রগ্রেসিভ সমাজে কোনো ট্যাবু থাকে না। তা হচ্ছিল গিয়ে সিরিয়ালটার ভাষার কথা। এই ভাষা বাঙালিরা ভালোবাসে, কিন্তু নিজেরা বলে না। বলে না, কারণ বলা সম্ভব নয়। অন্য কেউ লিখে দিলে আউড়ে যাওয়া যায়। এর উদ্ভব সম্ভবত ১৯৪০ সাল নাগাদ। উদয়ের পথে সিনেমায় সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব ডায়ালোগ ছিল। সত্যজিৎ রায় যাকে বলেছিলেন, 'স্মার্ট ডায়ালোগ'। উদয়ের পথে সিনেমা হিট করেছিল, যত দূর মনে পড়ে, গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি কোনো সময়। ওই স্মার্ট ডায়ালোগ আজও আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। কারণ একটাই। গত ষাট-সত্তর

বছরে আমরা কোনো বিকল্প বার করতে পারিনি। অবশ্য আমরা যা পারি না তার দোষ সর্বদাই অন্য লোকের। দু-চার জনও যে পারেননি তা নয়, তবে ওই দু-চার জনই। আমার ব্যর্থতার জন্য তো অন্য লোক দায়ী। অতএব দোষী খোঁজা। এ বিষয়ে দোষী খোঁজা দুঃসাধ্য কাজ।

এই সিরিয়ালের ডায়ালোগ, এখানে মনোলোগ যদি স্মার্ট হয়, তবে সংবাদেরটা ওভারস্মার্ট। বলার ভঙ্গি ও স্বরক্ষেপণে বেশ একটা তেজ আছে। গোটা প্রেজেন্টেশনের মধ্যে 'তুই বেটা বদ কিন্তু আমি ধরে ফেলেছি' ভাবও থাকে আগাগোড়া। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে ভঙ্গিটা পাবলিক 'বেশ খেয়েছে'। এর পর আর কোনো কথা কী থাকতে পারে? অতএব খবরের মধ্যে যদি কিছু বাপধন, বাছাধন, চৌপট থাকে তা আর দোষের কী? আর যদি কিছু ধমক-ধামকও পাই, সেটা প্রাপ্য বলেই মেনে নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু এই যে সবাই খেয়ে গেল ব্যাপারটা তার মধ্যে কি কিছু গভীর কারণ আছে। এ-বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত দিতে পারব না। অনুমান করা যায়। আসলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সবাই চাই, কিন্তু চাইলেই তো সে-কাজটা করে উঠতে পারি না, 'ক্ষমতায় কুলোয় না', 'সময় নেই', 'আমি একা কীই-বা করতে পারি', এইরকম নানা অপ্রতিরোধ্য কারণে ওটা হয়ে ওঠে না। কিন্তু যদি ও কাজটা আমাদের হয়ে অন্য কেউ করে দেয়, তাহলে খুবই খুশি হই। ঠিক এই কারণেই হিন্দি ছবির শেষে যখন বদমাশটাকে বেধড়ক দেন নায়ক, ও শেষে পুলিশ এসে কানুনকে তার নিজের পথে চলতে সাহায্য করে, তখন হাততালি দিয়ে থাকি। ভালোই করি, কারণ এ ছাড়া অন্য কিছু করার সাধ্য নেই আমাদের। আর এইসঙ্গেই দর্শকদের অর্থাৎ আমাদের হিংস্র চেহারাটা বড্ড প্রকট হয়ে ওঠে। বস্তুত সারা জীবজগতে হিংস্র প্রাণীর সংখ্যা মাত্র এক। প্রাণীটি হল মানুষ। তার স্বভাবটা যাবে কোথায়? ভেবে দেখুন খেলাতে অন্যকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য শুধু দক্ষতাই যথেষ্ট নয়। অন্য একটা ইনসটিংকট লাগে, কিলার ইনসটিংকট। অন্যের দ্বারা ইচ্ছাপূরণ ও তজ্জনিত আহ্লাদ আমাদের অন্য কাজকর্মেও প্রকাশ পায়। তাই যখন দেখি ও শুনি 'তিন ডাকাত পাকড়াও', তখন ভাবি সমাজে পাপের পরিমাণ তো কিছুটা কমল। আর যিনি সেটা প্রেজেন্ট করেন, তাঁর ভাষা ও ভাবের মধ্যে কিছুটা কাঁধ-ঝাঁকানো ভাব থাকতেই পারে। থাকতেই পারে শুধু নয়, থাকেই।

কিন্তু সত্যিই বিপদে পড়ে যাই নাটকের ভদ্রলোকের কথায়। এগুলিই সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দুর্দান্তপাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত'। বিপদের কারণটা অন্য জায়গায়। এইসব কথার সবগুলো শব্দেরই মানে জানি, কিন্তু টানা মানে করতে পারি না। তবে এটাও সমান ঠিক যে আমি না পারলেও অন্য অনেকেই পারেন। যাঁরা পারেন, তাঁদের কয়েক জনকে চিনি। তাঁদের কাছে বুঝতে গেলে আবার আরেক সমস্যা হয়। এসব বুঝতে গেলে বেশ কিছু ইংরেজি, ফরাসি, গ্রিক, লাটিন, স্প্যানিশ বই পড়তে হয়। আর সে ভারি কঠিন কাজ। তবে কঠিন কাজ করার লোকেরও তো অভাব নেই। কিন্তু ওটা একটা ভিন্নতর জগতের ব্যাপার। ও-জগৎটা সমৃদ্ধ কিন্তু সীমাবদ্ধ।

অনেকক্ষণ বলে কিছুই না বলার বিষয়ে একটা গল্প মনে পড়ল। ওটা রাজনীতিক রাজনারায়ণের নামে চলে, তবে তার সত্যি-মিথ্যে জানি না। তিনি একবার ইংল্যান্ডে গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন, আর সেটা নাকি অনেকক্ষণ চলেছিল, তিনি নিজেই ঘণ্টাখানেক বলেছিলেন। তো এক কাগজের সাংবাদিক দেরি করে এসেছিলেন. ততক্ষণে সম্মেলন শেষ। সবাই বেরিয়ে আসছেন। এক সহযোগী সাংবাদিকের কাছে তিনি জানতে চাইলেন ব্যাপারটা।

'হোয়াট ডিড হি সে'?

'ওয়েল, হি সেইড নাথিং'।

'বাট্, আই গেস, হি স্পোক ফর এ লং টাইম'।

'ইয়েস, ইট ওয়াজ কোয়াইট সাম টাইম, বাট হি টুক লং টাইম টু সে নাথিং'।

অনেকক্ষণ ধরে বলেও কিছুই না বলার মতো দুরূহ কাজ অনেকেই করতে পারেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে এঁদের বাজারদরও কম নয়। অবশ্য আলোচনাভিত্তিক সব অনুষ্ঠানই শেষ হয় একইরকমভাবে। 'আপনার কাছে আরও অনেক অনেক জিনিস জানার ছিল, কিন্তু আমাদের সময় তো শেষ হয়ে আসছে'। আশ্চর্য, শুরুতে কিন্তু একই কথা আঠারো বার বলে কালহরণ করা হয়েছে। আর শেষে সময়াভাব......এই ফরম্যাটটা ভাঙা যাচ্ছে না। জানি না, কার মাথার দিব্যিতে চব্বিশ ঘন্টা চ্যানেল খোলা রাখার বাধ্যবাধকতা এসে গেল। অত সময় ধরে অত কথা জোগানো সহজ কাজ নয়। কাজেই

অনেক সময় নিয়ে অনেক কথা বলেও কোনো কথা না-বলার টেকনিকটা আয়ত্তে রাখতেই হবে।

২

এই লেখাটা এই পর্যন্ত পড়ে ভবেশ দাশ বিব্রত যে হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ তিনি যে-ধরনের লেখা চাইছেন, এটা কি তার ধারে-কাছে যাচ্ছে? বস্তুত, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কি কোনো ভাষা আছে? আমরা যেভাবে কথা বলি সেইভাবেই তো বলব রেডিয়োতে অথবা টেলিভিশনে। আমাদের বলার ভঙ্গি ও ভাষা অন্যের মতো নয়। সত্যি যদি একইরকম হত, তাহলে ব্যাপারটা খুব একঘেয়ে ও বাজে লাগত। প্রত্যেকের কথাতেই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। দোষ যেমন থাকে, তেমনি গুণও থাকে। ধরাই যাক আমাদের শ্রদ্ধেয় একজনের কথা। 'ওসব হবে-টবে না', 'ও তো কবিতা-টবিতা ভালোই বোঝে', কিন্তু তিনিই যখন বড়ো পরীক্ষার আগে পরীক্ষার্থীদের মঙ্গল কামনা করে ভাষণ দিতেন, তাতে পরীক্ষা-টরীক্ষা, সরকারি বাস-টাস থাকবে যথেষ্ট পরিমাণে, এইরকম জোড়শব্দের খুবই অভাব থাকত। তখন কেমন যেন অচেনা লাগত। তা ওটা কোনো বড়ো বিষয় নয়। সেদিন রেডিয়োতে শুনলাম, এক গুণী ও নামকরা ভদ্রলোক বলছেন গানের ওস্তাদদের বিষয়ে, 'তা যাঁরা টিকতেন না তাঁরা পঁচিশ-ছাব্বিশ কী তারও আগে ফৌত হয়ে যেতেন। আর যাঁরা বেঁচে যেতেন তাঁরা রাত্রি তেরোটার সময়েও বিরিয়ানি সাঁটিয়েও দিব্যি আশি, পঁচাশি এমনকী, নব্বুই-বিরানব্বুই বছর পর্যন্ত গান চালিয়ে যেতেন। এই যে ভাষা, বিশেষ করে শব্দের ব্যবহার, তাকে কি রেডিয়োর ভাষা বলব? না ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলব। না কি তাঁকে আগেই বলে দেব, রেডিয়োতে ওসব ফৌত, রাত্রি তেরোটা বলবেন না। এটা হলে খুবই মুশকিল।

এইখানে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যবহৃত ভাষার কমপক্ষে তিনটি ভাগ করাই যায়। এক, যাঁরা সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন, টেলিফোনে কথা বলছেন, টক-শো করছেন, অর্থাৎ আগে থেকে না-ভেবে কথা বলছেন, ব্রডকাস্ট কিংবা টেলিকাস্টটা হচ্ছে 'লাইভ'। দুই, কথিকা প্রভৃতি যার স্ক্রিপ্ট আগে, অন্তত রেকর্ডিঙের আগে, জমা দিতে হয়। তিন, রেডিয়ো কিংবা টিভিতে যাঁরা ঘোষণা করেন, খবর বলেন, তাঁদের ভাষা। আর একটা চার নম্বর বিষয়

আছে, বিজ্ঞাপনের ভাষা। মনে কার যাক কেউ বিজ্ঞাপনে বললেন, 'আমাদের জুতো অন্য সব জুতোকে জুতিয়ে দেবে'। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করাই যায়, এবং হয়ও। যদি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কোনো ল্যাঙ্গোয়েজ কোড থাকে, তবে এক নম্বর ক্ষেত্রে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। দুই থেকে চার পর্যন্ত যেগুলো আছে তাতে অবশ্যই করা যায়। এক নম্বর বিষয়টির অনেক রকমারির মধ্যে একটার কথা বলি। টেলিফোনে যে-শ্রোতা অথবা দর্শক-বন্ধু আছেন, তিনি যদি বলে বসেন, 'হ্যালো, এতক্ষণ আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে যে আপনারা সব্বাই আস্ত এক-একটা—', তাহলে লাইন কেটে দেওয়াই যায়, কিন্তু তার আগে যা বলবার তা বলা ও সম্প্রচারিত হয়েই গেছে। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য এরকম কোনো ঘটনা এখনও পর্যন্ত সম্ভবত ঘটেনি। লাইনটা পাওয়াই তো এক অসম্ভব ব্যাপার। আর একবার লাইন লাগাতে পারলেন যিনি, তিনি চেষ্টা করবেন তাঁর গলার আওয়াজটা যতক্ষণ সম্ভব শোনানো। তিনি কোনো রিস্ক নেন না। হয়তো এই কারণেই তেমন কোনো দুর্ঘটনা বোধ হয় আজও ঘটেনি। ভাগ্যিস।

কথিকার স্ক্রিপ্ট দেখে কোনো প্রযোজক মশাই দুটো-একটা শব্দ পালটাতে বলছেন, এ-অভিজ্ঞতা এই লেখকেরও হয়েছে। তবে সেটা নেহাতই অন্য কারণে। যেমন, হয়তো কোনো কোম্পানির ট্রেড নেম ছিল, তাতে ওই জিনিসটির বিজ্ঞাপন হয়ে যেতে পারে, তাই শব্দটি বদলানো হল। এতে ক্ষতি কিছু নেই হয়তো ইংরেজির অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, একটু সামলে চলা যেতেই পারে। সরকারি চ্যানেলে নাকি প্রোডিউসারদের হাত-পা বাঁধা। কে বেঁধেছে? না, দিল্লি বেঁধেছে। জলকে এবার থেকে পানি না উদক বলা হবে, তা-ও নাকি দিল্লি ঠিক করে। এই বিশেষ উদাহরণটা ঠিক নয় হয়তো, কিন্তু এর নিহিত অর্থে কোনো ভুল নেই। 'গৈরিকীকরণ' বললে সম্প্রচার মন্ত্রী চটবেন কি না জানা নেই। তিনি যদি না-ও চটেন, কোনো বড়োকর্তা চিঠি লিখে তাঁকে রাগিয়ে দিয়ে প্রোডিউসারকে বয়লাডিলায় বদলি করতেও তো পারেন। অতএব কে চান্স নেবে। তবে বেসরকারি চ্যানেলগুলিতে এ-বালাই নেই, অতএব বেপরোয়া হতে বাধা কোথায়? বিপত্তি তাঁদেরও আছে। চ্যানেল না চললে চাকরিটাও চলে যাবে। তাঁদের বেশিরভাগ দর্শক কারা? যাঁদের ক্রয়ক্ষমতা বেশি, যাঁরা নিয়মিত শপিং করেন। শপিং কী? বাড়িতে চা চিনি ফুরিয়েছে, দোকান থেকে কিনে

আনলাম। এটা শপিং নয়। টাকা কিংবা ক্রেডিট কার্ড নিয়ে সাজানোগোছানো দোকানে ঘুরছি, হঠাৎ কোনো জিনিস ভালো লেগে গেল, তার দরকার থাক আর না-ই থাক কিনে ফেললাম, এটাই হল শপিং। এঁদের সঙ্গে তাঁদের ভাষাতেই কথা বলতে হবে। সে-কারণেই বাংলা-ইংরেজির মিশেলটা চরমে উঠেছে। বিজ্ঞাপনেও পাওয়া যায়, 'আমার মা—আফটার অল', 'ওয়ান মোর প্লিজ', 'নাথিং লাইক মাছের ঝোল'। একটানা বাংলা বলাটা এখন আপওয়ার্ডলি মোবাইলদের দস্তুর নয়।

৩

বস্তুত, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভাষা কেমন হবে তা বলা এক কথাতে কিংবা হাজার কথাতেও বলা যায় না। বিশেষ করে, আমরা যারা ষাট বছর পার করেছি, তারা এ-বিষয়ে কিছু বলতে কিংবা লিখতে গিয়ে প্রায়শই নিজেদের জ্যাঠামশাই ভেবে বসি। আমাদের সময় খুব ভালো ছিল, এখন সব গোল্লায় গেছে—এই ভাবটাও গোপন থাকে না। তৃতীয়ত, আবার আমাদের হাতে ভার থাকলে যেন একটা দারুণ ব্যাপার করে ফেলতে পারতাম, এমন একটা অলীক দম্ভও উঠে আসে। (এই 'উঠে আসে' শব্দ দু-টির এইরকম ব্যবহার হালে হচ্ছে, এবং খারাপ হচ্ছে না)। আলোচনা করতে গেলে, 'এ ভুলটা করেছে, সে ওটাও জানে না, ও খবর পড়ে অথচ রাষ্ট্রপতিকে বলে রাষ্টপতি, অমুকে আবার অভিনেতা কিন্তু গোল্ড রাশ ছবিকে বলে গোল্ডেন রাশ', 'কোত্থেকে সব ধরে এনেছে'—এইরকম মন্তব্যই দখল করে নেবে গোটা লেখাটা! তাতে কোনো পক্ষেরই কাজ এগোবে না।

এই রেডিয়ো, টেলিভিশন মাধ্যম দু-টিই অতিমাত্রায় ব্যক্তিনির্ভর। বিভিন্ন ধরনের মানুষ এর সঙ্গে জড়িত। দর্শক-শ্রোতারা এই মানুষদের তো প্রায় ঘরের লোকই বানিয়ে নেন। তাঁদের নিজস্ব বচন ও বাচনভঙ্গির বিশিষ্টতা তাঁদের অনুষ্ঠানকে কারো কাছে বর্জনীয়, আবার অন্য এক জনের কাছে সেটাই, যাকে বলে গিয়ে, অতীব গ্রহণযোগ্য করে তোলে। ইন্দিরাদি বহু দিন 'শিশুমহল' পরিচালনা করেছেন। শুরু হত এইভাবে। 'তোমাদের ইন্দিরাদি বলছি। ছোট্ট সোনা বন্ধুরা ভাই আদর আর ভালোবাসা নাও। ভালো আছ তো সব?' সমবেত শিশুরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠত, 'হ্যাঁ।'

ইন্দিরাদির এই ভাষা ও ভঙ্গি ছিল একান্তই নিজস্ব। আজ যদি কোনো অন্য দিদি ওই কাজটা করতে গিয়ে ইন্দিরাদিকে নকল করতে লেগে যান, তাহলে বেশ মুশকিল হবে।

একটা হাহাকার শোনা যায়। টিভির বিরুদ্ধে বেশি, রেডিয়োর বিষয়ে অতটা নয়। এর কারণ বোধ হয়, যাঁদের চিৎকার বেশি কানে আসে অর্থাৎ যাঁদের গলার জোর বেশি, তাঁরা রেডিয়ো খুব-একটা শোনেন না। হাহাকারটার মূল বক্তব্য হল টিভিতে এমন সব জিনিস দেখানো-শোনানো হয় যা দেখে ছেলে-মেয়েরা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। উচ্ছন্নে অবশ্য ছেলে-মেয়েরা যায়নি, গেছেন তাদের বাবা-মায়েরা। জীবনের অনেক অতৃপ্ত শখ তাঁরা মেটাতে চাইছেন টিভি থেকে। ওদিকে দুটো তো মাত্র ঘর, ছেলে-মেয়েদের আইসোলেট করবেন কেমন করে? উপগ্রহ থেকে 'বিম' করা দৃশ্য ও বাণীর ফুটপ্রিন্টকে বন্ধ করা যাবে না। তবে অপছন্দ হলে নিজের বাড়িতে তার দেখা-শোনা সহজেই বন্ধ করা যায়। প্রত্যেক টিভি সেটেই একটা অফ করার সুইচ থাকে। ভালো না লাগলে বন্ধ করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু এমনটি হবার জো নেই। খুলে রাখব এবং গেল গেল করব। তবে এ-টুকু বলে নিতেই হবে যে টিভির বিরুদ্ধে অভিযোগটা মূলত ওই মাধ্যমটির ভাষা নিয়ে নয়। আসলে বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালিরা এখন ভাবেনই না, কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছেন, আর ওটা সবসময়ই থাকে ও থাকবে। তবে তাদের সংখ্যা ক্রমশ কমছে, আরও কমবে। আজকের বাঙালির নির্ভরতার ভাষা ইংরেজি, আর হিন্দির প্রতি আছে অকৃত্রিম আনুগত্য। হ্যাঁ, আনুগত্য। এখানে বাঙালি বলতে বোঝাতে চাইছি মধ্যবিত্ত ও আংশিক উচ্চ মধ্যবিত্তদের। এটা অবশ্য অন্য বিতর্ক। অন্য কোনো প্রসঙ্গে সেটা বলা যাবে।

বাংলার বিষয়ে চিৎকার হল, এরা বাংলাটার সর্বনাশ করছে। সেই সর্বনাশের স্বরূপ কী। হিন্দির অনুপ্রবেশ? কেমন সেটা? খুব বেশি উদাহরণ দেন না কেউ, কেবল বলেন, 'ধামাকা', 'মস্তি', 'হো যায়', ও এই ধরনের আরও কয়েকটি শব্দ। ওগুলি সবই কিন্তু বিজ্ঞাপনের ভাষা, এবং টিভিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ বাংলা ও ইংরেজি খবরের কাগজেও বাংলা ও ইংরেজি হরফে আরও বিচিত্র সব হিন্দি বিজ্ঞাপন রোজই থাকে।

টিভির বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ, বাংলা বানানে ভুল। অভিযোগ সত্য। কিন্তু শুধু টিভিই দোষী? এই বিষয়টাকে খতিয়ে দেখার জন্য তিনটি বড়ো শারদীয়া সংখ্যার বিজ্ঞাপনের পাতাগুলো দেখছিলাম। বানান ভুল নেই এমন একটা বাংলা বিজ্ঞাপনও চোখে পড়ল না। এমনকী খোদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাতা-জোড়া রঙিন বিজ্ঞাপনেরও একই হাল। প্রমাণ চাইলে দেখানো যাবে সহজেই। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। শুধু বিজ্ঞাপন কেন? অধুনা যেসব বাংলা বই প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলো দেখেছেন নজর করে? হাতের কাছে একটা বইতে দেখছি শ্রীমতি, মনস্তত্ব, সৌন্দর্যতত্ব, প্রচন্ড, কান্ড, মালি, মুরগী ও মুরগি, বাঙালী, আকর্ষনীয়—না আর দরকার নেই। হাল আমলের অন্য যেকোনো বই নিলেও উদাহরণের ঘাটতি হত না। টিভির লোকেরা বলেন, 'দাদা তাড়াতাড়িতে ও-রকম হয়ে যায়'। কৈফিয়তটা অংশত সত্য হলেও হতে পারে, কিন্তু প্রকাশকদের বেলায় কী বলা যাবে? রাজনীতিবিদদের প্রিয় খেলা, তোমার এক ভুল আর আমার এক ভুল কাটাকুটি হল, ফল—শূন্য ভুল। এই পাটিগণিতে আমার আস্থা নেই। ও এক সর্বনেশে গাণিতিক প্রক্রিয়া। আমার দলের তিন জন খুন হয়েছে। অতএব ওদের চার জনকে মারব। তাহলে আমরা এগিয়ে থাকব এক গোলে। কিন্তু, আমার অঙ্ক হল, তোমার ভুল ও আমার ভুল মিলে হবে দুই ভুল। শুনতে হয়, 'ওরা ভুল বানান লেখে তখন তো দোষ হয় না মশাই। আমরা ভুল করেছি তো করেছি'। অতএব বাংলা বানানের ভুল যে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এদের নেতা কলকাতা দূরদর্শন, আর অনুগামীদের মধ্যে আছে বিজ্ঞাপন সংস্থা, অন্য বেসরকারি চ্যানেল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার, যার সব বিজ্ঞাপনই নাকি বার হয় তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগ থেকে। বাংলা বইয়ের প্রকাশকরাও পিছিয়ে নেই। পিছিয়ে নেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও। বাংলার নতুন সিলেবাস বিষয়ে প্রতিটি কলেজে প্রেরিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে অনুমোদিত এক অফিশিয়াল নির্দেশে পাওয়া যায় এইসব শব্দ—সৌন্দর্যতা, সন্ধারীভবন, রন্ধারীভবন, শংকর শব্দ। মুদ্রণপ্রমাদের অজুহাত এখানে চলবে না, কারণ সার্কুলারটির বাংলা অংশটা হাতে-লেখা। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপানো পাঠ্য বইতে দেখি, আঘ্রান, ক্ষুন্ন, সমাজগ্রন্থনা, বিমূর্ত্ত, স্থায়ীত্ব, পৃথকীকরণ ও আরও অনেক কিছু। বেশী, দেরী, তৈরী এইসব বর্জিত বানানের কথা নাহয়

বাদই দিলাম। সব জন্তুই ভার বয়, ধরা পড়েছে গাধা। সবাই বানান ভুল করে, কিন্তু কেন যেন ধরা পড়েছে কলকাতা দূরদর্শন। ভারি অন্যায়।

কিন্তু বলার ভাষা? সেখানেও কি মিডিয়ার লোকজনেরা ধামাকা, মস্তি বলেন? আমি তো অন্তত শুনিনি। কোনো সিরিয়ালের চরিত্র বলতেই পারে, কারণ ওই চরিত্রে ওটাই 'ইন থিং'। কিন্তু আগামী সপ্তাহে আপনাদের জন্য যেসব ধামাকা আর দিলচসপির আয়োজন করেছি, এমনটা শুনিনি। বরং আশ্চর্যই হই যখন স্রেফ বাংলায় কথা বলে, এফ. এম. রেডিয়োতে 'আজ রাতে' ও অন্য অনেক অনুষ্ঠান জমিয়ে দেন নবীন-নবীনারা। এঁদের বাহাদুরিই দিতে হয়। তিন-চার বার এঁদের টেলিফোন পেয়েছি। 'রাত এগারোটা তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে আপনাকে আমরা টেলিফোনে নেব, আপনার অমুক বিষয়ে অভিমত জানার জন্য'। 'টেলিফোনে নেব' একটু অপরিচিত ঠেকেছে, কিন্তু পরিচয় করে নিতে তো বেশিক্ষণ লাগে না। ওটাই এখনকার বাংলা। কেউ বলেন না, ফোন করব, বলেন ফোন করে নেব। এই 'কেউ'দের বেশির ভাগেরই বয়স চল্লিশের নীচে। ওঁরা ওইরকমই শিখেছেন, ওটাই এখনকার লব্জ। কোনো স্টেশনেই এখন ট্রেন আসে না, ট্রেন ঢোকে। বাজারে তরি-তরকারি বা আনাজ আর পাওয়া যায় না, সবাই সবজি কেনে। 'কেননা' এখন 'কেনকী'। রাস্তার বহুত জাম, ছেলেটা বহুত জিদ্দি-বাজ আছে, ইনি আমার মামা হচ্ছেন। বাড়ির সাধারণ কথাবার্তাই এখন এ-রকম। তা হলে মিডিয়ার কী দোষ।

এসব সত্ত্বেও মনে হয় না যে, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বাংলা ভাষাকে গোল্লায় পাঠাচ্ছে। আলোচনার শুরুতে যে-উদাহরণগুলো দেখানো হয়েছে ও তার মধ্যে যে ঘোলাভাব ছিল সেটা কোনো অংশেই ইলেকট্রনিক মিডিয়ার একচেটিয়া ব্যাপার নয়, আর ওই মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত সব্বাই ওইরকম বাচনিক মুদ্রাদোষে আক্রান্ত, সে-কথাও জোর করে বলা যাবে না। আমাদের কথাবার্তায়, সাহিত্যেও ওই একই জিনিস চলছে। সাধারণ কথাবার্তায় যে-বাংলা শব্দটির সব থেকে বেশি ব্যবহার তা সম্ভবত 'মানে'। 'বলছিলাম কী মানে' কেমন যেন লেগেই থাকে কথার সঙ্গে। ইংরেজিতেও কথার মধ্যে 'ওয়েল', 'আই মিন', 'ইউ সি'-এর প্রকোপ দেখা যায়। আকাশবাণীর 'আজ রাতে' একদিন হাতে পেনসিল নিয়ে শুনবেন, আর

এইরকম 'মানে' কানে এলেই একটা দাগ দেবেন। তারপর গুনে দেখবেন দাগের সংখ্যাটা। আমার এক বন্ধু, খুবই বিদ্বান মানুষ, কথা বলবার সময় প্রতি বাক্যে অন্তত দুটো 'আর কী' বলেন। তাঁকে টিভিতে বসালে কী হবে জানি না, তবে তাঁর বাংলা লেখা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার, সেখানে কোনো মুদ্রাদোষ নেই। বাংলা সাধারণ কথনভঙ্গিটা এইরকমই, তাকে মানতেই হবে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।

কিন্তু সুখের বিষয়, ফর্মাল প্রচারে, যেমন সংবাদ কিংবা ঘোষণায় এসব গোলমাল থাকে না। কখনো শোনা যায় না, 'এখন ইয়ে মানে রবীন্দ্রসংগীত শুনবেন সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে', কিংবা 'গত কাল সন্ধ্যায় মার্কিন বিমান থেকে, ওর নাম কী, তালিবান ঘাঁটিগুলির ওপর আক্রমণ চালানো হয়'। তবে সংবাদে অনেক ভারী ভারী শব্দ বলা হয়, যা সহজ করেও বলা যায়। এ-বিষয়ে রেডিয়ো ও টিভিতে কোনো তফাত নেই। যেমন, আবহাওয়ার খবরে, 'সর্বনিম্ন ও সর্ব উচ্চ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়', 'গত চব্বিশ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল এত ও এত'। ওটা কখনোই সবচেয়ে বেশি কিংবা সবচেয়ে কম হবার উপায় নেই। 'তিন জন নিহত হয়', কখনোই মারা যায় না। 'প্রস্তাব উত্থাপন করেন', তোলেন না। কিন্তু আবারও বলতে হয় এ-টি কোনো আকাশ থেকে-পড়া ব্যাপার নয়। বাংলা ভাষায়, এমনকী, সাধারণ কথাবার্তাতেও ভারী শব্দের ব্যবহার বাড়ছে। সভাপতিকে 'পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়', ফুলের তোড়া দেওয়া হয় না। 'কুশ পুত্তলিকা দাহ', 'পথ অবরোধ', 'অমুক অমুককে মঞ্চে আসতে আহ্বান জানানো হচ্ছে', 'প্রবল বর্ষণে মুম্বাই প্লাবিত', 'নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি', 'পরবর্তী সংবাদ রাত দশটায়' (পরের খবর নয়)। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে আইনমন্ত্রী, দমকলমন্ত্রী ছাড়া আর প্রায় সব মন্ত্রীই তৎসম মন্ত্রী। মৎস্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী, নগরোন্নয়নমন্ত্রী। মাছমন্ত্রী, খেলামন্ত্রী, শহরের দেখভালমন্ত্রী, এসব ভাবাই যায় না। যেসব জায়গায় তৎসম শব্দে সুবিধা, সেখানে সংগত কারণেই তা রাখা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু পুষ্পস্তবক অর্পণ না করে দেওয়াও যায়, মঞ্চে আসতে আহ্বানের পরিবর্তে অনুরোধ করতেও বাধা নেই, নির্বাচনের পরের অবস্থা বলেও একই কথা বলা চলে। অবশ্য প্রচারমাধ্যমের দাপটে গ্রামেগঞ্জের মানুষও ভারী কথায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। মাইক্রোফোন ও ক্যামেরার সামনে তাঁরা দিব্যি বলছেন,

'এখনে রোজ সন্ত্রাস হোচে'। 'রোজ ট্রেন লেট, পরীক্ষার্থীরা আটকে যাচ্ছে, ইন্টারভিউ দিতে না পেরে যুবকরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাই আমরা আজ রেল অবরোধ কইরেছি।' 'আমি তখন খাচ্ছি, এমন সময় দুটো বিস্ফোরণের শব্দ।' এখানেও আবার আগে-বলা কথাই বলতে হয়। মিডিয়ার ভাষা কোনো আলাদা ব্যাপার তো নয়। যে-সময়ে যেমন ধারা থাকে প্রচারমাধ্যমেও তার প্রতিফলন থাকে। কিছু দিন ধরে আনন্দবাজার পত্রিকায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রকাশিত খবর, চিঠিপত্র বার করা হচ্ছে। দেখে আশ্চর্য লাগে, এতটা পরিবর্তন কবে হল? কিন্তু হয়েছে, আর তা ঘটেছে আমাদের চোখের সামনেই। পরিবর্তন যে হচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল নিশ্চয়ই, তবে তার মাত্রাটার ব্যাপকতা বিষয়ে ধারণাটা ছিল নিতান্তই অস্পষ্ট।

৪

টিভি চ্যানেলগুলোতে নানান ধরনের অনুষ্ঠান হবে এটাই প্রত্যাশিত। মজা, হল্লা, রঙ্গ রসিকতা, শিল্প-সাহিত্য থেকে শুরু করে খেলাধুলো সবই আছে। একটু নজর করলেই বোঝা যায় যে এই জায়গাটাতেও এক কিংবা একাধিক স্টাইল তৈরি হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে নতুন ভাষা। কয়েকজনের মুখও পরিচিত হয়ে যাচ্ছে। ভিন্নতর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মানুষদেরও নতুনতর গুণের পরিচয় পাচ্ছি। কে ভেবেছিল ফুটবলার পি কে ব্যানার্জি, যাঁর 'ভোকাল টনিকের' কথা একসময়ে খুবই আলোচিত ছিল, তিনিই একজন সংযতবাক্ সঞ্চালক হয়ে উঠবেন? এক সাংবাদিকের ও এক জন চিত্রপরিচালকের যে অন্যাকে দিয়ে এত কথা বলিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে, তা-ও তো জানা ছিল না। অনেক নতুন মুখ নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজেদেরই এলেমে। পিছু হটে গেছে কিছু পুরোনো মুখ। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে অনেকেরই বলার ভঙ্গি, মুখব্যাদান, শরীর ঝাঁকানো আর তার সঙ্গে ক্যামেরার যথেচ্ছ ডাইনে-বাঁয়ে প্যান মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। 'আপনিই বলুন কে না বড়োলোক হতে চায়? কে না চায় লটস অব মানি। তা বাবা আপনি না চাইলেও, আমি তো ভীষণই চাই। তা আপনারা থাকুন আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ। হ্যাঁ, বাচ্চারাও থাকবে। ওরা কিন্তু দারুণ। আমরা কয়েকটা প্রশ্ন করব, আর আপনাদের দিতে হবে তার সঠিক উত্তর। দেখবেন, আপনি হয়তো পারবেন না, কিন্তু আপনার

বাচ্চা জানতে পারে। উত্তর পাঠাবেন এই ঠিকানায় ঠিক তিন দিনের মধ্যে। ই-মেলেও পাঠাতে পারেন। কে জানে, আপনার জন্যই হয়তো অপেক্ষা করে আছে আমাদের দারুণ দারুণ সারপ্রাইজ গিফ্‌ট। কী সেটা? না, এখন বলব না, ওটা টপ সিক্রেট'।

কী বলব এই ভাষাকে? গেল বাংলা ভাষা? ইঙ্গ-বঙ্গ কালচার? উপস্থাপিকা এম-টিভিকে নকল করছে, কেবল অতটা খোলামেলা হতে পারছে না? হাজার প্রশ্ন তোলা যায়, কিন্তু এ-সত্যটা অস্বীকার করা যায় না যে এই ভাষা ও ভঙ্গি মানুষকে আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। যত বেশি মানুষ আকৃষ্ট হবেন, তত বেশি বিজ্ঞাপন আসবে। তাঁরা তো ব্যাবসা করতেই নেমেছেন, আর এই উপস্থাপিকাও কলেজের ক্লাস নিচ্ছেন না। যদি কিছু অ-বাংলা এর মধ্যে থেকেই থাকে, তাতে আর যারই হোক, বাংলা ভাষার কোনো ক্ষতি হবে না। পৃথিবীর চার কিংবা পাঁচ নম্বর ভাষা বাংলা। কুড়ি কোটিরও বেশি মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন। কোথায় কোন টিভি কিংবা রেডিয়োতে কে কী বলবেন, তা এই ভাষাটাকে খুব বেশি প্রভাবিত করবে না। আর মিডিয়ার লোকেরা সবসময়েই বৈচিত্র্য খোঁজেন, পালটে দেন স্টাইল। আজ ওঁরা যে-ভাষায় প্রোগ্রাম প্রেজেন্ট করছেন, কাল হয়তো সেটা অন্যরকম হবে। তবে বেশি অন্যরকম হতে গিয়ে তো মাঝেমধ্যে নাকাল হতে হয়। তবে তা তো সবাই হন জীবনের নানা ক্ষেত্রে।

রেডিয়ো-টেলিভিশনের কথাবার্তার কী কোনো আদর্শ মডেল থাকা উচিত? এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কোনটা উচিত আর কোনটা তা নয়, সেটা কে ঠিক করবেন? বর্তমান লেখক এ-ব্যাপারে নিতান্তই অব্যবসায়ী। যাঁর যা বক্তব্য তিনি অবশ্যই তাঁর ভাষাতেই বলবেন।

অনেকদিন আগে লেখা ও বলা বিষয়ে একটা বই পড়েছিলাম। ফগ ফ্যাক্টর বলে একটা কথা ছিল তাতে। লেখক মজা করেই কথাটি বলেছিলেন। কী করে ফগ ফ্যাক্টর বার করতে হয়, তার কিছু সূত্রও দেওয়া ছিল। মনে করা যাক কোনো রচনার থেকে তিন-শো শব্দ নেওয়া হল। তার মধ্যে কতগুলো সাধারণ পাঠকের অজানা, যাদের অর্থ জানার জন্য অভিধান খুলতে হয়। যেমন উট বোঝাতে ক্রমেলক বলা হয়েছে কি না। কতগুলি শব্দের ব্যবহার একাধিক বার হয়েছে। বাক্যের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য কত? পাঁচ শব্দ না পঁচিশ শব্দ? না কি আরও বেশি? এই ফ্যাক্টর বার করার একটা

ফরমুলাও দেওয়া ছিল। এই ফ্যাক্টর বেশি হলে ও-লেখা পড়বেন না, এই ছিল লেখকের পরামর্শ। কারণ ওটা পড়ে কিছু বোঝা যাবে না। আমাদের মিডিয়ায় যাঁরা লেখেন কিংবা বলেন তাঁদের ভাষার মধ্যে এই ফগ ফ্যাক্টর খুবই বেশি। এটাকে সামলানো দরকার। কিন্তু কে সামলাবে? ভুললে চলবে না যে বলা-কথা বোঝার সময়টা কিন্তু ওই বলার সময়টুকুই। দু-তরফা কথা হলে আমরা প্রায়শই বলি, 'ঠিক বুঝলাম না, আবার যদি বলেন'। ইংরেজিতে 'বেগ ইয়োর পারডন'। রেডিয়ো-টিভিতে এ-রকমটা হতে পারে না। বই পড়ার সময় এক বারে না বোঝা গেলে, বার বার পড়া যায়। অবশ্য তাতে যে বোঝা যাবেই তার স্থিরতা নেই, কারণ বোঝার মতো বস্তু লেখাটার মধ্যে না-ও থাকতে পারে। দেখা-শোনার মাধ্যমে বাক্যে শব্দের সংখ্যা সীমিত রাখতেই হবে। অনেকে তা রাখেনও।

কিন্তু মোদ্দা কথাটা অন্য। টিভিতে যে এতগুলো চ্যানেল, চব্বিশ ঘণ্টা চমৎকার সব আমোদের আয়োজন তা কী আমাদের দেশের অসংখ্য খেতে না-পাওয়া মানুষদের উন্নতির জন্য? চ্যানেল চালাবার যে বিপুল খরচ সেটা কি দেশের উন্নতির জন্য ব্যবসায়ীদের শিক্ষাখাতে ব্যয়? আগে কেউ কেউ এ-রকম ভাবলেও সে-ভাবনা এখন আর নেই। কোটি কোটি টাকার খেলায় এখন মানুষের দুটো শ্রেণি।

এক দল হল 'ডিসপোজেব্‌ল'। এরা মরে গেলে পৃথিবীর ভার কমে। অন্য দল 'দোজ হু পে'। চতুর মানুষেরা বিশ্বব্যাপী এমন ফাঁদই পেতেছেন, ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। আমাদের প্রদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই দলের মাঝখানে আর একটা ক্রমক্ষীয়মাণ শ্রেণি আছে, বাঙালি, মধ্যবিত্ত, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বাংলা ভাষাটা নিয়ে ভাবেন। পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের সংখ্যা কত? গুনে দেখা হয়নি, তবে খুব বেশি-একটা হবে না। নন্দনের আশেপাশে একই মুখ দেখা যায় ঘুরেফিরে।

ভাষা নিয়ে যাঁরা ভাবেন না তাঁরা অন্য কিছু নিয়ে তো ভাবেন। না ভাবলেও চ্যানেল ব্যবসায়ীরা তাঁদের ভাবিয়ে ছাড়বেন। কোন ভাবনা? ভোগবাদিতায় শামিল হওয়ার ভাবনা। তাতেই তো লাভ। এক জন মানুষের চাহিদাকে তার সংগতির ওপরে তুলে দাও। চাহিদা পূরণের জন্য টাকা ধার

করার প্রাথমিক মানসিক বাধাটা তাড়াও। লোককে লোভী করে তোলো। টাকা ধার দেওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছেন একদল মানুষ। চিঠির বাক্সে নানারকম হ্যান্ডবিল আসে। তাতে থাকে বিচিত্র সব লোভানি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে আমাকে বড়োলোক বানাবার জন্য এত জন উঠে-পড়ে লেগেছেন? টাকা নেই তো কী আছে? (এই 'কী আছে' বাক্যাংশটা আসলে হিন্দি)। জিরো ব্যালেন্সেও ক্রেডিট কার্ড পাবেন আপনি। ক্রেডিট কার্ডের সুবিধার দিকটা অনস্বীকার্য, কিন্তু যেভাবে ও যে-কারণে ওটা গছাবার আন্দোলন চলছে, তার মধ্যে ব্যাবহারিক সুবিধের দিকটা নিতান্তই গৌণ। একবার আসুন আমাদের ফাঁদে, তার পর আপনার অজান্তেই আপনি অন্য জগতের মানুষ হয়ে যাবেন। সন্ধ্যে বেলাটা কাটাবার জায়গা বদলে যাবে। খাবার, পোশাক অন্যরকম হয়ে যাবে। 'লেট নাইট' হবে প্রায়শই। অনেক ব্রান্ডনেম শিখে যাবেন। জানবেনই না যে কবে থেকে জামা, জুতো, আইশ্যাডো, কুর্তা, সানগ্লাস প্রভৃতির নাম ও দাম দেখে আপনার বন্ধুদের শ্রেণিকরণ শুরু করছেন আপনি। আপনাদের আলোচনার অধিকাংশই অধিকার করে নিচ্ছে শপিং, বিলাসদ্রব্য, জামা-কাপড়, ফেসপ্যাক, ছবির নায়ক-নায়িকা, বিজ্ঞাপনের মডেল, কোন জয়েন্টে কেমন পিৎজা, ফ্রিজের দরজার সংখ্যা এইসব। বাড়িতে একটা বাংলা খবরের কাগজ রাখতে লজ্জা পাচ্ছেন। আপনি যদি একবার এই বৃত্তে এসে পড়েন, কিংবা আপনাকে আনতে পারেন যাঁরা আপনাদের চালান অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা, তবেই তাঁদের পোয়া বারো। আপনাকে এই পথে টানতে ঘরের মধ্যে এসে গেছে পসরার সমারোহ। সঙ্গে উপযোগী ইডিয়াম, ভাষা। মুখের কথা, শরীরের ভাষা, চোখের চাহনির ভাষা, পোশাকের ভাষা, লম্বা পায়ের নীচে পেনসিল-হিল জুতোর ভাষা, স্ক্রিন-জুড়ে কালচে ঠোঁটের ভাষা। এসবও টিভির ভাষা।

যাঁরা আমাদের চালান—এই শব্দ তিনটি এখন খুবই তাৎপর্যবহ। আমাদের কিন্তু নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চলার স্বাধীনতা আর নেই। দু-চার জন ব্যতিক্রম থাকতেই পারেন, তাবে তাতে গোটা অঙ্কটার কোনো হেরফের হবে না। মাসমিডিয়া সর্বাংশেই বিজ্ঞাপননির্ভর। এটাও কোনো নতুন সংবাদ নয়। কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে তার দাপট ও উদ্দেশ্য আগের সব হিসেবকে ছাড়িয়ে গেছে। সাধ্যের বাইরে সাধকে নিয়ে যাওয়াতে এত কম সময়ে এত মানুষকে শামিল করতে পারবেন, এতটা তাঁরাও বোধ হয়

ভাবেননি। প্রোগ্রামগুলো যা হয় তারও তো একটাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এগুলো খুব ভেবেচিন্তে করা। টপ এন্টারটেইনিং হিন্দি ছবির মধ্যেও রক-পপ-র‍্যাপের সঙ্গেও ঠাকুরঘরে ঠাকুমার 'হরি তুমারহি চরণ' গানও একটা রাখতে হয়। একই কারণে চ্যানেলগুলোতেও রাখতে হয় কিছু গম্ভীর কথাবার্তা, সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুষ্ঠান। তাতে বিজ্ঞাপনের বিরতি বড়ো হয় না, থাকে না মোটর গাড়ির বিজ্ঞাপন। সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক পরিবেশে কিছু শিক্ষা গুঁজে-দেওয়া মিডিয়া তার সঙ্গে তাল মেলাবে। এটাই হবে ও হচ্ছে।

কিন্তু একটা কথা আগেও বলা হয়েছে, আবারও বলছি। এখনও ভয় পাওয়ার মতো কিছু ঘটেনি।। এদেশে তো 'ডিসপোজেবল' মানুষই বেশি। তারা সংখ্যায় আরও বাড়ছে। এত মানুষকে কোথায় ফেলা যাবে? কলকাতার পৈতৃক ভিটে থেকে এদের হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাদকুল্লা কিংবা ডিহি মেদনমল্লতে। কিন্তু তারা সেখানে থেকেই যাবে। এরা লুপ্ত হলে আপওয়ার্ডলি মোবাইলরাও থাকবেন কি না সন্দেহ। কে করবে তাঁদের গৃহস্থালীর অড জবস? কম্পিউটারে তাঁদের ব্যাবসার লাভের হিসেবে কে কষবে? ধনী-দরিদ্রের এ এক অদ্ভুত সিমবায়োসিস। এটার বদল কি হবে? এই সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদের আঞ্চলিক বাংলাতেই কথা বলেন। মিডিয়ার বাংলা তাঁদের আর কতটা বদলাতে পারবে। মাইক্রোফোন আর ক্যামেরার সামনে অনভ্যস্তদের মুখ থেকে কিছু ভারী ভারী কথা বেরোয় ঠিকই, কিন্তু ওগুলো সরিয়ে নিলে বাংলাটাই ফিরে আসে। আগামী দিনগুলোতেও আসবে।

লেখক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। অভিধান-প্রণেতা



শব্দই ব্রহ্ম এবং কখনো ব্রহ্মদৈত্যও

হিমানীশ গোস্বামী

শব্দই ব্রহ্ম এটি অতি প্রাচীন কথা। এর ব্যাখ্যা করার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয় নেই। বলা হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আগে ছিল কেবলই বাক্য, বাক্য থেকেই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি শুরু হয়েছিল আজ থেকে মোটামুটি পনেরো-শো কোটি বছর আগে দারুণ এক আওয়াজের মাধ্যমে। ভগবানকে যদি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বলে ধরে নিই তাহলে মেনে নিতে হবে ভগবান নিজেও বিশ্বসৃষ্টির আগে বিশাল এক শব্দ করেছিলেন, যেটার নাম সাহেব বৈজ্ঞানিকেরা দিয়েছেন বিগ ব্যাং। সেই যে শুরু হয়েছিল তার এখনও শেষ হয়নি—এখনও সৃষ্টিকর্ম শেষ হয়নি, আর আমাদের জীবদ্দশায় শেষ হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। এই যে বিরাট একটা সময়কাল এর মধ্যে আবার পৃথিবীর সৃষ্টি করা হল শ-পাঁচেক কোটি বছর আগে। তার পর সেই আদি সময়কার ভয়ংকর গরম নানাবিধ গ্যাস থেকে ক্রমশ ভগবান তৈরি করে দিলেন একটি প্রায়

গোলাকার বিশ্ব— যেটি আমাদের কাছে অতীব বিস্ময়কর। তবে একটি কথা প্রমাণ করার জন্যই এতখানি কথা বলা হল, সেটি হল জীবজগতের বিশিষ্ট জীবদের মতো ভগবান নিজেও নীরব কর্মী ছিলেন না, তিনি বিশ্বসৃষ্টির আগে যে-হুংকার ছেড়েছিলেন, আমরা বিবর্তনের শেষ ধাপে পৌঁছে মানুষেরা সেই ধারা বজায় রেখেছি। আমরা কিছু করবার আগে কেবল নয়, ভগবানের উপর টেক্কা দিয়ে কিছু করার সময় এবং কিছু করার পরও গলা ফাটাতে কসুর করিনি। এর সঙ্গে এটাও যোগ করা ভালো যে আমরা বাঙালিরা একেবারে কিছু না করেও চিৎকার চেঁচামেচিটা করেই চলেছি। স্বীকার করছি আমিও ওই শেষের দলে। শব্দ সৃষ্টি করার কাজে বাঙালি ভারি দক্ষ। সমস্ত বিশ্বের প্রায় পনেরো-শো কোটি বছরের মধ্যে মানুষের আগমন কিংবা বিবর্তন ঠিক কত বছর আগে জানা নেই, তবে লাখ কয়েক বছর হয়তো হবে, আর বাঙালির জন্ম মাত্র হাজার বছর আগে। তার আগে বাঙালি কী ছিল জানি না। তবে বাঙালি হিসেবে জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই বাঙালি শব্দ করেই চলেছে। এই শব্দকে বলা হয়েছে ব্রহ্ম। শব্দ অর্থ বহন করে, এবং শব্দ ব্যবহার একটু এদিক কিংবা একটু ওদিক হলে শব্দের অর্থ নাটকীয়ভাবে পালটে যায়। সেজন্য শব্দ যেমন ব্রহ্ম, শব্দগঠন একটু বেচাল হলে সৃষ্টি হয় ব্রহ্মদৈত্যের। আমরা যারা কথা বলি, কিংবা লেখালেখি করি, রেডিয়ো-টিভিতে বলি কই, তারা কখনো-সখনো ব্রহ্মদৈত্যদেরও সৃষ্টি করে ফেলি, কেননা বাঙালিদের সৃষ্টিশীলতা খুব-একটা কম নয়। আশি বছর আগে বাঙালিরা সংখ্যায় ছিলেন, আমার মনে পড়ছে সাত কোটি। এখন সৃজনশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমরা হয়েছি কুড়ি-বাইশ কোটি, কেউ কেউ বলেন আরও বেশি। বিশ্বের প্রায় ছ-হাজার ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার স্থান সংখ্যার দিক দিয়ে চতুর্থ। সংখ্যার দিক দিয়ে এত উঁচুতে থাকলেও এর স্বাস্থ্য তেমন ভালো নয়, মাথারও কিছু গোলমাল দেখা যাচ্ছে। এর উপরে এই ভাষার বিপুল সংখ্যার মানুষ নানা ভাগে বিভক্তও। দেশের রাজনৈতিক বড়োকর্তারা যখন দেশের দু-টি প্রদেশকে ভাগ করে নিজেরা হালকা বোধ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন তখন বাঙালিরা প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়েন। হঠাৎই এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার মাঝখানে নেমে এল বিরাট এক দেওয়াল এবং মানসিকভাবে বাঙালিরা দু-ভাগে চিরতরে ভাগ হয়ে গেল, একটি ভাগ হল হিন্দুপ্রধান ভাগ অন্যটি হল মুসলমানপ্রধান ভাগ। দু-টি ভাগ পশ্চিমবঙ্গ

এবং বাংলাদেশ দু-ভাবে বদলাতে লাগল। মুসলমানপ্রধান বাংলা সামান্য হলেও প্রভাবিত হতে শুরু করল আরবি শব্দ ফারসি শব্দ গ্রহণে, আর হিন্দুপ্রধান অংশটি প্রভাবিত হতে শুরু করল গঙ্গার পবিত্র জলধারা বেয়ে হিন্দির দ্বারা। ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গও স্বাধীন হল বটে, তবে ভাষাটি ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়তে লাগল। বাংলাদেশ পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্তি পাবার পর আরবি-ফারসি প্রভাব ১৯৭১ সালের পর থেকে ক্রমশ কমতে শুরু করল, আর দুই বাংলাই যে-ভাষা, যে-বাগ্‌ধারা যে-উচ্চারণভঙ্গি গ্রহণ করেছিল সেটাই আদর্শ হিসাবে রয়ে গেল। অর্থাৎ কলকাতা শান্তিপুর অঞ্চলের ভাষা যেভাবে বদলায় সেভাবেই বদলাতে লাগল। কেবল তথাকথিত সাধু ভাষা যেমন ছিল প্রায় তেমনটাই রয়ে গেল।

দুই মিডিয়ার দুই ভাষা

রেডিয়ো এবং সংবাদপত্রের ভাষা প্রথম দিকে প্রায় একই রয়ে গেল। রেডিয়োয় যে-সমস্ত কথিকা সংবাদ ইত্যাদি পড়া হত সেগুলি আগে লিখে নেওয়া হত। সেই লেখা আগে জমা দিতে হত এবং প্রয়োজনমতো সংশোধন করাও হত। অর্থাৎ প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্বে যিনি থাকতেন তিনি সেই লেখা পড়বার আগে ভালো করে দেখে নিতেন। দেখে নেওয়ার একটি বড়ো কারণ ছিল রেডিয়োতে যা প্রচার করা হবে সেটি সরকারবিরোধী কিছু যেন না হয়। কোনোভাবে যেন অশ্লীলতাসূচক কিছু কথা না থাকে, লেখা পড়বার সময় যেন ভুল বোঝার সম্ভাবনা না থাকে সেটাও দেখা হত। রেডিয়োর ভাষা ছিল অনুকরণীয়—অর্থাৎ ওই ভাষা মোটামুটি সঠিক করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হত। রেডিয়োতে যখন সংবাদ পাঠ করা হত তখন প্রতিটি বাক্য স্পষ্টভাবে যেমন লেখা হত, তেমনি উচ্চারিতও হত। ভাষার প্রতি ভালোবাসা ছিল অনেকেরই, এখনও তা স্মরণ করতে পারি। বিভূতি দাশ এমন চমৎকার খবর পড়তেন যা মনে পড়লে এখনও শিহরন জাগায়। বিজন বসুর কথাও স্মরণ করা যায়। বিজন বসু থাকতেন বারাসতে, তিনি আমাদের বাড়িতে বাবা পরিমল গোস্বামীর কাছে আসতেন প্রায়ই, আর দু-জনের মধ্যে ভাষা নিয়ে প্রচুর চিঠিপত্রও লেখালেখি চলত—কেননা বিজনবাবুর বাড়িতে সম্ভবত টেলিফোন ছিল না। তখন বাংলা ভাষাকে ভালোবাসেন এমন বহু বেতার ব্যক্তিত্বকে আমাদের বাড়িতে দেখেছি।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বছরে অন্তত তিন-চার বার আসতেন, নলিনীকান্ত সরকার আসতেন, সেও মনে হয় বছরে দু-তিন বার। আসতেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়। রেডিয়োর নানা অনুষ্ঠান নিয়ে হত নানা আলোচনা—সেসব আলোচনায় বলা বাহুল্য আমার স্থান ছিল না। মাঝে মাঝে দূর থেকে কিছু কথা কানে আসত। আসতেন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়—তাঁর আসার কোনো দিন বা ক্ষণ ছিল না। প্রায়ই আসতেন এবং নানা কথা বলে আমাদের মাতিয়ে রাখতেন। ওঁর সঙ্গে অবশ্য কথা বলার সুযোগ বহুবার হয়েছে। উচ্চারণ নিয়ে বাবার খুঁতখুঁতানি ছিল খুব—ওঁর উচ্চারণ এবং পড়বার ধরন খুবই ভালো ছিল, কিন্তু উনি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কাছ থেকে বক্তৃতা ঠিক কেমনভাবে এবং ভঙ্গিতে দেওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করতেন। ভাষা এবং উচ্চারণ নিয়ে লীলা মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে বাবার আলোচনা হত রেডিয়ো অফিসে—যখন গার্স্টিন প্লেসে ছিল অফিসটি। মনোমোহন ঘোষ আসতেন প্রায় নিয়মিতভাবেই। এঁরা সকলেই বাংলা ভাষা ভালোবাসতেন এবং রীতিমতো ভাষাচর্চা করতেন। আসতেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—আমাদের সিঁথির বাড়িতে, বছরে এক দিন, আর সুধীন চট্টোপাধ্যায় আসতেন সস্ত্রীক বছরে অন্তত দু-বার সেই গড়িয়া থেকে। মনে আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কোনো এক সময়ে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন দাদুমণি নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—সে যে কী আনন্দ হয়েছিল তা বলে বোঝানো আমার পক্ষে অসম্ভব। জয়ন্ত চৌধুরি ছিলেন আমার বিশেষ পরিচিত। ওঁর সঙ্গে ১৯৫১ সালের পর অবশ্য আমার আর দেখা হয়নি। ওঁর দাদা প্রশান্ত পড়তেন বিদ্যাসাগর কলেজে—আমার চাইতে দু-বছরের সিনিয়র ছিলেন তিনি। জয়ন্তর কণ্ঠস্বর অবশ্য রেডিয়োতে বহু বার শুনেছি।

মিডিয়া সম্পর্কে লিখবার আমার বিশেষ যোগ্যতা আছে বলে আমার মনে হয় না, তবে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা যে আছে সেটি আমি বিশ্বাস করি। আমি রেডিয়োয় হাজির হয়ে গল্প-প্রবন্ধ-রম্যরচনা পাঠ করেছি সর্বসাকুল্যে পঁচিশ কি ত্রিশ বার। এটাও বোধ হয় বাড়িয়ে বলা হল। এবারে আমার প্রথম রেডিয়োয় প্রচারের অভিজ্ঞতার কথাটা বলি। সেটা এখন থেকে সাতান্ন বছর আগে, ১৯৪৪ সালে। যুদ্ধ—অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তখন পঞ্চম বছর চলছে। দু-টি স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা

হবে—কোনো কিছু দেখে পড়া নয়, রীতিমতো ডিবেট! আমাদের স্কুল থেকে পাঠানো হল দু-জনকে, আমি এবং অমল চক্রবর্তী। আমরা তখন ক্লাস টেনে পড়ি। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে এল মলয় ঘোষ, সে-ও বোধ হয় ছিল ক্লাস টেনেরই ছাত্র। এক জন বলবে মিত্রশক্তি হারবে, আর দু-জন বলবে, জিতবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মিত্র শক্তিরই জয় হবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা আগে তো পৌঁছোনো গেল রেডিয়ো অফিসে। লাইভ ব্রডকাস্ট! অর্থাৎ সরাসরি প্রচার! তখন রেকর্ড করে প্রচারের ব্যবস্থা ছিল না। যা বলব সবই রেডিয়ো প্রচার করে দেবে! ফলে মনে মনে যথেষ্ট ভয় এবং উদ্‌বেগ। প্রচারের প্রায় আধ ঘণ্টা আগে আমাদের ডাকা হল। যাঁর সামনে আমরা উপস্থিত হলাম, দেখেই চিনতে পারলাম—তিনি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তিনি অবশ্য আমাকে চিনতে পারেননি—যদিও বেশ কয়েক বার তিনি আমাকে দেখেছেন। বাড়িতে কড়া নাড়ার পর দরজা খুলে যাঁদের বাবার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিতাম তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আমার চেহারা মনে রাখার কথাও নয়।

যাই হোক কী হল তাই বলি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ আমাদের সমস্ত বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন। কে কী বলবে আগে থেকে তালিম দিলেন। আমাদের উচ্চারণে যেসব ভুল হচ্ছিল সেগুলো যত্ন করে দেখিয়ে দিলেন। আমাদের এক জন কী-একটা উচ্চারণ কিছুতেই ঠিক করতে পারছিল না দেখে তিনি সেই কথাটি না বলতে নির্দেশ দিলেন। তার পর রসিকতা করে বললেন, উচ্চারণ আয়ত্ত করা বেশ কঠিন। একজন পড়ছিল ফক্‌স মানে খ্যাঁসকিয়াল, ফক্‌স মানে খ্যাঁসকিয়াল। তাঁর উচ্চারণ ঠিক করে দেওয়া হল—খ্যাঁসকিয়াল তো খাঁকশিয়াল হল! কিন্তু নতুন বিপত্তি দেখা দিল—এবারে শোনা গেল সে পড়ছে ফসক্ মানে খ্যাঁকশেয়াল! এত সব বলার এই উদ্দেশ্য যে সেই সময়, তার আগে এবং তার পরবর্তী কালের বেশ কয়েক বছর যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম (আরও কিছু নাম বাদও রয়ে গেল অবশ্যই), তাঁরা সকলেই বাংলা ভাষা ভালোবাসতেন, বাংলা ভাষা চর্চা করতেন এবং কখনোই গদ্য লেখায় বা বলায় 'সাথে' কথাটা ব্যবহার করতেন না। সাথে নয়, সাথে সাথেও নয়। সাথে কথাটি পূর্ববঙ্গ থেকে আমদানি এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র একবার বলেছিলেন, ওই কথাটি তাঁর কাছে অশ্লীল এবং গেঁয়ো বলে মনে হয়। কথায়ই হোক বা ছাপার অক্ষরেই হোক সাথে কথাটা এখন সর্ব

পরিব্যাপ্ত। পরিমল গোস্বামী এই কথার বিরুদ্ধে অনেক বার বলেছেন, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। বাংলাচর্চা, বাংলাকে ভালোবাসার দিন কি শেষ হয়ে গেছে?

শুরু করেছিলাম দুই মিডিয়ার দুই ভাষা, এই বিষয় নিয়ে। এককালের বাংলার ভদ্র সমাজে দু-টির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কিন্তু এখন লেখার ভাষা আর কথা বলার ভাষা অনেকটাই আলাদা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, প্রথমে লিখে পরে পড়া একরকম হয়, অন্যরকম হয় সরাসরি কথা বলা। এগুলি হয় যেখানে আলোচনায় একাধিক ব্যক্তি উপস্থিত থেকে কথা বলেন, কিংবা কোনো সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা হয়। এইসব সময় যাঁদের কথা বলার বিশেষ অভ্যেস নেই তাঁদের উত্তর স্বাভাবিক হয় হয়তো, কিন্তু নানারকম অসংগতি এসে যায়। কথার মধ্যে প্রচুর ইংরেজি শব্দ অনাবশ্যকভাবে এসে পড়ে। রক্ত বললেই যেখানে হয়, সেখানে ব্লাড কথাটা এসে যায়। কেউ আবার ব্লাড বলতে গিয়ে বলে ফেলেন ব্ল্যাড! নিজের ভাষাকে ভালোবাসার প্রমাণ এসব কথায় থাকে না। আজকাল গণ্ডায় গণ্ডায় ইংরেজি কথা বলার কেতা শেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে পাড়ায় পাড়ায়। সেখানে শুনি শিক্ষার্থীরা গিজগিজ করে কিন্তু বাংলা শেখানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। কেতাদুরস্ত বাংলা কাকে বলে সেটা যাঁরা শিখতে চান তাঁদের ভরসা রেডিয়ো কিংবা টিভি। মুশকিল হয় তখনই যখন বেশ বোঝা যায় রেডিয়ো বা টিভি-র বক্তারা নিজেরাই অনেক সময়ে জানেন না কেতাদুরস্ত বাংলা। ভাষার প্রতি ভালোবাসা থাকলে এমনটি হত না বোধ হয়। কিন্তু তারও আগে ভাবতে হবে ভালোবাসার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে কি না? অর্থাৎ, আমাদের মাতৃভাষার প্রতি আমাদের দরদ কতখানি?

মাতৃভাষা—কোথায় পাব তারে?

অত্যন্ত সহজ কথা এই যে মাতৃভাষা শোনা হয় মায়েরই কাছ থেকে। এটা না বললেও চলত। কিন্তু এর মাধ্যমে বিদ্যাশিক্ষা, প্রথম থেকে সর্বোচ্চ ধাপ পর্যন্ত? সেটা সম্ভব নয় আদপেই। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান—এমন একটা কথা প্রচার করে করে এমন একটা কাণ্ড ঘটানো হয়েছে যে ওই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। কথাটা খুব মনোমুগ্ধকর হলেও ওর মধ্যে সারবস্তুর সাক্ষাৎ কমই মিলবে। সব মা শিক্ষিত হবেন এমন কথা বলা যায়

না, আমাদের দেশে নাম সই করতে পারেন এমন নারীর সংখ্যা শতকরা ষাট হবে, উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করেছেন এমন নারীর সংখ্যা শতকরা পাঁচও কি হবে? এঁদের যদি উচ্চশিক্ষিত বলে ধরে নেওয়া যায় তা হলে আট কোটি মানুষের পশ্চিমবাংলায় এদের সংখ্যা কত? মনে রাখতে হবে অবশ্যই যে পশ্চিমবঙ্গের একটি বড়ো অংশ বাংলা জানেন না—এঁরা হলেন নেপালিভাষী। এছাড়া বহু বহিরাগত আছেন যাঁরা বাংলা জানেন না—সাঁওতালরা আছেন যাঁরা বাংলা জানেন না, অতএব কেবল বাঙালি শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা পঁচিশ-ত্রিশ লক্ষ। এঁদের সন্তানরা মাতৃভাষা ভালো করে হয়তো শিখতে পারবে। মাতৃভাষায় কোনোমতে কথা বলা একটা ব্যাপার, মাতৃভাষায় সঠিকভাবে বলা এবং লেখা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। মাতৃদুগ্ধ সব মায়েরই থাকবে কিন্তু সব মা কি মাতৃভাষা সঠিকভাবে শেখাতে পারবেন? আর সঠিকভাবে ভাষা না শিখলে কোনো শিক্ষাই তাদের আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে পারবে না। এই ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে যাঁরা যোগ্য সে তিনি মা-ই হোন বা পিতাই হোন—কিংবা মেসো কাকা মামা ইত্যাদি যিনিই হোন তাঁদের কাছ থেকেই মাতৃভাষা শিখতে হবে। মায়ের কাছ থেকে দুধ অবশ্য পান করতেই হবে। যে রবীন্দ্রনাথের কথা আশ্রয় করে মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান বলা হয় সেই রবীন্দ্রনাথই কিন্তু শিশুবয়স থেকেই শেখার জন্য বাংলার সঙ্গে ইংরেজি বইও লিখেছিলেন। চমৎকার বই—সহজপাঠের সঙ্গে সেগুলিও বোধ হয় আধুনিক যুগেও খুব-একটা বেমানান হত না। আসল কথা এই যে বাংলা হোক ইংরেজি হোক যেকোনো ভাষা শিখতে হবে যাঁদের শেখানোর যোগ্যতা আছে তাঁদেরই কাছ থেকে। পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে দেখছি, বুঝবার এবং অনুভব করার চেষ্টা করছি এবং এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছি যে বাঙালিরা খুব কমই বাংলা ভাষা শেখবার চেষ্টা করেছে—সরকারি-বেসরকারি কোনো উদ্যোগই প্রচুর পরিমাণে হয়নি, শিক্ষাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন আমাদের জনপ্রতিনিধিরাই। এই ব্যর্থতার জন্যই বাংলা শেখানোর মতো আকর্ষক বই রয়েছে অতি সামান্য পরিমাণে, অথচ এই পশ্চিমবাংলাতেই ইংরেজি বর্ণমালা এবং ইংরেজি শেখার প্রাথমিক বইয়ের সংখ্যা হয়তো এক-শো ছাড়িয়ে যাবে। আমাদের শিক্ষা দেওয়ার প্রণালীটাও এমন যে ছাত্ররা আরও কিছু পড়বার কথা ভাবে না, কেননা সেই ভাবনাটা জাগিয়ে

দেওয়াটাও শিক্ষকদের একটা বড়ো কাজ। সাধারণ লোক, সরকার, বিবেকবান ব্যক্তিবর্গ, যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরা অনেকে যাঁরা আছেন তাঁরা সচেষ্ট হয়ে যদি একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন তবেই বাংলা ভাষা এগিয়ে যেতে পারবে—তবু, এর সঙ্গে আমি একটা "হয়তো" যোগ করতে চাই, কেননা মূলে একটা বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। সাধারণ মানুষ তাঁদের সন্তানদের বাংলা শেখানোর ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন, বাংলা শিখলে আমার সন্তানেরা দুধে-ভাতে থাকবে তো? অন্য কথায়—তারা চাকরি পাবার সুযোগ সুবিধে পাবে তো?

এর পরেই আসছে হিন্দির কথা। পশ্চিমবাংলার বাইরে ভারতের যেখানেই হোক ইংরেজি এবং হিন্দি এই দু-টি ভাষা জানা থাকলে বেশ সুবিধেই হবে, অতএব সন্তানদের দুধে-ভাতে রাখতে গেলে ইংরেজির পরই পিতামাতার ইচ্ছেয় হিন্দিটাও শেখার দিকে বাঙালিদের ঝোঁক থাকবেই। তাহলে প্রথম স্থানে এল ইংরেজি। দ্বিতীয় স্থানে এল হিন্দি এবং শেষে এল বাংলা। বাংলায় এম. এ. পাশ করার পর তাদের একমাত্র ভালো চাকরি পাবার স্থান হল সরকার অনুমোদিত স্কুলে শিক্ষকতা করা। সে-সুযোগও যে সকলে পাবেন তা নয়। ইংরেজি হিন্দি জানা ছেলেমেয়েরা তবু রাজ্যের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারবে এমন আশা করতে পারে, কিন্তু কোনোমতে পাশ করার মতো বাংলা শিখে প্রায় প্রত্যেকেই এই উন্নত কারিগরি এবং গতির যুগে তাদের প্রতিভাকে ধনে রূপান্তরিত করতে ব্যর্থ হয়। ফলে বাঙালি মানসিকতায় একটি বিষণ্ণতা আসে, তার চাইতেও বড়ো হয় উদাসীনতা। এই উদাসীনতা সর্বস্তরে প্রবেশ করে, যন্ত্রশিল্প থেকে শুরু করে সমস্ত রকম শিল্পের উপর আঘাত করে। এই উদাসীনতা এবং বিষণ্ণতা অবশ্যই মিডিয়াতেও প্রতিফলিত হয়—কিংবা হতে বাধ্য। এরই ফলে দেখা যায় একটা অযত্ন—নিজের প্রতি এবং ভাষার প্রতি। উৎকর্ষ কেউ দেখালেও তা তারিফ করা বা প্রশংসা করাটাও অনেকের মনের মধ্যে আসে না। কথা বলা, বাংলা ভাষা নিয়ে চর্চা করা তাই তাঁদের অনর্থক বলে মনে হয়। এখন বাঙালি ভুলে থাকার কথাই ভাবে—কেননা বাঙালি মনে মনে হেরে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস। বাস্তব থেকে ক্রমশ বাঙালি মানসিকতা দূরে চলে যাচ্ছে। সচ্ছল ব্যক্তিরা মজলিশে দায়িত্বহীন প্রমোদে-আমোদে গানে বিনোদনে ঝুঁকে পড়েছেন, কেমন করে আরও অর্থ কোথা থেকে সংগ্রহ করে

কোথায় বিনিয়োগ করলে মোক্ষলাভ হবে এ-কথা তাঁরা দিবারাত্র ভাবছেন, আর অন্যেরা—যাঁদের প্রত্যেক বাড়িতে একটি দু-টি করে কর্মহীন সন্তান, তাঁদেরও অল্প আয় এবং প্রবল হতাশার মধ্যেও ভুলে থাকার জন্য কিছু না কিছু প্রমোদের উপকরণ জুটিয়ে নিতে হচ্ছে। তাই কেউ যদি বলেন 'ঝড়বৃষ্টির ফলশ্রুতিতে শহরে দারুণ ক্ষতি হয়েছে', সেটি যে ভুল এবং কেনই-বা ভুল তা তাঁরা জানেন না, এবং জানলেও ভাবেন তাতে আমার কী এসে গেল? ইংরেজি এবং হিন্দি যে বাংলা ভাষার অস্তিত্বই বিপন্ন করছে, সেটাও খুব একটা গুরুতর বিষয় বলে তাঁরা মনে করেন না। এই দলে অবশ্য আমরা সকলেই আছি। "সাথে সাথে" সঠিক গদ্য নয়, "সঙ্গে সঙ্গে"ই ব্যবহার করা দরকার এটা শুনেও তাঁরা অবিচলিত থাকেন।

সামগ্রিক উদাসীনতা ও মিডিয়া

প্রধানত রেডিয়োর কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলব। সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সালে এমন দু-টি ঘটনা আমেরিকার নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে ঘটানো হয় যা অকস্মাৎ সমস্ত পৃথিবীর দুশ্চিন্তাশীল মানুষকে আরও দুশ্চিন্তাশীল করে তুলেছে। এই দু-টি ঘটনার বিবরণ দেব না, তার দরকারও নেই, কিন্তু অতঃপর এর জন্য দায়ী করা হয় আত্মগোপনকারী আরব্য ধনকুবের ওসামা বিন লাদেনকে। ইনি আফগানিস্তানের তালিবান প্রশাসকদের আশ্রয়ে ছিলেন। সমস্ত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ এঁর এবং তালিবানদের নিন্দা করে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই মারাত্মক হিংস্র আতঙ্কবাদীদের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লেনদেন বন্ধ করে দেন। রেডিয়োতে বাংলা সংবাদে প্রথম দিন বলা হল অ্যাকাউন্টগুলিকে ফ্রিজ করে দেওয়া হচ্ছে। পরদিন একজন সংবাদপাঠক বলেন ব্যাঙ্কের টাকা ক্রোক করা হয়েছে, সেদিনই অন্য একজন বললেন, ব্যাঙ্কের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, এবং ওয়াশিংটন থেকে ভারতীয় রেডিয়োর বাঙালি সাংবাদিক অমিতাভ চক্রবর্তী (যিনি ইংরেজিতে তাঁর নাম উচ্চারণ করেন অমিতাভ্!) বললেন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিকে হিমায়িত করা হয়েছে! এতে বোঝা গেল এবং হয়তো বোঝানো গেল ভারতীয় রেডিয়োর বাংলা নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট নীতি নেই। অর্থাৎ বাংলা নিয়ে ভাববার কেউ নেই। এই কারণে দিল্লি এবং কলকাতা দু-টি জায়গা থেকেই নানারকম অসংগতি এবং ভুলভ্রান্তি দেখা দেয়। এই

ঔদাসীন্যের সঙ্গে একটি বেপরোয়া ভাবও দেখা যায়। আমি কলকাতা এবং দিল্লি রেডিয়োর দু-একটি উদাহরণ দিতে চাই। রেডিয়োর নামকরণ হয় আকাশবাণী—এই নামটি পূর্বে অন্য অর্থে প্রচলিত ছিল—সেটি হল দৈববাণী। প্রাচীন কাব্যগ্রন্থে এই শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। দিল্লির ইংরেজি অনুষ্ঠানে কখনো আকাশবাণী কথাটার উল্লেখ করা হয় বলে আমি শুনিনি, সেখানে বলা হয় *অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো*। অল-ইন্ডিয়া রেডিয়োর প্রচার, কিন্তু কোন প্রচার কেন্দ্র থেকে সেটি বলা হচ্ছে তা বলা হয় না। যেন দুনিয়া সমেত লোককে তা জানানোর মধ্যে কোনো একটা নিষেধাজ্ঞা আছে! আমাদের সরকারি রেডিয়োর সরকারি নামটা সঠিকভাবে জানা দরকার। দিল্লি থেকে কলকাতা ক থেকে দিনে তিন বার সবসমেত আধ ঘন্টা সংবাদ প্রচার করা হয়। বলেও দেওয়া হয় দিল্লির খবর। এই সংবাদের সময় যেটুকু দেওয়া হয় তার মধ্যে থাকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ খবর, ভারতের গুরুত্বপূর্ণ খবর এবং পঁচিশটি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ খবর! প্রতিবার দশ মিনিটে এটা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বিশ্বসংবাদ যদি পাঁচ মিনিটে কোনোমতে দেওয়া যায় বাকি থাকে আর মাত্র পাঁচ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে ভারতের পঁচিশটি (সঠিক সংখ্যা মনে পড়ছে না) রাজ্যের জন্য দু-মিনিট করে ধরলেও আরও পঞ্চাশ মিনিট সময় দরকার। দিল্লির আকাশবাণী এই অদ্ভুত এবং অসাধ্য কর্ম করে থাকে। এর ফলে আমাদের মতো কিছু খুঁতখুঁতে মানুষ খুঁত খুঁত করে থাকেন, কিন্তু দিল্লির আকাশবাণী নির্বিকারই থাকেন। এ তো গেল সময়ের বিষয়—এত কম সময়ে খবরের বহু জরুরি বিষয় বাদ পড়তে বাধ্য। আমার এক বন্ধু বলেন, আরে বাবা আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্রের দশ মিনিটের খবরেই যদি অন্তত দুটো করে ভুল করে তাহলে দিনে আড়াই-তিন ঘণ্টায় কতগুলি করে ভুল প্রয়োগ ভুল তথ্য এবং ভুল উচ্চারণ শুনতে হবে সেটা ভেবেছ? বরং সংবাদের সময়টা কমিয়ে চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাখলে আরও ভালো হয়। এ-কথা ভাববার মতোই বটে!

রেডিয়োর সংবাদলেখককে একটা বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয় না—সেটা হল বানান। বাংলা বানানের অজস্র জটিলতার ফলে মুদ্রণ মাধ্যমগুলির অবস্থা খুবই—ভদ্রভাবে বলতে গেলে দুর্ভাগ্যজনক। রেডিয়োর সে দুশ্চিন্তা নেই, কিন্তু ভুল করবার অন্য যে অনেকরকম সুযোগ রয়েছে সেগুলির

সদ্‌ব্যবহার তাঁরা করে থাকেন। এটা অবশ্য কলকাতা কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও ঘটে। এখানে আমি দিল্লির বাংলা এবং কলকাতার বাংলা সংবাদ থেকে কিছু কথা যা শুনেছি সেগুলির উল্লেখ করি। কোন কথা ব্যবহার করলে সেটা ঠিক হয় সেটা নিয়ে যদি কোনো নীতি রেডিয়োর থাকে তা হলেও সেটা স্পষ্ট নয়। যেমন অনেক সময়ে বলা হয় ফ্রান্স জার্মান রাশিয়া ইত্যাদি। জার্মান যে একটা দেশের নাম নয় সেটা সংবাদলেখক জানেন না। উচ্চারণে কোনো সময় বলা হয় রুশিয়া, কখনো রাশিয়া কখনো বা রাশ্যা!! আবার যেখানে রুশ বললেই চলে, সেখানে রুশি কথাটা একাধিক বার শুনেছি! মার্কিন যেখানে বোঝায় অ্যামেরিকান, সেখানে মার্কিনি বলা হয়—তাতে মনে হতে পারে আমেরিকার নারীদের সম্পর্কে কিছু বোধ হয় বলা হচ্ছে। আবার নারী বোঝাতে মহিলা কথাটিরও ব্যাপক ব্যবহার বহু বছর আগেই শুরু হয়েছে। সকল নারীকেই মহিলা বলেন রেডিয়ো-র সংবাদ লেখকরা। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না, তাঁরা চাকরি করছেন মাইনে পাচ্ছেন এ অতি উত্তম কথা, কিন্তু যাঁরা উক্ত বিভাগের কর্তা তাঁদের তো একটা দায়িত্ব থাকার কথা। আমি এমন সংবাদও শুনেছি যেখানে বলা হয়েছিল আহতদের মধ্যে তিন বছরের একটি মহিলাও ছিলেন! নিহত হওয়ার ব্যাপারটিও রহস্যজনক! এটি কেবল রেডিয়ো-র ব্যাপার নয় বা টিভিরও ব্যাপার নয়, মুদ্রণ মাধ্যমেও নিহত কথাটি দু-টি অর্থে ব্যবহার হয়—একটি অর্থ ঠিক, যেমন কেউ কাউকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে মেরে ফেললে সেটাকে বলা যায় (মৃত ব্যক্তি) নিহত হয়েছেন, কিন্তু বাস উলটে চার জন নিহত কথাটি ঠিক নয় অবশ্যই। কিন্তু এর ব্যাপক ব্যবহারের ফলে এটি এখন আর ভুল বলে কারও মনে হয় না। কখনো যদি বাক্য নিয়ে আমূল সংস্কারের প্রয়োজন হয়—সেটা প্রায় অসম্ভব ভবিষ্যতের কথা—তখন এই কথাটির সঠিক প্রয়োগ ভাবা যেতে পারে। আমি এই কথাটি নিয়ে আমার কর্মস্থলের একজন কর্তাকে প্রশ্ন করেছিলাম। প্রশ্ন করেছিলাম, বাস দুর্ঘটনায় কেউ কেমন করে নিহত হতে পারে? তিনি বলেছিলেন ও-নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। বাস দুর্ঘটনায় মৃত কথাটির চাইতে নিহত কথাটিতে জোর অনেক বেশি! আমি আর কী বলি, বার্তা-কর্তা যা বলেন আমি তাই করি। কিন্তু দু-দিন পর আমার মনে একটু দুষ্টুমি করার শখ হয়। নেহাতই শখ, কেননা জানি আমার উপর নেই ভুবনের বা কথার ভার! একটি সংবাদে আমি লিখি—আন্ত্রিক রোগে

দু-জন নিহত! তখন উক্ত কর্তা আমার উপর বেশ ক্রুদ্ধ হন, বলাই বাহুল্য। আমিও তাই চেয়েছিলাম। প্রায়ই দেখা যায় এবং শোনাও যায় আন্ত্রিকে ৪০ জন আক্রান্ত। মনে প্রশ্ন আসে—আন্ত্রিকে কথাটার অর্থ কী? আন্ত্রিক কি একটা অসুখ? বার্তা-কর্তাকে গিয়ে বলি—তখন আমি চাকুরিরত—কেবল আন্ত্রিক না লিখে আন্ত্রিক রোগে কথাটা ব্যবহার করলে ভালো হয়। অন্ত্র তো দেহের একটি স্থানকে বোঝায়। তিনি আমার কথায় কান দেন না। হেডিং-এ অতিরিক্ত একটা কথা "রোগে" লিখলে জায়গায় কুলোবে না। দু-দিন পর আমার একটি ইয়ার্কি করবার সুযোগ এসে যায়—এক ভদ্রলোকের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আকস্মিক স্তব্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। আমি খবরটি লেখার পর হেডিং বসাই—হঠাৎ হৃৎপিণ্ডে এক ব্যক্তির মৃত্যু!! এর পর কী হয়েছিল সেটা বোধ হয় বলার দরকার নেই। যাই হোক, বার্তা-কর্তার সঙ্গে ইয়ার্কি আর বিশেষ করিনি, কেননা ইচ্ছে করলেই তিনি আমাকে বনবাসে পাঠাতে পারতেন!

রেডিয়োর নানা বিভাগে, কেবল সংবাদ বিভাগই একমাত্র নয়, হৃদয়ের আক্রমণ কথাটি ব্যবহার করা হয়; হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে হৃদয় ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু যায়, রেডিয়ো এবং খবরের কাগজে এটি ভুলভাবে ব্যবহার অনেকসময়েই হয়ে থাকে। ক্রমাগত একই ভুল অধিকাংশ লোক করতে থাকলে সেটাই ঠিক হয়ে দাঁড়ায়। উপায় নেই—ভাষার চিরস্থায়িত্ব নেই। কথার অর্থের হরদম অদলবদল ঘটে যায়।

একটু আগে মহিলা কথাটির ব্যাপার নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছি। একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, এই কথাটির অপূর্ব ব্যবহার ২০০১ সালে শ্রীনিকেতন থেকে—এই নামের একটি অনুষ্ঠানে শুনেছিলাম। শ্রীনিকেতনের একজন (সম্ভবত) কর্তাব্যক্তি জানাচ্ছিলেন, তাঁরা গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙা করার প্রয়াসে ৩৪টি গ্রামে একটি করে মহিলা শুয়োর উপহার দিয়েছেন। ভাষার এমন অপূর্ব চমক এর আগে আমি তো শুনিনি! এই প্রসঙ্গে আর একটু যোগ করি—আমাকে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছিলেন, যাঁর সঙ্গে আমি এক বাড়িতেই থাকতাম—মহিলার আদি অর্থ হল যে-ভদ্র নারী অন্তঃপুরে অর্থাৎ মহলে থাকেন তাঁকেই বলা যায় মহিলা। নারী এবং মহিলা সমার্থক নয়। আসল কথা হল যা আগেই বলেছি ভাষা নিয়ে বাঙালির চিন্তা নেই। উদাসীন, ঘুমন্ত, কিছুটা বেপরোয়া এবং 'আমরা

সবাই রাজা’ এইরকম চমৎকার মনোভাব অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন, ভাষার ক্ষেত্রেও তো তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। তা নইলে ‘উদ্দেশে’ কথাটা যেখানে ঠিক সেখানে, উদ্দেশ্যে, বলার বা লেখার কী মজা থাকতে পারে? এটি তো ইস্কুলের গণ্ডি পার হবার আগেই শিখে নেওয়ার কথা। প্রায়ই রেডিয়োয় শুনবেন (সপ্তাহে অন্তত তিন বার!) কোনো ব্যক্তির স্মৃতির “উদ্দেশ্যে”! শুনবেন এবং পড়বেন সাদা পোশাক-এর কথা। পুলিশেরা সব নাকি সাদা পোশাকে লোকেদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন! কিংবা দরখাস্ত পাঠাবেন সাদা কাগজে!! এইরকম অসংখ্য অন্যমনস্ক উদাসীনতা সমগ্র বাংলা মিডিয়াকে ভরিয়ে রেখেছে। কলকাতায় রেডিয়ো প্রচারের পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হয়েছে—এই সময় যাঁরা ভাববার তাঁরা ভাবুন কীভাবে এই ভাষার এবং নানা বিষয়ের উন্নতি করা যায়। প্রথম কথা হল—উন্নতির প্রয়োজন আছে কি না সেটি কীভাবে স্থির হবে। অনেকে বলবেন বেশ তো—এতদিন যা-হোক করে চলে গেল তো, আর এখানে নাক গলানোর দরকার কী? তবু, মনে হয়—কিছু একটা বোধ হয় করা দরকার।

মারাত্মক উদাসীনতা

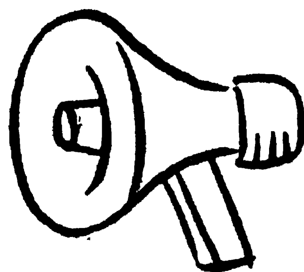
উদাসীনতার তো সীমা নেই রেডিয়োয়। নানা মুনি, অতএব নানা মত তো থাকবেই। যেহেতু প্রত্যক্ষে হোক পরোক্ষে হোক এটি সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং চাকরি যখন স্থায়ী তখন কর্মীরা নির্ভাবনায় উদাসীনতা এবং আরও উদাসীনতা চর্চা করতে পারেন। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করলে এবং কর্মীদের প্রচুর মাইনে দিয়ে, এক বছর দু-বছর কিংবা তিন বছরের চুক্তিতে নিয়োগ করলে, এবং ভাষা উচ্চারণ এবং প্রয়োগ ব্যাপারে একটি শক্তিশালী উপদেষ্টামণ্ডল থাকলে মনে হয় এর উন্নতি কয়েক বছরের মধ্যে করে ফেলা সম্ভব। কিন্তু এ-কল্পনা এখনও অবাস্তব বলেই মনে হচ্ছে। তবে প্রথমেই বলি, একটি পত্রিকা যেটিকে একেবারে অবিবেচকের মতো তুলে দেওয়া হয়েছিল সেটিকে আবার প্রকাশের ব্যবস্থা করা দরকার। রেডিয়োর একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানেই একাধিক বার বলা হয়েছে যে *বেতার-জগৎ*-এর পুনরাবির্ভাবের কোনো সম্ভাবনা নেই। এমনকী এটাও বলা হয়েছে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করলে অন্যান্য অনুষ্ঠানের ক্ষতি হবে! এমন অসাধারণ বিচারের উপর আর তো কথা বলার উপায়

নেই। রেডিয়োর আওয়াজ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় আর ফিরে আসে না। কিছু অনুষ্ঠান অবশ্য রেকর্ড করে রাখা যায়, এবং রাখা হয়ও, কিন্তু সাধারণ লোকের আওতায় সেটা থাকে না। ফলে প্রচুর ভালো ভালো রচনা, কথিকা, গল্প, কবিতা ইচ্ছে করলেও পরে আর পড়া যায় না। *বেতার-জগৎ* হচ্ছে রেডিয়োর একটি সম্পদ। এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকে। পুরোনো *বেতার জগৎ*গুলিকে এখনও কেউ কেউ গবেষণার কাজে লাগান। এই সম্ভাবনাটাকে নষ্ট যাঁরা করতে পারেন সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের মনোভাব সত্যিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। *বেতার-জগৎ* প্রকাশ করতে গেলে অন্য অনুষ্ঠানের ক্ষতি হবে এমন প্রচার আমি শুনেছি ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ রবিবারে! আমি আর কী বলব—নিজেই নিজের হাত কামড়াবার চেষ্টা করি, কিন্তু তাতেও তো কিছু লাভ হয় না! *সবিনয় নিবেদন* অনুষ্ঠান শুনলে বোঝা যায় উপস্থাপক বা উপস্থাপিকারা কিছু সময় এটা-সেটা বলে সময় কাটাতে আসেন। সেপ্টেম্বর ২০০১-এর শেষ রবিবারে একজন চিঠি লিখেছিলেন কেন *বিচিত্র সংবাদ* বন্ধ করা হয়েছে, এটি ফের চালু করা কি যায় না?—না ওটি আর চালু করা সম্ভব নয়, বললেন এক জন রেডিয়োর কর্তা। এটুকু ঠিক আছে—কিন্তু এই বাণী প্রচারের ঠিক এক দিন আগেই *বিচিত্র সংবাদ* প্রচারিত হয়েছিল। কী বলা যাবে অতঃপর? একটি কথা এখানে বলে নেওয়া ভালো, যদি *বেতার-জগৎ* প্রকাশ কখনো হয় তখন রেডিয়োর অনুষ্ঠানসূচি প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েক ফর্মা পৃষ্ঠা রাখতে হবে যাতে উৎকৃষ্ট রচনাগুলি স্থানাভাবে বাদ না পড়ে যায়, এবং আরও একটি কথা—এটির সম্পাদনার ভার দিতে হবে বাইরের কোনো ব্যক্তিকে, যাঁর রেডিয়োর কোনো অনুষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে না। তাঁর উপর কোনো খবরদারিও করা চলবে না। তবে এসব তো আপাতত স্বপ্ন—তবু মনে হয় একটু স্বপ্ন দেখাই যাক না কেন? প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা এখানে বলি—*উদ্যোগকে* যাঁরা উদ্‌দোগ—এইরকম উচ্চারণ করেন, তাঁরা স্মরণে রাখবেন, রবীন্দ্রনাথ *উদ্যোগকে* উচ্চারণের সঙ্গে সংগতি রেখে বানান লিখেছেন *উদ্‌যোগ*। ছন্দ এবং ভাষা বিশারদ প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ও *উদ্‌যোগ*, এই বানান লিখেছেন। পরিমল গোস্বামী লিখেছেন *উজ্জোগ*। বাংলা আকাদেমির বানান অভিধানেও উদ্‌যোগ বানানই পছন্দের প্রথম জায়গায় রাখা হয়েছে। তবুও রেডিয়োতে *উদ্‌দোগ*—এই উচ্চারণ শুনতে হবে?

ভাসা বরফের উপরিভাগ

স্বল্প পরিসরে অনেক কথাই বলা হল না। অনেক বিষয় একেবারেই বাদ পড়ে গেল—আজকের দিন, প্রাত্যহিকী, বিজ্ঞান, শিশু বিভাগ, গানের নানা অনুষ্ঠান, স্পোর্টস, নাটক, যুববাণী, সাহিত্য বিভাগ—(এর সময় বড়োই কম), কৃষিকথা, যাত্রা, এফ এম-এক এবং দুই-এর নানা সুযোগ এবং সুযোগের ব্যবহার/অপব্যবহার নিয়ে—হরেকরকম বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আরও শ-দেড়েক পৃষ্ঠা লেগে যাবে। অত সময়ও নেই আর এটাও জানি না আমার এইসব অনুভবের কথা কেউ আগ্রহ নিয়ে পড়বেন কি না, আলোচনা করবেন কি না। উৎসাহ পেলে হয়তো ফের বসা যাবে বেশ আসর জমিয়ে— আজ এখানেই শেষ করছি। শুধু একটা কথা, আমি যা যা বলেছি সেগুলি এক ঝাপ্‌সাচোখ বৃদ্ধের অর্বাচীন মন্তব্য বলে রায় দিলেও আমার আয়ু খুব একটা বাড়বে না। আরও একটি কথা—এটি আপাতত শেষ কথা—তা হল শব্দই ব্রহ্ম এবং আগেই বলেছি— সেই শব্দ ব্রহ্মদৈত্যরূপেও দেখা দিতে পারে এটি মনে রাখা দরকার!!

লেখক ভাষাভাবুক ও রম্যরচনাকার



সংবাদের ভাষা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

অদৃশ্য অনির্দিষ্ট শ্রোতা। বাঁধা সময়। সরাসরি বলবার মতো করে সংবাদ পড়া।

লেখকের মুখপাত্র পাঠক। লেখক আড়ালে। সামনে পাঠক। পাঠককে উতরোতে গেলে লেখককেই হাল ধরতে হবে। চাই ছোটো ছোটো বাক্য। যাতে শ্রোতারা চট করে ধরতে পারে। কে কী কবে কোথায়—সহজ কথায় স্পষ্ট করে যেন তার হদিশ মেলে।

বলতে গেলে, এ সবই ছেঁদো কথা। হাতে-কলমে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের দম ফেলার সময় থাকে না। মাথার ওপর ছড়ি-হাতে সরকার। পান থেকে চুন খসলে মাথা কাটা যাওয়ার ভয়।

অর্থবোধ সবসময় বাক্যের গঠননির্ভর নয়। শ্রোতার শিক্ষাদীক্ষা যুগোপযোগী না হলে আধুনিক জগৎচিত্র থাকবে তার নাগালের বাইরে। বাক্য সরল হলেও, জ্ঞানপরিচয়ের অভাবে সেখানে কথার হাত-পা বাঁধা। ছোটো হলে মিশ্র বা যৌগিক বাক্যেও

তেমন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এমনকী সরল বাক্যও যদি বেশি ডালপালা- ছড়ানো হয়, তাহলে এক নিশ্বাসে বলে গেলেও শ্রোতাদের পক্ষে তাল সামলানো কঠিন হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের আটপৌরে কথা বলার ধরনটাকেই বাক্য গঠনের কাজে লাগানো উচিত নয় কি? উদ্দেশ্য আর বিধেয় নিয়ে হয় সম্পূর্ণ বাক্য। কিন্তু অনেকসময়ই হয় শুধু উদ্দেশ্য, নয় শুধু বিধেয় দিয়েই আমরা গোটা ভাব ফুটিয়ে তুলি। মাঝরাত্তিরে শুধু 'চোর! চোর'! শুনলেই লাঠিসোঁটা নিয়ে পাড়াপড়শিরা ছুটে আসবে। স্থানকালপাত্র বিশেষে এক কথাতেই দশ কথার কাজ হয়। কখনো একবচনকে বাড়িয়ে বহুবচনে আর বহুবচনকে কমিয়ে একবচনে এনে সমষ্টি আর ব্যষ্টিকে মিলিয়ে দেওয়া যায়। অভিপ্রায় অনুযায়ী হবে বাক্যের গড়ন।

এমন মাথার দিব্যি দেওয়া ঠিক নয় যে, জটিল বাক্য এড়াতেই হবে। কেউ যদি সমানে সরল বাক্য আউড়ে যায়, বক্তার একঘেয়েমিতে শ্রোতার হাই না উঠে পারবে না। আসল কথা হল, কোনো বাক্য অযথা টেনে লম্বা না করা। কেননা সেক্ষেত্রে শ্রোতা আগে-পরের যোগসূত্রের খেই হারিয়ে ফেলতে পারে। খেয়াল না রাখলে, বিশেষণ অব্যয় অসমাপিকা-ক্রিয়া জুড়ে জুড়ে, এমনকী সরল বাক্যকেও যে-কেউ অনর্থক প্যাঁচালো করে তুলতে পারে।

'যাকে রাখো সেই রাখে', 'টাকা মাটি, মাটি টাকা', 'যে-দিন যায়, সে-দিন ভালো'— এর প্রত্যেকটা বাক্যই জটিল। কাজেই জটিল বাক্যকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। যেকোনো বাক্যই এমনভাবে বেঁধেছেঁদে বলা উচিত, যাতে শ্রোতার ধরবার সুবিধে হয়।

তৎসম বলতে শুধু সংস্কৃত নয়। আমরা যেসব উত্তমর্ণ ভাষার খাতক, তাদের আদত শব্দাবলিও তৎসম পর্যায়ে পড়ে। সংস্কৃত শব্দের তদ্ভব রূপগুলো বাংলায় আমরা মোটামুটি মেনে নিয়েছি। অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা টানাপোড়েনের ভাব থেকে গেছে। ইংরিজি অনেক শব্দই আমরা বাংলা করে নিয়েছি। বাংলার ছাঁচে ঢেলে নেওয়া হয়েছে ভিনদেশি আরও অনেক শব্দ।

বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পর্যন্ত বাঘা বাঘা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। এ-কাজে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে চলতি ভাষার ব্যবহারে। মুখে বলার মতো

করে লেখা আর বলার মধ্যে কোনোই তফাত থাকবে না। সব অঞ্চলে সব স্তরের মানুষ তো আর একভাবে কথা বলে না। কাজেই মুখের কথায় জনে জনে যে-পার্থক্য, লেখায় তা ঘুচিয়ে সর্বজনের গ্রহণযোগ্য করতে হয়। রেডিয়ো, টিভিতে বলবার ভাষাও হবে এমন যাতে সকলের সায় থাকবে।

এ-যুগের নগরকেন্দ্রিক সমাজজীবন নানাসূত্রে বাংলা ভাষাকে মোটামুটি একছাঁদে বেঁধে রেডিয়ো-টিভিকে সবার কাছে পৌঁছোবার পথ করে দিচ্ছে। সেইসঙ্গে কিছু নতুন সমস্যাও মাথা তুলছে। সঠিক ইংরেজি, আরবি, ফারসির তৎসম শব্দ উচ্চারণ—এসব নিয়ে খুঁতখুঁতুনি আগেও ছিল। স্বাধীনতার পর হরকিসিমের ভাষা-জানা মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বাংলায় দেশ-বিদেশের ভাষার শব্দ আর নামাবলির শুদ্ধ প্রয়োগের দাবি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 'অভ্যাস'কে 'অভ্যেস', 'বেওকুফ'কে 'বেকুব' বলছি, 'বোম্বাই'কে বলছি 'মুম্বই'। কিন্তু ইংরেজের দেখাদেখি আজও 'প্যারিস' বলব, না 'পারী'? 'প্রাগ' না 'প্রাহা'?

না কি আমরাও বাংলায় কারো পরোয়া না করে স্বাধীন মতে চলব?

সাবেকের দিন হলে বলা যেত, মা-মাসিদের মুখের কথা কান পেতে শোনো। এখনকার মা-মাসিরা সব ইস্কুলকলেজে-পড়া। তারা কথা বলে বইপুঁথি খবরের কাগজের ভাষায়। ধরি মাছ না ছুঁই পানি ধরনের এড়ো-এড়ো কথায়-ভরতি সেসব লেখা। তা দিয়ে কিছু ধরাছোঁয়া যায় না। একসময়ে গ্রামেগঞ্জে, কলকারখানা, খনি এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে হাটেবাজারে লোকমুখে এমন ভাষা শুনেছি যা হাত-পা নেড়ে চোখে-কানে কথা বলে।

এখন আমি ঘরবন্দি। একেবারে দুনিয়ার বার। তবু আমার বিশ্বাস সহজ কথায় কাজের মানুষেরই গরজ বেশি।

কাজেই সংসারের শতকর্মে ব্যস্ত সেই মানুষজনের কাছেই কথার খোঁজে যাওয়া দরকার।

বইয়ের শব্দ কাগজ মুড়ি দিয়ে চোখ বুঁজে চুপ করে থাকে। পাঠক ডেকে তুললে তবেই সে মুখ খোলে। লিখিত-পড়িত অনেক শব্দ কালভেদে হারিয়েও যায়।

ভাষা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। মুখে মুখে ক্রমান্বয়ে তার বদল হয়। আমরা কম বয়সে যে-কথা যেভাবে বলতাম, এখনকার

ছেলেমেয়েরা অন্যভাবে অন্য কথা বলে। অনভ্যাসের ফোঁটায় আমাদের কপাল চাপড়াতে হয়।

যারা করেকম্মে খায়, ঘোর সংসারী সেই রকমারি মানুষজনের কাছে গিয়েই তাদের কথার নাগাল পেতে হবে। ঘর ছেড়ে বেরোতে হবে সরেজমিন তদন্তে। খুব একটা হাতি-ঘোড়া ব্যাপার নয়। চলতে চলতে শুধু দু-চোখ আর দু-কান খোলা রাখা। সেইসঙ্গে নিজেকে বোঝানো দরকার যে, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।

ভাববাচ্যে পর-পর ভাবটা প্রকট। রেডিয়ো-টিভিতে বক্তার বলার মধ্যে একটা আত্মীয়সূচক ভাব ফোটাতে পারলে শ্রোতাকে কাছে টানার সুবিধে হয়। নইলে পুরোটাই স্বগতোক্তির মতো শোনাতে পারে। মাঝে মাঝে জিভ কেটে কেউ যখন 'মাপ করবেন' বলেন, অন্তত সেই সময়টাতে তখন ইলেকট্রনিক যন্ত্রটাকেও যেন মানুষ বলে মনে হয়। আকাশবাণীর কণ্ঠস্বর শ্রোতা যেন অপৌরুষেয় দৈববাণী বলে ভুল না করে, তারজন্যে মাঝে মধ্যে প্রথমপুরুষ আর উত্তমপুরুষের ব্যবহার কাজে লাগতে পারে।

সুসংবাদ দিতে গিয়ে একটু খুশির ভাব। দুঃসংবাদ দিতে গিয়ে গলা ভারী হওয়া। এমন তো হওয়াই উচিত।

লেখাপড়া জানা না-জানাটা ভাষাগত সামর্থ্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়। তার প্রমাণ রামকৃষ্ণের কথামৃত।

রাস্তা, যানবাহন, রেডিয়ো-টিভি-সিনেমা, গণতন্ত্র, ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত, ইস্কুল-কলেজ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, খবরের কাগজ—এই সবকিছুর যোগফলে গ্রামের পরিবর্তন আজ চোখে পড়ার মতো।

রেডিয়ো-টিভির নিজস্ব কোনো খোঁজতল্লাশি বিভাগ আছে কি না আমার জানা নেই। থাকলে সেই বিভাগকে দিয়ে নিয়মিতভাবে নমুনা-জরিপ করানো যায়। অবশ্য সেই ফলাফলের ভিত্তিতে ঝাড়াই-বাছাই করা শব্দযুক্ত ভাষাতেই যে এক্ষেত্রে মুশকিল আশান হবে, সে-বিষয়ে আমার ভরসা কম। নাড়ি টিপে শরীরের গতিক বোঝা আর চাল টিপে ভাত হয়েছে কি না বোঝা—দুটো কখনোই এক নয়।

ভূয়োদর্শিতা ছাড়া নাড়িজ্ঞান হয় না।

হিসেবটা এখানে অঙ্কের নয়। আন্দাজ আর হাতযশের।

সর্বগ্রাহ্য ভাষা বলে আমরা যা আন্দাজে নিই, সেটা আমাদের মনগড়া। মন জিনিসটাই তো কল্পনা।

নতুন জুতোয় যেমন ফোসকা পড়ে, তেমনি নতুন শব্দেও ধাতস্থ হতে কিছুটা সময় লাগে। গোড়ায় খটোমটো লাগলেও, পরে সড়োগড়ো হয়ে গেছে এমন শব্দ আমাদের কম নয়। কোনটা পলকা আর কোনটা টেঁকসই, এ কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। 'আরক্ষা' চলেনি। 'দূরভাষ'ও হালে পানি পায়নি। 'মহাকরণ' চলছে এবং চলবে বলেই মনে হয়।

আমার ঠিক জানা নেই। তবে 'এন্‌জিও'র কথা অনেকের মুখেই শুনি। সরকারি নয়, আবার মামুলি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবীও নয়। বিদেশের অর্থে জনহিতকর কাজ করে। আক্ষরিক অনুবাদে শুধু 'অসরকারি সংগঠন' বললে নিহিত অর্থটা চাপা পড়ে যায়। তাই আমার মতে, 'ইঞ্জিনে'র মতো 'এঞ্জিও' অনায়াসে চলতে পারে।

এমন কোনো মাথার দিব্যি থাকা উচিত নয় যে, বিদেশি শব্দ হলেই তাব একটা বাংলা প্রতিশব্দ বানিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে বড়োজোর তাকে একটু ভেঙেচুরে বাংলা ভাষায় কিছুটা মানানসই করে নেওয়া যেতে পারে। এমন পাতানো শব্দ বাংলায় অনেক আছে। 'ডাম্পিং' হল এক দেশের জমে-যাওয়া গুদামের মাল জলের দরে আরেক দেশের বাজারে ফেলা। 'ডাম্পিং'-এর আগে গুদামখালাসি সস্তার মালের কথাটা জুড়ে দিতে পারলে বোধ হয় ভালো হয়। অথবা অন্য কোনোভাবে—লোকশিক্ষামূলক (কথিকা প্রচার করে কিংবা চিঠিপত্রে প্রশ্নোত্তরের প্রসঙ্গে) এইসব শব্দের যথাযথ অর্থ খোলসা করে বলে দিতে পারলে এ নিয়ে খুব একটা ফাঁপরে পড়তে হবে না। পি. আচার্য-র 'বাণিজ্য বিচিন্তায়', 'ডাম্পিং' শব্দের এইভাবে বাংলা করা হয়েছে : 'বিদেশে শস্তায় মাল রপ্তানি করা, ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিদেশে মাল চালান।'

ইন্টারনেটকে বাংলা 'অন্তর্জাল' করলে সাট বা সড় বলে মনে হতে পারে। বামন হয়ে তথ্যপ্রযুক্তির চাঁদে হাত দেওয়া আমার সাজে না।

একালের দরকারি শব্দগুলো রপ্ত করে নিয়ে বাংলায় স্বচ্ছন্দে চালিয়ে দেওয়া যায়। নইলে বাংলা প্রতিশব্দের পেছনে খামোখা সময় নষ্ট করে আমরা ইহকাল পরকাল হারাব। যদি বলি জলের মতো সহজ, কেউ আপত্তি

করবে না। জলবত্তরলং বললেও নয়। শুধু তরল বললে গায়ে লাগবে। কেননা অভিযোগটা হল গুরুত্ব লাঘবের।

যাঁরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম—একটু নরম ঠেকলেই তাঁরা ঠোঁট ওলটান।

একসময়ে সাধুভাষা ছেড়ে চলিত ভাষার ডাল ধরতে গিয়ে গেল-গেল রব উঠেছিল। গুরুচণ্ডাল মিশে ভাষার জাত চলে যাবে। কোন কথায় ভার আছে আর কোন কথা খেলো—এটা মনে হওয়া না-হওয়াটা স্থানকালপাত্রনির্ভর। বাতিকগ্রস্ত কেউ কেউ সামান্য বেয়াড়া শব্দেও কানে আঙুল দেন।

শব্দ নির্বাচনে সাবধান হওয়া ভালো। সেইসঙ্গে দরকার জায়গামতো ঠোঁটকাটা হওয়ার।

রবীন্দ্রনাথ রাজশেখর সুনীতিকুমারের পর আজ বাংলা ভাষাকে একা দেখভাল করবার কেউ নেই। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি যৌথভাবে এই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে।

সাহিত্য পরিষদের অদ্যভক্ষ্যোধনুর্গুণঃ অবস্থা। এ রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যায় বাড়লেও তারা বাংলা ভাষা মাথায় নিতে রাজি নয়। কিন্তু হারাধনের দশটি ছেলের রইল বাকি এক। সবেধন সেই আকাদেমি।

আকাদেমি ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের ভাষা নিয়ে বৈঠক ডাকতেই পারে। কবে তারা দৃষ্টি দেবে, সে-আশায় বসে না থেকে উচিত এ-বিষয়ে তাদের নজর কাড়া। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমকেই গায়ে পড়ে এ-ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে। নিজেদের শ্রোতা-দর্শকদেরও ডেকে এনে আসরে মুখ খোলাতে হবে।

ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের যে-সেবাব্রতীরা একাজে এগিয়ে এসেছেন, আমরা অবশ্যই তাঁদের সহযাত্রী হব।

নামের আগে শ্রী শ্রীমতী মিস্টার জনাব তুলে দেবার আগে কিছু সওয়াল জবাবের প্রয়োজন আছে।

বাংলায় একসময়ে মৃতদের নামের আগে শ্রী ব্যবহার রীতিবিরুদ্ধ ছিল। এখন কেউ আর তা মেনে চলে না।

নামের এই পূর্বপদ থেকে স্ত্রী-পুরুষ আর জাতিধর্মের হদিশ মেলে।

নিজেদের নামের আগে শ্রী বর্জন এখন প্রায় চলতি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত নাম দেখেই লিঙ্গভেদ করা যায়।

ইংরেজিতে একটা বাড়তি সুযোগ থাকে তৃতীয় পুরুষে সর্বনামের ব্যবহারে। বাংলায় সে-সুবিধে নেই। 'সে' বা 'তিনি' উভলিঙ্গ।

বাংলায় 'মিস্টার' খট্ করে কানে লাগে। নিজের নামের আগে 'জনাব' দেওয়াটা অনেকেরই পছন্দ নয়। পূর্বপদ রাখার পক্ষে শেষ যুক্তি হতে পারে সৌজন্য। কিন্তু সে-যুক্তিও ধোপে টেকে না। শুধু রামমোহন রায় বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললে কি শ্রদ্ধায় কোনো হেরফের হয়? কাজেই আমি নামের আগে শ্রী শ্রীমতী মিস্টার জনাব গোছের কোনো পূর্বপদ না রাখারই পক্ষে। এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে বাংলা ভাষার রীতিরেওয়াজ নিয়ে দু-চারটে কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না।

বাংলায় তুই-তুমি-আপনি এ-ও-সে ইনি-উনি-তিনি দিয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য করি। আজকাল আমরা শ্রমিক কৃষক কিংবা নিম্নবর্গের মানুষকে ইজ্জত দিয়ে কথা বলি। সামাজিক অপরাধীদের ক্ষেত্রে অবশ্য এখনও 'সে' বা 'তিনি' দিয়ে ইতর-ভদ্র ভেদ করা হয়ে থাকে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে হয়তো এ-থেকে রেহাই নেই। দত্তসাহেব ওপরওয়ালা, দত্তবাবু করণিক, জামালসাহেব মান্যগণ্য লোক। এ ছাড়াও নামের সঙ্গে বাবু বা সাহেব জুড়ে হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য ঘটানো হয়। এখনও আমরা একটা টলমলে অবস্থার মধ্যে রয়েছি। ফলে, ভাষার আদবকায়দাগুলো পায়ের নীচে শক্ত জমি খুঁজে পাচ্ছে না। আমার তো মনে হয়, খণ্ডনাম ব্যবহার শুধু প্রয়াত ব্যক্তি নয়, সবার ক্ষেত্রেই সমর্থনীয়। বিশেষ করে যেসব ব্যক্তিনাম বহুল পরিচিত।

রেডিয়োতে কোনো হেডিঙের ঝামেলা নেই। নইলে শুধু অনায়াসে জি-হীন অটল, বসু কিংবা বাবুহীন জ্যোতি লিখলেও বেআদবি হত না। মধ্যপদযুক্ত (সত্যেন্দ্রনাথ) অথবা কিছুটা গালভরা নামের (বুদ্ধদেব) ক্ষেত্রে তো কখনোই কোনো আপত্তির কারণ ঘটেনি।

কান টানলে মাথা আসে বলে রেডিয়োকে বোকা বাক্সের দুর্নাম সইতে হয় না। কিন্তু উঠতে-বসতে শুনতে হয় যত নষ্টের গোড়া টিভি। মাথা খাওয়ার যম। একটিকে সপ্রমাণ আর অন্যটিকে অপ্রমাণ করতে দুই মাধ্যমেরই অগ্রণীদের হাত মেলাতে দেখে ভরসা হচ্ছে যে, এবার হয়তো চোখ কান আর মাথার একটা মেলবন্ধন হবে। ভালো করার এই চেষ্টায় যাতে ছেদ না পড়ে, তারজন্যে একটা কাগজ হলে সবচেয়ে ভালো হয়। যারা টিভি দেখে, রেডিয়ো শোনে—তারাই হবে এর খদ্দের। এখন কাগজ গ্রাহক

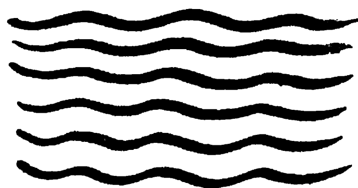
আর বিজ্ঞাপনের ওপর ভর করে চালানো সম্ভবপর বলেই মনে হয়। তাহলে আর সরকারের খপ্পরে পড়তে হয় না। এই কাগজই হবে জনসংযোগের সেতু। এর পাতায় জ্ঞানীগুণীদের বুদ্ধিপরামর্শের খোলা আসরও বসানো যাবে।

এর পাশাপাশি রেডিয়ো-টিভির প্রতিষ্ঠান থেকে ভিডিয়ো আর অডিয়ো ক্যাসেট বার করায় কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কি?

গান ছাড়াও ছড়া, রূপকথা, নাটক, কবিতাপাঠ, স্মরণীয়দের কণ্ঠস্বর—এইরকম অনেক কিছুই সংরক্ষণ আর প্রচারিত হতে পারে।

আমার কল্পনার পক্ষীরাজ ছাড়া পেলেই উড়তে চায়। অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়ার জন্যে ডাকাবুকোদের তোল্লা দিয়ে বলি—এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

প্রয়াত লেখক কবি প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক



সংবাদ প্রসঙ্গে

রমা মুখোপাধ্যায়

বছর পঁয়ত্রিশ আগে যখন আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্রের বহির্বিভাগে বাংলা অনুষ্ঠানে অনুবাদক-ঘোষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম, সে-সময়ে বিভাগের উপ-অধিকর্তা ডি. পি. বাসুর প্রথম দিনের বক্তব্য মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন: আমি বাঙালি হলেও ভালো বাংলা জানি না। তবে একটা কথা বলে দিচ্ছি, তা হল সম্প্রচারের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষা কিন্তু এক নয়। রেডিয়ো-শ্রোতাদের মধ্যে শিক্ষিত ছাড়াও স্বল্পশিক্ষিত এবং নিরক্ষর মানুষের একটা বিরাট অংশ রয়েছেন, যাঁরা খবরের কাগজ পড়তে পারেন না। তাঁদের যাতে বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয় সেইজন্যই সম্প্রচার বা ব্রডকাস্টিংয়ের ভাষা হবে সহজ, বহু মানুষের ব্যবহৃত কথ্য শব্দ নিয়ে। অথচ তা অমার্জিত হবে না।

শ্রীবাসুর এই উপদেশ আমার গোটা কর্মজীবনে আমি অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করেছি। কারণ বেতারে সম্প্রচারের কাজে

এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা আর কিছু নেই। পরবর্তীকালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন বা IIMC-তে প্রশিক্ষণের সময়ে একথাটা বারে বারে সামনে এসেছে। আকাশবাণীর সংবাদ-সেবা বিভাগে News Services Division কাজ করতে গিয়ে এ-বিষয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতাও যেমন হয়েছে, তেমনি মিলিতভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালিয়েছি আমরা।

আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত আঞ্চলিক ভাষার সংবাদ মূলত অনুবাদভিত্তিক। জেনারেল নিউজ রুম বা GNR-এ মূল বুলেটিন তৈরি হয় ইংরেজি ভাষায়। তারপর তা পাঠানো হয় বিভিন্ন ভাষার ইউনিটে। সেখানে অনুবাদ এবং প্রয়োজনমতো অল্পস্বল্প এডিটিং করার পর একজন পাঠক কিংবা পাঠিকা নির্ধারিত সময়ে তা প্রচার করেন।

অনুবাদের কাজটা করা হয় কয়েকজনে মিলে। প্রত্যেকেরই অনুবাদের ধরণ বা স্টাইল আলাদা। শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারেও প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ থাকতে পারে। যদিও কিছু কিছু শব্দ চয়ন করা হয়ে থাকে নির্দিষ্ট কিছু ইংরেজি শব্দের প্রতিরূপ হিসেবে। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন কলম থেকে অনূদিত হয়ে যে বুলেটিন তৈরি হল তার একটা বড়ো দিক হল সংবাদ রচনায় সামঞ্জস্য থাকা। আর একটু খুলে বলা যাক। কারও রচনায় হয়তো গুরুগম্ভীর শব্দ বেশি। আবার কোথাও হয়তো চটুল প্রকাশভঙ্গি স্থান পেয়েছে। দুয়ের মধ্যে একটা সমঝোতা করতে পারলে তবেই সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। এক্ষেত্রে এক-শো শতাংশ সাফল্য না পাওয়া গেলেও অনেকটাই হয়তো করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে কলকাতা কেন্দ্র বোধহয়, কিছু সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। সংবাদ এখানে পুরোটাই অনুবাদ-নির্ভর নয়। খবরের মাল-মশলা সংগ্রহ ও তা দিয়ে সংবাদ রচনাব অনেকটা কাজ বাংলা ভাষাতেই হয়। তাই এতে স্বতঃস্ফূর্ততার আশা করা যায় বেশ কিছুটা। তবে সংবাদের কাঠামোগত কিছু নিয়ম প্রত্যেককেই মেনে চলতে হয়।

বুলেটিনের ক্ষেত্রে অনুবাদ কথাটার পরিবর্তে বোধ হয় ভাষান্তর শব্দটি ব্যবহার করা ভালো। কারণ ইংরেজি থেকে অন্য কোনো ভাষায় তর্জমা করার সময় আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়োজন হয় না। তথ্যগত ভুল অথবা বিকৃতি না ঘটিয়ে বিষয়বস্তুর সুষম উপস্থাপনাই ভাষান্তরের মূল লক্ষ্য। এর জন্য অনুবাদককে প্রথম মূল খবরের অর্থ বুঝতে হবে এবং তারপরে নিজের

ভাষায় উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ভুল অবিকৃত তথ্য পরিবেশন করতে হবে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুবাদকের কিছুটা জ্ঞান থাকা কাম্য। এর সুফল অথবা কুফল অনেক সময় বুলেটিন প্রচারকালে মনোযোগী ও খুঁতখুঁতে শ্রোতার কানে ধরা পড়ে।

বেতার কিংবা দূরদর্শনে সংবাদই হোক আর অনুষ্ঠান পরিচালনাই হোক বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যমরূপে ভাষাকে হতে হবে স্বচ্ছ, সহজ ও অর্থবহ। দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার না করাই ভালো। কারণ এটা হল কানের ভিতর দিয়া মরমে পশানোর ব্যাপার। অর্থাৎ একজন বলে যাচ্ছেন অন্য জন শুনছেন। এই বলার মধ্যে যদি স্পষ্টতা না থাকে, যদি একটি বাক্যকে অনাবশ্যক টেনে লম্বা করা হয়, তবে শ্রোতার কাছে সেই নির্দিষ্ট খবরের খেই হারিয়ে যায়। তা ছাড়া রেডিয়ো টিভিতে মানুষ খবর শোনেন। কোথাও দুর্বোধ্য মনে হলে ভালো করে বোঝার জন্য সংবাদপত্র পড়ার মতো তাতে আবার ফিরে আসা যায় না। সেই কারণে এমন সব বাক্য ও শব্দ আমাদের ব্যবহার করা দরকার যা আমরা কথাবার্তা বলার সময় ব্যবহার করে থাকি। এ ধরনের লেখা শুনতে সহজ এবং বোধগম্য। আর তাতে শ্রোতার আগ্রহও বজায় থাকে। হালকা ওজনের শব্দ প্রয়োগের প্রসঙ্গে একটু পেছন ফিরে দেখা যাক।

আকাশবাণীর কিংবদন্তি সংবাদ পাঠিকা নীলিমাদির (নীলিমা সান্যাল) সঙ্গে ডিউটি করছি। খবরটা ছিল আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত। কেউ অনুবাদ করেছেন, 'আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা' ইত্যাদি ইত্যাদি। 'ইতস্তত বিক্ষিপ্ত' শব্দগুলি নিয়ে নীলিমাদি খুব-একটা স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন না। অথচ আবহাওয়া সম্পর্কিত খবরে এটাই ছিল তখনকার বাঁধা গত। আমায় বার বার অনুরোধ করলেন, দেখুন তো কিছু করা যায় কি না। ইংরেজি স্ক্রিপ্ট পড়ে দেখলাম। একটু ভেবেচিন্তে লিখে দিলাম, 'আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত কোথাও কোথাও ছাড়া-ছাড়াভাবে বৃষ্টি হতে পারে।' লিখলাম বটে কিন্তু মন থেকে দ্বিধা গেল না। চিরাচরিত নিয়মের বেড়া ভেঙে দেওয়াটা কি ঠিক হল? কিন্তু নীলিমাদি বললেন, এটাই আমি পড়ব। কারণ এটার মানে আমার কাছে জলের মতো সহজ। নিজে যদি বুঝতে না পারি তবে তা শ্রোতাদের বোঝাব কী করে?

নীলিমাদি খবর পড়লেন। আবহাওয়ার ওই খবরটুকুর পেছনে আমার অবদান অতি নগণ্য। কিন্তু যে স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতার সঙ্গে ওই ছোট্ট খবরটা সেদিন পরিবেশিত হল তা আমার মনে থাকবে চিরদিন।

এরকম ছোটোখাটো পরীক্ষা আমরা অনেক করেছি এবং সফলও হয়েছি। দেখা গেল শ্রোতারা তা গ্রহণ করেছেন।

বাংলা ভাষার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটছে। প্রচুর বিদেশি শব্দ আমাদের ভাষায় এসেছে। শুধু এসেছেই নয়, সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অপরিহার্যও হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে আরবি, ফারসি, উর্দু, পোর্তুগিজ, ইংরেজি এবং আরও বিভিন্ন ভাষার শব্দসমূহ এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে যে, অনেকসময় সেগুলিকে বহিরাগত বলে মনে হয় না। দৈনন্দিনের কথ্য ভাষা ক্রমাগত ব্যবহারের দরুন সেগুলি সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। বলা হল, The Prime Minister leaves today for USA on a two-day official visit, এর তর্জমা দাঁড়ায় : প্রধানমন্ত্রী দু-দিনের সরকারি সফরে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন। আবার অন্যভাবেও বলা যায় : সরকারি পর্যায়ে দু-দিনের মার্কিন সফরে প্রধানমন্ত্রী আজ রওনা হচ্ছেন। এখানে উর্দু শব্দ 'সফরের' পরিবর্তে পর্যটন, ভ্রমণ বা এরকম কোনো কথা কোনোমতেই চলবে না। অর্থাৎ এখানে অভিধানের ভরসায় থাকার উপায় নেই। সেই কারণেই এমন সব বাক্য ও শব্দ আমাদের ব্যবহার করা দরকার যা আমরা কথাবার্তা বলার সময় ব্যবহার করে থাকি। আগেই বলেছি এ ধরনের লেখা শুনতে সহজ এবং বোধগম্য হওয়ায় শ্রোতার আগ্রহ বজায় থাকে।

ছোটো ছোটো বাক্যে বক্তব্য বলা হলে তা সহজে বোঝা যায় এবং পরের বাক্যটির সঙ্গে অনায়াসেই সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে। তাছাড়া রেডিয়ো কিংবা টিভিতে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। সুতরাং একটা বাক্যে কোনো শব্দ অপ্রয়োজনীয় মনে হলে, তা বাদ দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য লক্ষ রাখতে হবে যে তার জন্য যেন অর্থের বিকৃতি বা বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা কালে ঘোষণা কিংবা সংবাদ পাঠের সময় পাশাপাশি একই ধ্বনির শব্দ বার বার ব্যবহার না হলেই ভালো। কারণ মনে রাখতে হবে যে, এগুলি হল শোনার বিষয়। একটা বাক্যে একটাই শব্দ দু-তিন বার উচ্চারণ করা হলে তা শ্রুতির পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক:

'হুগলি জেলার সিঙ্গুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার একটি বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে ডাকাত দলের দু-জন গ্রামের লোকেদের হাতে ধরা পড়েছে।' দেখা যাচ্ছে পরপর কয়েকটি 'র' এর ব্যবহার। এখানে অনায়াসে জেলার পরিবর্তে 'জেলায়', ডাকাত দলে দু-জন এর জায়গায় 'দুই ডাকাত' করা

যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভাবতে হবে কিছু অপ্রয়োজনীয় শব্দ বাদ দেওয়া যায় কি না। তার জন্য হয়তো বাক্যটিকে একটু ভেঙেচুরে নিতে হবে। 'দক্ষিণ পাড়ার' শব্দ দুটি ছেঁটে ফেলা যেতে পারে। কারণ রেডিয়োতে হুগলি জেলার সিঙ্গুর গ্রামই যথেষ্ট। তার চেয়ে বেশি ভৌগোলিক পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। আর টেলিভিশন প্রচারে যদি সঙ্গে ছবি থাকে তবে তো একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। অতএব বাক্যটি ঢেলে সাজানো যেতে পারে এভাবে : 'হুগলি জেলায় সিঙ্গুর গ্রামের এক বাড়িতে ডাকাতি করার সময় গ্রামবাসীদের হাতে দুই ডাকাত ধরা পড়েছে।' দেখা যাচ্ছে 'র'-এর আধিক্য কমানো যায়। এর ফলে সামান্যতম হলেও সময়ের সাশ্রয় হচ্ছে।

আবার দু-একটি উপযুক্ত শব্দ যোগ করে সংবাদকে আকর্ষণীয় করার নজিরও আছে। সংবাদ-সেবা বিভাগে কাজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পরেই পনেরোই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস। চোদ্দো তারিখ থেকেই বারে বারে ঘোষণা হতে লাগল : 'আগামীকাল লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেবেন।' ইংরেজি বাক্যটি ছিল। The Prime Minister will address the nation tomorrow on the Independence Day from the rampart of the Red Fort.। আমার সঙ্গে ডিউটিতে ছিলেন খ্যাতির শিখরে আসীন ইভা নাগ। শুধু সংবাদ পড়াই নয়, ভাষান্তরের কাজেও তাঁর তুলনা ছিল না। ওই বাক্যটির তিনি অনুবাদ করলেন, আগামীকাল স্বাধীনতা দিবসে ঐতিহাসিক লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

এখানে লক্ষণীয় 'ঐতিহাসিক' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং nation বলতে জাতি কথাটার ব্যবহার করা হয়েছে। সুদীর্ঘ রাজনীতির ইতিহাসে অজস্র ঘটনাবলির সাক্ষী হয়ে আছে লালকেল্লা। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মধ্যরাত্রিতে লালকেল্লার প্রাকারেই উঠেছিল স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা। সুতরাং এখানে 'ঐতিহাসিক' শব্দটি বসানোর ফলে লালকেল্লার মর্যাদা এবং আমাদের বিশেষ অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত, জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার ব্যাপারে আমি মৃদুস্বরে ইভাদিকে কিছু বলতে চাইলাম। ওঁর একটা মহৎ গুণ ছিল যে, অন্যলোকের বক্তব্য তিনি শুনতেন এবং কিছু পরামর্শ দিলে একেবারে তা উড়িয়ে দিতেন না। আমায় জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বলার আছে আপনার? আমি ধীরে ধীরে কুণ্ঠার সঙ্গে বললাম, জাতির বদলে যদি 'দেশবাসী' বসানো যায় তাহলে কেমন হয়? আমার যুক্তি হল, জাতি শব্দটার মধ্যে ব্যাপকতা আছে ঠিকই,

কিন্তু তাতে একটু abstractness বা বিমূর্ত ভাব লক্ষ করা যায়। আর দেশবাসী বলতে পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ বিন্ধ্য হিমাচল প্রমুখ সারাদেশের মানুষের মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমার ধারণা দেশবাসী শব্দটার মধ্যে সারা দেশের মানুষই নিজেকে সামিল ভাবতে পারবেন।

অবশ্য তারপরেই বললাম, আপনার কাছে যেটা ঠিক মনে হবে, সেটাই পড়ুন। ইভাদি আমার যুক্তি মেনে নিয়ে 'দেশবাসী'ই পড়লেন। ওঁর পড়ার ভঙ্গিতে মনে হল অগণিত দেশবাসী, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মনে ওই পূর্ব ঘোষণা পরদিন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করে তুলবে। আর সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য সার্থক হবে তখনই।

স্বাধীনতা দিবস এবং সাধারণতন্ত্র দিবসের পরে কয়েকদিন ধরে সংবাদপত্রে ও ইলেকট্রনিক প্রচারমাধ্যমে জাতীয় পতাকার উল্লেখ থাকে বহুবার। বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী এবং বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলিতে এই উপলক্ষ্যে পতাকা উত্তোলনের খবর থাকে। যেমন অমুক রাজ্যের রাজ্যপাল জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন। পর পর এ ধরনের খবর থাকলে, জাতীয় পতাকা শব্দটি বারে বারে ব্যবহার না করে ত্রিবর্ণ, ত্রিবর্ণরঞ্জিত বা রাষ্ট্রীয় পতাকা প্রয়োগ করলে হয়তো খুব-একটা খারাপ লাগবে না।

মাঝে মধ্যে সম্প্রচারের সময় শোনা যায় 'গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এগিয়ে আসার জন্য শিল্পপতিদের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং এ-বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।' বাক্যটি যথেষ্ট দীর্ঘ। তার ওপর ঝড়ের গতিতে পড়ার সময় অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্টতা বা যাকে আমরা বলি clarity থাকে না। সুতরাং শ্রোতার পক্ষে যেমন বক্তব্য বুঝে ওঠা মুশকিল হয়, তেমনি বারে বারে 'জন্য' এবং 'জানানো হয়েছে' শব্দগুলি বিরক্তি উৎপাদন করে। এতে ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট হয়। বক্তব্যটি পেশ করতে গিয়ে যদি বলা যায় 'গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এগিয়ে আসতে শিল্পপতিদের অনুরোধ করা হয়েছে এবং সরকারের কাছে এ-বিষয়ে সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়েছে।' তাহলে হয়তো অসংগতি কিছুটা লাঘব করা যায়। অথবা বাক্যটি আরো ছোটো করতে হলে বলা যায়: গ্রামের সার্বিক উন্নতিতে শিল্পপতিদের এগিয়ে আসার অনুরোধ, একই সঙ্গে

সরকারের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। অনুপ্রাসের ব্যবহার সাহিত্য রচনাকে যে মাত্রাই দিক না কেন, সম্প্রচারের ভাষায় তা কখনোই সব সময়ে হয় না।

খেলাধূলার বিষয়ে সম্প্রচারের আগে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নিতে হয়। সব খেলার সম্পর্কে সকলের বিশেষ জ্ঞান থাকে না, এবং থাকাও হয়তো সম্ভব নয়। তবু সাধারণভাবে কিছুটা জানা থাকলে খেলার খবর তৈরিতে তা সহায়ক হয়। বিভিন্ন খেলার ধারাবিবরণী কিংবা সংবাদ প্রচারের সময় তাদের নির্দিষ্ট শব্দাবলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। এ-প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সবাই জানেন ক্রিকেট এখন ভারতবাসীর অত্যন্ত প্রিয় খেলা। পাঁচ থেকে পঞ্চাশ বা আট থেকে আশি পর্যন্ত বয়সের মানুষেরা এ-খেলায় মশগুল। সুতরাং এই খেলার প্রতিটি পদক্ষেপ তারা উপভোগ করেন রেডিয়োতে শুনে অথবা টেলিভিশনে দেখে। কোনো একজন বিখ্যাত সংবাদ পাঠকের সামনে ইংরেজির একটি লাইন ক্রিকেটকে সমস্যারূপে খাড়া করে দিয়েছে। 'The opening batsman returned to the pavellion on duck.' ওপেনিং ব্যাটসম্যান প্যাভেলিয়নে ফিরে গেছেন এটুকু তো বোঝা গেল। কিন্তু 'ডাক' শব্দটি যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে ; 'হংসের ভূমিকা এখানে কী?'

এক্ষেত্রে আভিধানিক অর্থের প্রয়োগ চলবে না কোনোমতে। এর আলংকারিক অর্থ হল গোল্লা। অর্থাৎ ব্যাটসম্যান শূন্য রানে আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে গেছেন। এই নির্দিষ্ট শব্দটি সেই অনুবাদক তথা সংবাদপাঠকের জানা ছিল না। এ-রকম হতে পারে। সবার পক্ষে সব জানা সম্ভব নয়। তবে সম্প্রচারের জন্য তথ্যভিত্তিক বক্তব্য রচনা করতে হলে তা জানা দরকার। কারণ শ্রোতার ধারণায় সংবাদপাঠক একজন তথ্যাভিজ্ঞ বেশি খবর-রাখা মানুষ। সর্বদা প্রচলিত প্রয়োগাত্মক শব্দসমূহ ও তাদের অর্থ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলে ভালো।

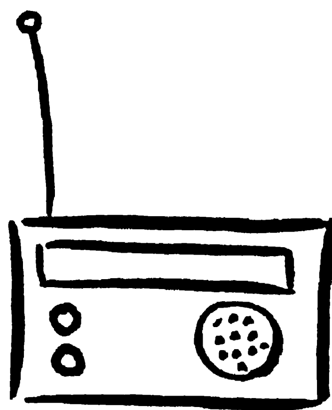
সম্প্রচারের ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা হল বিদেশি শব্দ কিংবা নামের ব্যবহার। ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য বিদেশি ভাষার সঙ্গে সাধারণভাবে আমাদের পরিচয়ের সুযোগ খুব বেশি নেই। সেই কারণেই ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিকে আমরা বানান অনুযায়ী 'জিন চিরাক' বলব না 'জাঁ শিরাক' বলব কিংবা চীনের রাজধানীকে 'বেজিং' নামে অভিহিত করব না 'পেইচিং' নামে ডাকব সে নিয়ে আমরা অসুবিধার মুখে পড়ে যাই। সৌভাগ্যক্রমে আমার স্বামী চীনা ভাষার বিশারদ বলে চীনা শব্দের সঠিক উচ্চারণের জন্য

আমাকে বা আমার সতীর্থদের তেমন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি। কিন্তু এমন সুযোগ তো সবসময় পাওয়া যায় না। একসময়ে আকাশবাণী সংবাদসেবা বিভাগে একটি 'উচ্চারণ সেল' ছিল। ইংরেজিতে লেখা শব্দটির পাশে যথাযথ উচ্চারণ হিন্দিতে লিখে দেওয়া হত। যিনি এই সেলের দায়িত্বে থাকতেন তার কাজ ছিল বিভিন্ন দূতাবাস, ভাষাবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের কাছে সঠিক উচ্চারণ জানবার চেষ্টা করা। এর ফলে যথেষ্ট উপকার হত। তা ছাড়া ভারতের আঞ্চলিক ভাষার শব্দের উচ্চারণ বিভিন্ন ইউনিট থেকে সঠিকভাবে জেনে নেওয়া এমন কোনো মুশকিলের ব্যাপার নয়।

আর একটা বিষয়ের উল্লেখ না করে পারছি না। তা হল কথায় কথায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার। অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করে পারা যায় না। কিন্তু যেগুলির সুষ্ঠু প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায় সহজলভ্য সেগুলির জন্য ইংরেজি কথা প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন হয় না। সাম্প্রতিককালে টেলিভিশনের কোনো-একটা চ্যানেলে একদিন ঘোষিকা বললেন, পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে এক কুখ্যাত জঙ্গি মারা গেছে। ইংরেজি এনকাউন্টার শব্দের জায়গায় বাংলার সংঘর্ষ কথাটা যথেষ্ট প্রচলিত এবং সুবোধ্য। কিংবা বলা হল, 'রাহুল মহাজনের নারকো-অ্যানালিসিস টেস্ট করার আবেদন জানানো হয়। সাধারণ শ্রোতার পক্ষে 'নারকো-অ্যানালিসিস টেস্ট' বুঝতে পারা সহজ নয় এবং তা আশাও করা যায় না। তার পরিবর্তে মাদকের অস্তিত্ব বিশ্লেষণ পরীক্ষা শব্দগুলি ওজনেও ভারী নয় এবং সরল অর্থবহ। এ-রকম ছোটোখাটো দৃষ্টান্ত আছে অনেক।

আসল কথা হল সম্প্রচারের ভাষা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। আর সেইসঙ্গে প্রয়োজন শব্দ চয়নের কাজে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে মিলিয়ে নেওয়া। সর্বোপরি বলা যায়—সহজ, স্পষ্ট, ঋজু ও সাবলীল ভাষা বেতার প্রচারে বক্তব্যের সুষ্ঠু মূর্তি তৈরি করতে পারে। কিন্তু তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সংবাদ পাঠক কিংবা ঘোষকের সরস এবং অনবদ্য বাচনভঙ্গি। সেখানেই ভাষার সার্থকতা।

লেখক আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্রের প্রাক্তন বাংলা সংবাদ-পাঠিকা



সম্প্রচারের ভাষাদর্শ

সুভাষ ভট্টাচার্য

এক

ভাষার একটা বড়ো কাজ নিশ্চয় জ্ঞাপন বা কমিউনিকেশন। কিন্তু ভাষা মোটামুটি শিখে নিলেই জ্ঞাপনের কাজটাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে এমন মনে করা যাবে না। সমাজভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন যে ভাষার নিয়ম বা সূত্রাবলি বা ব্যাকরণ আয়ত্ত করাই যথেষ্ট নয়, ভাষার যথাযথ ব্যবহারও শেখা দরকার। তবেই সুষ্ঠু জ্ঞাপন সম্ভব। আর এই ব্যবহার শেখার জন্য নিজের সমাজকে জানা, সমাজে নিজের অবস্থান জানা এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিবেশকে জানা একান্তই প্রয়োজন। অর্থাৎ ভাষার ব্যাকরণ জানাই যথেষ্ট নয়, জানতে হবে ভাষার "সাংস্কৃতিক ব্যাকরণ"[১] অনেক ক্ষেত্রেই ভাষার ব্যাকরণ ও ভাষার এই সাংস্কৃতিক ব্যাকরণ দু-টিকেই সমান গুরুত্ব না দেবার ফলে জ্ঞাপনের কাজটিতে অনেক ত্রুটি থেকে যায়, ভাষার প্রয়োগ যথাযথ সুষ্ঠু ও সুচারু হতে পারে না। এই কথাগুলো সাধারণ ভাষাব্যবহার

সম্বন্ধে যতখানি প্রযোজ্য ঠিক ততখানি কিংবা তার চাইতে বেশি প্রযোজ্য ইলেকট্রনিক সম্প্রচার সম্পর্কে। কেননা বেতার ও দূরদর্শন লক্ষ লক্ষ শ্রোতা-দর্শককে অনুপ্রাণিত করে, প্রভাবিত করে। অন্য যেকোনো গণমাধ্যমের চাইতে বেতার ও টেলিভিশনের প্রভাব বেশি দূরপ্রসারী ও গভীর। কাজেই বেতার ও দূরদর্শনে সম্প্রচারের ভাষার আদর্শ রূপ কী হবে বা কেমন হবে তা অবশ্যই বিশেষ আলোচনার বিষয়। কিন্তু তার আদর্শ রূপ সম্পর্কে কিংবা তার বর্তমান আদল সম্পর্কে কোনো আলোচনা করার আগে আমাদের ভাষার ব্যাবহারিক বা প্রায়োগিক রূপ সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার।

দুই

সচল বা জীবিত ভাষার অনেকগুলো স্তর থাকে, বাংলা ভাষাতেও আছে তা। মুখের ভাষার আছে একাধিক প্রকার—উপভাষা আছে, শিষ্ট বা মান্য ভাষা আছে। এ ছাড়া আছে লেখ্য ভাষা। লেখ্য বাংলারও আছে দুটো রূপ—সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা। ভাষার বিশিষ্ট আঞ্চলিক রূপই উপভাষা। উপভাষাগুলোর মধ্য থেকে কিংবা বিশেষ দু-একটি উপভাষার মধ্য থেকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায় শিষ্ট বা মান্য ভাষা। মান্য ভাষাকেও কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক একটি উপভাষা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মান্য ভাষার সঙ্গে লেখ্য চলিত বাংলার তফাত থাকলেও সে-তফাত খুব বেশি নয়, কেননা মান্য ভাষাই চলিত ভাষার ভিত্তি। তবে একথাও ঠিক যে লেখ্য চলিত ভাষাও ভারী ও গম্ভীর তৎসম শব্দবহুল হতে পারে, চলিত ভাষাও হতে পারে সমাসাকীর্ণ ও বড়ো বড়ো বাক্য দিয়ে গড়া। মান্য মৌখিক ভাষা সচরাচর তেমন হয় না, হওয়া স্বাভাবিক নয়।

মান্য মৌখিক ভাষার মধ্যেও আছে একাধিক স্তর। আমরা অনানুষ্ঠানিক বা অনাচারিক বা ইনফর্মাল কথাবার্তা যখন চালাই, যখন বাড়িতে বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় স্বতঃস্ফূর্ত কথোপকথন চালাই তখন যে-ভাষা ব্যবহার করি, তার রূপ আনুষ্ঠানিক বা আচারিক বা ফর্মাল রীতির ভাষার চাইতে কিছু আলাদা হয়েই থাকে। তাহলে আচারিক বা ফর্মাল মান্য ভাষা কোনটা, আর কী তার প্রয়োগক্ষেত্র? আচারিক বা আনুষ্ঠানিক ভাষা মান্য

ভাষারই এক রূপভেদ। সভার ভাষণে, আবৃত্তিতে, বেতার ও দূরদর্শনের সংবাদ পাঠে ও ঘোষণায় যে-পরিশীলিত ভাষা ব্যবহৃত হয় তাকেই বলা যায় আনুষ্ঠানিক বা ফর্মাল ভাষা। ফর্মাল বা আনুষ্ঠানিক ভাষার শব্দের ব্যবহারে পরিশীলন যথেষ্টই লক্ষ করা যায়। কথ্য ভঙ্গির শব্দ বা শব্দের কথ্য রূপ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। এই পরিশীলন কথাটার একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এমন নয় যে আনুষ্ঠানিক ভাষায় যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয় তা আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় না। নিশ্চয় হয় তা। কিন্তু ফর্মাল শব্দ প্রয়োগের পৌনঃপুনিকতা এবং উচ্চারণের রীতি দুই দিক থেকেই কিছুটা আলাদা হয়ে যায় মান্য কথ্য ভাষা ও ফরমাল বা আনুষ্ঠানিক ভাষা। আবার একথাও সত্যি যে, বড়ো পার্থক্য উচ্চারণে। কথাটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকতে পারে, কিন্তু এ-কথা প্রমাণিত যে, ঘোষকের বা সংবাদপাঠকের-বা আবৃত্তিকারের উচ্চারণে যে চেষ্টিত পরিশীলন থাকে তা আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনের ভাষায় থাকার কথা নয়। কয়েক বছর আগে একটি রচনায় শিষ্ট কথ্য ভাষার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাষার পার্থক্যের কথা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন শিশিরকুমার দাশ।[২] অন্য একটি রচনায় এই বর্তমান লেখকও কিছু আলোচনা করেছিলেন এই বিষয়ে।[৩]

ফর্মাল বা আনুষ্ঠানিক উচ্চারণে বহু ক্ষেত্রে বানান ও অর্থকে অনুসরণ করে শব্দ উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তার ফলে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়ম ও প্রবণতার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক উচ্চারণের পার্থক্য তৈরি হয়। পদ্ম, বিস্ময়, লেজ, একান্ন, বেচারা, অশ্লীল প্রভৃতি শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণ যথাক্রমে পদ্‌দো, বিশ্‌শয়, ল্যাজ্, অ্যাকান্নো, ব্যাচারা ও অস্‌লিল্। কিন্তু আনুষ্ঠানিক বাংলায় এসব শব্দের যে-পরিশীলিত উচ্চারণ শোনা যায় তা এইরকম—পদ্‌দোঁ, বিশ্‌শঁয়্, লেজ্, একান্নো, বেচারা ও অশ্‌লিল্।

শব্দের মধ্যে ও শব্দান্তের মহাপ্রাণটা শিষ্ট বা মান্য কথ্য ভাষায় ক্ষীণ হয়ে যায়। এটা বিশেষত ঘটে বদ্ধ দল বা অক্ষরে বা closed syllableএ। কিন্তু আনুষ্ঠানিক উচ্চারণে সচেতনভাবে ওই মহাপ্রাণতা সংরক্ষণের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। মান্য কথ্য ভাষায় কাঁধ ধরা হয়ে যায় কাঁদ্ ধরা, বাত ধরেছে হয়ে যায় বাদ্ ধোরেছে। কিন্তু লক্ষ করি যে, আনুষ্ঠানিক বাংলায় ও-দুটি যথাক্রমে কাঁধ্ ধরা ও বাত্ ধোরেছে উচ্চারিত হয়। আনুষ্ঠানিক উচ্চারণে

বানানের প্রভাব বেশি। তবে এও লক্ষ করবার বিষয় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক উচ্চারণ মান্য উচ্চারণের বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আনুষ্ঠানিক উচ্চারণ যে বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক মান্য উচ্চারণ থেকে কিছুটা আলাদা হবে সেটা অস্বাভাবিক নয়। এ তো গেল উচ্চারণের কথা। এ ছাড়া আছে ভাষার অন্যবিধ ব্যবহারের প্রসঙ্গ। শব্দ ব্যবহারেও আনুষ্ঠানিক ভাষায় লেখ্য ভাষার প্রভাব একটু বেশিই দেখা যায়। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে পড়ে, এই যে আনুষ্ঠানিক ভাষার কথা বললাম, বেতার ও দূরদর্শনে সম্প্রচারের ভাষার আদলটাও কি ওইরকমই হবার কথা? বড়ো প্রশ্ন এটাই যে, বেতার ও দূরদর্শনে বাংলা ভাষার প্রয়োগ কি যথাযথ হচ্ছে? এই প্রশ্নটি বিবেচনার প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে এখানে উচ্চারণেরও একটা ভূমিকা যদিও আছে, তবু উচ্চারণের প্রসঙ্গ তুলনামূলকভাবে গৌণ এখানে। সম্প্রচার মাধ্যমে বাংলা ভাষা কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার ত্রুটিবিচ্যুতির সন্ধান এবং ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগের কিছু পথ নির্দেশ করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

তিন

সাহিত্যের গদ্যভাষার সঙ্গে সম্প্রচার মাধ্যমের ভাষার তুলনা বেশিদূর যাবে না। লেখকভেদে সাহিত্যের গদ্যভাষার রীতি ভিন্ন হতে বাধ্য। তবে যতই ভিন্নতা থাকুক, সাহিত্যের ভাষামাত্রেই অনেক বেশি পরিশীলিত একটা রীতি থাকে। অন্য দিকে সম্প্রচারের ভাষায় পরিমার্জনা অবশ্যই থাকবে। কিন্তু যথাযথতা, স্বচ্ছতা ও প্রত্যক্ষভাষণ তাতে অনেক বেশি জরুরি। সাহিত্যের গদ্যরীতিতে বাক্য জটিল হতে পারে, দীর্ঘ হতে পারে, বাক্যবন্ধ হতে পারে কুটিল ও তির্যক। সে-দিক থেকে সম্প্রচারের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার একটা বড়ো পার্থক্য তৈরি হয়েই রয়েছে।

বরং এক-শো বছর আগে শব্দ ব্যবহারের যে-নীতির কথা বলেছিলেন ফাউলার ভাইয়েরা তা আজও মান্যতা হারায়নি। তাঁরা বলেছিলেন, শব্দ নির্বাচনের সময় কষ্টকল্পিত বা স্বল্পব্যবহৃত শব্দের চেয়ে পরিচিত শব্দই ব্যবহার করা উচিত। তাঁদের দ্বিতীয় পরামর্শ, অস্পষ্ট নির্বস্তুক শব্দের চেয়ে সুনির্দিষ্ট শব্দের ব্যবহারই ভালো। তৃতীয় পরামর্শ, বড়ো সমাসবদ্ধ শব্দের বদলে ব্যবহার করা ভালো ছোটো শব্দ। পরবর্তীকালে ইংরেজি ভাষার

প্রয়োগরীতি নিয়ে যাঁরাই লিখেছেন তাঁদের প্রায় সকলেই ফাউলারদের নীতিগুলোকে মান্য করেছেন। সকলেই যে ওই নীতিগুলোকে হুবহু মেনে নেবার পরামর্শ দিয়েছেন তা নয় অবশ্য, তবে মূলত এগুলোর উপরই ভিত্তি করে এগিয়েছে তাঁদের আলোচনা। আইভর ব্রাউনই বলি আর এরিক পারট্রিজই বলি, আরনেস্ট গাওয়ার্সই বলি আর লোগান পিয়ারসাল স্মিথই বলি, এঁদের অনেকেই নতুন সূত্রের কথা বললেও এঁদের রচনায় ফাউলারদের নির্দেশিত সূত্রগুলো কখনোই পুরোপুরি অগ্রাহ্য হয়নি। আমাদের বাংলা ভাষায় ঠিক এই ধরনের আলোচনা তেমন ব্যাপকভাবে না হলেও কিছু পার্শ্বিক আলোচনা পাওয়া যায় রাজশেখর বসু, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, পরিমল গোস্বামী, কালিদাস রায় প্রমুখের রচনায়।[৪] অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য কেবল লিখিত গদ্যই এঁদের আলোচনার উপলক্ষ্য। কিন্তু একথা বলতেই হবে যে, এঁরা মূলত প্রয়োগের দিকেই নজর দিয়েছেন, গদ্যরীতির কথা বলেননি। বাংলায় গদ্যরীতির বিষয়েও কিছু আলোচনা অবশ্য হয়েছে। সুকুমার সেন, নবেন্দু সেন, শিশিরকুমার দাশ, পবিত্র সরকার এবং সীমিত ক্ষেত্রে আশিসকুমার দে বাংলা গদ্যরীতির তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

যে-কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে তা এই যে, বাংলা গদ্যের রীতি বা স্টাইলকে একটা মাত্র ছকে ফেলে বুঝতে গেলে বিপর্যয় অনিবার্য। গদ্যের নানান লক্ষ্য, নানান মাত্রা। একটা বড়ো প্রশ্ন এই যে, গদ্যকে লক্ষ্য হিসেবে দেখব, না কি উপায় বা মাধ্যম (means) হিসেবে দেখব? এটা যেমন দেখব, তেমনি দেখতে হবে গদ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রটাকে। অর্থাৎ ভাষার উদ্দেশ্য যদি বাচনিক বা জ্ঞাপনিক (communicative) হয় তবে তার লক্ষণ বা গুণাগুণ নির্দেশ করা হবে একভাবে, নান্দনিক বা aesthetic গদ্যের অর্থাৎ সাহিত্যিক গদ্যের লক্ষণ বা প্রকৃতি বা গুণাগুণের বিচার হবে অন্যরকম।[৫]

যেহেতু আমরা মূলত সম্প্রচারের ভাষা নিয়ে আলোচনা করছি, তাই বলতে হবে যে এ-ভাষা বাচনিক বা জ্ঞাপনিক ভাষাদর্শ দিয়ে বিচার করতে হবে।

প্রথম কথাটা ওঠে শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে। শব্দের নির্বাচন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিচিত শব্দ নির্বাচন করাই প্রথম কথা। অবশ্য কেবল পরিচিত হলেই চলবে না, শব্দকে হতে হবে যথার্থ ও প্রত্যক্ষ। শব্দের

ও শব্দার্থের প্রত্যক্ষতা সার্থক জ্ঞাপনের কাজটাকে সম্ভব ও সহজ করে। আলংকারিক ভাষার প্রতি একটা দুর্বার ঝোঁক অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। কোথাও কোথাও যে আলংকারিক বা figurative ভাষারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে সে-কথা অস্বীকার না করেই বলতে হয় যে, সাধারণভাবে অর্থাৎ বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য না থাকলে আলংকারিক শব্দের ব্যবহার মোটেই বাঞ্ছিত নয়। আলংকারিক শব্দ সচরাচর অস্পষ্ট হয়ে থাকে, তাতে প্রত্যক্ষ বাচনে বাধা হয়। অথচ আমরা তো জানি সম্প্রচার মাধ্যমে ব্যবহৃত ভাষাকে প্রত্যক্ষ হতেই হয়। সে-ভাষা যত প্রত্যক্ষ ও যথাযথ হবে, ততই অমোঘও হবে। ইংরেজিতে woolliness বলে একটা কথা আছে। অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে অর্থের প্রত্যাশিত প্রত্যক্ষতা নষ্ট করারই নাম woolliness, কাজেই কাঙ্ক্ষিত অর্থ স্পষ্ট না হয়ে অস্বচ্ছ হয়ে যাওয়াকেই woolliness, বলা যেতে পারে। 'আমার মনে হয় তিনি নিশ্চয় আসবেন' এই বাক্যের মধ্যে একটা অস্পষ্টতা তৈরি হয়ে আছে। 'মনে হয়' এবং 'নিশ্চয়' এই দু-টির মধ্যে যে অর্থগত অসংগতির ইশারা আছে তারই ফলে বাক্যটি প্রত্যক্ষতা হারাচ্ছে; স্পষ্টতা হারাচ্ছে। আর একটা বাক্য নিই— 'দু-টি উপন্যাসই আমার ভালো লাগেনি'। এই বাক্যটিও অস্পষ্ট। কী বলতে চান লেখক বা বক্তা? দু-টি উপন্যাসের কোনোটিই ভালো লাগেনি? না কি দু-টির একটি ভালো লেগেছে, অন্যটি ভালো লাগেনি? প্রথম অর্থ কাঙ্ক্ষিত হলে লিখতে হবে— দু-টি উপন্যাসের একটিও (বা কোনোটিই) ভালো লাগেনি। আর দ্বিতীয় অর্থ কাঙ্ক্ষিত হলে লিখতে হবে—দু-টির একটি ভালো লেগেছে, অন্যটি ভালো লাগেনি। শব্দগত অস্পষ্টতা যে বাক্যের ক্ষতি করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[৬]

বহুবচনের ব্যবহারে একটা মস্ত ত্রুটি আমরা লক্ষ করি। বাংলা ভাষার বহুবচনের নানান প্রক্রিয়া আছে। শব্দের শেষে বহুবচনসূচক নির্দেশকের ব্যবহারই তার মধ্যে প্রধান। -রা, -এরা, -গুলি, -গুলো তো আছেই, সাধু ভাষায় কিংবা গম্ভীর চলিত ভাষায় -গণ, -বৃন্দ, -মণ্ডলী, -আবলি, -বর্গ প্রভৃতি শব্দাংশ শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয়ে বহুবচন নির্দেশ করে। শব্দের দ্বিত্ব ঘটিয়েও বহুবচন পাওয়া যায় (ঝুড়ি ঝুড়ি আম, দেশে দেশে বেড়াই, জনে জনে প্রশ্ন করি)। কিন্তু লেখায় ও কথ্য ভাষায় প্রায়ই ডবল প্লুর্যাল ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। অনেক লোকেরা, বহু বিদগ্ধজনেরা, হাজার হাজার

পাখিরা ('হাজারে হাজারে পাখিরা আসে' এই প্রয়োগে দোষ নেই), নানা লোকেরা—এই ধরনের প্রয়োগ অত্যন্ত অনুচিত। বহুবচনের চিহ্ন হয় শব্দের আগে বসবে, নয়তো শেষে। যোলোই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় একটি বাংলা চ্যানেলের খবরে শোনা গেল এই বাক্য, 'এই প্রদর্শনীতে অনেক খ্যাতনামা শিল্পীদেরও চিত্রকর্ম থাকবে'। ঠিক এইরকম বাক্য সম্বন্ধেই আপত্তি আমাদের। আগে এবং পরে দু-বার বহুবচনের চিহ্ন ব্যবহারের কোনো সার্থকতা নেই।

ডবল বহুবচন এক রকমের আতিশয্য। আতিশয্য গদ্যকে অনর্থক ভারাক্রান্ত ও অস্পষ্ট করে তোলে। যথাযথ জ্ঞাপনের স্বার্থে বাক্যে আতিশয্য বা redundancy বর্জন করে চলতেই হবে। বাক্যে অনর্থক আতিশয্যের আরও দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে। নেওয়া যাক আর একটি বাক্য—'সে হয়তো আজ আসতে পারে।' এই বাক্যের 'হয়তো' এবং 'আসতে পারে' দু-টিই একসঙ্গে ব্যবহার করার কোনোই দরকার হয় না। হয়তো-তে যে-সম্ভাবনার কথা বলা হল তা নিশ্চয় 'আসতে পারে' শব্দটি বাড়িয়ে দেবে না। বরং এর ফলে বাক্য অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে।[৭]

চার

শব্দ নির্বাচনের সময় শব্দের অর্থবহতা ও যথাযথতার দিকে যেমন খেয়াল রাখতে হয় তেমনি খেয়াল রাখতে হয় শব্দের বিশুদ্ধতার দিকে। একথা সত্যি যে, বাংলা ভাষায় বহু অসিদ্ধ শব্দ বহুল ব্যবহারের ফলে গ্রহণযোগ্য হয়েছে, প্রচলিত হয়েছে। মর্মান্তিক, জাগ্রত, বিশৃঙ্খলা, পার্বত্য, আন্তর্জাতিক, ইতিমধ্যে, সক্ষম, সততা, চলমান, সিঞ্চন, সৃজন, সমসাময়িক, ভাসমান, উপরোক্ত, বিস্তারিত, সাবধানি প্রভৃতি অজস্র এমন শব্দ বাংলায় প্রচলিত হয়েছে যেগুলো সংস্কৃত ব্যাকরণমতে অসিদ্ধ। কিন্তু এই শব্দগুলোকে পরিহার করে চলব এমন প্রতিজ্ঞা অসম্ভব এবং অযৌক্তিক। কিন্তু এই যুক্তিতে নিশ্চয় যেকোনো অসিদ্ধ শব্দকেই প্রয়োগযোগ্য বলে ধরে নেওয়া যাবে না। স্বাধীনোত্তর শব্দটি অনেকেই নির্বিচারে ব্যবহার করেন। স্বাধীনতা-উত্তর বা স্বাধীনতোত্তর বা উত্তর-স্বাধীনতার মতো শব্দ থাকতে কী করে স্বাধীনোত্তর বলে একটা কুৎসিত শব্দ চালু হতে পারল জানি না। এইরকম

আরও শব্দ আছে। রুচিবান, ন্যূনাধিক্য, সন্তানসম্ভবা, যুদ্ধমান, অধীতব্য, শুদ্ধাশুদ্ধি, দোষস্খালন, পাপস্খালন, সর্বশ্রী, প্রিয়পাত্র প্রভৃতি শব্দ কোনোমতেই ব্যবহার করা উচিত নয়। ন্যূন বিশেষণ, তার সঙ্গে বিশেষ্য আধিক্য কীভাবে যুক্ত হতে পারে?

ন্যূনাধিক হতেই পারে। কিন্তু ন্যূনাধিক্য অতীব হাস্যকর। একইভাবে শুদ্ধ বিশেষণ। তার সঙ্গে অশুদ্ধির মতো বিশেষ্যের সন্ধি হয় না। হতে পারে শুদ্ধ্যশুদ্ধি (অর্থাৎ শুদ্ধি + অশুদ্ধি)। সন্তানসম্ভবা মানে আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু কোনো মহিলার সন্তানসম্ভাবনা দেখা দিলেই কি তাঁকে সন্তানসম্ভবা বলা উচিত হবে? যে-বই পড়তে হবে তাকে অধ্যেতব্য বলতে পারি, কিন্তু অধীতব্য বলতে পারি না। অধীত কথাটার সঙ্গে একটা তব্য জুড়ে দিলেই নতুন শব্দ পাওয়া গেল এইরকম ভাবনা থেকেই এই বিশ্রী শব্দটা এসেছে। সর্বশ্রী আর একটি কদাকার শব্দ যার বিরুদ্ধে রাজশেখর বসু ও পরিমল গোস্বামী বহুকাল আগেই তাঁদের প্রবল আপত্তির কথা জানিয়ে গেছেন। ক্ষালন ও স্খালন-এর মধ্যে বিভ্রান্তির জন্যই একটির জায়গায় অন্যটি ব্যবহৃত হয়। ক্ষালন অর্থ ধুয়ে ফেলা, ধুয়ে পরিষ্কার বা নির্মল করা। স্খালন অর্থ বিচ্যুত করানো, চ্যুত করানো। কাজেই দোষক্ষালন, পাপক্ষালন বলতে হবে, দোষস্খালন বা পাপস্খালন কদাপি নয়। পেশল শব্দের অর্থ সুন্দর, মনোহর। কীভাবে যে 'পেশি' শব্দের একটা সম্পর্ক এর সঙ্গে ঘটে গেল তা বোঝা কঠিন। কাজেই পেশল শরীর মানে পেশিবহুল নয় বা বলিষ্ঠ নয়। কিন্তু যেভাবে এই ভুল অর্থে শব্দটা চলছে তাতে এই অপপ্রয়োগ ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়ছে।

এবার অপ্রতিরোধ্যভাবে এসে পড়ছে বানানের প্রসঙ্গ। বাংলা ভাষার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগের কোনো আলোচনাই বানানকে এড়িয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না। সকলেই বানানের সমস্ত নিয়ম মেনে লিখবেন বা বানানের সমস্ত নিয়ম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকবেন এ-আশা নিতান্তই দুরাশা। কিন্তু যে-বানান শুদ্ধ বা সংগত বা গৃহীত সেই বানান যেকোনো লেখককেই জেনে নিতে হবে। বানানের ভিত্তি বা কারণ যিনি জেনে নেবেন তাঁকে তো ভাষা সম্পর্কেই আগ্রহী বলতে হবে। যিনি অতদূর যেতে চান না তাঁকে অন্তত পক্ষে একটু কষ্ট স্বীকার করে সংশয়ের ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করে বিশেষ বিশেষ বানান সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। আমাদের বলবার কথাটাকে আর একটু

সহজ করে বলি। হিরণ্ময় শব্দে কেন মূর্ধন্য-ণ আর মৃন্ময় শব্দে কেন দন্ত্য-ন তার কারণ জানতে সকলে আগ্রহী না হতেই পারেন। কিন্তু এটুকু কষ্ট করে মনে রাখতেই হবে যে, হিরণ্ময় মূর্ধন্য-ণ দিয়ে এবং মৃন্ময় দন্ত্য-ন দিয়ে লিখতে হয়। যিনি সংশয়ী তিনি কম ভুল করেন। বেশি ভুল তাঁরাই করেন যাঁদের মনে সংশয় নেই।

বানানের প্রসঙ্গ এই আলোচনায় মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। যখন টেলিভিশনের বিভিন্ন বাংলা চ্যানেলের পর্দায় ভয়াবহ সব বানান ফুটে ওঠে প্রতিদিন, তখন আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। টেলিভিশনে মূর্ধন্য-ণ, য-ফলা প্রভৃতিকে প্রায়ই বাহুল্য মনে করে বর্জন করা হয়। টেলিভিশনের পর্দায় জ্বলজ্বল করে ফোটে এইরকম বানান—ভ্রমন, নির্মান, সর্বাঙ্গীন, কঙ্কন, গ্রামীন, প্রাঙ্গন, বন্দোপাধ্যায়। পুণ্য শব্দটাকে কতভাবে কত রূপে দেখা যায়— পূন্য, পুন্য, পূণ্য। শূন্যকে পাই এইভাবে শূণ্য, শুণ্য। এ ছাড়া তৈরী, ষ্ট্রীট, খুনী, ট্রেণ, মুলতুবী, তফসিলী, তফশিলী, মিনতী, দাশরথী, সারথী, গোষ্ঠি, গিন্নী, ভিখারী, ভূটান, ভীড়—এইসব ভুল ও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত বানানের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

বানানকে উপেক্ষা করা অত্যন্ত অনুচিত কাজ। বানান সম্বন্ধে ঔদাসীন্য লেখকের আন্তরিকতার ঘাটতিই প্রমাণ করে। যিনি লেখক হিসাবে কিছু মান্যতা দাবি বা আশা করেন তাঁকে বানান বিষয়ে সতর্ক ও যত্নশীল হতেই হবে। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, আলোচনা যখন মূলত সম্প্রচারের ভাষা নিয়ে, তখন কেন আলোচিত হবে বানানের প্রসঙ্গ? সম্প্রচার তো শ্রব্য মাধ্যম (যেমন বেতার)। তাই বানানের প্রসঙ্গকে অবান্তর মনে হতেও পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে বেতার বা আকাশবাণী শুধুই শ্রব্য মাধ্যম হলেও, টেলিভিশন শুধুই শ্রব্য বা audio মাধ্যম নয়। তা দৃশ্যও (visual) বটে। পর্দায় যে-লেখা ফুটে ওঠে তাকেও তো উপেক্ষা করতে পারি না। দ্বিতীয়ত, মূলত সম্প্রচারের কথা যদিও বলছি আমরা, তবু সাধারণভাবে শব্দের শুদ্ধ ও সিদ্ধ রূপ এবং প্রয়োগসিদ্ধ রূপ সম্বন্ধে আলোচনাও প্রয়োজন। আর সেখানেই এসে পড়ে বানানের প্রসঙ্গ। একটি বাংলা চ্যানেলে সেদিন ফুটে উঠল 'চিত্রাঞ্জলী' কথাটি এই বানানে। একই চ্যানেলে একটি বিজ্ঞপ্তিতে শোনা গেল ইংরেজি Thomsonকে থমসন বলতে।

পাঁচ

প্রতিবর্ণীকরণ বা লিপ্যন্তরীকরণের প্রশ্নটি বানানের সঙ্গে এক হিসাবে কিছুটা যুক্ত। তার পৃথক আলোচনাও একান্তই প্রয়োজনীয়। কেননা বিদেশি নামের প্রতিবর্ণীকৃত কোন রূপটি বাংলায় গৃহীত হবে তা যেমন লেখার ক্ষেত্রে তেমনি বলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশি স্থাননাম ও ব্যক্তিনামের উচ্চারণকে অনুসরণ করে লেখাই সাধারণ রীতি হলেও আমরা লক্ষ করেছি সর্বত্র এই রীতি অনুসরণ করা হয় না। বিষয়টি বিশেষ অভিনিবেশের যোগ্য। সংবাদপত্রে এবং বেতার ও টেলিভিশনের সম্প্রচারে বিদেশি শব্দ ও নামের প্রতিবর্ণীকৃত রূপ খুবই বহুলব্যবহৃত। কিন্তু এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ রূপ যে পাওয়া গেছে একথা বলা যায় না। সে-কারণেই বিষয়টা নিয়ে বিবেচনার প্রয়োজন থেকেই যাচ্ছে।

সাধারণভাবে যেসমস্ত বিদেশি শব্দ ইংরেজির মারফত আমাদের কাছে পরিচিত হয়েছে সেগুলো ইংরেজি রীতিতে উচ্চারণ করাই সাধারণ রীতি ছিল এতকাল। তাই আমরা অক্লেশে Jespersen-কে জেসপার্সেন, Garibaldi-কে গ্যারিবলডি, Napoleon-কে নেপোলিয়ন বলে এসেছি আর সেইভাবে লিখেও এসেছি। অথচ বহুকাল ধরেই কতকগুলো শব্দ ও নামের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু তদ্দেশীয় রীতিই মেনেছি। যেমন Montaigne-কে কখনো মন্টেন বলেছি বলে মনে পড়ে না। আমরা তো মঁতেন বলতেই অভ্যস্ত। Renaissance-কে আমরা রিনেইসান্স বলি না, বরং বলি রনেসাঁস বা রেনেসাঁস, Versailles তো সেই কবে থেকে আমাদের মুখে ও লেখায় ভ্যের্সাই বা ভের্সায়ি। আমরা স্পেনীয় কবি Jimenez-কে স্পেনীয় কায়দায় হিমেনেথ বলতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। প্রতিবর্ণীকরণের মূল ভিত্তি হল উচ্চারণ। কখনো মূল ভাষার উচ্চারণ কখনো ইংরেজি উচ্চারণ, আবার কখনো-বা যে-উচ্চারণ আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে সেই উচ্চারণ। হিমেনেথ, আলব্যের কামু, দা ভিঞ্চি, তিন্‌তরেত্তো এসব প্রতিবর্ণীকরণে মূল উচ্চারণকে অনুসরণ করা হয়েছে। আবার প্যারিস, রোম, কোপেনহেগেন, প্রাগ এসব প্রতিবর্ণীকরণে ইংরেজি রীতিকে অনুসরণ করেছি আমরা। গ্যেটে, মুসোলিনি প্রভৃতির ক্ষেত্রে মূল উচ্চারণ ও ইংরেজি রূপের মধ্যে একটা আপোশ হয়েছে। রঞ্জনরশ্মি (র‍্যন্টগেন এর নামানুসারে) একেবারেই বঙ্গীকৃত রূপ। অন্যদিকে ইংরেজি বানান ও রূপ অনুসরণ করে মারাঠি

দস্যুদলকে আমরা পিন্ডারি বলতে অভ্যস্ত, মূল মারাঠি রূপ পেন্টারি আমাদের কাছে আমল পায় না।

একথা সত্যি যে, বহু বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকৃত রূপ মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেলেও অনেক শব্দ সম্বন্ধে বা নাম সম্বন্ধে এখনও সংশয় আছে। সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়া এবং মান্য অভিধানের নির্দেশ মেনে নেওয়াই সংগত। এই প্রসঙ্গে অনুবাদের কথাও উঠে পড়বে। ইলেকট্রনিক সম্প্রচারের কর্মীদের প্রায়ই ইংরেজি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বাংলায় রূপান্তরিত করতে হয়। এক্ষেত্রে যান্ত্রিকভাবে অনুবাদ না করে অর্থকে অনুসরণ করে বাংলায় বলাই ভালো। clear skyকে রৌদ্রোজ্জ্বল বা রৌদ্রোকরোজ্জ্বল আকাশ বললে রাতের আকাশকে কী বলব? কাজে-কাজেই বলা ভালো পরিষ্কার আকাশ। Sunny day বললে অবশ্য রৌদ্রোজ্জ্বল হতেই পারে। কেবল রাতের অনুষঙ্গ থাকলে রোদ বা রৌদ্র কথাটা না থাকলেই ভালো। কখনো কখনো অনুবাদ বাংলা ভাষার সঙ্গে সংগতি রেখেই করা হয়। কিন্তু প্রায়ই আবার তা হয় না। অনুবাদ আক্ষরিক হল কি না তার চাইতেও জরুরি কথা হল অনুবাদ বাংলা ভাষার পক্ষে অস্বাভাবিক হচ্ছে কি না।

সম্প্রচারের ভাষা নিয়ে আমাদের আলোচনায় এবার বলব পরিভাষার কথা। পরিভাষা যে বিদ্যাচর্চায় এবং সম্প্রচার মাধ্যমের জ্ঞাপনে একান্তই প্রয়োজনীয় এ-সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। যে সমস্ত পরিভাষা বাংলায় গৃহীত হয়ে গেছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চাই না। Volatile-কে উদ্‌বায়ী বলতে আপত্তি নেই, থার্মোমিটারকে তাপমান যন্ত্র বলতেও দ্বিধা নেই। রোড ট্যাক্স হয়েছে পথকর, জ্যাম হয়েছে যানজট, ইউনিটারিকে বলা হচ্ছে এককেন্দ্রিক, স্ট্যাটিউট হয়েছে সংবিধি। এসবে কোনো আপত্তি বা অসুবিধে নেই। কিন্তু অকারণে কৃত্রিম ও দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দবন্ধকে বাংলা পরিভাষা বলে চালিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। তেমন চেষ্টা হয়নি এমন নয়, তবে সে-চেষ্টা সফল হয়নি। ইম্‌পিচমেন্টকে অভিশংসন করা হলেও তা সংগত কারণেই জনপ্রিয় হয়নি। সার্টিফিকেট অব ফিটনেস-এর পরিভাষা ক্ষমত্বপত্র চালু হওয়ার কোনোই কারণ নেই। কেন একে যোগ্যতাপত্র বা সুস্থতাপত্র বলা যাবে না?

সম্প্রচার মাধ্যমে তাহলে পরিভাষার কোন রূপ গৃহীত হবে? যেহেতু দুরূহ ও দুর্বোধ্য পরিভাষা তেমন জনপ্রিয় হয়নি, তাই তা সকলে ব্যবহার

করছেন না। অতএব সম্প্রচার মাধ্যমেরও সেগুলি ব্যবহার করার দায় নেই। ঠিক যেমন সনেট আর চতুর্দশপদী, ডায়ালেকটিকস আর দ্বন্দ্ববাদ, কমিশন আর আয়োগ পাশাপাশি চলছে, তেমনি আমরা চাই দুরূহ ও দুর্বোধ্য বাংলা পরিভাষার বদলে সহজ সুবোধ্য ও যথাযথ পরিভাষা নিতান্তই না পাওয়া গেলে ইংরেজি শব্দটিই বলা বা বাংলা হরফে লেখা উচিত।

ছয়

আর এক বার আমাদের পাঠকদের মনে করিয়ে দেব যে, সাহিত্যিক ভাষার কথা সাহিত্যিক গদ্যের কথা এখানে আদৌ আলোচনা করছি না আমরা। সাহিত্যিক গদ্যের রীতি ও ভঙ্গি নানারকম হতে বাধ্য। এক-এক লেখকের এক-এক ভঙ্গি। শুধু তা-ই নয়, আমরা সম্প্রচারের ভাষার বেলায় যেসব ত্রুটিবিচ্যুতির কথা বলেছি কিংবা যেসব মান্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছি, তার অনেকগুলোই সাহিত্যিক ভাষার বেলায় গৌণ হয়ে যায়। সাহিত্যিক ভাষার নিরিখ অন্যরকম। আর যদি সম্প্রচারের কথাই বলি তবে বাক্য নিয়েও কয়েকটা কথা বলা নিতান্তই জরুরি।

ভাষার বৃহত্তম একক বাক্য। কতকগুলো উপাদান নিয়ে তৈরি হয় বাক্য। কিন্তু কেন বলছি বৃহত্তম? অনেকের মনে হতে পারে অনুচ্ছেদ তো বাক্যের চাইতে আরও বড়ো। আসলে অনুচ্ছেদ তো কতকগুলো বাক্যেরই সমবায়ে তৈরি। কাজেই অনুচ্ছেদ মানে অনেকগুলো বা কতকগুলো বাক্য। অনুচ্ছেদকে তাই বাক্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। সে যাই হোক, বাক্য হতে পারে নানান রকমের। গঠনের দিক থেকে সরল যৌগিক জটিল ও মিশ্র। ভাবের দিক থেকে সদর্থক নঞর্থক প্রশ্নবাচক ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে সাপেক্ষ বাক্য। এই যে এত রকমের বাক্য তৈরি হয় তার প্রত্যেকটিরই আলাদা উদ্দেশ্য থাকে, প্রত্যেকটিতেই আলাদা রকমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সম্প্রচারের ভাষায় বিশেষত বেতারে ও দূরদর্শনে, কী ধরনের বাক্য ব্যবহার করা উচিত? সম্প্রচারের ভাষায় বাক্যকে হতে হবে সুষ্ঠু ও অমোঘ জ্ঞাপনের উপযোগী। বেশি বড়ো আর কুটিল বাক্য এড়িয়ে চলাই সেদিক থেকে বাঞ্ছিত. এড়িয়ে চলা উচিত পৌনঃপুনিক প্রশ্ন ও উচ্ছ্বাস। আর প্রত্যক্ষবাচন যে একান্তই জরুরি তা তো বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এসব কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে, সবসময় বাক্য ছোটোই হবে, প্রত্যক্ষ হবে, একেবারে নির্মেদ ও হালকা হবে এমন কোনো প্রস্তাব করছি না আমরা। অনেককাল আগে ইংরেজ লেখক জর্জ অরওয়েল প্রস্তাব করেছিলেন double negative ব্যবহার না করে সোজাসুজি কথা বলা হোক। তাঁর মতে It is not that he is not hungry এ-ধরনের বাক্য না বলে বলা উচিত He is hungry. তাতে বাক্য সরলতা সম্পাদন হয়, বলবার কথাটা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। বক্তব্যের ঠিক জায়গায় ঝোঁকটাও পড়ে। কিন্তু অন্যান্য লেখকেরা অনেকেই অরওয়েলের এই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন। সত্যিই তো, সবসময় এমন প্রত্যক্ষ ও সরাসরি কথায় কাজ হয় না। তা ছাড়া তাতে উদ্দেশ্যও সবসময় সাধিত হয় না। বাংলায় যদি বলা হত—এমন নয় যে সে লম্বা, তাতে অরওয়েল নিশ্চয় আপত্তি করতেন। তিনি হয়তো বলতেন—সে বেঁটে। কিন্তু এ-দুটো তো সমার্থক হল না। সে লম্বা নয়, এই বাক্যের মানে তো, সে মাঝারি উচ্চতার লোক, এমনও হতে পারে।

আমরা যে-কথাটা বলতে চাই তা এই যে, বাক্য তৈরির নিয়মগুলোকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ না করে আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী গ্রহণ করব। অযথা বাক্যকে অস্বচ্ছ বা অস্পষ্ট করে তোলা উচিত নয়। কেউ কেউ মনে করেন, কর্তৃবাচ্যের বাক্য কর্মবাচ্য বা ভাববাচ্যের বাক্যের চাইতে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট এবং সেই কারণে অনেক বেশি কার্যকর, অনেক বেশি ফলপ্রসূ। কথাটা সাধারণভাবে ঠিক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যকে যেমন করেই হোক পরিহার করে চলতে হবে। আমাদের ভাষার স্বাভাবিক কতকগুলো প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্য আছে। সেই প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্যকে এড়িয়ে চলাটাও কাজের কথা নয়। এখানে কতগুলো বাক্য পর পর লিখে যাচ্ছি। পাঠক নিশ্চয় বুঝবেন এসব বাক্য আমাদের ভাষার একান্তই নিজস্ব, আর এসব বাক্যে বিশেষ ভাব ও ভঙ্গির প্রকাশ ঘটে।

(১) সেদিন ছাতা কেনা হয়েছিল? (২) আমার আজ পর্যন্ত তোমাদের বাড়ি যাওয়া হল না। (৩) চালের বস্তাটাকে কোথায় রাখা হবে? (৪) বাজার থেকে টাটকা সবজি আনা হয়েছে। (৫) তোমার খাওয়া হল? (৬) সেদিন এক বিধায়ক আক্রান্ত হয়েছিলেন। (৭) এমন বাঁদরকে মানুষ করা আমার কম্ম নয়।

পাঠক লক্ষ করবেন, এই সাতটি বাক্যের একটিও কর্তৃবাচ্যের বাক্য নয়। অথচ কত স্বাভাবিক এবং অর্থবহ এসব কর্মবাচ্য আর ভাববাচ্যের বাক্য। তাই একথা বলতেই হবে যে, অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃবাচ্যের বাক্য বেশি উদ্দেশ্যসাধক হলেও প্রয়োজনে কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের বাক্যও ব্যবহার করতে দ্বিধা থাকা উচিত নয়। এখানেও সেই এক কথাই আবার বলব, বাক্যের গঠনটা প্রধান কথা নয়, প্রধান কথা বক্তব্যের স্বচ্ছতা ও অমোঘতা। যাতে তা সাধিত হয় তেমন বাক্যই ব্যবহার করতে হবে।

সাত

ভাষার সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে আসবে উচ্চারণের কথা। উচ্চারণ সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলেছি এই নিবন্ধের গোড়ার দিকে, নিতান্তই পার্শ্বিকভাবে। এবারে বাচনের শৈলীর প্রসঙ্গও এসে পড়বে। আমরা দেখেছি যে, ভাষা উচ্চারণের একটা আচারিক বা আনুষ্ঠানিক বা ফর্মাল ভঙ্গি আছে। বলা বাহুল্য সে-ভঙ্গি বেশ-একটু পরিশীলিত ও চেষ্টিত। আবৃত্তিকারের উচ্চারণে, বেতার ও দূরদর্শনের ঘোষণায়, আনুষ্ঠানিক বক্তৃতায় এই উচ্চারণের নমুনা পাওয়া যায়। এই আলোচনা যেহেতু মূলত ইলেকট্রনিক সম্প্রচার মাধ্যম সম্পর্কিত, তাই উচ্চারণ ও বাচনশৈলীর একটা বড়ো জায়গা আছে এখানে। প্রথমেই একটা কথা বুঝে নিতে হবে আমাদের। সেটা এই যে, সব ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই পরিশীলিত আনুষ্ঠানিক উচ্চারণ বাঙালির সাধারণ ও স্বাভাবিক মান্য উচ্চারণ থেকে আলাদা। আগে দেখব কোথায় কোথায় তা আলাদা। আপাতত চারটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করব যেখানে মান্য উচ্চারণ ও আনুষ্ঠানিক উচ্চারণ আলাদা হয়ে যায়। প্রথমত, একান্ন, একাত্তর, একাহারী প্রভৃতি শব্দে বাঙালির মান্য উচ্চারণে প্রথম সিলেবলে অ্যা পাই, এ নয়—অ্যাকান্নো, অ্যাকাত্তোর্, অ্যাকাহারি। কিন্তু আনুষ্ঠানিক উচ্চারণে পাওয়া যায় এ—একান্ন, একাত্তোর্, একাহারি। বুঝে নেওয়া দরকার যে ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মে এসব ক্ষেত্রে অ্যা হওয়ারই কথা। যে-নিয়মে এক এগারো একা-তে অ্যা এবং একুশ এদিন, এখুনি-তে এ হয়, সেই একই নিয়মে একান্ন-তে অ্যা এবং একত্রিশ-য়ে এ হবে। দ্বিতীয়ত, যুক্তব্যঞ্জনের বিশেষ মান্য প্রবণতা আনুষ্ঠানিক উচ্চারণে মানা হয় না। অশ্লীল, শ্লেষ, শ্লথ এসব শব্দের মান্য উচ্চারণ তালব্য-শ দিয়ে নয়,

দন্ত্য-স দিয়ে—অস্‌লিল্‌, স্লেশ্‌, স্লথো। কিন্তু আনুষ্ঠানিক উচ্চারণে শুনি অশ্‌লিল্‌ শ্লেশ্‌। অথচ র-ফলাযুক্ত শ-য়ের উচ্চারণে পার্থক্য হয় না। শ্রাবণ, শ্রম, শ্রান্তি এসব শব্দ দন্ত-স দিয়েই উচ্চারিত হয় মান্য এবং আনুষ্ঠানিক দুই ক্ষেত্রেই। তৃতীয়ত পদ্ম, বিস্ময় এইসব শব্দের অনুনাসিকতা মান্য ভাষার উচ্চারণে অনেকটাই ক্ষীণ, প্রায় অশ্রুত। কিন্তু আনুষ্ঠানিক উচ্চারণে অনুনাসিকতা খুবই স্পষ্ট—পদ্‌দোঁ. বিশ্‌শঁয়্‌। চতুর্থত, মান্য বাংলায় শব্দের শেষের বদ্ধ সিলেবলে মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকলে তার মহাপ্রাণতা একটু দুর্বল হয়ে পড়ে। আধ ফোটা-কে আদ্‌ফোটা শোনায়। আনুষ্ঠানিক উচ্চারণে মহাপ্রাণতাকে রক্ষার জোরালো চেষ্টা দেখা যায়। এ থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আনুষ্ঠানিক ভাষার উচ্চারণ কিছুটা বানানানুগ বা বানানপ্রভাবিত, যাকে ভাষাতত্ত্বের ভাষায় spelling pronunciation বলা হয়।[৮]

স্বীকার করতেই হবে যে, এই বানানানুগ উচ্চারণ যতই চেষ্টিত হোক, ক্রমে তা মান্য উচ্চারণেরই একটা প্রতিস্পর্ধী রূপ বা বিকল্প রূপ হিসেবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অন্তত কিছু ক্ষেত্রে তো স্পষ্টই ঘটছে এটা। প্রশ্ন, লেজ, বেচারা, অস্ফুট প্রভৃতি শব্দের মান্য বা স্বাভাবিক উচ্চারণ যথাক্রমে প্রোস্‌নো, ল্যাজ্‌, ব্যাচারা, অশ্‌ফুট্‌। কিন্তু প্রোশ্‌নো, লেজ্‌, বেচারা ও অস্‌ফুট্‌ এখন এতই বেশি শোনা যাচ্ছে যে এই উচ্চারণকে বিকল্প বলে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই। বলা বাহুল্য বেতার ও দূরদর্শনের সম্প্রচারে আমরা সচরাচর যে-উচ্চারণ শুনি তা আনুষ্ঠানিক উচ্চারণ। সম্প্রচারে বাঙালির স্বাভাবিক মান্য উচ্চারণ ব্যবহৃত হলেও অসুবিধে ছিল না। তবু আনুষ্ঠানিক বা ফরমাল উচ্চারণকেও মেনে নেওয়াই সুবিবেচনার কাজ বলে মনে হয়।

আরও একটা কথা। সম্প্রতি বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে একটা ভয়াবহ প্রবণতা লক্ষ করে ব্যথিত ও আতঙ্কিত হচ্ছি আমরা। অন্ত্যাক্ষরীকে কেউ কেউ অন্‌তাক্‌সোরি এবং কলাক্ষেত্রকে কলাক্‌সেৎরো বলছেন। বাংলা ভাষা যে বাংলাই, হিন্দি নয়, এ-কথা জোর দিয়ে বলার সময় এসেছে। এই প্রবণতাকে প্রতিরোধ করা দরকার। নইলে এর পরে হয়তো পক্‌সি (পক্ষী), লক্‌স্‌মি (লক্ষ্মী), শিক্‌সা (শিক্ষা) এসবও শুনতে হবে।

উচ্চারণের প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে বাংলা ভাষার মান্য উচ্চারণের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা দরকার। আমরা জানি বাংলায় বহু

শব্দের অন্ত্য অ উচ্চারণে আসে না। অর্থাৎ বানানে হস্ না থাকলেও অন্ত্যস্বর উচ্চারণে লোপ পায়। রূপ, ফল, দেব, মত, গীত, নগর, জল এইরকম অজস্র শব্দের উচ্চারণ ব্যঞ্জনান্ত অর্থাৎ যথাক্রমে রুপ্, ফল্, দেব্, মৎ, গিৎ, নগোর্, জল্। কিন্তু অনেকসময়ই সমাসের পূর্বপদে এগুলো থাকলে এদের স্বরান্ত উচ্চারণ হয়। রূপবাণী (রুপোবানি), দেবজ্যোতি (দেবোজ্জোতি), গীতবিতান (গীতোবিতান্) গীতভারতী (গিতোভারতি), পথনির্দেশ (পথোনির্দেশ্), মতবিরোধ (মতোবিরোধ্), জলচর (জলোচর্), কেশপাশ (কেশোপাশ্), করতল (করোতল্) ইত্যাদি। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে—পথবদল, মতবদল। এখানে একটা সম্ভাব্য কারণের কথা বলা যায়। সমাস যেহেতু হয়েছে একটা অসংস্কৃত বা অতৎসম শব্দের সঙ্গে তাই পথো বা মতো না হয়ে পথ্ মৎ হয়েছে। অবশ্য এই ব্যাখ্যাও সর্বত্র ঘটবে না। রূপসাগর-এর উচ্চারণ রুপ্শাগোর্ হল কেন তবে? কাজেই এই নিয়ম এবং তার ব্যতিক্রমগুলোকে শনাক্ত করা অত্যন্ত জরুরি, আর ইলেকট্রনিক সম্প্রচার মাধ্যমের ভাষা ব্যবহারকারীদের পক্ষে অপরিহার্য।

উচ্চারণ প্রক্রিয়ার আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যতি বা বিরাম। বাংলা বাক্যে একটা স্বাভাবিক বিরামের ব্যাপার আছে, তা হল শ্বাসযতি। একসময় মনে করা হত যে, কথ্য ভাষায় বাক্যের মধ্যে যে বিরতি বা বিরাম বা যতি থাকে তা শ্বাসযতিই। কেবল শ্বাসের বিরামের জায়গাতেই ক্ষণিক বিরতি দেওয়া হবে। কিন্তু ক্রমশ দেখা যাচ্ছে যে, শ্বাসযতিকে আর একমাত্র যতি বলে মনে করা হচ্ছে না।[৯] বাংলা বাক্য বলার সময় বাক্যের গঠন ও অর্থ অনুযায়ীও বিরাম বা যতি দিতে হয়। আর তাহলেই বাক্যের অর্থ সহজবোধ্য হবে, জ্ঞাপন হবে অব্যর্থ, অমোঘ। বাক্য যত দীর্ঘ হবে, ততই বাক্যের জায়গায় জায়গায় স্বল্প বিরাম দরকার হয়ে পড়ে। যেকোনো ঘোষক বা সঞ্চালকের পক্ষে এই বিরামের জায়গাগুলোকে সঠিক বুঝে নিয়ে বাক্য বলা অভ্যাস করতে হবে।

আনুষ্ঠানিক ভাষার ব্যবহারকারীদের অবশ্যই লক্ষ করতে হবে ভাষার ব্যবহার যেন আন্তরিক হয়, প্রত্যক্ষ হয়। জ্ঞাপন সুষ্ঠু ও যথাযথ হওয়া একান্তই প্রয়োজন। তাঁদের ব্যবহৃত ভাষাকে যে গম্ভীর বা ভারী হতেই হবে এমন প্রস্তাব করব না। তবে অযথা লঘুতাও কাম্য নয়। লিখিত

ভাষাকে হতে হবে শুদ্ধ, ঋজু, স্বচ্ছ। বাচনকে হতে হবে স্পষ্ট, যথাযথ ও আন্তরিক। সমস্তরকম অস্বচ্ছতা বাহুল্য ও লঘুতা এড়িয়ে চলাই সুবিবেচনার কাজ।

আট

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভাষা নিয়ে কিছু বলেছি চতুর্থ পরিচ্ছেদে। সেখানকার একটি বক্তব্যের সম্প্রসারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এখানে। কলকাতার বেতার ও টেলিভিশনের চ্যানেলগুলো যেভাবে বাংলা ভাষার সেবা করে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে এরা শুধু বাংলা ভাষার রূপান্তরের সাক্ষীই হয়ে থাকবে না, এই রূপান্তরে তাদেরও থাকবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একটা সময় কলকাতায় টেলিভিশন ছিল না। আর বেতার বলতে কলকাতা-ক, কলকাতা-খ আর বিবিধ ভারতীই আসর জমিয়ে রাখত। তখনও বেতারে বাংলা ভাষার উপর অত্যাচার কম চলেনি। তা নিয়ে বিস্তর লিখেছেন পরিমল গোস্বামী। প্রায় একাই লড়াই করে গেছেন নিরন্তর। কিন্তু তাতে খুব কাজ কি হয়েছে? হয়নি বোধ হয়। এখন বেতারেরও নানান ভাগ, নানান শাখা। রমরমিয়ে চলছে এফ. এম. তরঙ্গের অনুষ্ঠান, নানান অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে যতিচিহ্নের মতো থাকে বিজ্ঞাপন। স্পনসরিং ছাড়া এখনকার অনুষ্ঠান ভাবাই যায় না। এত-যে আয়োজন, তাতে পরিমল গোস্বামীর প্রচেষ্টার ফল কতখানি ফলেছে? বোধ হয় শূন্য। আজও বেতার আর দূরদর্শন ভুল ভাষার কারখানা। বেতারের ভাষা নেহাত চোখে দেখা যায় না, তা কেবল কানে শোনবার বিষয়। তাতেই কর্ণপ্রদাহ বাড়বার অবস্থা। সংবাদপাঠকদের মধ্যে যোগ্য লোকের নিশ্চয় অভাব নেই। নেই যে, তা কয়েক জনের ভাষাপাঠ শুনেই ধরা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সংবাদপাঠকের ভাষাজ্ঞান মর্মান্তিক। কখনো মনে হয় তাঁরা হিন্দি রীতিতে বাংলা বলছেন, কখনো মনে হয় ইংরেজি রীতির বাংলা ওটা। আবার কোনো কোনো সময়ে শব্দগুলো বাংলা হলেও বাক্যটা বাংলা কি না সন্দেহ থেকে যায়। বিশেষণের ব্যবহারে, বহুবচনের ব্যবহারে এবং সংযোজকের ব্যবহারে এঁদের অনেকেই নির্দ্বিধায় ভুল করেন। 'অত্যাধিক,' 'পাকিস্থান,' 'ব্যাকারণ' এসব শব্দের ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করেছিলেন পরিমল গোস্বামী। কী হল তাতে? আজও সমানে চলেছে এইসব ভয়াবহ প্রয়োগ।

বেতারে ভুল বাংলা হয়তো চলতেই থাকবে। চলতেই থাকবে ভুল উচ্চারণে বাংলা বলা। এই ভুল উচ্চারণ কানে বড়োই লাগে। সৈন্যকে সৈন, আহ্বানকে আহোভান, ন্যূনকে নূন্য শুনলে আর আঁতকে উঠি না, তবে ব্যথিত হই নিশ্চয়। কয়েক বছর ধরে চালু হয়েছে এফ. এম. তরঙ্গের অনুষ্ঠান। এই অতি-জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলোতে কথক-কথিকারা এক ধরনের স্মার্ট ভাষা ব্যবহার করেন। তাঁদের হিন্দি ও বাংলা সমান স্মার্ট, সমান সাবলীল। এঁরা যখন হিন্দি বলেন তখন এঁদের হিন্দিভাষীই মনে হবে, যখন মুহূর্তে ভাষা বদলে বাংলা বলতে শুরু করেন, তখন সবিস্ময়ে লক্ষ করি এঁরা বাঙালিই বটে। এঁদের বলার বাংলাটাকে সর্বাংশে অবশ্য আমার ব্যবহৃত বাংলার মতো মনে হয় না। বাক্য বলার সময় ঝোঁক এবং শব্দ উচ্চারণে প্রস্বরস্থাপনকে অনেকসময় অচেনা বলেই মনে হয়। হয়তো বাচনের এই ভিন্নতা মিডিয়ানির্দিষ্ট নীতির জন্যই হয়ে থাকে। সে যাই হোক, এঁদের বাংলার বিরুদ্ধে আমার বিরাট কোনো আপত্তি নেই। যা আছে তাকে সংশয় বলতে পারি। এঁরা কেন এমন অচেনা সুরে কথা বলেন? এটাই কি তবে ক্রমশ স্বাভাবিক হবে? আপত্তি করে বোধ হয় লাভ নেই, তবে ভীত হতে আপত্তি কী? বেতারের বিভিন্ন তরঙ্গে যেসব ভুলভ্রান্তির কথা বলেছি সেগুলোর জন্যে ঘোষক বা কথকদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে বটে, তবে সর্বত্রই তো ভুলের ছড়াছড়ি। কাকে আর বাদ দেব? ক্রমাগত ভুল শুনতে শুনতে আর দেখতে দেখতে মানুষ ভুলটাকেই ঠিক বলে ভাববে একদিন। আমাদের আতঙ্ক আর উদ্‌বেগেব কারণ সেটাই।

বেতারের চাইতে অনেক বেশি ভয়াবহ অবস্থা টেলিভিশনের। টেলিভিশন যেহেতু দৃশ্য ও শ্রব্য দুইয়েরই মাধ্যম, তাই সেখানে কান যতটা পীড়িত হয়, ততটাই পীড়িত হয় চোখ। যেসব ভুল বানানের কথা এই নিবন্ধের চার-এর পরিচ্ছেদে বলেছি, তার সবকটি তো পর্দায় ফুটে ওঠেই। তার বাইরেও আছে অগুনতি ভুল। 'বেনারসী কুঞ্জ' হয়ে দাঁড়ায় 'বেনারসী কুজ্ঞ'। অতি সম্প্রতি দূরদর্শনে দেখলাম একটি টেলিছবির বিজ্ঞাপন—তাতে জ্বলজ্বল করছে নাম—'অন্তর্জ্জলী'। কে বলে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বহুকাল বর্জিত হয়ে গেছে। দূরদর্শন তাকেই তো ফিরিয়ে আনছে।

সংবাদপত্র বেতার আর টেলিভিশনের মতো শক্তিশালী গণজ্ঞাপন মাধ্যম আর কী-ই আছে। এদের মধ্যে আবার পরের দু-টি বেশি শক্তিশালী,

বেশি জনপ্রিয়। শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে এদের প্রভাব সুবিপুল। অথচ এরাই যদি ক্রমাগত ভুল শেখায় ভুল দেখায় আর ভুল শোনায়, তাহলে কুশিক্ষার বাড়বাড়ন্ত রুখবে কে? ভুল বাংলা আর কদর্য বাংলার অগ্রগতি রোধ করা এক সুকঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু আমরাও নিশ্চয় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব না। বাংলা ভাষার প্রতি যেহেতু দায় আমাদের সকলেরই রয়েছে, তাই আর কিছু না হোক, অন্তত এই চিৎকৃত ভুলের বিরুদ্ধে আমাদেরও সরব হতে হবে। 'ভুল বাংলার তরঙ্গ রোধিবে কে' বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা চলবে না।

লেখক ভাষাবিদ, বিশিষ্ট অভিধান প্রণেতা

সূ ত্র নি র্দে শ

১ মৃণাল নাথ, *ভাষা ও সমাজ*, ১৯৯৯, পৃ.১৭-১৯।

২ শিশিরকুমার দাশ, 'মুখের বাংলা, লেখার বাংলা', 'ভাষা', চতুর্থ-পঞ্চম যুগ্ম সংখ্যা ১৯৮৫-১৯৮৬।

৩ সুভাষ ভট্টাচার্য, 'আদর্শ কথ্য বাংলার উচ্চারণ', *বাংলাভাষা চর্চা*, ১৯৯২।

৪ রাজশেখর বসুর *বিচিন্তা, লঘুগুরু ও চলচ্চিন্তা* ; চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ; পরিমল গোস্বামীর *রবীন্দ্রনাথ বাঙালী বাংলা ভাষা ও নানা নিবন্ধ* ; বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের *বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি* ; কালিদাস রায়ের *শাব্দিক* ; কুন্তকের (শঙ্খ ঘোষ) *শব্দ নিয়ে খেলা* ; সুভাষ ভট্টাচার্যের *আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান* প্রভৃতি বইয়ে বাংলা ভাষার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগের নানা দিক আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বাচনিক ভাষা নিয়ে বা মান্য কথ্য ভাষায় জ্ঞাপনের নানা দিক নিয়ে কোনো আলোচনা এসব বইয়ে নেই।

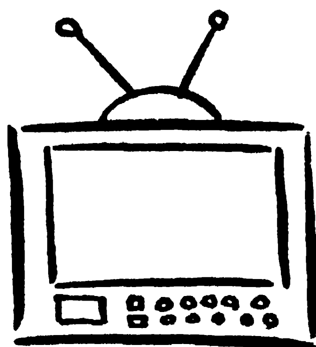
৫ পবিত্র সরকার, 'বাংলা গদ্য : রীতিগত অনুধাবন', *গদ্যরীতি পদ্যরীতি*, ১৯৮৫, পৃ. ৬৮-৭১

৬ এ নিয়ে আলোচনা করেছেন H.W. Fowler তাঁর *A Dictionary of Modern English Usage*-এ এবং Eric Partridge তাঁর *Usage and Abusage* বইয়ে।

৭ দ্র. 'Redundancy', 'Verbosity', Eric Partridge, *Usage and Abusage*, Penguin books, 1963

৮ পবিত্র সরকার, *বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, ১৯৮৭, পৃ.৩৮

৯ সুভাষ ভট্টাচার্য, *তিষ্ঠ ক্ষণকাল*, ১৯৯৯, পৃ. ১০



খবর বলছি...

দেবেশ রায়

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাততুল্য চিন্তক ও লেখক জর্জ বার্নার্ড শ ছিলেন বিশ শতকে তিরিশ-চল্লিশের দশকের মোহনীয় এক মানুষ। জে. বি. এস. এই সংক্ষেপণের স্টাইল, নাটকের চাইতে ভূমিকা বড়ো লেখা, চাঁছা কথা মুহূর্তে প্রবাদ হয়ে যাওয়া—ব্যক্তিত্ব যেন ফুলকি ছোটাত। এক ধরনের সমাজতন্ত্রী ছিলেন, আর বোধ হয় একটু স্নবও।

শ-এর রাজত্বকালে আমি নেহাতই শিশু ও বড়ো জোর বালক। বাড়িতে শ-মুগ্ধতা ছিল, বাবার ও দাদার। ফলে দুটো-একটা বইও ছিল। যদ্দূর মনে পড়ে, স্কুলের শেষের দিকেই বোধ হয় শ পড়ি, নাটক। ভূমিকার কিছুই বুঝতে পারিনি, সংলাপ কিছু কিছু মনে গেঁথে গিয়েছিল। পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই শ মারা গেলেন আর সবাই শ-কে ভুলে গেল। দু-এক বছরের মধ্যেই শ কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়ে নোট বইয়ে জায়গা পেলেন।

এত কম বয়সের কথা তো, তাই ভুলতে পারি না। তখনই কোনো এক সচিত্র ইংরেজি সাপ্তাহিকে শ-এর ফটো-কাহিনিতে তাঁর লন্ডনের বাইরে গ্রামে ফোন-রেডিয়োহীন কাঠের বাড়ি দেখা।

এক-এক সময় মনে হয়, ফোনটা ছেড়ে দিলে হয়। সাহসে ও হিসেবে কুলোয় না। পেট্রোল-ডিজেলের দর বাড়ছে, বাস-মিনি-ট্যাক্সিরও রেট বাড়ছে। ফোন ছাড়া তো কোনো জন্ম-মৃত্যু-বিচ্ছেদ-বিবাহতেও গরহাজিরার মিথ্যে বলা যাবে না।

কিন্তু ফোনে সত্যি কথা বলা অসহ্য হয়ে উঠছে। হঠাৎ করে আমাকেই চায়, তারপর একটা অদ্ভুত অ্যাকসেন্টের ইংরেজির ঝড়। কুণ্ঠিত গলায় বলি, 'বাংলাতে বলা যায় না একটু?' 'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই', ঝড়ের গতি ও অ্যাকসেন্টের বিপর্যয় তাতে ঠেকে না। আমি সময় দিলেই ওদের বিলেতি ইন্সিয়োরেন্সের কোনো এক্‌জিকিউটিভ এসে আমাকে ওদের 'লেটেস্ট' অফার বুঝিয়ে দেবেন।

'আসলে তো স্যার, লাইফের ডেফিনিশনটাই বদলে গেছে।'

মেয়েটিকে কী করে বোঝাই কিংবা জানাই যে মনোজ মিত্র তাও লিখেছেন, 'বাঞ্ছারামের বাগান'-এ। বই-ফিল্‌ম-নাটক। পড়েননি বা দেখেননি? একজনকে কথাটা বলে ফেলায় সে বলল, 'ইয়েস স্যার! আশ্চর্য! আপনি এই বয়সে এত ট্র্যাক রাখেন কী করে। আমাদের কোম্পানি আমাদের এই নিউ কনসেপ্ট অব লাইফটাকে পপুলারাইজ করতে অক্টোপাস-ক্যাম্পেন শুরু করেছে—থিয়েটার, ফিল্‌ম। আপনি কি ইংরেজিটা দেখেছেন, স্যার, ওই *দি গার্ডেন অব বাঞ্ছা?*'

এখন আমি পরিত্রাণের একটা সহজ উপায় বের করেছি। আমিই কথাটা শুরু করি, 'ইন্সিয়োরেন্স, রিট্যায়ারমেন্ট বেনিফিটস, না বিউটি ক্রিম? তাহলে, আপনি মিছিমিছি খাটবেন না। আমার বয়স ৭৪।' এর জবাবে বেশিরভাগ সময়ই লাইন কেটে দেওয়ার আওয়াজ হয়—প্রচলিত দুঃখপ্রকাশ বা ধন্যবাদ ছাড়াই। একজনই হেসে বলেছিল, 'না স্যার, আমরা তো স্যার রিংটোন।' 'আমার তো ভাই মোবাইলই নেই।'

বড়োমেয়ে এসে একদিন খুব রাগারাগি করে গেল। একেবারে হামাটানার বয়স থেকেই ও আমার ওপর রেগে থাকে। 'ওইসব থার্ডক্লাস ফোন তুমি ধর কেন? বুঝলেই রেখে দেবে।'

এখন বড়োমেয়ের ছেলের বয়স চৌদ্দ। আমি বললাম, 'সে কী রে? আমাকে একজন ফোন করছে আর আমি ধরবই না? তুইও তো হতে পারিস।'

'নিশ্চয়ই ধরবে। তোমার যা মনে হয়, তাই করবে। মা-র কথা শুনবে না কি? তুমি তো মা-র বাবা,' আমার নাতি বাতলায়।

আরে ওগুলো তো প্রিরেকর্ডেড ভয়েস। কথা বলে না কি? ক্যাসেট বাজে। দাঁড়াও একটা 'কলার আইডেনটিটি ডিভাইস' লাগিয়ে দিয়ে যাব—তাতে দেখতে পাবে কত নম্বর থেকে কল আসছে।'

আমার বড়ো মেয়ে বরাবরই করিৎকর্মা। দু-দিন পর সন্ধ্যায় আমার নাতি এসে ফোনে খুটখাট করতেই লোডশেডিং। 'রাবিশ,' বলে নাতি চলে গেল, 'কাল সকালে—'। ওর চটির আওয়াজ, এক থেকে চার তলা নানা উচ্চাবচতায়, ভেজা ঢাকের মতো বাজতে লাগল।

পরদিন সকালে এসে খুটখাট করে কাজটা চুকিয়ে ফেলে, ফোনের পাশে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে তার মোবাইল ফোনে আমার নম্বর ডায়াল করল। আমার ফোন থেকে, 'যব তুম্ না নাচে, কথাগুলো সুরে বেরোতে লাগল। নাতি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে শেখাল—'এই যে আমার নম্বরটা ফুটে উঠেছে। তুমি দেখে ঠিক করবে, ফোনটা তুলবে কী তুলবে না।'

'আর গানটা?'

'ওটা গান কোথায়? ওটাই তো রিংটোন। অন্য রিংটোনও বসাতে পার। একইরকম করে ফোন যদি প্রত্যেক বার বাজে তাহলে বোরিং না?'

'মানে—যদি আমি রিসিভার না তুলি, তাহলে এই গানটি আমাকে শুনে যেতে হবে?'

'বাই ডিফল্ট। যতক্ষণ তোমাকে যে ফোন করছে সে তোমাকে ডিসকানেক্ট না করে।'

'তোর মা উন্নতিটা কী করল? আগে ফোন তুলে ইন্সিয়োরেন্স শুনতে হত। আর এখন ফোন না তুলে এই গান শুনতে হবে।'

'তা কেন? তুমি তো এখন দেখতেই পাচ্ছ, কে ফোন করছে, এখানে নম্বরটা দেখতে পাচ্ছ না?'

'দেখতে তো পাচ্ছি। জানব কী করে এটা কার নম্বর, তুলব কি না।'

'সে তো মনে রাখতেই হবে দাদু। আগে, যে ফোন করত, সে বলত, আমি রোহণ বলছি। এখন যে ফোন ধরে, সে বলে, হ্যাঁ, বলো রোহণ। তুমি

কি এখনও—কে বলছেন, কে—এ, অ্যাঁ, অ্যাঁ—কর নাকি? এরপর কোরো না, এই যে ডিভাইস বসিয়ে দিয়ে গেলাম।'

'এই তোর মায়ের ডিভাইস? আগে আমার ইচ্ছেমতো আমি ফোনটা তুলতে পারতাম বা তুলতাম না। তুললে লাইফের নতুন ডেফিনিশন শুনতে হত। এই তো?'

'বেশ। তাই। তো—?'

'তোদের ডিভাইসের ফলে—হয় আমাকে তুলে ইন্সিয়োরেন্স, নয় আমাকে না তুলে এই গানটা শুনে যেতে হবে। তার আগে এত-এত নম্বর মনে রাখতে হবে।'

'দাদু, তোমরা-না নতুন কিছু হলেই তার খুঁত ধর। আগে তোমাকে ফোন না ধরা পর্যন্ত ক্রি-ই-ই-র্ং ক্রি-ই-ই-র্ং শুনতে হত না? তার বদলে এখন গান শুনছ। ক্ষতিটা কী হচ্ছে তোমার? ক্রিং-ই-ই-র্ং-এর বদলে গান।

দুই

'লেটস মেক থিংস হ্যাপেনিং।'

'আসুন, কিছু করে দেখাই।'

টেকনোলজি এখন ভাষাকে চোখে চোখ রেখে এমন সহজ ডাকার ভাষা করে তুলেছে। দুনিয়া-জোড়া হাজার-হাজার টিভি চ্যানেলে আহ্নিক গতি জুড়ে লক্ষ লক্ষ বিষয়ে কোটি কোটি কথা বলা হচ্ছে। ওই চোখে চোখ রেখে সরাসরি।

এটা সম্ভব হচ্ছে, কারণ টিভি পর্দার চোখ-দুটোকে চোখ রাখতে হচ্ছে, একজোড়া কাল্পনিক চোখের ওপর। পর্দা যে আমাকে দেখতে পাচ্ছে তার ইশারা পাওয়া যায় কিছুটা চোখে, কিছুটা পোশাকে, কিছুটা স্বরে। পর্দা থেকে একটি মেয়ে হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে যে চোখ মেরে গেল, সে কি সম্ভব, আমার চোখে চোখ না রেখে!

ভাষা ও ভঙ্গির এমন ছলনাময় অদলবদল ছাড়া টেকনোলজি নিষ্ক্রিয় হয়ে যেত। কতকগুলি ভঙ্গির সঙ্গে কতকগুলি অর্থ আমাদের মনের অভ্যাসে মিশে আছে। অন্তত আড়াই হাজার বছর আগে থেকেই মিশরে-ভারতে মানবভঙ্গির অর্থ জানা যায়—সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, পিরামিডের রেখাঙ্কনে। আমরা জানি—দানের ভঙ্গি কী, মিশরের রানির সেই ভঙ্গিতেই আমরা

শ্রাদ্ধে পুরোহিতকে দান করি। আমরা জানি—শকুন্তলার পায়ে কাঁটা ফোঁটার ভঙ্গি কী ও অর্থ কী, সেই ভঙ্গিই আমরা ঐশ্বর্য রাইয়ে দেখি যখন আধ-এক মিনিটের কোনো বিজ্ঞাপনে তিনি রাস্তায় ঘুরে দাঁড়ান।

আমরা জানি কোনারকের মিথুন-মাতাল যুগল তাদের উত্তল (আঁজলায়) কোন বিপরীত উত্তানকে আকার দেয়, তাই, জাঙিয়া-পরা বা ব্রা-বাঁধা পূর্ণায়ত পুরুষ বা নারীর হোর্ডিং কলকাতার ট্র্যাফিকসংকুল রাস্তায় এত চকিতে এত কথা জানিয়ে দিতে পারে।

যে অর্থ মনের অভ্যস্ত—তা বাক্যের হতে পারে, ভঙ্গির হতে পারে, তারই সঙ্গে ছলনাটা ঘটায় টেকনোলজি, একেবারে অকল্পনীয় সব মিল দেখিয়ে। যে ছলনার আয়ু তো এক-দেড় সেকেন্ড। এইটুকু সময়ে কোনো দর্শকের পক্ষে কি ভুলে যাওয়া সম্ভব— চোখ মারার অর্থ? একেবারে ব্যক্তিগত অথচ অভ্যাসিক? অর্থ? ওইটুকু সময়ের পরে, ওই এক-আধ সেকেন্ডের পরেও কি কারো পক্ষে মনে রাখা সম্ভব যে সে একটা গোপন ইশারা পেয়েছে।

এক-আধ সেকেন্ডেও হয়তো বেশি বলা হল। এক-পলক বলতে যে-সময়টুকুর সংকেত আসে সেটুকুই যথেষ্টর চাইতে বেশি—অভ্যাসিক অর্থ থেকে টেকনোলজির অর্থের দিকে সরণের। এক-আধ সেকেন্ড করে সরতে সরতে—এখন টেকনোলজি খুব তাড়াতাড়িই অভ্যাসিক অর্থ থেকে অভ্যাস মুছে দিতে পারে।

বা, এক জায়গায় টেকনোলজির অভাব, আর-এক টেকনোলজি দিয়ে পুষিয়ে নিতে পারে। টেলিগ্রাফের টেকনোলজির বিস্ময়ের কণাটুকুও কি এখন অবশিষ্ট আছে? বিশ শতকের তিরিশের দশকের মাঝামাঝি ইংল্যান্ড-ভারতের মধ্যে টেলিগ্রাফ চালু হয়। ফলে, ভারতের সাম্রাজ্যের ক্ষমতা কাকে কী ভাগ করে দেওয়া হবে, তা নিয়ে ভাইসরয় ও কমান্ডার-ইন-চিফের সঙ্গে লন্ডনে ভারত সচিবের চিঠিপত্র লেনদেন রাতারাতি ঘটতে লাগল। তার আগে যে ১৭৮ বছর ধরে ব্রিটিশ ভারতের প্রতিষ্ঠা, আধিপত্য বিস্তার, প্রশাসন ও যুদ্ধ চলেছে সেই পৌনে দু-শো বছরের মধ্যে ১১২ বছরই তো গেছে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে পঁয়ত্রিশ দিনের জাহাজ যাত্রায় ইংল্যান্ড ভারতের মধ্যে। সেটা অর্ধেক হয়ে ১৮ দিন হল, ১৮৬৯-এ সুয়েজ খাল খোলার পর। এতে তো ভারত লুঠও কিছু কম হয়নি, সাম্রাজ্যবিস্তারও কিছু

কম ঘটেনি। টেকনোলজি সংযোগের গতি এই মুহূর্তে নামিয়ে আনার আগে গতির অভাবে সাম্রাজ্যবিস্তার ঠেকে থাকেনি। কারণ, সংযোগের গতির অভাব পুষিয়ে দিয়েছিল, ইংরেজদের বন্দুক-কামানে গুলি ভরার ও ছোঁড়ার দ্রুততর গতি। ফোন কিংবা জেট প্লেনের অভাব পুষিয়ে দিয়েছিল বন্দুক-কামান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে অনেকসময় বলা হয়—রেডিয়োর লড়াই। তখন সবেমাত্র রেডিয়ো-প্রচার শুরু হয়েছে। গোয়েব্‌ল্‌স এই নতুন মাধ্যমকে যুদ্ধ তৈরির কাজে লাগালেন। ১৯৩৩-এ ক্ষমতা দখলের ভোটে জেতার আগে নাতসিরা দখল করতে পেরেছিল সমস্ত গণ-সংগঠন, আর্থিক সংস্থা ও ব্যবসায়ী ব্যবস্থা। নানা কারণে সেটা সম্ভব হয়েছিল। প্রধান একটা কারণ ছিল—রেডিয়ো-প্রচার। রেডিয়োতে নাতসি নেতাদের বক্তৃতা ও দেশের ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় এস-এস-এর লুঠপাট, রাহাজানি, খুনখারাপি, ধর্ষণ-মর্ষণ প্রচারিত হত রাজনৈতিক আন্দোলন বলে ও এস-এসদের রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষমতার দাপট বলে।

নাতসি-রাষ্ট্র তৈরি হওয়ার পর সেই রেডিয়োই ব্যবহার করা হল—পৃথিবীর বিরুদ্ধে। রেডিয়োর প্রচার-গতিতে ও পুনরাবৃত্তিতে নাতসি দর্শন নেমে এল রোজকার স্লোগানে। বক্তৃতার এক নতুন ধরনকে অননুকরণীয় করে তুললেন হিটলার—যেন পুরাকালের কল্পিত কোনো ঈশ্বরের সেনাবাহিনীকে আত্মদানে আহ্বান করছেন কল্পিত ঈশ্বরের বাস্তব প্রতিনিধি, ফ্যুয়েরার। রেডিয়োয় এই মুহূর্তের প্রচার—সন্নিহিত দেশগুলি নির্লজ্জ দখলের নতুন নাম দিল, 'পিতৃভূমি উদ্ধার।'

রেডিয়োর টেকনোলজির আনুষঙ্গিক ছিল—মাইক্রোফোন, গলার স্বরকে এতটা উঁচুতে তোলা যেত, যাতে একসঙ্গে অনেক লোক শুনতে পায়। মাইক্রোফোন ধ্বনিকে উঁচু করার কৃৎকৌশল। ১৯২১-এ উড্রো উইলসন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ৫০০০ লোকের এক সমাবেশে মাইক্রোফোনে ভাষণ দিয়েছিলেন। ইয়োরোপের অনেক দেশেই তিরিশের দশকের মাঝামাঝি মাইক্রোফোন ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতারা মাইক্রোফোন ব্যবহার নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন। প্রাক্‌-মাইক্রোফোন কালের সমাবেশের আকার, স্বভাব, নেতাদের বাচনের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য, সবই যেন বদলে যাচ্ছিল।

হিটলারই ইয়োরোপের প্রথম নেতা, যিনি মাইক্রোফোন ব্যবহারের উদ্দেশ্যটাই উলটে নিলেন। যেন, মাইক্রোফোন তার গলার আওয়াজটা বড়ো করে একইসঙ্গে অনেকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে না, যেন মাইক্রোফোন সৃষ্ট আওয়াজটা তাঁরই গলার স্বাভাবিক আওয়াজ। মানব কণ্ঠের সাধ্যের বাইরের আধিভৌতিক আওয়াজ যিনি নিজের কণ্ঠস্বরে বদলে নিতে পারেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটা আধিভৌতিক ব্যক্তিত্বও নিজের ওপর আরোপ করেন ও সেই আধিভৌতিক ব্যক্তিত্ব মেনে নিতে বাধ্য করেন।

তাঁর *গ্রেট ডিকটেটর*—সিনেমায় চার্লি চ্যাপলিন হিটলারের এই পদ্ধতিটা ধরে ফেলেছিলেন। তাই হিটলার মাইক্রোফোনের সামনে একাধিকবার আসেন। তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা করেন। একবার, মাইক্রোফোনটি জ্যান্ত হয়ে ওঠে, ভয়ে বা প্রতিবাদে। অর্থনীতির দরকারে ইহুদিদের ওপর আক্রমণে সামান্য বিরতির ঘোষণা মাইক্রোফোন মারফত রেডিয়ো থেকে প্রচারিত হয়।

শেষ দৃশ্যে হিটলারের বিহ্বল প্রতিকল্পকে হিটলারের বিভ্রান্ত অনুগামীরা মঞ্চে তুলে, মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তৃতা মাইক্রোফোনে ও রেডিয়োতে দেশ-দেশান্তরের মানব-মানবী-শিশুর গভীর প্রার্থনার কোরাস হয়ে উঠতে থাকে। মানুষ তার নিজের টেকনোলজি পুনরধিকার করে।

তিন

পরাধীন বলে ও পরাধীন ছিলাম বলে টেকনোলজি আমাদের হয় হাত পেতে, নয় ঘাড় নুইয়ে, নিতে হয়েছে। দরকারটাও আমাদের নয়। আমাদের যে-দরকার সাহেবদেরও দরকার নয়, তা মেটাতে কোনো টেকনোলজি সাহেবরা আমাদের ধারও দিত না। পাট সাহেবদের চটকলে লাগত। তাই পাটের ফলন বাড়াবার ব্যাপারে সাহেবদের চোখ ছিল। ধান সাহেবদের দরকারে লাগত না। তাই ধানের ফলনের দিকে সাহেবদের চোখ ছিল না।

আবার পরাধীনতার কারণেই কতকগুলি টেকনোলজি ও তার প্রয়োগকে আমাদের বদলে নিতে হয়েছিল স্বাদেশিক প্রেরণায়। সাংবাদিকতা তেমন একটি বিষয়। সেই বিষয়ের ভিতরে ছিল অনেকরকম

টেকনোলজি—ছাপা ও ভাঁজ সংক্রান্ত। রেডিয়ো-সম্প্রচার তেমনই আর-একটি বিষয়। তারও ভিতর ছিল আরও অনেক টেকনোলজির ব্যবহার। সাংবাদিকতা ও সম্প্রচারের অন্যান্য বিষয় নিয়ে এই নিবন্ধে আমরা কোনো কথা তুলছি না। আমরা শুধু দেখতে চাই—রেডিয়ো, খবরের কাগজ কতটা বাঙালি বৈশিষ্ট্য লেখায়, পড়ায়, বলায় ও শোনায় আনতে পেরেছিল। বাঙালি বৈশিষ্ট্য বলতেই-বা আমরা কী বুঝতে চাই।

বাংলা খবরের কাগজে এমন অনেকে তখন কাজ করতেন, যাঁরা লেখক হিসেবেই এত বড়ো দরের ছিলেন যে তাঁদের পক্ষে বেশ নামজাদা ইংরেজি কাগজের সাংবাদিকতার আলাদা কোনো টান ছিল না। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন জেলখাটা বিপ্লবী। তাঁরা দেশকে চিনতেন—জানতেন নিজের বাড়িঘর, উঠোনের মতো। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় সমস্যা ছিল তাঁদের নখের ডগায়। তাঁদের রাজনীতির পক্ষপাতিত্ব কোনো সময়ই লুকোনো থাকত না। প্রধানত ব্রিটিশবিরোধী, কোনো কোনো কাগজ কংগ্রেসপন্থী গান্ধীবাদী, কোনো কোনো কাগজ অনির্দিষ্ট বিপ্লববাদী। তেমন একটা অংশই সুভাষচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঝগড়ার সময় সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছেন। তখন প্রধান কাগজ ছিল—*দৈনিক বসুমতী*, *যুগান্তর* ও *আনন্দবাজার পত্রিকা*। প্রচার ও জনমত সংগঠনে এই কাগজগুলির প্রাধান্যও ছিল—এই ক্রম অনুযায়ী।

১৯৩৫-এর 'ভারত শাসন আইন' অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভিত্তিতে ১৯৩৭-এর জানুয়ারিতে প্রাদেশিক আইনসভার প্রথম ভোট থেকে বাংলা কাগজগুলির ভিতরের এসব রাজনীতির সূক্ষ্ম ভাগাভাগি মুছে গেল। সব কাগজই তারস্বরে সাম্প্রদায়িক হয়ে গেল। সাম্প্রদায়িকতার জিভ ছিল সাপের জিভের মতো কাটা। তার এক ডগা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াত, আর এক ডগা তপশিলি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিষ ছড়াত। এই দুই শত্রুর কাছে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ এত তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল যে অগাস্ট আন্দোলনের খবরও এসব কাগজে যথেষ্ট কম বেরোত। হিন্দু কাগজগুলির এই সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়ায় ও মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক স্বাধিকারের আন্দোলনের প্রয়োজনে *আজাদ* ও *ইত্তেফাক* কাগজ দু-টি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার পোষকতা শুরু করে।

বাংলা খবরের কাগজে বাঙালি যে-বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছিল, তার জায়গায় নতুন এই বাঙালি বৈশিষ্ট্য এল—চিৎকৃত সাম্প্রদায়িকতা। ১৯৪০ থেকে প্রায় ১৯৭০ পর্যন্তই এই বিদ্বিষ্ট, চিৎকৃত, বিকারগ্রস্ত ও অপ্রমাণিত সংবাদনির্ভর সাংবাদিকতা বাংলার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। রেডিয়োতে বরং নীলিমা সান্যাল, বিজন বসু ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় ও প্রণবেশ সেনদের মতো স্থিতধী কয়েকজনের লেখা সমীক্ষায় উদার ও চিন্তাশীল প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণ পাওয়া যেত। ১৯৬২-র চীনা আক্রমণের পর কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা হেডিং দিয়েছিল—'সারা দেশে দেশদ্রোহী গ্রেপ্তার'। তখন রেডিয়োতে খবর পড়তেন বিজন বসু। তৈরি যে বুলেটিন তিনি পড়তেন, তাতেও তাঁর স্বরে বা উচ্চারণে ওই ধরনের বিকৃত শব্দ শোনা যায়নি।

এর মাত্র সাত-আট বছরের মাথাতেই দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সংবাদ ও সমীক্ষা পাঠে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এক প্রধান অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেন। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর এই বেতার পঠনের জন্য যে অপেক্ষায় থাকতেন ও সেই পাঠ থেকে যে-নতুন শক্তি প্রতিটি রাতে নিজেদের ভিতর সঞ্চারিত করতেন—তা সত্যিই এক মহান আখ্যানের যোগ্য বিষয়। সে-আখ্যান লেখা হয়নি। বাংলা সাংবাদিকতায় সেই ঘটনা উজ্জ্বলতম গৌরব। কাগজের সাংবাদিকতার কিন্তু বাংলায় সে-গৌরব নেই। কিন্তু রেডিয়ো ও কাগজকে মিলিয়ে তখনও আমরা মিডিয়া বলি না।

মিডিয়া বলে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে সত্তর দশকের শেষে টিভি আসার পর। দিল্লিতে তো তার অনেক বছর আগেই টিভি ছিল, তবু মিডিয়ার ধারণা তৈরি হয়নি তখন। তখন টিভি ছিল বড়োজোর বাড়িতে বসে ছোটো একটা স্ক্রিনে সিনেমা দেখা। সিনেমা মানে এমন ছবি, যা চলাফেরা করে ও কথা বলে—সিনেমা মানেই সেলুলয়েড নয়।

খবরের কাগজ-টিভি-স্টিল ফটোগ্রাফি-মুভি-টকি-বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞাপনের জন্য তৈরি আধ-এক মিনিটের টুকরো ফিল্ম—ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু মিলিয়ে মিডিয়া-র ধারণাটা তৈরি হয়েছিল। সব ধারণাই যেমন, তেমনি 'মিডিয়া'—ধারণাও, ধারণা হওয়ার আগে ছিল—বিক্রি করা যায় এমন উৎপাদনের মাধ্যম। সব ধারণাই যেমন, তেমনি 'মিডিয়া-ধারণাও, ধারণা থেকে দর্শন—জ্ঞানতত্ত্ব ও প্রয়োগতত্ত্ব মিলিয়ে তৈরি দর্শন রচনার দিকে মোড় নিচ্ছে ও আমাদের প্রচলিত ও পুরোনো সব ধারণা ধসিয়ে দিচ্ছে।

কাকে মিডিয়া বলা যাবে ও কবে থেকে, সে-প্রশ্নের জবাবে স্থানকাল নিয়ে খুবই সাবধান হওয়া দরকার। ১৯৬৪ সালে বেরিয়েছিল মার্শাল ম্যাকলুহান-এর সেই বইটি, 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিডিয়া', যার পরে আমরা আর পুরোনো চোখে, নতুন কিছু দেখতে পারিনি। সেই সময়ই জন বার্জার-এরও একটা ছোটো বই বেরিয়েছিল—'অন্যরকম দেখা'। ভিয়েতনামের যুদ্ধে পৃথিবীর শক্তিমত্তম দেশ তখন নাজেহাল।

আশির দশকের মুখোমুখি তিনটি ঘটনা ঘটল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতির গতিহীনতা ধরা পড়ে গেল। ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য নাকে খত দিয়ে দেশে ফিরল। আর, ডিজিট্যাল সংযোগ ব্যবস্থা একটা ব্যাবসা হয়ে উঠল।

এই ডিজিট্যাল সংযোগ ব্যবস্থা যেমন অক্ষরকে লেখা থেকে বিন্দুতে নিয়ে গেল, তেমনি মানবশরীরের অজ্ঞাত ও দুর্গমতম সব জায়গা—মানুষের মাথার ভিতরটা, যকৃতের ভিতরটা, চোখের মণির ভিতরটা সার্জেনের হাতে-ধরা একটা আট-দশ ইঞ্চির সরু সন্না বা চিমটের আওতায় নিয়ে এল। অতীতে যেমন, বাষ্প, তেল ও বিদ্যুৎ বিভিন্ন সময়ে উৎপাদনের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল, মধ্যসত্তরের দশকে তেমনি জায়গা পেয়ে গেল—ডিজিট্যাল উৎপাদন ব্যবস্থা। আর এটা ঘটল—এতদিনকার নানা উৎপাদন—অবলম্বনের যৌথ প্রয়োগে। যেমন, গাড়ি চলে পেট্রোল বা ডিজেল বা রান্নার গ্যাসে কিন্তু গিয়ার বদলে, জানলা তোলা ও খোলায়, স্টিয়ারিং ঘুরোনোয় এসে গেল ডিজিট্যাল।

মেকানিক্যাল উৎপাদন ব্যবস্থাকে সরিয়ে ডিজিট্যাল উৎপাদন ব্যবস্থা এসেছে। মেকানিক্যাল উৎপাদনে যন্ত্র একটা কাজ একবারে করত। আর, ডিজিট্যাল উৎপাদনে সিস্টেম একইসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করে।

চার

খবরের ব্যাপারে কাগজের লেখা ভাষা আর টিভি-র বলা-ভাষার মধ্যে কোনো মিল থাকার কথা নয়। কাগজে খবর আসে সাংবাদিকদের কাছ থেকে। অন্যান্য যে-পদ্ধতিতেই খবর আসুক—তাও সাংবাদিকই কারো লেখা। সংবাদের ভিতর যেসব কথা খুঁটে বের করা যায়—তাই নিয়ে ফিচার বা বিতর্ক বা মতামত যে ছাপা হয় কাগজে, সেগুলো নিশ্চিতভাবেই সেসব

কথা তোলার যোগ্য ব্যক্তিদের দিয়েই লেখানো হয়। এই সবকিছু ধরলে কাগজের কোনো এক সম্পাদনা থাকবেই, আজকাল তাকে গেটকিপারিও বলা হয়—সম্পাদককে জানতেই হয় তাঁর গেট দিয়ে কী ঢুকছে আর কী ঢুকছে না। এই গেটকিপারির সুবাদে এক-একটি কাগজ রাজনীতি, সম্প্রদায়, ধর্ম এসব নিয়ে নিজেদের মতো প্রচার করতে পারে।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা ই-নিউজকে গেটকিপারি থেকে আলাদা করতে গেটওয়াচ পরিভাষাটি একটু-আধটু ব্যবহার হচ্ছে। তাতে গেটকিপারির চৌকিদারির বদলে, এমনকী নজরদারিরও বদলে, জোর পড়ছে গেটের বাইরের রাস্তার ওপরে। সেখানে কী ঘটছে বা যা ঘটছে, গেটের এপাশ থেকে যে দেখছে, সে তার কোনো কিছুই তো বদলাতে পারবে না। তাই গেটওয়াচিং, মানে, গেট থেকে দেখাই হয়ে উঠছে ওয়েব ও নেটধৃত তথ্যের জগৎ—সে জগৎ সম্পূর্ণ না-জানা, সে-জগৎ প্রতি মুহূর্তে জানা।

তথ্যের ঘটনাস্থল আর ঘটনার ঘটনাস্থল ক্রমেই আলাদা হয়ে যাচ্ছে। যে-ঘটনা একটি কোনো জায়গায় ঘটে সেটাই এতদিন ছিল ছাপা-খবরের একমাত্র বিষয়—সেটা কোনো প্রসূতির চার সন্তান প্রসবের ঘটনাও হতে পারে বা সল্টলেকে বিয়ের বরের হারিয়ে যাওয়াও হতে পারে। যা ঘটছে, তাই খবর, তাই ছাপা হয়। এই কথাটা 'নিউইয়র্ক টাইমস' একসময় খুব সাজিয়ে বলত, 'এই তো সমস্ত খবর, যা-কিছু খবর হয়ে উঠেছে।'

ওয়েব ও নেটে খবর আর খবর থাকছে না। তথ্য বা ইনফরমেশন হয়ে উঠছে। দর্শক সেই তথ্য বা ইনফরমেশনটা জানছে। এই দেখা ও জানার প্রক্রিয়াটার মধ্যে কোনো কারিকুরি নেই—দর্শকের চোখের সামনে ঘটিয়ে দেওয়া হল ঘটনাটা। একজন রিপোর্টার যেমন দেখে, দর্শকই তেমন দেখছেন। দর্শকই তাহলে রিপোর্টার হয়ে উঠছেন। যেমন, যিনি খবর দিচ্ছেন—তিনিও এক রিপোর্টার। তার ওপর ঘটনাস্থল থেকে 'আমাদের প্রতিনিধি...' ও 'ক্যামেরা'য় যাঁরা, তারাও আছেন। স্টুডিয়োতে মন্তব্য করার জন্য এক-আধ জন বিশেষজ্ঞ মজুত থাকেন। এইভাবে আধ মিনিট-দেড় মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে উঠছে—তথ্যভাণ্ডার বা হাইপারটেক্সট। আমরা যদি নেট বা ওয়েব শব্দ দু-টি একটু ভুলে থাকতে পারি, তাহলে বলা যায়—ডিজিট্যাল অনক্ষরে, হ্যাঁ, অনক্ষরে, তৈরি হয় প্রিজমের মতো বহুকোণ তথ্য—সে তথ্য খবরের মতো অব্যবহিত বা immediate নয়, অত্যবহিত

বা hypermediate । অতি+ অবহিত = অত্যবহিত— শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়, যা জানার প্রক্রিয়ায় কোনো ছেদ ঘটে না। যেমন, অবচ্ছিন্ন, অবচ্ছেদ, অবশেষ, অবিরাম, অবিরত। আর যখন যা অবহিত হওয়া হচ্ছে তা হয়ে ওঠে 'অত্যবহিত'—hypermediate. অতি + অবহিত, তখন mediate করার প্রক্রিয়ার কথা দুই জায়গাতে বলা হয় প্রাপক বা গ্রাহককে প্রাধান্য দিতে। এতে একটা ভুল ধারণা রক্ষা করে যাওয়া হচ্ছে যেন খবরের কাগজ আর টিভির পর্দার কাজটা একই—এক জন শেষ পাঠক বা গ্রাহকের কাছে পৌঁছোনো। কাগজের পাঠক মাত্রই পাঠক। গ্রাহক নন। টিভির গ্রাহক, মাত্রই গ্রাহক। পাঠক নন।

এ লেখাটির কোনো টেকনো-জ্ঞানতাত্ত্বিক উদ্দেশ্য নেই। কাগজ আর টিভি মিলিয়ে আমাদের *মিডিয়া* বলে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে। সেই ধারণা আরও বোধগম্য করতে—মুদ্রণ মাধ্যমে, প্রিন্ট মিডিয়া আর ইলেকট্রনিক মিডিয়া—এমন ভাগাভাগিও করা হয়। ধারণাকে সহজ করে নেওয়ার এই জনপ্রিয়তায়—আমাদের কাগজগুলিতে টিভির মতো খবর ছাপা হচ্ছে আর আমাদের টিভিতে কাগজের মতো খবর বলা হচ্ছে।

দোষগুণ ও উচিত-অনুচিতের কথা এখানে অবাস্তব। নানারকম প্যাঁচও আছে।

যেমন প্রধান একটা ব্যবস্থাগত প্যাঁচ। চব্বিশ ঘন্টা চলছে এমন নিউজ চ্যানেল তো এখন বাংলাতেই কতগুলো। যে-খবরগুলি দেখে গ্রাহক শুতে গেছে—পরদিন সকালে পাঠক হয়ে সে কি সেই খবরই পড়তে চাইবে। বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায়, কাগজগুলি নতুন হেডলাইন করে। এই কারণে প্রথম পৃষ্ঠার খবর এখন কাগজে কমে আসছে। সাংবাদিকতার একটা বড়ো পরীক্ষা ছিল—কোন বার্তা-সম্পাদক কতগুলি খবর প্রথম পাতাতে আঁটাতে পারলেন। এখন তেমন প্রধান খবর প্রথম পাতাতে দিলে টিভির খবরের পুনরাবৃত্তি হবে। এখন পাঁচ-ছটির বেশি খবর প্রথম পাতায় থাকে না। এতটা আগে থেকে প্ল্যান করা যায় না। সেই ফাঁক ভরতে খবরের সম্পর্কহীন খুব ভালো বড়ো ছবি ছাপতে হয়। টিভি-র খবরে যে তাৎক্ষণিকের টান থাকে—সেটার মতো করে কাগজের খবর অকারণ বিশদ হচ্ছে। আর, খবর হিসেবে কোনো ঘটনার মূল্য নির্ভর করছে ঘটনাটির

উপস্থাপনার নাটকীয় সম্ভাবনায়। মিডিয়া নিয়ে ধারণা-বিভ্রাটের ফলে নানা মজার ঘটনাও ঘটছে। দূরদর্শন বাদে অন্য সব চ্যানেলের সংবাদ-পাঠিকারা কোট-প্যান্ট পরেন। পাঠকরা তো টাইও পরেন। যাঁরা এসব ঠিক করেন, তাঁদের নিশ্চয়ই ধারণা কোট-প্যান্ট-টাইয়ে বেশ স্মার্ট লাগে। যাঁদের নকল করে এমন ধারণা তৈরি হয়েছে, সেই সাহেবরা তো শীতপ্রধান দেশের মানুষজন—তাই শীতবস্ত্রের বাহারে তাঁরা চোখ ভোলাতে পারেন। দিল্লির ৪৪-ডিগ্রি গরমে স্মার্ট কোট-টাইয়ে টিভিতে সংবাদ পাঠকদের দেখায় যেন প্রাইভেট সেল্সম্যানদের ইউনিফর্ম পরে আছেন।

কী খবর, কেন খবর, কোথায় খবর, কার খবর, টিভির খবর কী, কাগজের খবর কী—এইসব নিয়ে কলকাতায় বেশ একটা মজা হল। এই ধারণা বিভ্রাটের চাইতে লাগসই উদাহরণ খুব দুর্লভ।

প্রায় একই সময়ে বাংলায় দু-দুটো সংবাদ চ্যানেল খুলল—মার্চ-এপ্রিলে, ভোটের মুখে, দুই চ্যানেলই অষ্টপ্রহরের। *কলকাতা টিভি* ও *২৪-ঘণ্টা*। চ্যানেল শুরুর আগে *কলকাতা টিভি* শহর মুড়ে দিল—সুমন চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেনের, কখনো যুগল, কখনো একক ছবি দিয়ে, হোর্ডিঙে—'আমরা ছাড়া খবর হয় না।' যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, সুমন চট্টোপাধ্যায়ও একজন স্টার ও তাঁর মুখ অপর্ণা সেনের মুখের মতোই সকলের চেনা, তবু, এ তো খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন হল—কাগজেই এক রিপোর্টার ছাড়া খবর হয় না। *২৪ ঘণ্টা* বিজ্ঞাপন করল, 'খবর যেখানে আমরা সেখানে।' হ্যাঁ—এটা টিভি চ্যানেলের বিজ্ঞাপন · টিভির খবরের কোনো স্টার হয় না।

লেখক ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক



টেলিভিশনে বুদ্ধিজীবী

প্রদীপ বসু

বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি মিলিয়ে প্রায় পনেরো-বিশটা সংবাদের চ্যানেল আছে, তাদের মধ্যে আবার ভীষণ প্রতিযোগিতা, সর্বক্ষণ রেটিংস-এর লড়াই চলছে, লড়াই চলছে কে কাকে টেক্কা দিতে পারে, কিন্তু খবর পরিবেশনের দিক থেকে সব চ্যানেলই এক। বিজ্ঞাপনের বিরতির সময় এক চ্যানেল থেকে রিমোটের ঢেউ চড়ে অন্য চ্যানেলে যান, দেখবেন একই খবর, একই ছবি এবং একই বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য বিতরণ করে যাচ্ছেন। এ এক নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণি যাদের আমি নাম দিয়েছি 'চট্‌জলদি বুদ্ধিজীবী'। এক চ্যানেল থেকে অন্য চ্যানেলে এঁদের অনায়াস যাওয়া-আসা, কিন্তু শুধু যাওয়া-আসা এবং স্রোতে ভাসা। কেন সেটা একটু পরিষ্কার করে বলি। প্রথমেই যেটা বলতে হবে তা হল টেলিভিশন কিন্তু কোনো চিন্তা প্রকাশের মাধ্যম নয়। টেলিভিশনে দু-টি জিনিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সময় এবং দ্রুততা। যেকোনো

অনুষ্ঠানে দেখা যায় সময়ের এক অসম্ভব চাপ, তাই সবকিছু দ্রুত শেষ করতে হয়। সময়ের চাপের সঙ্গে চিন্তার সম্পর্ক কিন্তু নেতিবাচক। সোজা কথায়, মাথার উপর কেউ যদি সবসময় বলতে থাকে বেশি সময় নেই, তাড়াতাড়ি শেষ করুন, তাহলে কারও পক্ষেই ভালোভাবে চিন্তা করা সম্ভব নয়। এটা একটা পুরোনো দার্শনিক বিষয়। দার্শনিক এবং সাধারণ মানুষের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে প্লেটো বলেছিলেন, দার্শনিকের সময় আছে, কাজে ব্যস্ত সাধারণ মানুষের কোনো সময় নেই। এককথায় প্লেটো বলছেন যে, ব্যস্তসমস্তভাবে চিন্তা করা যায় না। বলা বাহুল্য, এই তত্ত্ব অনেকটাই অভিজাততান্ত্রিক, সমাজে বিশেষ সুবিধা ও অধিকারপ্রাপ্ত মানুষের যে সময় আছে এই তত্ত্ব সেটা ধরেই নিয়েছে। কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয় তা নয়। এখানে বরং মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই চিন্তা ও সময়ের সম্পর্কের প্রতি। টেলিভিশন যে-সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল সময় ও দ্রুত চিন্তার সম্পর্ক। দ্রুত চিন্তা করা কি সম্ভব? কত দ্রুত চিন্তা করা সম্ভব? যেসব দ্রুত চিন্তাশক্তিসম্পন্ন চিন্তানায়ক ও বুদ্ধিজীবী টেলিভিশনের জমি আঁকড়ে পড়ে থাকেন, তাঁদের দেখে এটাই মনে হয় যে, টেলিভিশনে চট্‌জলদি বুদ্ধিজীবী ছাড়া আর অন্য কোনো চিন্তাবিদকে কোনোদিনই দেখা যাবে না, এটাই আমাদের নিয়তি। আমরা শুধু দেখব সেইসব বুদ্ধিমন্তদের যাঁরা বুলেটের চেয়ে দ্রুত চিন্তা করতে সক্ষম।

কীরকম এই দ্রুত চিন্তা? আগেই বলেছি, টেলিভিশনে সময়ের অনটন লেগেই আছে। এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীরাই টেলিভিশন দেখেন না, সাধারণ মানুষদের জন্যই এইসব অনুষ্ঠান। যত বেশি মানুষ দেখবেন তত অনুষ্ঠানের রেটিং বাড়বে, ফলে ততই বিজ্ঞাপন বাড়বে। বুদ্ধিজীবীকে তাই দ্রুত, সংক্ষিপ্ত এবং বোধ্য বক্তব্য রাখতে হবে। এতটাই বোধ্য হতে হবে যাতে শেষ মানুষটি অবধি তা বুঝতে পারে। প্রশ্ন হল সব প্রশ্নের কি সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য উত্তর হয়? কিন্তু চট্‌জলদি বুদ্ধিজীবীদের এ নিয়ে ভাবলে চলবে না। এঁদের ক্রমাগত টেলিভিশনে নিজেদের মুখ দেখিয়ে যেতে হবে। প্রশ্ন: 'আর হাতে সময় নেই, একটিমাত্র বাক্যে উত্তর দিন, ভারতবর্ষের মানুষের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণ কী?' একটি বাক্যে উত্তর আছে। প্রশ্ন: 'সময় ভীষণ কম তিরিশ সেকেন্ডে বলুন, ভারতে নারীরা এখনও পিছিয়ে রয়েছে কেন?' উত্তর রয়েছে। 'এক

মিনিটে বলুন নৈতিকতার সঙ্গে সামাজিক অধিকারের সম্পর্ক কী?' প্রশ্ন হল এই সব বুদ্ধিজীবীরা এইরকম শর্তে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হন কেন? তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল বুদ্ধিজীবীরা নিজেরাই নিজেদের এই প্রশ্ন করতে ব্যর্থ কেন? বস্তুত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আদৌ কিছু বলতে পারা যাবে কি যাবে না, কিছু বললেও তার সারবস্তু কতখানি থাকবে এইসব বিষয়ে উদ্‌বেগহীনতা থেকে যেটা পরিষ্কার সেটা হল এঁরাও এটা ভালোভাবে জানেন যে ছোটো পর্দায় তাঁদের উপস্থিতি, চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার জন্য নয়, বরং সম্পূর্ণ এক অন্য কারণে। যার মধ্যে প্রধান হল নিজেকে জনসমক্ষে উপস্থিত করা। বিশপ বার্কলি বলতেন 'টু বি ইজ্ টু বি পারসিভ্‌ড', এইসব বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে বলা যায় এঁদের অস্তিত্ব নির্ভর করে নিজেদের সর্বক্ষণ টিভিতে দর্শনীয় করে তোলার উপর। এরজন্য যা সমঝোতা, আপোশ, রফা, রেয়াত করতে হয় হোক, কুছ পরোয়া নেই। নিজেদের অস্তিত্ব যেহেতু নির্ভর করছে মুখনিঃসৃত বচন ও ব্যাখ্যানের উপর তাই এই বুদ্ধিজীবীরা সবসময়ই ছোটো পর্দার জন্য সহজলভ্য। মনে রাখতে হবে যিনি এমন লেখক বা চিন্তাবিদ যাঁর লিখিত রচনার এক দীর্ঘস্থায়ী গুরুত্ব আছে, তাঁকে তাঁর অস্তিত্বরক্ষার জন্য টিভিতে মুখ দেখাবার প্রয়োজন নেই। এইসব চট্‌জলদি বুদ্ধিজীবীরা যে একেবারেই কিছু লেখেন না তা নয়, এঁরা যা লেখেন তা বহুলপ্রচারিত পত্রপত্রিকায় সাধারণত লেখকের ছবি-সহ প্রকাশিত হয়। এর পেছনে মতলব একটাই, টিভিতে ঘন ঘন ডাক পাওয়া। ফলে টিভির পর্দা হয়ে ওঠে নারসিসাস্‌দের এক রকমের দর্পণ। পর্দার পরিসরে যা দেখা যায় তাকে আমরা বলতে পারি নারসিসিস্টদের প্রদর্শনী।

অন্য কথায় যে প্রশ্নগুলি উঠে আসে তা হল, টিভি যে শর্তগুলি আরোপ করে, সেইসব শর্ত মেনে সত্যি কি কিছু বলা যায়? যা বলা হল তা কি সকলের কাছে পৌঁছোনো সম্ভব? আমাকে যা বলতে হবে তা কি সকলের বোধগম্য হতে হবে? এমনকী এই প্রশ্নও করা যায় যে সকলের বোধগম্য হওয়াও কি জরুরি? যিনি টিভিতে আবির্ভূত হচ্ছেন তাঁর পক্ষেও যে প্রশ্নগুলি জরুরি তা হল, আমার সত্যি কি কিছু বলার আছে? আমি কি এই শর্তাবলীর অধীনে সেকথা বলতে পারি? আমার যা বলার সেটা এখন এবং এই সময়ে বলার কোনো মূল্য আছে কি? অর্থাৎ, আমি এখানে এসে কী করছি? যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছোতে হবে এই যুক্তির কারণে

টিভি তার এক নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। অথবা, বলা যায় রাজনীতির এক বিশেষ ধারণা দর্শকদের উপর আরোপ করে। যে-মাধ্যম সবসময় এই ভয়ে শঙ্কিত যে অনুষ্ঠান যেন একঘেয়ে না হয়ে পড়ে, দর্শক যেন চ্যানেল সুইচ্ করে অন্য চ্যানেলে চলে না যায়, সেখানে রাজনীতিও এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করবে, এ আর আশ্চর্য কি? তাই, যদিও বলা হয় দর্শকদের প্রত্যাশা অনুযায়ী অনুষ্ঠান তৈরি করতে হবে, কিন্তু দর্শকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। এই একঘেয়েমির ভয় থেকেই তাই তৈরি হয় এমন অনুষ্ঠান যেখানে বিতর্কের পরিবর্তে দেখা যায় মুখোমুখি সংঘাত, যুক্তির বদলে বাগ্‌বিতণ্ডা। অনুষ্ঠানের নামগুলিও সেরকম হয়, যেমন 'বিগ ফাইট'; অনুষ্ঠানের আগে ছবি ভেসে ওঠে বক্সিং গ্লাভ্‌স-পরা দু-টি হাত ঘুষোঘুষি করছে এবং তার থেকে স্ফুলিঙ্গ ছিটকে বেরোচ্ছে। একটি বাংলা অনুষ্ঠানে তো আলোচনার দুই প্রতিপক্ষকে বক্সিং রিং-এ নামিয়ে দেওয়া হত, মাঝে রেফারির পোশাকে মডারেটর। কঠোর, শৃঙ্খলাবদ্ধ যুক্তির পরিবর্তে এইসব আলোচনায় প্রাধান্য পায় বাদানুবাদ এবং এককথায় এমন সবকিছু করা হয়, যাতে সংঘাত বৃদ্ধি পায়। তাই রাজনীতির আলোচনায় যুক্তিবিচারের পরিবর্তে ব্যক্তিই প্রধান হয়ে ওঠে। রাজনীতির বিশ্লেষণে প্রাধান্য পায় রাজনীতির কলাকৌশল, ভাষণের রাজনৈতিক প্রভাব, এগুলির যথার্থ অর্থ ও সম্পর্কগুলি নয়।

এ সম্পর্কে টেলিভিশনে সংবাদ পরিবেশন ও বিশ্লেষণের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। রাজনৈতিক জগতে সাংবাদিকদের অবস্থান কিছুটা অনির্দিষ্ট। এই জগতে সাংবাদিক একজন গুরুত্বপূর্ণ, প্রভাবশালী সদস্য, কিন্তু পূর্ণ সদস্য নন। এই অবস্থানের জন্যই তাঁরা রাজনীতিবিদদের অত্যাবশ্যক সমর্থন জোগাড় করে দিতে পারেন। একদিকে সাংবাদিকদের এই অবস্থান এবং অন্যদিকে অনুষ্ঠানকে জনপ্রিয় করার তাগিদেই তাঁরা যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তা হল এক সংশয়বাদীর। এই সংশয়বাদ রাজনীতিকে গুটি কয়েক সহজবোধ্য সম্পর্কের ভিত্তিতে দেখে, যেমন সব রাজনৈতিক কার্যকলাপের পেছনে কোনো-না-কোনো স্বার্থ লুকিয়ে আছে এবং সেই স্বার্থও কোনো এক ক্ষুদ্র স্বার্থ। এর ফলে রাজনীতি সম্পর্কিত এক সিনিকাল দৃষ্টিভঙ্গিতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ি এবং এটাই ভাষ্যকারদের বিশ্লেষণ ও সাক্ষাৎকারে প্রতিফলিত হয়। এঁদের কাছে রাজনীতি হল কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের

কার্যকলাপ, যাদের নিজেদের কোনো বিশ্বাস নেই, যারা শুধু স্বার্থের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সচেতন। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে সাংবাদিকতার এই ক্ষেত্রের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যার উৎস হল এই ক্ষেত্রের নিজস্ব প্রতিযোগিতা। যেমন 'স্কুপ'-এর প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ, নতুন এবং সর্বশেষ খবরের প্রতি প্রশ্নহীন পক্ষপাত, যে-সংবাদ আহরণ করা সবচেয়ে শক্ত তাকে বিনা প্রশ্নে প্রচার করা। এইসব ক্ষেত্রে মূল সংবাদটির কোনো গুরুত্ব নেই, কত পরিশ্রম করে প্রতিবেদক এবং চ্যানেলটি সেটি সংগ্রহ করেছে সেটাই ফলাও করে প্রচারিত হয়। এর সঙ্গে আরও যোগ করতে হবে ভবিষ্যদ্‌বাণী করার প্রবণতা। যেহেতু সাধারণ দর্শক সাম্প্রতিক ঘটনাবলির কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পায় না এবং যার ফলে এক ধরনের সামূহিক স্মৃতিলোপের স্বীকার হয়, তাই ভবিষ্যদ্‌বাণী করার এই খেলাও খুব সহজ হয়ে যায়। সকলেই জানেন এই ভবিষ্যদ্‌বাণী কয়েকদিন পর আর কেউই মনে রাখবে না।

এই ক্রিয়াবিধির ফল হল রাজনীতি সম্পর্কে এক রকমের অনীহা, অরুচি, অনাসক্তি সৃষ্টি করা। কারণ যখনই রাজনীতি কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ অথচ অনাকর্ষণীয় প্রশ্ন তোলে তখনই খোঁজ পড়ে চিত্তবিনোদনের জন্য কোনো স্পেক্‌টেকল বা স্ক্যান্ডালের। 'সাম্প্রতিক ঘটনাবলি' তাই পর্যবসিত হয় কিছু চিত্তবিনোদনকারী ঘটনাক্রমে, এই ঘটনাগুলি পরিবেশিত হয় কিছুটা 'হিউম্যান ইন্টেরেস্ট স্টোরি' বা মানুষের কৌতূহল জাগায় এমন গল্প হিসেবে এবং কিছুটা বিচিত্রানুষ্ঠানের ঢঙে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি তাই শেষ অবধি বিচিত্রানুষ্ঠানে পরিণতি লাভ করে। ফলস্বরূপ আমরা যে ঘটনাগুলি দেখতে থাকি তার কোনো শুরুও নেই, শেষও নেই। এইগুলি একসঙ্গে পরিবেশিত হচ্ছে শুধু এইজন্য যে ঘটনাক্রমে এইগুলি একই সময়ে ঘটেছে। তাই খরার সঙ্গে সঙ্গে খুনের বিচারের গল্প থাকে, বাজেটে নতুন ছাঁটাই-এর সঙ্গে পরিবেশিত হয় পুরুষদের নতুন ফ্যাশনের খবর, দাঙ্গা এবং ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ একইসঙ্গে বিরাজ করে। বস্তুত এই ঘটনাগুলি এক অ্যাবসার্ড স্তরে রূপান্তরিত হয়, কারণ টেলিভিশনে আমরা ঘটনার সেই উপাদানগুলিই দেখতে পাই যা টেলিভিশন দেখাতে সক্ষম এবং এই উপাদানগুলির সঙ্গে পূর্ববর্তী ঘটনার যেমন কোনো যোগ নেই তেমনি যোগ নেই তার পরিণামের সঙ্গে। বস্তুত এইসব ঘটনাবলি পরিবেশনের

উল্লেখযোগ্য দিক হল, ঘটনাপ্রবাহের সূক্ষ্ম প্রভেদ বা তারতম্যের প্রতি কোনোরকম মনোযোগ না দেওয়া; পরিবর্তনের এই সূক্ষ্ম দিকগুলির তাৎপর্য বোঝা যায় অনেক দূরে। ঘটনার এই সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি উদাসীনতা স্মৃতিবিলোপের প্রক্রিয়াকেই আরও শক্তিশালী করে। এই উপস্থাপনাই দর্শকের মনে যে ধারণা প্রোথিত করে দেয়, তা হল যা কিছু নতুন তাই গুরুত্বপূর্ণ—অর্থাৎ 'স্কুপ'। প্রতিবেদনকারী তাই শুধু কিছু ফ্ল্যাশ ছবিই পর পর দেখিয়ে যান। সময়াভাব এবং গভীর বিশ্লেষণে অনাগ্রহ (কোনোরকম তথ্য কিংবা গবেষণা এখানে অপ্রয়োজনীয়) ঘটনার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে কোনোভাবেই সাহায্য করে না। কারণ ঘটনাগুলিকে প্রকৃত সম্পর্কের নেটওয়ার্কে প্রতিষ্ঠিত করা কখনোই সম্ভব হয় না।

এই দর্শনক্ষেত্র এক দিকে যেমন অ-ঐতিহাসিক অন্য দিকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন, অসম্পূর্ণ। এর সর্বপ্রধান দৃষ্টান্ত হল টিভির খবর এবং যেভাবে এই খবরজগৎকে দৃশ্যমান করে তোলে: এমন কিছু ঘটনা পরম্পরায় সাজিয়ে, যেগুলি সবই শেষ অবধি একরকম মনে হয়। পরের পর খরাপীড়িত অঞ্চলের ছবি এবং ঘটনাক্রমের সারি উপস্থাপিত হয় কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই এবং অদৃশ্যও হয়ে যায় কোনোরকম বিশ্লেষণ না করেই। কোনো রাজনৈতিক পৃষ্ঠভূমি না থাকায় এইসব ঘটনার মালা মানুষের মনে আবছা কৌতূহল জাগানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। একের পর এক উপস্থাপিত এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা, যেগুলির কোনোরকম ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থাকে না, ঘটনাগুলিকে আলাদা করে বিচার করার ক্ষমতা লোপ করে দেয়. মানবিক ট্র্যাজেডি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়—দুইই মনে হয় এক। এই যে দর্শনক্ষেত্র, এই যে জগৎকে আমরা দেখি তা সাধারণ মানুষের বোধের বাইরে, ধরাছোঁয়ারও বাইরে। এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এই ধারণা, যা ওই দর্শনক্ষেত্র তৈরি করে যে রাজনীতি হল পেশাদারদের জন্য, যেমন খেলাধুলাও। যাঁরা বিশেষ করে অরাজনৈতিক, এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের মধ্যে এক ধরনের ভবিতব্যবাদী মনোভাবের সৃষ্টি করে, একইসঙ্গে নিজেকে আলাদা করে নেওয়ার মনোবৃত্তিও, যা শেষ অবধি স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেই সাহায্য করে। এইজন্যই রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং গণতন্ত্রের জন্য টেলিভিশন কতটা উপযোগী সে বিচার না করে উপায় নেই। টেলিভিশন-পূর্ববর্তী সমাজে যে স্বাধীন ও ক্রিটিকাল আলোচনার পরিসর ছিল, এমনকী

পাবলিক লেকচারের (তার যত দোষই থাকুক না কেন) যে অবকাশ ছিল, টেলিভিশন সে পরিসর ক্রমেই সংকুচিত করে দিয়েছে। শুধুমাত্র তাই নয়, যাঁরা টেলিভিশনে বক্তব্য রাখেন তাঁদের মনে রাখা উচিত এই মাধ্যমে এক অদৃশ্য অথচ শক্তিশালী সেন্সরশিপ কাজ করে। আগেই বলেছি সময়াভাবে কোনোকিছুই ঠিকমতো বলা সম্ভব হয় না। এই সেন্সরশিপকে বস্তুত এক ধরনের রাজনৈতিক সেন্সরশিপই বলা যেতে পারে, শুধু মনে রাখতে হবে যাঁরা এইসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা এই সেন্সরশিপ অন্তঃস্থ করে নিয়েছেন, তাঁদের আলাদা করে বলে দিতে হয় না। এর সঙ্গে যদি মনে রাখা হয় কারা এই চ্যানেলে বিনিয়োগ করেছেন, কারা এই চ্যানেলের প্রধান বিজ্ঞাপনদাতা, সরকার থেকেই-বা অনুদান অথবা ভরতুকির মাধ্যমে কতটা পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এই সেন্সরশিপের ছবি অনেকটা পরিষ্কার হবে।

আমি কিন্তু এই ধরনের সমঝোতা বা দুর্নীতির আলোচনায় যেতে চাই না। বরং মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই টেলিভিশন প্রবর্তিত এক বিশেষ ধরনের হিংসার উপর, যা সৃষ্টি হয়েছে দর্শক ও প্রযোজকের মধ্যে এক ধরনের যোগসাজশের মাধ্যমে। কারণ দু-পক্ষই যে হিংসার অধীন সে সম্পর্কে অনেকসময়ই তাঁরা সচেতন থাকেন না। খুব সহজ দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়। রোমাঞ্চকর, উত্তেজক, রগরগে খবর, এইগুলি একসময় কেচ্ছার কাগজের প্রিয় বিষয় ছিল; রক্ত, যৌনতা, মেলোড্রামা, অপরাধ এইসব খবরের বিক্রি সবসময়ই বেশি। টেলিভিশনের প্রথম যুগে এইসব খবরকে একটা ঢাকাঢাকি দিয়ে রাখা হত, এখন প্রতিযোগিতার বাজারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এইগুলিই হেডলাইন হয়ে যাচ্ছে। রহস্য-রোমাঞ্চ যেমন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঠিক সেইরকম দৃষ্টি সরিয়েও নেয়। খবরের ক্ষেত্রে টেলিভিশনের সিম্বলিক কাজ হল এমন কিছু উপাদান পেশ করা যা অধিকসংখ্যক দর্শকের মনোভাব আকর্ষণ করবে এবং যাতে সবার জন্য কিছু-না-কিছু থাকবে। এগুলি এমন বিষয় যে কেউই আর এসব দেখে ধাক্কা খান না, এখানে কোনো কিছুই হারাবার নেই, এসব বিষয় মানুষকে বিভাজিতও করে না, সকলেই এইসব বিষয়ে মোটামুটি একমত হন এবং দেখতেও আগ্রহী হন কারণ কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এই বিষয়গুলি স্পর্শ

করে না। খবরের মূল উপাদান হয়ে ওঠে এই ধরনের বিষয়গুলি কারণ এগুলি যেমন দর্শকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে তেমনি সময় কাটাতেও সাহায্য করে।

আগেই বলেছি টেলিভিশনে সময় হল অত্যন্ত রেয়ার কমোডিটি। যখন এই মূল্যবান সময় অসার, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের উপর খরচ হয় তখন এইসব অসার বিষয়ও মূল্যবান হয়ে ওঠে। যদি আরও একটু বিশদ করে বলি, তাহলে বলতে হয় আমাদের দেশে বহুসংখ্যক মানুষ খবরের কাগজ পড়েন না, এঁদের অনেকেই আবার খবরের জন্য টিভির উপর নির্ভরশীল। টিভি এঁদের একমাত্র খবরের উৎস বলা যায়। সুতরাং জনসাধারণের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের মাথায় কী চলছে এবং তাঁদের চিন্তা পদ্ধতির গতিপ্রকৃতিই বা কী তার উপর টিভির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। এইসব মানুষের কাছে রাজনীতি কী? রাজনীতি সম্পর্কে সত্যি কি এঁদের কোনো ধারণা জন্মায়? সত্যি বলতে কী খুব কম, যেটুকু একটা মানুষকে দেখে, সে কীরকমভাবে কথা বলে, তাকে দেখতে কেমন, কীরকম পোশাক পরে, এইসব থেকে জানা যায়। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক দিক থেকে সব থেকে পশ্চাৎপদ মানুষ যা বুঝতে পারে। একইসঙ্গে এটাও অনেকে জানেন যে টিভি বহুসময় একটি বিষয়কে চোখের সামনে আনার প্রক্রিয়ায় চোখের আড়াল করে দেয়। অর্থাৎ যা দেখাতে হবে তাকে এমনভাবে প্রদর্শিত করা হয় যে তার আর কোনো তাৎপর্য থাকে না অথবা বিষয়টি প্রদর্শিত করতে গিয়ে এমনভাবে নির্মিত হয় যে তার অর্থের সঙ্গে বাস্তবের কোনো যোগাযোগ থাকে না। আগেই বলেছি বিষয়ের দিক থেকে রোমাঞ্চকর ও চমকপ্রদ বিষয়ের প্রতি টেলিভিশনের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি, টেলিভিশনের জন্য এটাও জরুরি যে ব্যাপারটাকে নাটকীয় করে তুলতে হবে। নাটকীয় দুইরকম অর্থেই : টেলিভিশন ঘটনাটিকে মঞ্চস্থ করে, তার ছবিও অন্তর্ভুক্ত হয়। এটা করতে গিয়ে টেলিভিশন ঘটনাটির গুরুত্বকে যেমন অতিরঞ্জিত করে, তেমনি করে ঘটনার নাটকীয় ও ট্র্যাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিকেও। এর সঙ্গে যোগ হয় শব্দ। ছবি শব্দ ছাড়া উপস্থিত হয় না। এই শব্দগুলি কিন্তু খুব-একটা ভেবেচিন্তে ব্যবহৃত হয় না। সাধারণ শব্দ আর মানুষের মনে দাগ কাটে না, উচ্চগ্রামে নাটকীয় শব্দ ব্যবহার করতে হয়। বহুসময় শব্দগুলি শুনে মনে হয় যিনি ওই পাঠ লিখেছেন তিনি কি

সত্যি বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন, সত্যি কি তাঁর কোনো দায়িত্ববোধ আছে? কারণ শব্দগুলি ভাষ্যপাঠকের মুখ থেকে শুনছেন হাজার হাজার শ্রোতা, যাঁরা যা দেখছেন তা বুঝতে পারেন না, এবং এটাও বুঝতে পারেন না যে তাঁরা বুঝতে পারছেন না। অথচ এই সব শব্দগুলির ক্রিয়া ব্যাপক, তারা বহু জিনিস সৃষ্টি করে, আতঙ্ক, বিরক্তি, ভয়বিকার, এবং মিথ্যা প্রতিরূপ।

টেলিভিশনে সবসময় খোঁজ চলেছে অসাধারণ ব্যতিক্রমী কিছুর, অর্থাৎ টেলিভিশন যাকে অসাধারণ বা ব্যতিক্রম মনে করে। কারণ যা টেলিভিশনের কাছে অসাধারণ অনেকের কাছে তা খুবই সাধারণ মনে হতে পারে। আবার এর বিপরীতও হতে পারে। যা কিছু রুটিনের বাইরে, দৈনন্দিনতার বাইরে, খোঁজ চলেছে সেইসব বিষয়ের। ব্যতিক্রমী হওয়ার অন্য একটি ব্যঞ্জনাও আছে, অন্য চ্যানেল থেকে আলাদা হতে হবে। তাই এক ভয়ংকর চাপ কাজ করে 'স্কুপ' জোগাড় করবার জন্য, 'এক্সক্লুসিভ' হবার জন্য। কে সর্বপ্রথম ঘটনাস্থলে পৌঁছোল, কে এক্সক্লুসিভ প্রতিবেদন দিতে পারল এই নিয়ে চলে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। ফল হল, এই দৌড়ে পরস্পরকে পরাস্ত করার প্রতিযোগিতায় সকলেই শেষ অবধি অন্যকে অনুকরণ করে। সবকিছুই শেষ অবধি একরকম হয়ে যায়। এক্সক্লুসিভের খোঁজ অন্যক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে পারে মৌলিকতা, অভিনবত্ব, এই টিভিতে কিন্তু সৃষ্টি হয় তুচ্ছতা, গতানুগতিকতা ও একরূপতার। বাস্তবকে তার সাধারণ পোশাকে উপস্থিত করার চেয়ে শক্ত কাজ খুব কমই আছে। বৈশিষ্ট্যহীনতা, সাধারণত্বের বাস্তবকে প্রকাশ করা খুব সহজ কাজ নয়। ফ্লবেয়ার বলতেন সাধারণত্বের আলেখ্য রচনা করা এক কঠিন পরিশ্রমের কাজ। এক জন সমাজতাত্ত্বিকও সবসময় এই সমস্যার সম্মুখীন হন। কীভাবে সাধারণকে অসাধারণ করে তোলা যায়, কীভাবে সাধারণত্বের বর্ণনা মানুষকে দেখাতে পারে এই সাধারণ কতটা অসাধারণ।

এই জগতে তাই প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রেষারেষি থাকলেও যে 'বস্তু' এখানে উৎপাদিত হয় তা কিন্তু একই রকমের। অর্থনীতিবিদরা বলেন একচেটিয়া অধিকার অভিন্নতা, একরূপতার জন্ম দেয়, অন্য দিকে মুক্ত প্রতিযোগিতার ফলে সৃষ্টি হয় ভিন্নতা, বিচিত্রতার। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এর বিপরীত দেখতে পাই, প্রতিযোগিতার ফলেই সবকিছু একরকম

হয়ে যায়, প্রতিযোগিতাই এখানে এক ধরনের সমরূপতা তৈরি করে দেয়। তাই আমরা দেখতে পাই একই বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী, ভাষ্যকার একই ধরনের খবর, ছবি বৃত্তাকারে চ্যানেল থেকে চ্যানেল পরিক্রমা করছে এবং এক ধরনের ক্লোজার 'সৃষ্টি' করছে। এই 'ক্লোজার' থেকে কারও মুক্তি নেই। আমি যাদের চট্‌জলদি বুদ্ধিজীবী আখ্যা দিয়েছি তাঁরা অবশ্যই এই 'ক্লোজার' সৃষ্টিতে এক প্রধান ভূমিকা পালন করেন। প্রশ্ন হল এই বুদ্ধিজীবীরা কীভাবে এবং কেমন করে, এইসব শর্তে এত দ্রুত উত্তর-প্রত্যুত্তর দানে সমর্থ হন? এর একটাই উত্তর আছে। এঁরা 'ক্লিশে'র মাধ্যমে চিন্তা করেন, যা প্রচলিত, গতানুগতিক এবং সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য এঁরা সেইসব কথাই বলেন। এই চিন্তা যতক্ষণে দর্শকের কাছে পৌঁছোয়, ততক্ষণে সকলেই ওইরকম কিছু ভেবে ফেলেছেন, ফলে এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না। দর্শকের কাছে পৌঁছোনোর জন্য অবশ্য আরও একটি শর্ত পূরণ করতে হবে। যা বলা হচ্ছে তার মর্মোদ্ধার করার উপকরণ বা সরঞ্জাম তার কাছে আছে কি না? যখন এই গতানুগতিক, গ্রহণযোগ্য, প্রচলিত চিন্তাভাবনা প্রসারিত হয়, এই সমস্যার তৎক্ষণাৎ সমাধান হয়ে যায়। এখানে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ হয়, কারণ যা জানা তাই তো শোনানো হচ্ছে, অন্য কথায় কোনো যোগাযোগই হয় না, শুধু মনে হয় যেন প্রসারণ ও দর্শকের মধ্যে একটা যোগাযোগ হচ্ছে। কোনো অভ্যন্তরীণ বিষয় ছাড়া এই যে নতুনত্ব-বর্জিত, মামুলি, অতিব্যবহৃত বাঁধাবুলির বিনিময় হয় তাতে বস্তুত কোনো কিছুই কমিউনিকেটেড হয় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এইসব বাঁধাবুলির ব্যবহার যে এক বড়ো ভূমিকা পালন করে কারণ সকলেই তা অতি সহজেই গ্রহণ করতে পারেন। বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে এই বাঁধাবুলির বিনিময়ের (যেমন দিনের আবহাওয়া নিয়ে বাক্যালাপ) মধ্যে যে মিল আছে তা হল এর গতানুগতিকতা। এর একদম বিপরীত মেরুতে রয়েছে চিন্তা, যার এক ধ্বংসাত্মক, বিরোধী ভূমিকা রয়েছে। চিন্তা এই গতানুগতিক, বাঁধাবুলিকে যুক্তি-সহ ছিন্নভিন্ন করে। এই যুক্তিবিচারের জন্য সময় লাগে, চিন্তার এই প্রয়োগ সময়নির্ভর।

বর্তমান সময়ের একটা বড়ো অভিশাপ হল ফাস্ট ফুড বা চট্‌জলদি খাবার। টেলিভিশনে বুদ্ধিজীবীরা মানুষের মনের জন্য যে খাবার পরিবেশন

করেন তা হল চট্‌জলদি সাংস্কৃতিক খাবার। এই সংস্কৃতির মালমশলা পূর্বনির্ধারিত, পূর্বচিন্তিত এবং পরিপাকযোগ্য। টেলিভিশনের রোলকলে এইসব বুদ্ধিজীবীদের ডাকলেই হল, খাবার তৈরি আছে, পরিবেশন করে দিতেও দেরি হয় না। এই প্রসঙ্গে আলোচনার ধরনধারণ সম্পর্কেও কিছু বলা প্রয়োজন। প্রথমেই বলতে হবে এই আলোচনায় একজন মডারেটর থাকেন, বাংলায় এই মডারেটরকে বলা হয় সঞ্চালক। এই মডারেটরটি সব ব্যাপারে নাক গলাবেন, যাকে যখন ইচ্ছে থামিয়ে দেবেন, বার বার সময়াভাবের কথা বলা তো আছেই। এই মডারেটর আলোচনার বিষয়বস্তু স্থির করবেন, কী কী প্রশ্ন হবে নির্দিষ্ট করে দেবেন, তর্ককে লাইনে রাখবেন খেলার নিয়মের উল্লেখ করে, এই খেলার নিয়ম অবশ্য ঘন ঘন বদলাতে থাকবে। এই মডারেটর স্থির করবেন কে বলবে আর কে চুপ করে থাকবে। এই মডারেটর আরও একভাবে আলোচনায় হস্তক্ষেপ করে যাবেন, সেটা হল প্রশ্ন করার ভঙ্গি, স্বরের তারতম্য ঘটিয়ে। কখনো-বা প্রশ্ন হবে অনুরোধ, উপরোধ, মিনতির ঢঙে, প্রয়োজনবোধে আবার কখনো মডারেটর চাঁচাছোলা, কটকটে, কাটাকাটা। 'আপনি এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দেন নি, উত্তর দিন', বা 'আমরা আপনার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে আছি, আপনারা সরকারকে সমর্থন করছেন, না করছেন না।' এর একটা মোক্ষম দৃষ্টান্ত হল কীভাবে 'ধন্যবাদ' বলা হল। কখনো 'ধন্যবাদ'-এর মানে হল 'আপনি এসে আমায় বাঁচালেন, আপনার কাছে চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকব', আবার কখনো 'ধন্যবাদ' বলে মডারেটর বুঝিয়ে দেন 'অনেক হয়েছে, এবারে কেটে পড়ো' বা 'বাবাঃ বাঁচা গেল'। যাঁরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, তাঁরা সকলেই এই সূক্ষ্ম স্বরক্ষেপণ দ্বারা প্রভাবিত হন, দর্শক তো হনই। প্রচ্ছন্ন সেমান্টিকস এবং প্রকাশ্য সিনট্যাক্স এইভাবেই তাদের কাজ করে যায়।

এই মডারেটরই সময় ভাগ করে দেন, আলোচনার মেজাজও ঠিক করে দেন; তিনি কখনো শ্রদ্ধাশীল কখনো-বা উপেক্ষা অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য করছেন, কখনো মনোযোগী, সজাগ, সতর্ক কখনো-বা অধৈর্য, অসহিষ্ণু, অস্থির। মডারেটরের অধৈর্য 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি' শুনলেই আলোচক বুঝে যান এ ব্যাপারে তাঁর আর কোনো আগ্রহ নেই, এখন চুপ করে যাওয়াই শ্রেয়। মডারেটর অন্যভাবেও আলোচনায় নিজের প্রভাব খাটিয়ে যান। ঘড়ি

দেখিয়ে কাউকে চুপ করিয়ে দেওয়া, কারও বক্তব্যে বাধা দেওয়া এসব কলাকৌশলের প্রয়োগ তো সবসময় দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া অবশ্যম্ভাবী বিজ্ঞাপনের জন্য ব্রেক নিতে হবে তাই এবার চুপ করো—এর থেকে তো কারও পরিত্রাণ নেই। সব মডারেটররা আরও একটি উপায় অবলম্বন করেন। সকলেই নিজেদের সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি বানিয়ে তোলেন: 'আপনাকে বাধা দিতে হচ্ছে কারণ আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।' এর অর্থ মডারেটর নির্বোধ নন—কোনো মডারেটর নিজেকে এইভাবে উপস্থিত করবেন না—অর্থ হল সাধারণ দর্শক (যাঁরা টিভির সংজ্ঞা অনুযায়ী নির্বোধ) এইকথা বুঝতে পারবেন না। অথচ যে জনগণের নামে এই বাধাদান আমি দেখেছি, তাঁরাই তো সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হন। সাধারণভাবে অনুষ্ঠানগুলিতে এক ধরনের নিরপেক্ষতা, সমভাবের একটা আবরণ থাকে, কিন্তু শেষ অবধি দেখা যায় যাঁর বক্তব্য শুনতে আপনি আগ্রহী তিনি এক ঘণ্টার অনুষ্ঠানে পাঁচ মিনিট সময় পেলেন। অনুষ্ঠানের আগে অংশগ্রহণকারীদের নির্দেশ দেওয়া থাকে, প্রশ্ন ও উত্তরের স্ক্রিপ্টও মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে। এ হল অনেকটা ভিট্‌গেনস্টাইন বর্ণিত 'ল্যাঙ্গুয়েজ গেম'-এর মতো। খেলার অনুক্ত নিয়ম আছে, কারণ টেলিভিশন শো সমাজের অন্য ডিসকোর্সের মতো কিছু জিনিস বলতে দেয় আর কিছু বলতে দেয় না। এই খেলাও তাই নির্মিত হয়েছে কুস্তির মডেলে গণতান্ত্রিক তর্কবিতর্কের ধারণাকে ভিত্তি করে। যাঁরা কুস্তি ম্যাচ দেখেছেন তাঁরা জানেন এই খেলায় একজন 'ভালো' হন এবং অন্যজন 'মন্দ'। টেলিভিশনের এই খেলায় তাই বিরোধ থাকতে হবে, 'ভালো' লোক, 'মন্দ' লোক দুই থাকবে, কিন্তু বিরোধ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, ঘুসোঘুসির উপর একটা আবরণ থাকবে। এই আবরণ দেওয়া হবে অ্যাকাডেমিক, ইন্টেলেকচুয়াল ভাষার মাধ্যমে। এই পরিসরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল টিভিতে পেশাদার হোস্ট ও চট্‌জলদি বুদ্ধিজীবীদের যোগসাজশ, যেকথা একটু আগেই বলেছি। এইসব বুদ্ধিজীবী সব প্রশ্নের উত্তর, ব্যাখ্যা নিয়ে সবসময় তৈরি আছেন, এঁদের এই শিল্পে পরিচিতি 'ভালো অতিথি' হিসেবে। এঁদের আপনি সবসময় আমন্ত্রণ জানাতে পারেন ; কারণ আপনি জানেন এঁরা কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবেন না। এঁরা কোনোরকম

বেয়াড়ামিও করবেন না, তা ছাড়া এরা হলেন মসৃণ বক্তা। এইসব 'ভালো' অতিথিদের সঙ্গে টেলিভিশনের সম্পর্ক হল মাছ ও জলের মতো।

টেলিভিশন যোগাযোগের এমন একটি উপায় যার স্বাধীনতা খুবই সীমিত। এখানে বিভিন্ন স্বার্থের চাপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাংবাদিকদের মধ্যে দুই ধরনের সামাজিক সম্পর্ক : একে বলা হয় প্রতিযোগিতার সম্পর্ক এবং অশুভ আঁতাঁতের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের উৎস হল বাস্তব স্বার্থ, উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের অবস্থান, তাদের শিক্ষা (কিংবা তার অভাব) এবং প্রায় একই সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে তাঁদের উঠে-আসা। যখন টেলিভিশন প্রথম আবির্ভূত হয় তখন অনেক সমাজতাত্ত্বিক ভেবেছিলেন এই হল এক 'মাস কমিউনিকেশনের' উপায়, টিভি সবকিছুকে সমান করে দেবে, সব দর্শককে এক অবিভাজনীয় জনসাধারণে রূপান্তরিত করবে। এখন অবশ্য দর্শকের প্রতিরোধেব ক্ষমতাকে হিসেবের মধ্যে রাখা হয়নি। অন্য যেটা হিসেবের মধ্যে ছিল না তা হল টেলিভিশনের সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক ক্ষেত্রে প্রসারের ক্ষমতা। এই প্রসারের ফলে এক গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব বা বিরোধ দেখা দিয়েছে, এই বিরোধ হল যে সামাজিক শর্তে এক বিশেষ শিল্পকর্ম সৃষ্টি হবে এবং যে সামাজিক শর্তে এই শিল্পকর্মটি প্রচারিত হবে, তার মধ্যে। যেমন, যে সামাজিক শর্তে একেবারে নতুন, আভাঁ-গার্দ কবিতা লেখা হবে এবং যে শর্তে তা সাধারণ পাঠকের কাছে প্রচারিত হবে তার মধ্যে একটা বিরোধ আছে। টেলিভিশন এই বিরোধকে এক চরমসীমায় নিয়ে যায় কারণ এখানে দর্শকের রেটিংস-ই হল একমাত্র মাপকাঠি।

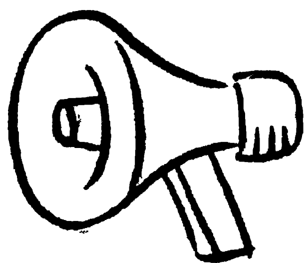
একটা সময় ছিল যখন মুদ্রিত মাধ্যমে একে অন্যকে টেক্কা দেবার প্রবণতা থেকে যা মুদ্রিত হত তাতে শিক্ষিত মানুষ শিউরে উঠতেন। রেমন্ড উইলিয়ামস তাঁর *কালচার অ্যান্ড সোসাইটি* গ্রন্থে বলেছেন কবিতায় রোমান্টিক বিপ্লবের সূচনার মূলে রয়েছে ইংরেজ লেখকদের বিপুল প্রচারিত প্রেমের প্রতি ভীতি ও বিতৃষ্ণা। টেলিভিশনের প্রভাব আরও অনেক বেশি ব্যাপক। এই বিপুল প্রচারিত সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলের কয়েকটি শর্ত মেনে চলতে হয়, যা প্রকাশিত হচ্ছে তা যেন পীড়াদায়ক না হয়, পাঠক/দর্শককে বিভাজিত না করে, সকলের মন জুগিয়ে চলে, কোনো সমস্যার যেন সৃষ্টি না করে এবং সমস্যার কথা বলতে হলে এমন সমস্যার কথা যেন বলা যায় যা কোনো সমস্যার সৃষ্টি করবে না। এককথায়

পাঠক/দর্শক যেটা 'খাবে' সেটাই পরিবেশন কর। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ আবহাওয়া নিয়ে এত কথা বলে কারণ এই কথাবার্তা কাউকেই পীড়া দেয় না, আঘাতও করে না। গণমাধ্যমের প্রচার ও কাটতি যত বেশি হবে ততই তারা এই ধরনের খবর প্রচারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবে। মোদ্দা কথা হল পাঠক/দর্শককে রসেবশে রাখো, একটা 'ফিলগুড' ভাব তৈরি করো। ঘটনার কর্কশতাকে মসৃণ করে, কাঁটাগুলো ঘষেমেজে শেষ অবধি যে অদ্ভুত বস্তুটি পরিবেশিত হয়, তাই হল 'টিভির খবর'। এই খবর সকলেরই ধাতে সহ্য হয় কারণ দর্শক যা দেখেন এবং শোনেন সেই সবকিছুই তাঁরা যা জানেন তাকেই সমর্থন করে। দর্শকের চিন্তার গঠন বা প্রকৃতি যা ছিল তাই থেকে যায়।

প্রকৃত চিন্তা মানুষের মনকে নাড়া দেয়, তাকে ভাবাতে বাধ্য করে। টেলিভিশন যে প্রতিযোগিতা ও কর্মপ্রক্রিয়ার মডেল অবলম্বন করে তাতে এরকম হওয়ার কোনো আশা নেই। দর্শকের মানসিক গঠনের সঙ্গে টেলিভিশন নিজেকে পুরোপুরি মানিয়ে নিয়েছে এইজন্য টেলিভিশন দর্শককে বলেও দেয় কী ব্যাপারে কী করতে হবে, নীতিবাগীশগিরি ফলানোও চলতে থাকে। সাধারণত বলা হয় মহৎ বা প্রশংসার্হ ভাবসমূহ নিকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করে, কিন্তু ওই একই ভাবসমূহ দর্শকের রেটিংস বাড়িয়ে দেয়। টেলিভিশনের এই নীতিবাগীশতায় অনেকে হয়তো আশ্চর্য হন এই ভেবে যে সিনিকাল ব্যক্তিরা কীভাবে এইরকম রক্ষণশীল উপদেশ দিতে পারেন। অথচ আমরা সর্বক্ষণ দেখতে পাই টক্-শোর হোস্ট, খবর পরিবেশনের অ্যাঙ্কর, ক্রিকেটের বিশেষজ্ঞ ভাষ্যকার, জ্যাঠামশায়ের মতো নীতি উপদেশ দিয়ে চলেছেন। এঁরা সকলেই হয়ে পড়েছেন দর্শকের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা, মধ্যবিত্ত নৈতিকতার প্রতিনিধি। এঁরা সকলেই আমাদের বলছেন 'সামাজিক সমস্যা' (অর্থাৎ এঁরা যাকে সামাজিক সমস্যা বলে মনে করেন) সম্পর্কে আমাদের কী 'ভাবা উচিত'। আগেই বলেছি এই মানবিক কৌতূহল-জাগানো গল্প, নৈতিক উপদেশ এক ধরনের রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি করে। এই গল্পগুলি শুধুমাত্র অরাজনীতিকরণেরই সাহায্য করে না, ঘটনাবলিকে কিস্‌সা বা চুট্‌কির স্তরে নামিয়ে আনে। এইসব গল্পের কোনো রাজনৈতিক পরিণাম থাকে না। কিন্তু এইসব গল্পকে এক নাটকীয় চেহারা দেওয়া হয়, যার থেকে আমরা 'শিক্ষা নিতে পারি' অথবা

ঘটনাগুলিকে 'সামাজিক সমস্যা' হিসেবে সম্প্রচার করা হয়। এইসব ক্ষেত্রেই আমাদের চট্‌জলদি বুদ্ধিজীবী বা টিভি দার্শনিকদের ডাক পড়ে, যাতে তাঁরা অর্থহীনকে অর্থ প্রদান করতে পারেন, চুট্‌কি কিস্‌সা যেগুলিকে কৃত্রিমভাবে মঞ্চে আনা হয়েছে তাদের একটা সুসংগত রূপ দিতে পারেন। প্রশ্ন হল কলকাতার গলিতে গলিতে ফুটপাথে 'চাইনিজ' রান্না খেয়ে অনেকে যেমন ভাবেন এই হল আসল চাইনিজ খাবার, তেমনি টেলিভিশনে বুদ্ধিজীবী পরিবেশিত চট্‌জলদি সাংস্কৃতিক খাবার নিয়মিত খাওয়ার পর 'আসল' 'নকল' ভেদ থাকবে তো? মুদ্রিত হরফে সত্যিকারের চিন্তার অভিব্যক্তিকে চেনার ও পড়ার মতো মানুষ অবশিষ্ট থাকবেন তো?

লেখক কলকাতায় সেণ্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক



সম্প্রচারের ভাষার ধরনধারণ

শোভন সোম

দূরদর্শন চালু হবার আগে সম্প্রচারের ভাষা বলতে বেতার বা পরবর্তীকালের আকাশবাণী বোঝাত। আমরা খবর শুনতাম, ফুটবল খেলাও শুনতাম। বাংলাদেশের গোটা মুক্তিসংগ্রাম আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কর্ণকুহরের মাধ্যমে। আমাদের কর্ণই ছিল চক্ষু।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিক থেকে বেতারের খবর সম্পর্কে মানুষের মনে কিঞ্চিত কৌতূহল সৃষ্টি হতে থাকে। সেটাও পঞ্চাশের মন্বন্তরের খবরের আগ্রহে নয়, মাগ্‌গিগণ্ডায় যে পরনের কাপড় জ্বালানির তেল ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনের জিনিস তখন যে উধাও, এই কথাটা সেদিন গুরুত্ব পায়নি। প্রচারের উন্মাদনায় সে সময় যুদ্ধের খবরই বড়ো হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধ, আজাদ হিন্দ ফৌজ. দাঙ্গা, গান্ধির অনশন এবং স্বাধীনতার হাত ধরে কী করে যে সম্প্রচারের ব্যাপারটা রাজনীতিসর্বস্ব হয়ে উঠেছিল, সেটা আমরা খেয়াল করিনি। এখনও আমাদের সম্প্রচারে রাজনীতিই যে

সবচেয়ে বলশালী সে-কথা বলা বাহুল্য। তবে, সে রাজনীতির নিজস্ব রং আছে।

এ/হ/বা/হ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে যাঁরা দিল্লি থেকে বাংলায় খবর পড়তেন, ক্রমে তাঁদের উচ্চারণ পদ্ধতি, বলবার ধরন শিষ্ট সমাজকে প্রভাবিত করতে থাকে। এককালে শোনা যেত যে, ভালো ইংরেজি শুনতে ও শিখতে হলে বি. বি. সি.-র খবর শুনতে হয়। তখন বি. বি. সি.-তে যাঁরা খবর পড়তেন তাঁরা সকলেই ছিলেন খাস ইংরেজ। এখন এশিয়াজাত-আফ্রিকাজাত অনেকেই বি. বি. সি.-তে খবর পড়েন। অবশ্য যখন খবর পাঠক মাত্রই ছিলেন খাস ইংরেজ, তখন তাঁরা যে-ইংরেজি বলতেন, সেই ইংরেজি কিন্তু লণ্ডনের পথেঘাটে শোনা যেত না। অতি শিষ্ট ভদ্র সমাগমে ওই ভাষা শোনা যেত। যাহোক, এখন ইংরেজির এত বিচিত্র রকমফের ঘটেছে যে, শিষ্ট ইংরেজের ইংরেজিকেও এখন আদর্শ ইংরেজি বলা যাবে না। এখন ইংরেজি ভাষায় আমাদের বোঝাপড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেই বেশি। এখন ইংল্যাণ্ডে নতুন বাঙালি কেউ যান বলে কালেভদ্রে শোনা যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যহ কয়েকজন বাঙালি যাচ্ছেন। ইংরেজের ইংরেজি ও মার্কিনদের ইংরেজি অবশ্যই এক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে-সকল বাঙালি আছেন, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই মার্কিনি ইংরেজি বলেন। অনেকের বোধহয় জানা নেই, বিশেষ করে ইংরেজ লেখকদের লেখা ছোটোদের এবং কোনো কোনো প্রকৌশলবিষয়ক বইপত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পড়ুয়াদের জন্য মার্কিনি ইংরেজিতে সম্পাদিত করে দেওয়া হয়। আসল কথা, এখন স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজি বলে কিছু নেই। এখন ভারতীয়দের লেখাও ইন্ডিয়ান ইংলিশ হিসেবে গণ্য, ভারতীয়দের বহু উচ্চারণ শুনে এখন ইংরেজ বা মার্কিনরা হাসেন না।

মোদ্দা কথা এই যে, সম্প্রচারের ব্যাপারটা এতদিন ছিল কর্ণসর্বস্ব, কিন্তু দূরদর্শন আসার পর থেকে তা হল চক্ষু ও কর্ণগোচর। এতদিন কর্ণসর্বস্ব থাকায় যা ছিল শ্রবণগোচর, সে দিকটাই ছিল মুখ্য। যখনি সম্প্রচার হল সদৃশ্য, তখন কিন্তু যাকে যথার্থ অডিয়োভিশুয়্যাল বা দৃশ্যশ্রব্য মাধ্যম বলে, সেটাই হল। কারণ শোনার ভাষা আর দেখার ভাষা মিলে তৈরি হল একটা ভাষা। মানুষ মুখের ভাষায় যা বলে, তার অনেকখানি সম্পূরণ সে দেহের ভাষাতেও করে। মানুষের দেহও কথা বলে। আমরা সম্মুখে উপস্থিত

ব্যক্তিটির কথাবার্তা যখন শুনি, তখন তাঁর কথা আর বলা-কে মিলিয়ে তাঁর একটা ব্যক্তিত্বও তৈরি করে নিই। যেমন এককালে বিজ্ঞাপনে অনামা মডেলেরা আসতেন। কিন্তু সেলিব্রিটি এন্ডর্সমেন্ট বলে একটা ব্যাপার কিছুদিন ধরে প্রডাক্টের ইমেজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। সেলিব্রিটির মুখের ভাষা আর দেহের ভাষার সাযুজ্য বিপণনের ব্যাপারকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলল।

প্রথম যখন দূরদর্শনে হিন্দি খবর পড়া শুরু হল, তখন কেউ কেউ ভাবলেশহীন বদনে কাঠের মতো প্রাণহীন খবর পড়ে যেতেন। কারণ তখনও দেখার ভাষাটাও যে জরুরি, সেটা খতিয়ে দেখা হত না। যাঁরা শুরুতে সরকারি দূরদর্শনে খবর পড়তেন, তাঁদের মধ্যে মহিলারা কেউ কেউ উশকু-খুশকু চুলে, কেউ বা মাথায় বাগান-উজাড়-করা ফুল গুঁজে বিয়ে বাড়িতে যাবার সাজে খবর পড়তেন। কোনও পুরুষ খবর পড়ুয়া যেমন তেমন একটা হাফহাতা শার্ট পরে দু হাত সামনে রেখে ঘাড় গুঁজে পড়ে যেতেন। তাঁরা ভাবতেন খবর যাঁরা শোনেন, তাঁরা বোধহয় দেখার ব্যাপারটা এত পরোয়া করেন না। কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড বাংলার মতো সুভদ্র পোশাকেরও যে-একটা ড্রেস কোড আছে, সেটাও সরকারি মহলে জানা ছিল না। কিংবা খবর কীভাবে পড়তে হবে, কী পোশাক পরে পড়তে হবে, সে বিষয়েও বোধহয় দিল্লির কোনও নির্দেশ ছিল না, তাই বাংলা দূরদর্শনে খবর পড়ার ব্যাপারটা অনেকটা শো-অ্যাজ ইয়ু লাইক ছিল। যখন দূরদর্শনে স্থানীয় চ্যানেল হব-হব করছে, তখন রাজ্য সরকার স্থানীয় চ্যানেলটি রাজ্য সরকারের হাতে দেবার জন্য তদবির করেছিলেন, কিন্তু তদবির করলেও সম্প্রচারের বিষয় ও ভাষার বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

অবশেষে সরকারি দূরদর্শনের অতিরিক্ত বেসরকারি চ্যানেল হল। গোড়ায় এই সব বেসরকারি চ্যানেলগুলি খবরকে অতটা গুরুত্ব না দিয়ে বিনোদনের দিকটাই দেখত। সম্ভবত, ঢাকার সোপগুলির সঙ্গে টেক্কা দেবার জন্যে বাংলায় মেগা সিরিয়াল তৈরি হতে লাগল। কিন্তু ওই যে খবরের খিদে বাঙালির মধ্যে ষাট বছর আগে জেগেছিল, তারই সুবাদে বোঝা গেল যে খালি গল্পেই চলবে না, তখন শুরু হল চব্বিশ ঘণ্টার একের পর এক খবরের চ্যানেল। বোঝা গেল যে, গল্পের চাটনি চললেও বাঙালি আসলে খবর চায়। বলা বাহুল্য, এই সব খবরের চ্যানেলের জনপ্রিয়তাও

সেটাই প্রমাণ করেছে, নতুবা যে-বাঙালি দর্শকের মধ্যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তই প্রধান, তাদের জনসংখ্যার হারে এতগুলি কেবল-খবরের চ্যানেল চলবার কথা নয়।

যেমন আজ স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজি বলে কিছু চিহ্নিত করা কঠিন, তেমনি বাংলাদেশের বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলাকে পাশাপাশি রেখেও বলা যায়, সম্প্রচারের ভাষার দিক থেকে কোন্‌টাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ধরব, সেটাও ঠিক করার অসুবিধে আছে। নুন এবং লবণ, গুঁড়ো এবং গুড়া, স্নান এবং গোসল, জল এবং পানি-জাতীয় শব্দের একটা দ্বৈধ তো আছেই, বড়ো দ্বৈধ আছে বাক্যের গঠনে, উচ্চারণে এবং খবর পাঠের ধরনে। এ-কারণে ভারতীয় বাঙালির কানে বাংলাদেশের খবর একটু আলাদা আলাদা ঠেকে, আর বাংলাদেশিদের কানেও কলকাতার বাংলা অন্যরকম ঠেকে। লোকসমাগমে কে বাংলাদেশি এবং কে পশ্চিমবঙ্গীয় সেটা কথা শুনলেই বোঝা যায়। এ ভাবে ঢাকার শিষ্ট বাংলা আর কলকাতার শিষ্ট বাংলা আলাদা। আলাদা অসমের শিষ্ট বাংলা, ত্রিপুরার শিষ্ট বাংলা, ঝাড়খণ্ড-বিহারের শিষ্ট বাংলা। তবে সমস্যা সম্প্রচারের বাংলা নিয়ে। কারণ সম্প্রচারের ভাষা এমনই ভাষা, যা আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে শিষ্ট সমাজে সমতা দেয়। কুচবিহারের মানুষ সামাজিক স্তরে যে বাংলা বলেন না, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মানুষ সামাজিক স্তরে যে বাংলা বলেন না, সেই বাংলাই তাঁরা দূরদর্শনে শোনেন এবং এই দু'জেলার মানুষ যখন পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক আদানপ্রদান করেন, তখন যে শিষ্ট বাংলা বলেন সেটা সম্প্রচার মাধ্যম থেকে পাওয়া।

আকাশবাণীর খবর জনপ্রিয় হবার আগে সিলেটের মানুষ কলকাতায় এসে শিষ্ট বাংলা শুনতে পেতেন তখনও বাঙালির মবিলিটি খুব বেশি ছিল না। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা যাবে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগ বাঙালিকে এক অবিশ্বাস্য মবিলিটি দিয়েছে। শরৎচন্দ্র মেসের পড়ুয়া আর ঝি-র মধ্যে প্রেমের কল্পনা করতে পেরেছিলেন এ-কারণেই যে, তখনও মেয়েরা ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া প্রকাশ্যে বলতে গেলে বেরোতেন না; দ্বিতীয়ত গ্রাম বা মফ্‌সসলকেন্দ্রিক সমাজে বহু অবিবাহিত-বিবাহিত পুরুষেরা কলকাতার মেসে মেসে থাকতেন। তখন পূজোর ছুটিতে দেশে যাওয়া, শীতের ছুটিতে পশ্চিমে অর্থাৎ ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্যকর জায়গায় বেড়াতে যাওয়া, কলকাতায়

এলে থিয়েটার দেখার একটা সামাজিক রেওয়াজ ছিল, যা এখন নেই। পূর্ববাংলার মফস্‌সলের মানুষ কলকাতার মানুষ দেখলে তাঁদের মুখে অবাক হয়ে শিষ্ট বাংলা শুনতেন। বলা বাহুল্য উনিশ শো পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতচল্লিশের শিষ্ট বাংলা যাঁদের মনে আছে, তাঁরাও স্বীকার করবেন যে, শিষ্ট বাংলাও কতটা পালটেছে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, তাঁর বক্তৃতা, তাঁর গদ্যকথার রেকর্ডিং শুনলে বোঝা যায় যে ওই ভাষায় এখন কেউ কথা বলেন না, চিঠি লেখেন না, বক্তৃতা দেননা কিংবা ওই বাগ্‌ভঙ্গিও এখন ব্যবহৃত হয় না। আসলে সর্বকালেই আঞ্চলিক ভাষাকে এক ধরণের শিষ্ট ভাষা সমতা দেয় ও একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে সেই শিষ্ট ভাষা বা ভাবভঙ্গি বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানেরও ভাষা হয়ে ওঠে। যেহেতু আমাদের মবিলিটি বা যাতায়াত একটি ভৌগোলিক অঞ্চলেই আবদ্ধ, তাই ওই শিষ্ট ভাষাটি সেই ভৌগোলিক অঞ্চলেই সীমিত, তাই ওই শিষ্ট ভাষাটি সেই ভৌগোলিক অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত শিষ্ট ভাষারূপে মান্যতা পায়। বাংলাদেশেও সেটি ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের এবং বাংলাদেশের শিষ্ট ভাষার রূপটি অনেকখানি নির্ধারণ করে আঞ্চলিক ভাষা, যাকে বুলি বলাই ভালো। ভারতের বঙ্গভাষী অঞ্চলের ও বাংলাদেশের আঞ্চলিক বুলি দু'জায়গার বাংলাকে কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট দিয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের কাজে বাংলাদেশের শিষ্ট বাংলা আলাদা ঠেকবেই। বাংলাদেশের কানেও পশ্চিমবঙ্গের শিষ্ট বাংলা আলাদা ঠেকবে।

লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে, বাংলা উচ্চারণে কোনো স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকসেন্ট না থাকায়, ঢাকার সম্প্রচারের বাংলা এবং কলকাতার সম্প্রচারের বাংলায় নিজস্ব কিছু অ্যাকসেন্ট তৈরি হয়েছে। যখন কেবল সরকারি দূরদর্শন ছিল, তখন সেখানে যে-সব আলোচনা হত, তাতে বাংলা বাক্যে প্রচুর ইংরেজির মিশেল থাকত। মনে হত যে, গড়পড়তা বাঙালিই দোভাষি। তার ভাষা একাধারে বাংলা ও ইংরেজি। কেউ কেউ পাণ্ডিত্য দেখাবার জন্যে কিঞ্চিৎ ইংরেজি বাংলার মধ্যে গুঁজে দিতেন। আলোচকেরা কেউ আমবাঙালির উদ্দেশ্যে কথা বলতেন না। তবে বেসরকারি চ্যানেলে খবর পড়া আর আলোচনা চালু হবার পর দেখা যাচ্ছে যে যথাসম্ভব ইংরেজি শব্দ বাদ দিয়ে খবর পড়া হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে। বেসরকারি চ্যানেলে খবর পড়ার ব্যাপারে একটা ড্রেস কোডও চালু হয়েছে। কেউ আর বিয়েবাড়িতে

যাবার মতো মাথায় একগাদা ফুল গুঁজে কিংবা বিশাল টিপ পরে খবর পড়তে বসেন না, পুরুষরাও যেমন-তেমন হাফ হাতা শার্ট পরে কুঁজো হয়ে বসে টেবিলে হাত রেখে খবর পড়েন না; আর এলোমেলো চুলেও কেউ দেখা দেন না। যেমন শিষ্ট পোষাকে, তেমনি শিষ্ট চেহারায়, হাসিখুশি মুখে এখন ঢাকায় আর কলকাতায় খবর পড়া হয়। এই ঝাঁ চকচকে শিষ্ট পোষাকে, শিষ্ট চেহারায় হাসিখুশি মুখে যাঁরা খবর পড়েন, ওঁদের অ্যাকসেন্টে ইংরেজি অ্যাক্সেন্টের ঝোঁক লক্ষ করবার মতো, ওঁদের খবর পড়া শুনলেই কেমন যেন ইংরেজি উচ্চারণে বাংলা শুনছি বলে মনে হয়। এখন বাংলা মাধ্যম আর ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের মধ্যে একটা সামাজিক দূরত্বও তৈরি হয়েছে। অথচ পুরো বাংলা মাধ্যম থেকে কিংবা বাংলা নিয়ে অনার্স বা এম. এ. পড়া কতজন বাংলা খবর পড়তে আসছেন, সেই পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখা দরকার। ইংরেজি মাধ্যমের পড়ুয়ারা যে অ্যাকসেন্টে বাংলা পড়েন, সেই অ্যাকসেন্ট যে অচিরে ব্যাপক হবে না, তা কে বলতে পারে!

আমরা দেখেছি যে বেতারের শুরুতে যেভাবে খবর পড়া হত, দূরদর্শনের শুরুতে সেভাবে পড়া হয়নি এবং দূরদর্শনে এখন যে বাংলা আমরা শুনি সেটাও গোড়ার দূরদর্শন থেকে আলাদা। সেটা হবেই। ভাষার চলমানতা স্বীকার করে নিতেই হবে। কম্পিউটারের ভাষা যে-ভাবে বিশ্বভাষা হয়ে উঠছে তাতে বাংলাভাষা জানবার চেয়ে ইংরেজি জানাটাই জরুরি হয়ে উঠছে। এককালে বলা হত, যে-ভাষার রাষ্ট্রশক্তি নেই সেই ভাষা বিপন্ন। এখন বলতে হচ্ছে যে, যে-ভাষা কম্পিউটারের ভাষা নয়, সেই ভাষার বিপদ আসন্ন। আমার মোবাইল ফোনে ইংরেজি ছাড়াও হিন্দি, ইন্দোনেশিয়ান, ফিলিপিনো আছে, বাংলা নেই। পশ্চিমবঙ্গে পণ্য হিসেবে আসা মোবাইল ফোনে বাংলা নেই অথচ ইন্দোনেশিয়ান ও ফিলিপিনো আছে, এ বড়ো তাজ্জব ব্যাপার কিন্তু নয়। আসলে পশ্চিমবঙ্গের বাজারে ইংরেজি যত জরুরি, হিন্দিও যত জরুরি, বাংলা তা নয়। ওই সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ান আর ফিলিপিনো ঢুকিয়ে দিলে ভারত, ইন্দোনেশিয়া আর ফিলিপাইন—তিন দেশেই একই পণ্য বিপণন সম্ভব হবে। এখনও বিশ্বের বহু লোকের ধারণা ইন্ডিয়ার ভাষা ইন্ডিয়ান। সেই ইন্ডিয়ান যে কী, তা তাঁরা জানেন না। সরকারি স্তরেও ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি। সুতরাং সেল ফোনে বাংলা না-থাকলেও চলবে। ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি তো আছে। এখনও

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে উচ্চস্তরীয় সভাসমিতি, সরকারি স্তরে কথাবার্তা ইত্যাদি ইংরেজিতেই হয়ে থাকে। কলকাতার কোনো তারকাখচিত হোটেলে গেলে দারোয়ান থেকে বেলবয় সকলেই আপনার সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা বলবে। এই পশ্চিমবঙ্গে বাংলা না-জেনেই কেবল হিন্দি বলেই আজীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। বিহারি মুটে কুলি দেখলেই আমাদের মুখে হিন্দির খই ফোটে। সুতরাং বাংলার যে খুব একটা প্রয়োজন ঘরের বাইরে আছে, তা নয়। এই সত্যটা মেনে নেওয়াই ভাল। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে সম্প্রচারে বাংলা খবরের কী প্রয়োজন! এখন বহু বাড়িতেই ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ভাইবোনেরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতেই কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। মা বাবার সঙ্গে তারা বাধ্য হয়ে বাংলায় কথা বলে। এই বাংলা মাধ্যমে পড়া বাংলা-বলা অভিভাবকেরা এখন অর্থশক্তি। তাঁরা বাংলায় খবর শুনতে বাংলা গান শুনতে বাংলায় দুটো কথা বলতে স্বস্তিবোধ করেন। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম তা করেন না। এঁরা নিজেরা বাংলামাধ্যমে লেখাপড়া করে কৃতী হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা সন্তানসন্ততিদের ভুলেও বাংলা মাধ্যমে পড়াবেন না। বিদেশে যে সব বাঙালি প্রথম প্রজন্মে গেছেন, তাঁরা শতকরা পঁচানব্বই জনই বাংলামাধ্যমে লেখাপড়া করে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, সেরা অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক হয়েছেন। তাঁদের জন্যেই বাংলার বাইরে বাংলা সম্মেলন, বাংলা গান, বাংলা সাহিত্য এখনও সমাদৃত। তাঁদের ভেতরে মাতৃভাষার জন্যে একটা জায়গা আছে। সেই জায়গাটা পরিতৃপ্ত হতে চায় বলে বাংলা খবরের সুইচ ঘোবায়, রবীন্দ্রসংগীত শোনে। কিন্তু তাঁদের ছেলেমেয়েদের অন্তরে সেই জায়গাটুকু নেই বললে সত্যকে স্বীকার করে নিতে হয়। যতদিন বাংলা মাধ্যমের লেখাপড়া আছে ততদিন সম্প্রচারের বাংলা বেঁচে থাকবে। ওই বাংলামাধ্যমের পড়ুয়ারা কিন্তু ভুলেও বাংলা মাধ্যমে সন্তানসন্ততিদের পড়াবেন না, তাই এখন বাংলা চ্যানেলে যারা খবর পড়তে আসছে, সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা আসছে সেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকেই। তাই তাদের বাংলায় অত ইংরেজি অ্যাকসেণ্ট। ইতিমধ্যে ইংরেজি মাধ্যম ও হিন্দি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের রমরমা চলছে। বাঙালিদের উদ্দেশে স্থাপিত বিদ্যালয় হস্তান্তরিত হলেও নতুন নতুন হিন্দি বা ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয় খুলেছে। কলকাতায় বহু বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয় ঝাঁপ বন্ধ করার মুখে, কোথাও শিক্ষকদের থেকে ছাত্রসংখ্যা কম।

উনিশশো ছত্রিশে যখন অসমে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সকল সরকারি বিদ্যালয়ে, সিলেট কাছাড় ও পার্বত্য জেলা বাদে, অসমিয়া হল শিক্ষার মাধ্যম, তখন অসমের বাঙালিরা অসমের বড়ো বড়ো শহরে বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয় খুলেছিলেন। তখন শিলং আইজল কোহিমা ছাড়া গোটা অসম উপত্যকায় ইংরেজি মাধ্যমের কোনও বিদ্যালয় ছিল না। পাঞ্জাবি ও মাড়োয়ারিরা পুত্রদের পড়তে বেনারসে পাঠাতেন। বাঙালি ছাড়াও অসমিয়া বহু ছাত্রছাত্রী, এমন কি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা তখন ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের অভাবে বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়ত। এখন অসমের বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলি বন্ধের মুখে। অসমে থাকতে গেলে একমাত্র বরাক উপত্যকা ছাড়া বাংলা চলবে না, এই বাস্তববোধ থেকে বহু বাঙালি তাঁদের সন্তানদের অসমিয়া বা ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। খোদ কলকাতায় এমন বহু বাঙালি আছেন যাঁরা সন্তানদের কেবল ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়েই যে-পড়ান, তা নয়, ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে তাদের বাংলার পরিবর্তে হিন্দি পড়ান। কারণ ভারতে বাংলা আর দশটা ভাষার মতো একটা আঞ্চলিক ভাষা মাত্র। যিশু যে-ভাষায় কথা বলতেন, সে-ভাষা এখন মৃত। পৃথিবীর বহু ভাষায় এককালে বহু মানুষ কথা বললেও তেমন বহু ভাষা এখন মৃত। এটাই মানব সংস্কৃতির লক্ষণ। তাই ক্রমাগত পরিবর্তনকে মেনে নিয়েই সম্প্রচারের ভাষার উত্তরোত্তর পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেওয়া ভালো।

ইংরেজি মাধ্যমের পড়ুয়ারা যে-কেবল খবর পড়তেই আসছেন, তা নয়, প্রত্যক্ষ ভাবে ইংরেজির প্রভাব বাংলা বাক্য গঠনে ও বাগভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে, যেমন 'এখন তিনি বক্তব্য পেশ করবেন' 'এই সুবর্ণ সুযোগ হারাবেন না' ইত্যাদি বাংলা অভিব্যক্তি নয়। এগুলি ইংরেজি থেকে আক্ষরিক অনুবাদেরই ফল। বক্তব্য কোনও বস্তু নয়, যা পেশ করা যায়। বিশ শতকের শুরুতে সুবর্ণযুযোগ বললে শ্রোতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন। কিন্তু ওই ধরনের বাক্য এখন সম্প্রচারেও দিব্যি চলে যাচ্ছে। যেমন 'সঠিক পথনির্দেশ' গোছের বহু অভিব্যক্তিও হরহামেশা শোনা যায়। ঠিক এবং বেঠিক শব্দ দুটি থাকতেও সঠিক শব্দ কী করে আসে, সেটা বোধগম্য নয়। সম্প্রচার কেবল খবরের ভাষাকেই বলে না। খবর শুনতে গেলেও বহু বিজ্ঞাপন দেখতে ও শুনতে হয়। শাড়ি গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপনে 'ধামাকা'

'ফাণ্ডা' ইত্যাদি শব্দ শুনতে হয়। এই শব্দগুলি কেবল দূরদর্শন থেকে আসেনি। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে একধরনের স্থানীয় কক্‌নি চলে, যা হিন্দিভাষী পরিবার থেকে আসা ছেলেমেয়ের দৌলতে সম্প্রচারিত। দূরদর্শনে সম্প্রচারিত বহু পণ্যের লক্ষ্য বা টার্গেট অডিয়েন্স এই খিচুড়ি ভাষা বলা সম্পন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরা, তাই তাদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত বিজ্ঞাপনে এই সব 'ফান্ডা' 'ধামাকা' 'হেভি' শব্দগুলি বাংলার সঙ্গে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কারণ পণ্য যদি ক্রেতার ভাষায় কথা না-বলতে পারে, তাহলে তার ভবিষ্যত নেই। এই সমস্যা কেবল বাংলারই নয়, মুম্বইয়ের হিন্দি চলচ্চিত্রে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, সেই ভাষায় মুম্বইয়ের চালু মারাঠি প্রবলভাবে ঢুকে হিন্দি ব্যাকরণই পালটে দিচ্ছে। বাংলাদেশের দূরদর্শনে যখন রান্না শেখাবার সময় বলা হয় 'এটা ভুনা খেতেই ভালো' তখন পশ্চিমবঙ্গে সেটা আমাদের কানে লাগে। কানে লাগে যখন শুনি 'পাক করে দেখুন, খাবারটা খুব মজার।' এটা হবেই, কারণ বাংলাদেশের কথার চলাচল ও-দেশের ভৌগোলিক সীমায় নিবদ্ধ। আমাদেরও তাই। দু'দেশের মধ্যে চলাচল যদি স্বাভাবিক হত তাহলে এমনটি হত না। কিন্তু তা যখন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে সম্ভব নয়, তাই এই উত্তরোত্তর পরিবর্তনের ধারা আমাদের মেনে নিতেই হবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলাভাষার সম্প্রচারের দায়িত্ব আর্থ-ভৌগোলিক ও সামাজিক কয়েকটি ব্যাপারের হাতেই ছেড়ে দিতে হয়।

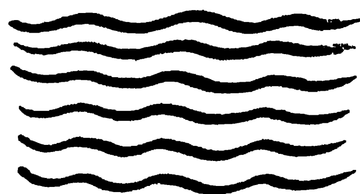
বাঙালির পোশাক কি, পোশাকে তার নিজস্ব কোনো পরিচয় আছে কি না, এই প্রশ্নও সম্প্রচারের ভাষায় আসে। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর থেকে মাইকেল এবং নজরুল অবধি সকলে এতই বিচিত্র পোশাক পরতেন যে তাঁরা সকলেই এক ভাষায় কথা বলতেন, সেটাই মেনে নেওয়া মুশকিল। প্রথম যাঁরা বাংলায় খবর পড়তেন, তাঁরা শাড়ি পরতেন। সেটা ছিল সরকারি চ্যানেল। প্রাইভেট চ্যানেল হবার পর থেকে খবর যাঁরা পড়েন বা অকুস্থলে সরেজমিনে বিবরণ দেন, তাঁরা কেউ শাড়ি পরেন না। হিন্দি ইংরেজি চ্যানেলের অনুসরণে তারা কোট পরেন মেমদের মতো। মুখের ভাষা না শুনলে বোঝা মুশকিল যে এঁরা বাংলায় খবর পড়ছেন। এক আশ্চর্য সমতায় হিন্দি ইংরেজি বাংলা খবর পড়ুয়া মহিলাদের মতো কোট টাই পরা পুরুষরাও এক হয়ে গেছেন। পোশাক কোনও দেশ বা স্থানপরিচয়

ছাড়াই নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠছে। এঁদের দেখাদেখি তরুণ প্রজন্মেও তার প্রভাব অনেকখানি পড়ছে। সিরিয়ালে জিনস ও টাই পরা চরিত্র ঢুকে পড়ছে। ফ্যাশন বা সাজগোজের পাঠও অনেকে দূরদর্শন থেকে নিচ্ছেন।

আসল কথা, বাংলা সম্প্রচারের বাণীর সঙ্গে আমজনতার একটা ফারাক যেমন তৈরি হয়েছে, তেমনি বাংলা খবর পাঠক-পাঠিকারাও সাধারণ বাঙালির পোশাকে আবির্ভূত হচ্ছেন না। এর প্রভাব সাধারণের মধ্যে পড়তে বাধ্য। ইতিমধ্যেই পড়ছে। পোশাকের ব্যাপারে বাঙালির আইডেনটিটি নিত্য পালটায় এবং এখনও পালটে চলেছে। যে-ধরনের শাড়ি পরা বা ধুতিপাঞ্জাবি পরা বাঙালি মহিলা ও পুরুষকে আমরা চিনতাম, তাঁরাও খুব বেশিদিন আগে আবির্ভূত হননি। গোটা ইয়োরোপের দেশগুলির সত্তর বছর আগের আলোকচিত্র দেখলে বোঝা যায় যে তখনও দেশে দেশে নিজস্ব পোশাকের ধরনধারণ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নারী পুরুষ সকলেই আপন-আপন জাতিসত্তার পরিচায়ক পোষাক ছেড়ে একই ধরনের পোষাক পরতে শুরু করেছেন। এই বিশ্বায়ন অবশ্যম্ভাবী। তার জন্যে কোনও আপশোস করবার প্রয়োজন নেই। ভারতে এই পোশাকের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন আনতে দেরি হয়েছে, কিন্তু সেটা আসতই।

এই যে ভাষার ধরনধারণ, পোশাকের যে ধরনধারণ তা যদিও আমজনতার ভাষা বা পোশাক নয়, সমাজের কয়েকজন শিষ্ট মানুষেরই কথাবার্তা ও পরিধানের বিষয়, এই সত্যটাও মেনে নিতে হবে। কারণ সব যুগেই সমাজের কয়েকজন বাছাই মানুষের কথাবার্তা ও পরিধান সমাজের মডেল হয়ে ওঠে। আর, এই মডেলও নিত্য পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন চলছে ও চলবে। এখন আমরা খবর শুনি ও দেখি। এই দেখা শোনা মিলিয়েই সম্প্রচারের ভাষাও নিত্য বিবর্তিত হয়ে চলেছে।

লেখক কবি, প্রাবন্ধিক, কলা সমালোচক ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের প্রাক্তন ডীন



সম্প্রচারের এখন-তখন

মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষুরের আঘাতটা আর একটু হলেই এসে লাগত একেবারে কণ্ঠনালিতেই। সেলুনে গিয়েছি দাড়ি কামাতে। এ-সব জায়গায় সচরাচর যেমন থাকে, অন করা রয়েছে রেডিয়োর একটি প্রাইভেট এফ. এম. চ্যানেল। তা থেকে ভেসে আসছে চখাচখির চোখা চোখা প্রলাপোক্তি। বাড়াবাড়িটা এমন পর্যায়ে পৌঁছোল যে, অতি দুর্বিনীত কয়েকটি বাক্যালাপ কানে যেতেই সেলুনে উপস্থিত আর সবার সঙ্গেই চমকে উঠল নিরক্ষর ক্ষৌরকারটিও।

পুরুষকণ্ঠ॥ শুনেছ, জ্যোতি বসুর এ.টি.এম. থেকে নাকি কয়েক লাখ টাকা চুরি হয়ে গেছে—

(ভাঙা গলায় আধো আধো উচ্চারণে)

নারীকণ্ঠ॥ আহা বে-চা-রা, ক'দিন আগেই স্ত্রী চলে গেল, আর এখন টাকাও!

মাত্রাছাড়া এই প্রগল্‌ভতার পরেও আরও যেসব অভব্য, অসুন্দর কথাবার্তা নির্গত হচ্ছিল তাঁদের মুখ থেকে, সেগুলি

কর্ণকুহরে পৌঁছোনোর আগেই ভাগ্যিস নিজেকে সামলে নিয়েছিল সেই নরসুন্দরটি!

পুরুষকণ্ঠ॥ নিশ্চয় খুবই মুষড়ে পড়েছে। মনটা ওর একটু চাঙ্গা করে দিই। কোন গানটা শোনাই বলো তো—

নারীকণ্ঠ॥ একটা লারে-লাপ্পা টাইপের হয়ে যাক। বি-শো-ন (ভীষণ) জমবে!

শুধু ফ্যাস্‌ফেসেই নয় নারীকণ্ঠটি, তাতে স্বেচ্ছাকৃত কৃত্রিমতায় ভরা 'গুনগুন'-সেনীয় (কল্পিত নাম) সেক্স-অ্যাপিল্‌ও। সম্প্রচারে সংলাপ বলার ধরনে এই 'সেন-সেক্স'-এর ক-দর নাকি এখন আকাশচুম্বী! বেপরোয়া উপস্থাপনায় কোনোরকম সেন্স আর নেই বলেই এদের ধরাকে সরাজ্ঞান, সর্বজনমান্যের প্রতি এহেন অশালীন অসৌজন্য!

একেই তো রফা করা গেছে বাংলা ভাষার দফা। ভয়ংকর 'ভীষণ' এখন 'অতিরিক্ত ভালো'। 'মারাত্মক'-ও আজ 'গভীর মমতাভরা'।

—-গত কয়েকদিন ধরেই 'মারাত্মক' ডায়ালিসিসে রাখা হয়েছিল প্রমোদ মহাজনকে। সংবাদ পাঠকের এই অভাবনীয় উক্তির সঠিক মর্মার্থ—এটাও হয়, ওটাও হয়। কী 'সাঙ্ঘাতিক' কোয়ালিটি বাক্-বৈদগ্ধ্যের!

ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে ভাষাকে ভাসিয়ে দেবার ধুম বলে ব্যঙ্গোক্তি যদি করেন, জেনে রাখুন, গতি রোধ করছেন প্রগতির। তেঁ-আঁশলা খোলস থেকে আসলটিকে বেছে নিতে যদি না-ই পারেন, তুলো দিয়ে বন্ধ রাখুন কান। 'উদয়ের পথে'-র নায়ক অনুপটা কী বোকা-ই-না ছিল; বলত— "ইংরাজি আর বাংলা—দুটো ভাষাই ভালো জানি কি না, তাই দুটোকে মেশাবার দরকার হয় না।"—রাবিশ!

এখন কোনোটাই জানার দরকার নেই বলেই দ্রুতি দিয়ে শ্রুতিকে নাকাল করার প্রতিশ্রুতি। রেডিয়োতে, টিভিতে। কথা বলার স্বাভাবিক উচ্চাবচতাকে 'বন্ধুর' ভেবে গড়গড়িয়ে রোলার চালানোর কেতা এনে দর্শক-শ্রোতার-কাছে পৌঁছোনোর পথ মসৃণ হবে বলে মনে করেন যাঁরা, তাঁদের আর যাই হোক সম্প্রচার মাধ্যমের বন্ধুর মর্যাদা দিতে পারি না। আবার, সংবাদ-শিরোনাম আর আবহবার্তা পাঠের নেপথ্যে অযথা জবরদস্ত বাদ্যবাদনও যে পাঠকের মুখের কথার ওপর পাথর চাপা দিয়ে যায়—এটুকু উপলব্ধি করার মতো বিচক্ষণ কোনো কর্তাব্যক্তিও কি নেই এসব মাধ্যমে? শোনার জন্যই যা বলা তা যদি অশ্রুত বা অস্পষ্টই রয়ে যায়,

তবে বলার অর্থই বা কী, প্রয়োজনই-বা কী? খাজনার চেয়ে বাজনাই হবে বেশি?...টিভির হাতের-পাঁচ আবার রোল মডেলের দেখনদারি। খবরের পুরুষের সাজগোজের বৈচিত্র্য এক'টাই'। তার সঙ্গে সময় বুঝে সুট-বুট। নারীর অত সময়-অসময়, রাখ-ঢাক নেই। তবে ঘুণাক্ষরেও কেউ যাতে অশালীনতার অভিসন্ধির অজুহাত দেখাতে না পারেন বক্ষসন্ধিতে তাই চোখে পড়ার মতো আবরণী। নইলে বড্ড বেশি 'বাঙালি-বাঙালি' মনে হয়। পিতৃপ্রতিম প্রবীণ প্রতিবেদককে নাম ধরেই সম্বোধন না করলে ক্ষুণ্ণ হয় আন্তর্জাতিকতা। আর, মাননীয় ভি.আই.পি-দেরও স্টুডিয়োয় সাক্ষাৎকারে ডেকে এনে দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান রাখাটা যদি দৃষ্টিকটু বলে মনে হয় তাহলে আপনি বড্ড সেকেলে মধ্যবিত্ত মানসিকতার এক উজবুক বাঙালি ছাড়া আর কেউ নন!

শোভনতার দেশীয় রীতিকে নস্যাৎ করার প্রবণতাটাই কি তাহলে আধুনিকতার নবচেতনা? এবং বিনোদনের নির্মল আনন্দেও কি আজ কেবলই শুধু বিপণনেরই কুৎসিত কালো ছায়া? বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের বাহারে আজ যত-না জেল্লা, তারও বেশি বেলেল্লা! আদিম রিপুই তো আজ আদত মিত্র! বুলাদিও বলছেন—'কোনও কিছুই কন্‌ডেম্ করো না, কন্‌ডোম্ থাকলে যার-তার সঙ্গও এখন দুঃসহবাস নয়।' এভাবেই চলছে সংযমের ওপর মিডিয়ার দমন নীতি। ভোগের হাতছানি অগ্রাহ্য করেছ-কী, দুর্ভোগ। সব গ্রাম্যতা ঝেড়ে ফেলে তাই আজ হও নগর-কেন্দ্রিক। বৃহদর্থে নগরের বাসিন্দাকেই তো বলা চলে 'নাগর'—সেখানে অযথা শব্দার্থে সংকোচন এবং মনের ভিতর সংকোচ থাকবে কেন? বিভিন্ন টিভি-চ্যানেলে অনুষ্ঠানের আগাম ঘোষণায় তাই বলা হয় না—রাত আটটায় 'ভারতে', রাত সাড়ে আটটায় 'বাংলাদেশে'; পরিবর্তে উচ্চারিত হয় 'কলকাতা' আর 'ঢাকা'-র নাম। আসলে 'নগর'-এর সঙ্গে ধ্বনিগত সাদৃশ্যও যে রয়েছে 'রগড়'-এর। ধনী হাতে তাই দিনভর চলেছে সেইসব রগড়ানি। মস্তির সঙ্গে দোস্তি পাকাতে অস্বস্তি হলে—দূর্ হটো।...বিনোদন এক বিরাট ভোজসভা—লঘু-গুরু পাক খাচ্ছে সমান তালে। বিতরণে-অকাতর-পরিবেষ্টারাই তৈরি করে দিচ্ছেন পরিবেশ-টা। অঙ্গনারা অঙ্গ না দেখালে রঙ্গ জমে না: পুরুষ সঙ্গীর অঙ্গ ভঙ্গিতেও একই অনুষঙ্গ। ছুঁতমার্গের গোঁড়ামিতে অবিশ্বাসী এরা সকলকে নাজির বানাতে তাই শৃঙ্গার-রসের ভৃঙ্গার নিয়ে হাজির। দ্রুতগতিতে চলেছে

একবিংশ শতাব্দী এক্সপ্রেস। তৃতীয় শ্রেণির চটুল হিন্দি সিনেমার মতোই তার সব ক-টি কামরায় সম্প্রচার মাধ্যমের কেটারাররা বিতরণ করে চলেছেন জিঘাংসা আর রিরংসার নানা উপকরণ।

দু-হাজার পাঁচের শারদোৎসবে একটি প্রাইভেট টিভি চ্যানেল চার দিন ধরে কভার করল কলকাতার বিশেষ একটি অভিজাত অঞ্চলের দুর্গা পুজো। বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি। পুজোর সকালে—আমরা বাঙালি! উচ্চারণে না হোক আচরণে চাই শুদ্ধতা। তাই পূজার উপচার মুখের কথায় যতই 'উপাচারে' পর্যবসিত হোক—সেই দিনগুলিতে অন্তত উপস্থাপিকার চাই শুচিশুভ্র জমির ওপর লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি ; উপস্থাপকের ধাক্কা-পাড় ধুতি, লক্কাপায়রা ধাঁচের কোঁচাটি সামনে লোটানো, সাবেকি বউভাতে দিনমান বসে-থাকা নববধূর ছড়িয়ে-রাখা বেনারসির কোল-আঁচলের ঢঙে। পোশাকের এই শালীনতায় চোখ জুড়োলেও, দুজনের কথোপকথনের মধ্যে 'অত্যাধিক' পুনরাবৃত্তি জুড়োতে পারেনি কান। এ তবু সহনীয়। কিন্তু সন্ধ্যার সমাগম হতেই হ্যান্‌কর-ত্যান্‌কর-রূপী কতিপয় 'অ্যাঙ্কর' রাতের পরিবেশটাই করে তুললেন ঘোলাটে, এবং ধোঁয়াটে! ধুনুচি নাচও যে একটি শিল্প তার লেশমাত্রও বোধ নেই এই অবোধদের। ফলে, তুর্কিনাচন। পুরো পরিকল্পনাটাই মাটি।

ওই মরশুমেই, দ্বিপ্রহর ঝিমিয়ে পড়া অবকাশে, স্থানীয় প্রবীণদের গৃহ-পরিক্রমার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল টিভি সিরিয়ালের পরিচিত দুই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে। ঘরোয়া কথা শুনতে চাই। এক প্রবীণ যখন তার ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে আগের বছরে এই মহানবমীর দিনেই তার স্ত্রী-বিয়োগের বিষাদময় করুণ কাহিনি শোনাচ্ছিলেন, সোফার হাতলের দুই প্রান্তে বসে থাকা ওই দুই তরুণ-তরুণী তখন একান্তে পরস্পরের শরীরে পরশ বুলিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিলেন কদর্য খুনসুটি। প্রেজেন্টেশন-প্রোগ্রামের যুগলবন্দির যেন ওই একটাই ফন্দি এটাই প্রমাণ করা—'কত বড়ো সেক্স-পেয়ার আমরা!' তাহলে কি সামাজিক রীতিনীতির সমস্ত নর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা আজ সকলেই হয়ে উঠছি শুধুমাত্র এ-ওর নর্মসহচর?

ওদিকে, সংবাদভিত্তিক উপস্থাপনাতেও আলটপকা কথা বলাটা প্রকট হয়ে কানে বাজে আরও। কনসোলে বসেন যিনি তাঁর কথাবার্তায় কখনো

কখনো অতিচালাকিটা অতিবোকামিরই নামান্তর মনে হয়। দর্শক-শ্রোতাকে বার বার শোনান একই কথা। আবার নিজেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন, দূরবর্তী সংবাদ প্রতিনিধি এতক্ষণ কী বললেন, সেটাও। যেন সকল দর্শক-শ্রোতার কর্ণদ্বয় বধির ছিল সেই সময়টুকু; যেন তিনি বুঝিয়ে না দিলে কোনো কিছু বোঝবার মতো বোধশক্তিই নেই কারও। শিশুপাঠ্যের অর্থপুস্তকে যেমন লেখা থাকে—'কী বলিল, মানে, কী কহিল'—এঁদের বুঝিয়ে বলাটাও সেইরকমই সহজের পরিবর্তে আরও জটিল হয়ে পড়ে। দক্ষ কথাকার না হওয়ায় বেশিরভাগেরই কথা যায় জড়িয়ে; আসে তোতলামিও। তবে আঁতলামিতে এসব নাকি এখন প্লাস্‌পয়েন্ট। যেন বলা হচ্ছে 'তোমরা বোকা, আমরা চালাক।' বুদ্ধিদীপ্ত বিদগ্ধ মানুষের জন্য উপস্থাপিত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানেও দেখি, এবং শুনি, 'শিরোনাম'-কে কেন্দ্র করেই চলেছে ফোলানো-ফাঁপানো বিস্তারিত ভূমিকা। অতি বিনম্রতার ভণিতাতেও কিন্তু সেখানে ঢাকা পড়ে না দর্শক-শ্রোতার বোধবুদ্ধির প্রতি তাঁদের তির্যক এই অবজ্ঞা।

সংবাদ পরিবেশনে এখন সব প্রেজেন্টারই অ্যাঙ্কর্। কিন্তু রাশ ধরার মতো একটু রাশভারী তাঁরা যদি না হতে পারেন, নিরাশ হতে হয় দর্শক-শ্রোতাদেরই। এতদিন জানতাম, বাচিক-শিল্পীর ভূমিকা পালনে প্রধান শর্তই হল—যেটা বলছি, সেটা ভেবে বলা। মুখে এসে পড়া অনেক কথার অর্থ যে অনর্থ ঘটাতে পারে, সেটা মাথায় রাখতে হবে সারাক্ষণ। ইয়ারফোনে সহকর্মী যা জানাচ্ছেন কানে কানে. ক্যামেরার সামনে সেটা লোক-দেখানি না-শোনার ভান করে চটপট বলে যাওয়াতে স্মার্টনেস থাকতে পারে, কিন্তু হঠকারিতায় আসতে পারে বিভ্রান্তিও। যেভাবে চাই, যা চাই—সেভাবে সেটাই বলতে গেলে নিজেকে যাচাই করতে হবে পলে পলে। নইলে, অজান্তেই, বক্তব্য প্রকাশের ঘাড়ে এসে চাপবে অভিপ্রেত কথার প্রেত।

এখন দেখছি আমাদের সেই ধারণাটার মধ্যেই বোধ হয় গলদ থেকে গেছে কোথাও। নইলে এসবও তো দিব্যি চলছে এখন। ...খুলেই বলি।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনের অন্যতম একটি দিনে এক প্রাইভেট বাংলা টিভি চ্যানেলে বিকেল চারটে নাগাদ সঞ্চালিকা বলে বসলেন,—"এইমাত্র খবর পেলাম, নদিয়ার পলাশিপাড়ায় ভোট ভেস্তে

গেছে।"...কেন ভেস্তে গেছে, কীভাবে ভেস্তে গেল, ভেস্তেই যখন গেল, তখন নিশ্চয়ই ওখানকার বুথগুলিতে কাল বা পরশু আবার ভোট নেওয়া হবে—দর্শক-শ্রোতার মনে যখন এই প্রশ্নগুলি ওঠানামা করছে, তখনও সঞ্চালিকা বারবারেই শুনিয়ে যাচ্ছেন একই কথা। মিনিট পঁয়তাল্লিশ পর ওই একই অ্যাঙ্কর অবশেষে জানালেন,—"ওখানে কালবৈশাখী শুরু হয়েছে। তাই এখন ভোটগ্রহণ বন্ধ আছে।" অর্থাৎ একটু পরেই ঝড়বৃষ্টি থামলেই পুনরায় শুরু হবে ভোট নেওয়া, চলবে নির্ধারিত সময় পার করেও। কাজেই আগের ওই 'ভেস্তে গেছে' কথাটি ছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, ত্রুটিপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর।

ঠিক এর ক-দিন পরেই ওইরকম বিকেলের দিকেই টিভি সেটে ওই একই চ্যানেল অন করতেই, দৃশ্যমান বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান ও সি.পি.এম-এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিমান বসু। নির্বাচনের ব্যাপারে দিল্লি থেকে প্রেরিত এক পর্যবেক্ষকের বক্রোক্তির জবাবে তখন বিষোদ্‌গার করে চলেছেন তিনি—"বাবারও বাবা আছে। চোরের মায়ের বড়ো গলা। 'নটোরিয়াস্' বেলগাছিয়া (পূর্ব) কেন্দ্র, না কি স্বয়ং ওই পর্যবেক্ষক—সেটা বুঝিয়ে দেবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণই। ওই অবজারভার, এইসব অবাঞ্ছিত, উদ্দেশ্যমূলক কথা বলে পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতাদেরই অপমান করেছেন শুধু নয়, আগের আগের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের শংসাপত্র দিয়ে গেছেন, অপমান করেছেন তাঁদেরও।"

প্রেস কন্‌ফারেন্স চলাকালীনই বার বার ক্যামেরা ফিরে আসছিল স্টুডিয়োয় সঞ্চালকের কাছে। সঞ্চালক ধরেই নিলেন বিমান বসুর কথাগুলি অনুধাবন করতে পারেননি সাধারণ দর্শক-শ্রোতা, এমনকী বোদ্ধারাও। তাই স্বয়ং নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন বুঝিয়ে বলার দায়িত্ব। বার দশেক গোঁত্তা খেয়ে অসংবদ্ধ অসংলগ্ন ভাষায় বিমান বসুর বক্তব্যের সারকথা তুলে ধরে বার বারই সমাপ্তি টানতে লাগলেন এই বলে—"বিমান বসু বললেন, বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার প্রতিনিধি মারফত তাঁর 'উত্তরসূরিদের' অপমান করছেন।" ...বোঝা গেল সঞ্চালকের উত্তর-পূর্ব জ্ঞানও অস্পষ্ট। পঞ্চাশ মিনিট ধরে ভুল বলে যাওয়ার পর 'উত্তরসূরি' 'পূর্বসূরি'তে রূপান্তরিত হল।

রেডিয়ো-টিভির বিভিন্ন চ্যানেলের সংবাদে চোখ-কান খোলা রাখাটা, আজ মনে হচ্ছে, আমার 'বদ্অভ্যেস' ছাড়া কিছু নয়। উদ্দেশ্য ছিল, নীর থেকে ক্ষীরটুকু ছেঁকে নেওয়া। যদিও জানি সেই ক্ষীরটুকুও সুপাচ্য নয়। তাই নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনার আঁচে বসিয়ে 'সন্দেশ' এর পাকটা বুঝে নেবার চেষ্টা। তাতেও বিড়ম্বনা কম নয়। সংবাদ-সঞ্চালকের অতি সপ্রতিভতায় সাংবাদিকতার কাজে তাঁদের প্রতিভা সম্পর্কে সংশয়ের পাশাপাশি মুখের কথার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন জাগে। অনেকসময় আবার সঞ্চালক ঘটনাস্থলে উপস্থিত সংবাদপ্রতিনিধিকে এমন বোকা বোকা প্রশ্নও করে থাকেন, মনে হয় সেই প্রেরিত প্রতিনিধিটি যেন সবজান্তা ঈশ্বর, ভূত ভবিষ্যৎ সব তাঁর নখদর্পণে!

একটি চ্যানেলের সঞ্চালকের কথা। নিজের কানেই শোনা, নিজের চোখেই দেখা। খবরটা এই রকম:

একটি পরিবারের প্রায় আটজন সদস্য ব্যারাকপুরের বাড়ি থেকে গাড়িতে করে বেরিয়েছিলেন তারকেশ্বরের উদ্দেশে। পথিমধ্যে বিরাট দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে আরোহী সকলেরই। ...ঘটনাস্থলেই প্রতিনিধির সঙ্গে তো সঞ্চালকের জিজ্ঞাসাবাদ চলল। এরপর ব্যারাকপুরে হাজির থাকা প্রতিনিধিকে টিভির সেই সঞ্চালকের মোক্ষম একটি প্রশ্ন—"ওদের ফ্যামিলির কেউ কি তাহলে রয়ে গেল?"—'তাহলে রয়ে গেল' কথাটির দ্যোতনাটা বুঝুন! এই-যে কেউ থেকে গেলেন, সেই থেকে-যাওয়াটা যেন ওই পরিবারের পক্ষে আরও বেদনার—এমনই উৎকণ্ঠা সঞ্চালকের কণ্ঠে।

এইরকমই নিরর্থক কথার ফুলঝুরি দিনরাত্তির চলে রেডিয়োর এফ. এম.চ্যানেলেও। রেডিয়ো যেহেতু শুধু কানের শোনা, তাই সেখানে আবোল-তাবোল বলা, কৃত্রিম বাচনভঙ্গি, নিপাট 'বঙ্গজ' উচ্চারণ কর্ণপীড়াদায়ক বেশি।

রেডিয়ো-টিভিতে কথা বলাটাও একটা শিল্প, আর্ট। উচ্চারণে তো বটেই, মার্জিত পরিশীলন যেমন প্রয়োজন বক্তব্যে, তেমনি বলার ভঙ্গিতেও! আত্মপ্রচার ও আত্মম্ভরিতার ব্যাঞ্জো না বাজিয়ে কম কথায় অনেক কিছু বলা—সেটাই আসল ব্যঞ্জনা। যাঁদের উদ্দেশে বলা, কথাগুলি তাঁদের মাথার ওপর দিয়ে চলে না গিয়ে যেন পৌঁছে যায় তাঁদের হৃদয়মন্দিরে।

সম্প্রচারকের মুখের ভাষা এবং বলার ভঙ্গিটি হবে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারী। কী বলছি, কীভাবে বলছি, তার সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে কোন অনুষ্ঠানে ব্যবহার করছি ভাষার কোনো ধরণ। বাচিকশিল্পী হিসেবে প্রায় বেয়াল্লিশ বছর সম্প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সুবাদে এই নিয়ে হয়তো কিছু বলার অধিকার না পেতে পারি, কিন্তু বেশ কিছু অভিজ্ঞতা তো অর্জিত হয়েছে। সুধীজন, অনুগ্রহ করে সেই অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না যেন। কোনো কিছু জাহির করতে নয়, দীর্ঘকাল তাবড়ো সম্প্রচারকদের সান্নিধ্যে থাকার অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু উপলব্ধি সর্বসমক্ষে হাজির করতেই এই নিবন্ধের অবতারণা। জানি, সেদিনের ধ্যান-ধারণার অনেক কিছুই আজ গেছে বদলে—আচার-আচরণ, চাল-চলন, হাব-ভাব কথাবার্তা। সম্প্রচারেও তার প্রভাব অবশ্যাম্ভাবী। এই বাস্তব সত্যটি যে বুঝিনা, এমন মূর্খ ভেবে বসবেন না যেন। কাউকে তা অস্বীকার করারও পরামর্শ দিই না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্প্রচাররীতিতেও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেও যেভাবে বেতার অনুষ্ঠান প্রচারিত হ'ত—সামান্য বিচ্যুতিকেও প্রশ্রয় দেওয়া হ'ত না। না বেতার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে, না শ্রোতৃমহলে। একটি দিনের ঘটনার কথা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের এক বুধবার। রাত সাড়ে ন-টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কলকাতা ক-এ আধঘন্টার অনুরোধের আসর আধুনিক গানের। ঘোষণায় আমাদের এক সহকর্মী। হঠাৎ কী খেয়াল হল তাঁর, ঘোষণায় বৈচিত্র্য আনার জন্যে শুরুতে একটু 'ফিলার' বাজিয়ে, তারপর বলে বসলেন,—"দেখছেন, আজ বুধবার, একদম ভুলেই বসেছি। খেয়ালই নেই এখন 'অনুরোধের আসর'। ক-সেকেন্ড অপেক্ষা করুন—রেকর্ডগুলো খুঁজে নিই। না, না, তারও দরকার নেই। আপনাদের অনুরোধে স্বয়ং সতীনাথ মুখোপাধ্যায় এসে দাঁড়িয়েছেন সমুদ্রতীরে। শুনতে পাচ্ছেন তাঁর কণ্ঠস্বর?"—(এই বলে চালিয়ে দিলেন রেকর্ডের গান) 'বালুকাবেলায় কুড়াই ঝিনুক, মুকুতা তবু তো মেলে না।' অমন ঘোষণায় অনেকেই হতচকিত। ওর ওপর ঘৃতাহুতি পড়ল অন্য একটি ঘটনায়। সতীনাথের গানটি চলতে চলতেই ট্রান্সমিটারে বৈদ্যুতিক বিঘ্ন ঘটায় বন্ধ হয়ে যায় সম্প্রচার। মেজর ব্রেকডাউন। পুরো অনুরোধের আসরটাই আর শোনা গেল না সে-রাতে। আর যায় কোথা? শ্রোতাদের চিঠির বন্যা বয়ে গেল। তাঁরা

নিঃসন্দেহ, ঘোষক আকণ্ঠ পান করে স্টুডিয়োয় ঢুকেছিলেন। কী শাস্তি তাঁকে দেওয়া হল, সেটাও 'সবিনয় নিবেদন'-এ জ্ঞাপন করার নির্দেশ ছিল সে-সব চিঠিতে।

এফ্.এম-এর যুগে এমন ঘোষণা এখন আকছার শোনা যাচ্ছে। এবং জানি, সে যুগের ওই-ঘটনাকে অকারণ গোঁড়ামি বলেই মনে করবে বর্তমান আলোকপ্রাপ্ত সমাজ। তাহলে? এখন যে-টা চলছে তাকে বক্রদৃষ্টিতে দেখছেন শুধু রক্ষণশীল গোঁড়াপন্থীরাই, প্রকৃত আলোকপ্রাপ্তরা নন—এই তো! কিন্তু মনে রাখতে হবে, রাতের আঁধারে মোটর গাড়ির দুটি হেডলাইট থেকেই যদি তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে, পথচারীর চোখ যায় ধাঁধিয়ে, দুর্ঘটনায় মৃত্যুও বরণ করতে হতে পারে তাকে! আলোকপ্রাপ্তিটা কোথায়, কীভাবে ঘটছে—প্রশ্নটা সেখানেই। অনুরূপ চোখ-ধাঁধানো বিজ্ঞাপনের বিচ্ছুরণেই সম্প্রচার মাধ্যমও আজ মেতেছে চটুল বিনোদনে সকলকে বিচেতন করার খেলায়। বিদ্বজ্জনের বিবর্জনে কিছুই এসে যায় না ভেবে অকিঞ্চনকে লাট-বেলাট বানাতে গিয়ে একদিন এই বেওসায়টাই না লাটে ওঠে! এখনই তো সঞ্চালককে বার বার বলতে হয়—"অনুষ্ঠান ছেড়ে যাবেন না কেউ, এখন একটুখানি বিজ্ঞাপনের 'বিরক্তি'!" বিজ্ঞাপনের এই ঘনত্বই ঘনিয়ে তুলবে না তো শেষের সেদিন? কেননা, যতই বিপণনের তাগিদ আর বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি থাক, সম্প্রচার মাধ্যমের 'একমাত্র লক্ষ্য কিন্তু ব্যাবসা নয়, যোগাযোগ।' কারণ এই মাধ্যম 'সুস্থ সামাজিক চেতনা বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।' বর্তমান সম্প্রচার ব্যবস্থায় এই শুভবোধ এবং পরিমিতিবোধের অভাবটাই সবচেয়ে বেশি। ঐতিহ্যের শক্ত বনিয়াদকে ভেঙে দিয়ে আধুনিকতার সুউচ্চ হর্ম্য গড়ে তুললে, যতই নয়নলোভন, যতই প্রমোদ-প্রলোভনের কেন্দ্রভূমি হোক তা ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে অচিরেই। ঐতিহ্যপ্রীতি তো অতীতচারিতাই নয় শুধু, আগামীর অচিন পথে এগোতে রসদের সঞ্চয়নও—যার অভাবে বন্ধ্যা হয় বর্তমান।

একটা সময় কলকাতা বেতারের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলির শীর্ষে ছিল শনি ও রবিবার বেলা একটা চল্লিশ থেকে দু-টো ছাব্বিশ পর্যন্ত গ্রামোফোন রেকর্ডে 'অনুরোধের আসর'। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে শ্রোতাদের পছন্দের ওই দুটি চাঙ্ক-এ আনা হয় অন্য অনুষ্ঠান। এমনিতেই তখন থেকেই শুকোতে শুরু করেছিল বাংলা গানের প্রবহমাণ ধারা, তার ওপর রেডিয়ো

থেকেও মাটি চাপা দিয়ে রাখা হল স্বর্ণযুগের গানের খনিমুখ। নতুন প্রজন্মের কাছে তারপর থেকে দীর্ঘকাল অজানা থেকে গিয়েছিল স্বর্ণপ্রভার সেই ঔজ্জ্বল্যের পরিচয়। অজ্ঞানতার এই ফাঁকিটা কেউ কেউ ভরাট করতে এলেন নকল সোনার অলংকার বানিয়ে। বর্তমানে অবশ্য কলকাতা বেতারে এফ.এম. চ্যানেল চালু হওয়ার পর থেকে সিংহভাগ সময় গান শোনানোর ব্যবস্থাপনায় ফিরে এসেছে অমূল্য ভাণ্ডারের সেইসব মণিরত্ন। ফাঁক ভরাটের ফাঁকিটুকু আজ তাই উপলব্ধি করতে পারছে বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরাও।

আজকাল তো রেডিয়ো-টিভিতে আরও কত রঙ-বেরঙের অনুষ্ঠান। সেইসব অনুষ্ঠানে বর্তমানের উপস্থাপক-উপস্থাপিকা যাঁরা, আকাল কি তাঁদেরও সংস্কৃতিমনস্কতার, বোধবুদ্ধির, হোমওয়ার্কের? তারা কি ধরেই নিয়েছেন মাইক্রোফোন পেয়ে যা-খুশি-তাই বলে যাবেন তাঁরা, আর এতই হাবা-গবা আর নির্বোধ দর্শক-শ্রোতার দল নির্বিবাদেই মেনে নেবেন এর সব হ?

কয়েকটি ঘটনার কথা মনে আসছে। আকাশবাণীর কর্মজীবন থেকে তখনও অবসর নিইনি। একদিন, বাড়িতে বসেই শুনছি এই কেন্দ্রেরই এফ.এম. প্রচার তরঙ্গে লেখিকা এবং এককালের গায়িকা প্রতিভা বসুকে নিয়ে 'আজ রাতে' অনুষ্ঠান। অসুস্থ প্রতিভা বসুর সাক্ষাৎকারের বেশিরভাগটাই রেকর্ড করে নিয়ে আসা হয়েছে টেপ-রেকর্ডারে, কিছু কিছু কথোপকথন টেলিফোনেও চলছে। প্রতিভা বসু (ছোটোবেলার রাণু সোম) গান শিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের কাছেও যেমন, তেমনি আবার মন্টুদা অর্থাৎ দিলীপকুমার রায় (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র)-এর কাছেও। অনুষ্ঠান চলতে চলতে উপস্থাপক একসময় ঘোষণা করলেন,—"রাণুদি যাঁর কাছে গান শিখেছিলেন—মন্টুদা—সেই দিলীপকুমার রায়ের গান শোনাই একটা।" ...শুরু হল গান—'কতভাবে বিরাজিছ বিশ্ব-মাঝারে'। কান্ত-গীতি। কিন্তু এই দিলীপকুমার রায় দ্বিজেন্দ্রলাল পুত্র নন, ইনি রজনীকান্ত সেনের দৌহিত্র দিলীপকুমার রায়—যাঁর কাছে কোনো দিনই গান শেখেননি রাণু সোম তথা প্রতিভা বসু। তখনই ফোন করি আকাশবাণীর ডিউটি রুমে। ব্যাপারটি সবিস্তার বুঝিয়ে ডিউটি অফিসারকে জানাই,—"উপস্থাপককে এখনই সংশোধন করতে বলো"। কান পাতাই রয়েছে রেডিয়ো-সেটে—

কিন্তু কা কস্য পরিদেবনা! ওইভাবেই চলতে থাকল অনুষ্ঠান। ডিউটি রুম থেকে রিং-ব্যাক করলেন ডি-ও—"উনি ঠিক লোকেরই গান দিয়েছেন বলে জানাচ্ছেন। তাই রিগ্রেট করার কোনো দরকার নেই বলছেন।" ...শুধু আকাশবাণী নয়, ওই উপস্থাপকেরও সম্মান রাখতেই তড়িঘড়ি করেছিলাম ফোনটা। কিন্তু 'বিচক্ষণ' উপস্থাপক আমার পরামর্শ গ্রহণযোগ্য মনে করেননি।

আরেকদিনও ওইরকম 'আজ রাতে' শুনছি বাড়িতে বসে। ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা চলছে দুই উপস্থাপক-উপস্থাপিকার মধ্যে। হঠাৎ কানে এল উপস্থাপকের এই কথাগুলি। বলছেন,—"এবারে শোনো 'মৌমাছি' অর্থাৎ বিমলচন্দ্র ঘোষের লেখা গান।" বলার পরই শুরু হল সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গান—'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা।' চম্‌কে উঠলাম। কিন্তু উপযাচক হয়ে টেলিফোনে সংশোধন করতে যাওয়াটা এবার মনে হল আমার অনধিকারচর্চা। তাই বিরত থাকলাম। ভাগ্য ভালো, এবার এক প্রবীণ শ্রোতাই অনুষ্ঠানের মধ্যেই টেলিফোনে জানালেন—"আপনারা এটা কী করলেন—বিমলচন্দ্র ঘোষকে 'মৌমাছি' বানিয়ে দিলেন! গীতিকার এই বিমলচন্দ্র ঘোষ হলেন কবি। আর 'মৌমাছি' ছদ্মনামে যিনি ছোটোদের জন্য লিখতেন, তিনি শিশুসাহিত্যিক। অন্য ব্যক্তি।" সপ্রতিভ উপস্থাপকের চটপট উত্তর,—"আমাদের কাছে তথ্য আছে গীতিকার বিমলচন্দ্র ঘোষই মৌমাছি।"

পরদিন দুপুরে ক্যান্টিনে সেই উপস্থাপকের দেখা পেয়ে পাকড়াও করলাম। গীতিকার ও কবি বিমলচন্দ্র ঘোষই যে 'মৌমাছি'-এই তথ্যটি কোথায় আছে জানার ঔৎসুক্য প্রকাশ করায়, তিনি নিরুত্তর রইলেন। অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ভুল তথ্য পৌঁছে দিতে বিন্দুমাত্রও লজ্জিত হননি তিনি। ঔদ্ধত্যের এই প্রসার সম্ভবত 'প্রসার-ভারতীর'ই দান।

এর আগে এমন ধরনের ভুল-ভ্রান্তি অল ইন্ডিয়া রেডিয়োয় যে ঘটেনি—এমন নয়। মনে আছে সেটা উনিশ-শো একাশি সাল। তার আগের বছরের সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান হল নয়াদিল্লিতে। সেবার শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক হিসেবে সম্মানিত হন অনুপ ঘোষাল, সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে গানের জন্য। রাষ্ট্রপতি-প্রদত্ত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান অবলম্বনে অমিতা মালিক-প্রযোজিত

আধঘন্টার একটি বিশেষ ফিচার আকাশবাণী দিল্লি থেকে প্রচারিত হয় রাত সাড়ে ন-টায়। ভারতের সব ক-টি বেতার কেন্দ্র তা রিলে করে। কলকাতা কেন্দ্রে ডিউটিরত অবস্থায় সেই ফিচারটি শুনে অবাক। শ্রেষ্ঠ গায়ক অনুপ ঘোষালের গানের পরিবর্তে ওই ফিচারে দেওয়া হয়েছে অমর পালের গানটি— 'ভাই রে, কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়'। তখনই স্টেশন ডিরেক্টরের বাড়িতে এই ভুলটির কথা ফোন করে জানাই। তিনি সেই মুহূর্তে টেলিফোনে দিল্লিতে জানান সে-কথা। দিল্লির আকাশবাণী রাত এগারোটার সর্বভারতীয় ইংলিশ নিউজে সেই ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে।

একবার আন্তর্দেশীয় প্রচার তরঙ্গে আমাদের এক ঘোষক বন্ধু ভরা শীতকালে রাত্রের ডিউটিতে ওস্তাদ আমির খানের একটি লং-প্লেইং ক্ল্যাসিক্যাল গানের রেকর্ড চালিয়ে, ওই স্টুডিয়োয় বসেই, মনোযোগ দিয়ে চিঠি লিখছিলেন। রেকর্ডটির সময়সীমা ১৮ থেকে ২০ মিনিট। চাঙ্ক্-টিও ছিল কুড়ি মিনিটের। উনি প্রোগ্রাম চালিয়ে চিঠি লিখছেন আর ঘড়ির দিকে চাইছেন। ঘড়ির কাঁটা যখন শেষের প্রহরে, ফেডার নামিয়ে রেকর্ডের ওপর থেকে পিক-আপটা সরাতে গিয়ে লক্ষ করলেন সেটি রেকর্ডের আরম্ভভাগেই রয়েছে, শেষ অবধি যায়নি। ট্র্যাক-ব্যাক্ নয়, খেয়ালের একটি অংশই নিটোলভাবে প্রচারিত হয়ে বার বার একই আবর্তে ঘুরপাক খেয়েছে—একটুও অন্যরকম কিছু টের পাওয়া যায়নি। সর্বনাশ, আমির খানের খেয়াল গান, কী হবে! ...পরদিন সকালেই সেই ঘোষক আমার কানে কানে বললেন, "জানিস, কাল রাত্রে একটা ব্লান্ডার হয়ে গেছে!" ঘটনাটি বলেই আবার নিজেই সান্ত্বনা খুঁজলেন—"অত রাতে কেই-বা আর আন্তর্দেশীয় প্রচার তরঙ্গ শুনছে, বল্?" দু-তিন দিনের মধ্যেই কিন্তু খান-পঞ্চাশেক চিঠি 'সবিনয় নিবেদন'-এ—"অ্যানাউন্সার কি গাঁজা খেয়েছিল?" ...এখন অনুষ্ঠান প্রচারের ধারাটিকেই গাঁজাখুরি ভেবে বোধ হয় এ ধরনের চিঠি আর কেউ লেখেন না।

এফ. এম. গোল্ড-এ এই সেদিন দুপুরে একটি গানের অনুষ্ঠান শুনছিলাম। শ্রোতাদের সঙ্গে মাথামুণ্ডুহীন গল্পের ফাঁকে ফাঁকে উপস্থাপক এক-একটি গান শোনাচ্ছিলেন রেকর্ডে। মাথা ধরার ওষুধ বাড়িতে ছিল না বলে আজে-বাজে কথাগুলি যথাসম্ভব এড়িয়ে, গানগুলিই শোনার চেষ্টা

করছিলাম। হঠাৎ-ই কানে এল উপস্থাপক বলছেন—"শাপমোচন ছবিতে পাহাড়ি সান্যাল ছিলেন নায়কের বড়ো ভাইয়ের ভূমিকায়। স্নেহশীল এই দাদা চাইতেন তাঁর ভাইয়ের একটা ভালো চাকরি হোক। সেই পাহাড়ি সান্যালের লিপ্-এ চিন্ময় লাহিড়ী এবং নায়িকা সুচিত্রা সেনের লিপ্-এ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছিলেন এই গানটি : 'ত্রিবেণী তীর্থপথে কে গাহিল গান'! এই গানের পরেই তাঁদের বংশে নেমে আসে অভিশাপ!"

'শাপমোচন' ছায়াছবিটি দেখেননি, এমন বাঙালি বোধ হয় খুব কমই আছেন। রেডিয়োয় তাঁরা শুনলেন গল্পের গোরু কোথায় গিয়ে উঠল। অভিশাপ কি বয়ে এনেছিল এই-গানটিই? নায়কের দাদাই বা নায়িকার সঙ্গে এই গানটি গাওয়ার অবকাশ পেলেন কখন?...এই ছায়াছবিতে নায়িকার সংগীতগুরুর ভূমিকায় চিন্ময় লাহিড়ী স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে নিজের গানে লিপ দিয়েছিলেন নিজেই। তাহলে?

আরও একদিন, ওই উপস্থাপকই দুপুরেরই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পীর রেকর্ডের গান শোনাতে গিয়ে একসময় বললেন—"এবার শুনুন বাণী ঘোষালের একটি গান।"—এই বলে গান দিলেন—'কূল ছেড়ে এসে মাঝ দরিয়ায় পিছনের পানে চায়'। তারপর আবারও বললেন—"বাণী ঘোষালের এই গানটির গীতিকার ও সুরকার কে বলুন তো?" এক শ্রোতা বন্ধু উত্তরও দিলেন সঠিক—"গানটি লিখেছেন ও সুর দিয়েছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।" শিল্পীর নাম যে বাণী ঘোষাল নয়, তা কিন্তু তিনি বললেন না। হয়তো সেটা জানতেন না তিনিও। এই গানটি পরবর্তীকালে অন্য শিল্পীও রেকর্ডে গেয়েছেন। কিন্তু সেদিনের সেই রেকর্ডটি ছিল বাণী সরকারের গাওয়া গানের। যিনি বিবাহ পরবর্তীতে হন বাণী কোনার। এরপরই ঘটল আসল মজাটা। এক মহিলা শ্রোতা টেলিফোনে জানালেন—"দেখুন, যে-গানটি বাণী ঘোষালের বলে চালালেন, গানটি কিন্তু বাণী ঘোষালের নয়, গানটি বাণী কোনারের।" উপস্থাপক একটু হতচকিত হয়ে বললেন—"তাই! আচ্ছা দাঁড়ান, দাঁড়ান, টেলিফোন ছাড়বেন না। রেকর্ডটি হাতের কাছেই রয়েছে। দেখে নিই।" রেকর্ডটি নিরীক্ষণ করে তারপর বলে উঠলেন—"আপনার কথাও হল না, আমার কথাও হল না। রেকর্ডে শিল্পীর নাম লেখা—বাণী সরকার।" ওই মহিলা বলে চলেছেন—"আমি যদ্দূর জানি, কণ্ঠশিল্পী বাণী কোনার।" এবার

উপস্থাপক রাগতভাবে বললেন—"আপনি বললেই তো হবে না, স্পষ্ট দেখছি রেকর্ডে লেখা বাণী সরকারের নাম।" বলেই সদর্পে কেটে দিলেন টেলিফোনের লাইন।

অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল আরও একটি ক্ষেত্রে। ঘোষক উৎপলা সেনের গানের মধ্যে চালিয়ে দিয়েছিলেন উৎপলা মুখোপাধ্যায়ের একটি গান। ইনিও কিন্তু উৎপলা সেন যিনি, তিনি নন। উৎপলা সেন বিবাহ-পূর্বে ছিলেন উৎপলা ঘোষ—সেই নামেও রেকর্ড আছে তাঁর। কিন্তু পরবর্তীকালে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঘরনি হয়েও রেকর্ড লেবেলে উৎপলা মুখোপাধ্যায় নাম ব্যবহার করেননি কখনো। উৎপলা 'মুখোপাধ্যায়' নামের ওই অন্য শিল্পী বিবাহ-পরবর্তীতে হন 'গোস্বামী'। এসব খোঁজ-খবরও কিন্তু রাখতে হয় সম্প্রচার মাধ্যমের উপস্থাপক-উপস্থাপিকাদের।

আবারও একদিন ওই উপস্থাপকই শোনাচ্ছেন গ্রামোফোন রেকর্ডে শচীনদেব বর্মনের গান। সংযোজনায় যথারীতি অপ্রাসঙ্গিক নানা আজে-বাজে কথা! ওরই মধ্যে কয়েকটি বেশ উপাদেয় লেগেছিল। শচীনদেব বর্মনের একটি গান—'বিরহ আমার ভালো লাগে' শোনানো শেষ হতেই বেশ গদগদ ভাবেই সংযোজক বলে চললেন—"শচীনকর্তার নিজেরই শুধু বিরহ ভালো লাগত না, সকলকে বিরহ ভালো লাগিয়ে তবেই তিনি ছাড়তেন!" ...উপস্থাপক হয়তো জানতেই পারলেন না, এরপর কতজনকে রেডিয়ো শোনা বন্ধ করিয়ে তবে ছাড়লেন তিনি!

বীরেনদা (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র) বলতেন—"জানো, রেডিয়োয় মাইক্রোফোন ফেস্ করে যারা, তাদের এখানে প্রবেশ করার দরজাটা অতি ছোটো, কিন্তু বেরোবারটা অনেক বড়ো।" ...এখন অবশ্য সবেতেই বিপরীত হাওয়া!

ভাবছেন, সম্প্রচারকেন্দ্রগুলি কি তবে অভিভাবকত্ব হীনতায় ভুগছে?—তাহলে শোনাই দূরদর্শনের এক অভিভাবক-স্থানীয় কর্তাব্যক্তির 'দর্শকের দরবারে' অনুষ্ঠানে একদিন একটি উত্তরদানের বৃত্তান্ত। প্রবীণ এক বিদগ্ধ দর্শক দূরদর্শনে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' ছায়াছবিটি প্রদর্শনের আবেদন জানান। উত্তরদাতা সরাসরি বলে দেন, "ওই কাহিনি নিয়ে কোনো ছায়াছবিই তৈরি হয়নি।" অথচ মধু বসু পরিচালিত 'শেষের কবিতা' ছায়াছবিটি মুক্তি পেয়েছে ১৯৫৩-র ৪ঠা ডিসেম্বর। এ-ছবির প্রিন্ট হয়তো

এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বলে উত্তরদাতা সদর্পে ঘোষণা করে দেবেন 'শেষের কবিতা' আদৌ চলচ্চিত্রায়িত হয়নি।

অবশ্য ভ্রম সংশোধনে তখনই-তখনই তৎপর হন, সম্প্রচার মাধ্যমে এমন দু-একজন ব্যক্তি আজও আছেন বই কী। একটি উদাহরণ দিই। গায়িকা প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন মারা গেলেন, সেদিন দূরদর্শনে সন্ধ্যার খবরে একটা ভুল তথ্য দেওয়া হয়। চলচ্চিত্রে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া গানের তালিকা দিতে গিয়ে সংবাদ পাঠিকা 'ঢুলী' ছবির 'নিঙাড়িয়া নীল শাড়ি শ্রীমতী চলে' গানের সুরকার হিসেবে উল্লেখ করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম। আমার যেমন স্বভাব, পরিচয় গোপন রেখে সঙ্গে সঙ্গে দূরদর্শনের নিউজ রুমে ডায়াল করে জানালাম,—"কাইন্ডলি একটু সংশোধন করে নেবেন খবরটা। 'ঢুলী' ছায়াছবির গানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নয়, রাজেন সরকারের সুর।" ও-প্রান্তে টেলিফোন ধরেছিলেন যিনি, তিনি-ও শূর। আমার কণ্ঠস্বরটি শনাক্ত করে সবিনয়ে জানালেন,—"পরবর্তী নিউজের জন্যে এটা এক্ষুনি আমি সংশোধন করে নিচ্ছি মিহিরদা। এ ধরনের ভুল-ত্রুটি তো ধরিয়ে দেবেন আপনারাই।" ...এমন বিনম্র শ্রদ্ধাশীলতার জন্য আমাদের মতো প্রবীণদের স্নেহাশিস রয়েছে সবসময়!

আরেকটি উদাহরণ। এই সেদিনের ঘটনা। ২০০৬-এর ১৩ই জুন। দূরদর্শনেই সন্ধ্যার সংবাদ চলাকালীন যথারীতি টিভি স্ক্রিনে স্লাইডে চলমান সেদিনের মুখ্য কিছু খবর। হঠাৎ নজরে এল—'সৌরভ গাঙ্গুলির বাড়িতে চুরি, বমাল সমেত ধরা পড়ল চোর।' তখনই টেলিফোন করি দূরদর্শনের নিউজ রুমে। ফোন ধরলেন এক সহকারিণী। বললাম, "দেখুন, আপনাদের নিউজের স্লাইডে যে-লেখা যাচ্ছে সৌরভের বাড়ির চোর 'বমাল-সমেত' ধরা পড়েছে,—ওখানে ওই 'সমেত' কথাটা বাদ দিতে হবে। 'বমাল' মানেই 'মাল-সমেত'। ভুলটা তাই এখনই ঠিক করে নেওয়া উচিত।"...ভদ্রমহিলা আমার নাম-ধাম জানতে চাইলে বললাম, "মনে করুন, কোনো শুভানুধ্যায়ী!"...মিনিট খানেকের মধ্যেই সংশোধিত হল ভুলটি।

কর্মসূত্রে কলকাতা বেতারে যোগ দিই যে-সময়টাতে, সৌভাগ্য আমাদের, তখন সেখানে বিরাজমান সংস্কৃতি জগতের উজ্জ্বল সব নক্ষত্র। একাধারে তাঁদের শাসন ও স্নেহচ্ছায়ায় চলেছে আমাদের শেখার কাজ। পান

থেকে চুন খসলে চলবে না। রেডিয়ো-ই সেযুগে সম্প্রচারে সবেধন নীলমণি। টিভি তখন কোথায়? যুগপৎ বিনোদন ও শিক্ষণের একমাত্র মাধ্যম এই রেডিয়ো কেন্দ্রটির শ্রোতা পূর্ব ভারতের সর্বত্র। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে শহর-গঞ্জ-মহানগরের বিস্তৃত সীমানা জুড়ে ছড়িয়ে-থাকা রুচিশীল শ্রোতার চাহিদা পূরণে সাজানো হয় অনুষ্ঠানের নানান সম্ভার। গান, নাটক—এ সবের বিপুল চাহিদা তো থাকবেই। বিখ্যাত শিল্পীদের সমাবেশ সেখানে। এ ছাড়াও, রেডিয়োয় যাঁরা ঘোষণা করেন, খবর পড়েন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন—কম ছিল না তাঁদেরও আকর্ষণ। তাঁদের কাছ থেকেই শেখা যেত সঠিক উচ্চারণ এবং সর্বজনগ্রাহ্য কথ্য চলিত ভাষার ব্যবহার। শিশুদের ইন্দিরাদি, মহিলাদের বেলা দে, পল্লিমঙ্গলের সুধীর সরকার—বিভাগীয় অনুষ্ঠানের উপস্থাপকদেরও যে কতখানি যোগ্যতা থাকা উচিত, এবং সে-সব উপস্থাপনাও যে কত মনোরম হতে পারে—এখানে যোগ দেবার আগে সেসব কানে শুনতাম শুধু, আকাশবাণীতে এসে চাক্ষুষ দেখলাম তাঁদের উদ্যম ও প্রস্তুতি। বলার ধরণ ও ভাষা এবং কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ বেতার অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় কতটা প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয়—উপলব্ধি করলাম নতুন করে। *পল্লিমঙ্গল আসর*-এ দুই গ্রাম্য চরিত্র 'কাশীনাথ' ও 'গোবিন্দ'-এর ভূমিকায় যথাক্রমে ভুবন মুখোপাধ্যায় ও মোহিত মুখোপাধ্যায় যে-সব অম্ল-মধুর কথার জাল বিস্তার করতেন, মুগ্ধ হয়ে শুনতেন গ্রামীণ সীমানা ছাড়িয়ে শহরের পরিশীলিত শিক্ষিত সমাজের মানুষও। ওই *পল্লিমঙ্গল আসর*-এ ওরই মধ্যে কিছুটা লেখাপড়া-জানা চটপটে এক তরুণের ভূমিকায় 'মঙ্গলময়'রূপে অবতীর্ণ হতেন পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কাশীনাথ'-কে উস্‌কে দিয়ে 'গোবিন্দ'-এর নিরেট মাথায় প্রাঞ্জল ভাষায় আধুনিক চাষবাস সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞের আলোচনাগুলি সুকৌশলে তুলে ধরতেন তিনি। শহর-গ্রামের শ্রোতার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাবার এই প্রয়াসটি ছিল সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। পরবর্তীকালে সংবাদপাঠক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু 'মঙ্গলময়' পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে যেতে পারেননি। সম্প্রচার-মাধ্যমে 'যার যেথা স্থান' নিরূপণ করাটা তাই সবচেয়ে জরুরি। রম্য সান্ধ্য অনুষ্ঠান *পল্লিমঙ্গল আসর*-এ কৃষিকাজের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি কী সুনিপুণ ভঙ্গিমায় পৌঁছে দেওয়া হ'তো সংশ্লিষ্ট শ্রোতার কাছে—ভাবতে অবাক লাগে আজও।

আমাদের কৈশোরের 'গল্পদাদু' জয়ন্ত চৌধুরীকেও পেয়েছিলাম এই আকাশবাণীতে—যখন 'ভয়েস অব আমেরিকা'র কার্যকালের মেয়াদ শেষ করে কিছুদিনের জন্য তিনি আবার গ্রহণ করেছিলেন 'গল্পদাদুর আসর' পরিচালনার দায়িত্ব। আর লীলা মজুমদারের কথিকা পাঠ কিংবা গল্প বলা?—বেতারে কথা বলা, অনুষ্ঠান সংযোজনা কেমন হতে পারে এবং হওয়া উচিত—তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রেখে গেছেন এঁরা। বেতার-কথনের এই অসাধারণ কৌশল তাঁরা রপ্ত করেছিলেন এই কারণেই যে, একদিকে সম্প্রচারের ভাষার ওপর ছিল তাঁদের সহজাত দখল, অন্যদিকে মানানসই শব্দ চয়নেও ছিল স্বতঃস্ফূর্ত দক্ষতা। ...আর নাট্য প্রযোজক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র? সুদক্ষ ব্রডকাস্টারের সমস্ত গুণাবলিই সঞ্চারিত ছিল তাঁর মজ্জায়। মুহূর্তের প্রস্তুতিতে যেকোনো বিষয়েই মাইক্রোফোনের সামনে, একটানা সাবলীল বাচনে কোনোরকম ভ্রান্তি কিংবা ক্লান্তি ছিল না তাঁর। আসলে, এঁদের মুখের কথাগুলি সাজানো থাকত কাগজে নয়, মগজে। সেই কথার বাঁধুনিতে তাই কখনোই প্রশ্রয় বা আশ্রয় পায়নি কোনো ফাম্ব্‌লিং বা তোতলামি। ইদানীং বড়োই অভাব বাচিকশিল্পীর এই গুণগুলির। সম্মুখবর্তী চলন্ত কথাগুলির পাঠোদ্ধারে অভ্যস্ত বর্তমানের অধিকাংশ সঞ্চালকই সরাসরি কথাবার্তা চালাতে গেলেই হোঁচট খান পদে পদে। তার কারণ মনে হয় এই যে বাচিক শিল্পে 'সর্বাঙ্গীণ' দক্ষ মানুষ অপ্রতুল হওয়া সত্ত্বেও যুগের হাওয়ায় এখন চলেছে একই অঙ্গে বহু রূপ ধারণের আরোপিত প্রয়াস। বিশেষত টিভির এই 'বহু-রূপী'রা একই আধারে কখনো সংবাদপাঠক, কখনো উপস্থাপক, কখনো ঘোষক, কখনো সংযোজক, কখনো গ্রন্থিক, কখনো ধারা ভাষ্যকার, কখনো সাক্ষাৎকারক, কখনো সঞ্চালক হতে গিয়ে মর্যাদা রাখতে পারছেন না অনেকগুলি ক্ষেত্রেরই। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটিরই ক্ষেত্র আলাদা ; ভাষার ব্যবহার, প্রকাশের ভঙ্গি, বাগ্-বিন্যাস, ডেলিভারি, মডিউলেশন্—এগুলিও প্রত্যেকটিরই আলাদা আলাদা। পৃথকভাবেই রপ্ত করতে হয় এগুলি। সকলের পক্ষেই সবগুলি একইভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। সম্প্রচার-মাধ্যমে কথা বলা মানে বকবক করে যাওয়া নয় ; সেটা একটা আর্ট। 'অ্যান্ড্ অ্যান্ আর্টিস্ট্ ইজ নোন্ বাই হোয়াট্ হি অমিটস্।' কতখানি বলব, কোথায় থামব—শিখতে হবে সেই আর্ট। প্রতিযোগিতা আছে বলেই স্বক্ষেত্রের বনিয়াদটা গাঁথতে হবে আরও মজবুত

করে। মনে রাখতে হবে, কোটিকে গুটিক হন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, যিনি মহালয়ার গ্রন্থিক যখন, তখন একরকম; যখন আবৃত্তিকার তখন আরেকরকম ; যখন নাট্যাভিনেতা তখন আরেকরকম ; যখন ধারাভাষ্যকার তখন আরেকরকম; আর যখন 'শ্রীবিরূপাক্ষ'—তখন একেবারে অন্যরকম। প্রকৃতই 'কথা-শিল্পী' তিনি। এমন প্রতিভাধর সকলে হন না। অধিকাংশই দক্ষতা দেখাতে পারেন একটি, কী দু-টি ক্ষেত্রে। যেমন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদ পরিক্রমা বা সংবাদ পাঠ। আবৃত্তিতে তাঁর নৈপুণ্যও এ-দুটির ধারে কাছে যেতে পারেনি। দেবদুলালের 'সংবাদ পরিক্রমা' শুনে রক্ত গরম হয়নি, চক্ষু সজল হয়নি—এমন বাঙালি কেউ কি ছিলেন তখন? সেইসব বেতার ভাষ্যের জোগান দিতেন যাঁরা, তাদের অন্যতম প্রণবেশ সেন। এমন জোগানদার মানুষই বা আজ ক-জন রেডিয়ো কিংবা টিভিতে? বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে এখন তো দেখি কর্তৃস্থানীয়রাই ব'সে যান দর্শক-শ্রোতার সামনে। উচ্চারণের ত্রুটি, কথার মধ্যে শব্দলুপ্তি, টেলড্রপিং—পদাধিকারীরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না এসব। তারা মনে করেন, কতিপয় খুঁতখুঁতে দর্শক-শ্রোতা ব্যতিরেকে এসব নিয়ে মাথা ঘামান না অন্য কেউ। আর, আগেকার সবকিছুই ছিল ভালো, এখনকার সবকিছুই ফেলনা—এটাই-বা কী? যুগ পালটেছে—এখন আর ওই সব বস্তাপচা রীতিনীতি চলে না। ওসব শুনলে এখন হাসি পায় তাদের। রেডিয়োর যুগে প্রেজেন্টারকে দেখা যেত না, তাই তাঁদের চেহারা সম্পর্কে একটা স্বপ্নিল ধারণা ঘুরপাক খেত মনের মধ্যে। টিভির-যুগে এখন অগ্রাধিকার দিতে হবে দেখনদারিতে।

প্রথমেই বলি, সম্প্রচার মাধ্যমে উৎকর্ষের প্রতিষ্ঠায় এ ধারণাটি সম্পূর্ণই একপেশে এবং ভ্রান্ত। তার আভাস আগেই দিয়েছি। মনে রাখতে হবে, সারা দেশে এখনও টিভির দর্শকের চেয়ে রেডিয়োর শ্রোতার সংখ্যা অধিক। রেডিয়ো সেটের সবচেয়ে বেশি বিক্রি মহালয়ার আগে এবং টিভি সেটের ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার আগে। এ যুগেও নবীন প্রজন্ম ভোর রাতে কান পাতে 'মহিষাসুরমর্দিনী'র চিরনতুন গানে ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণের গ্রন্থনায় ; আর মাঝ রাতে চোখ রাখে ক্রিকেট কিংবা ফুটবল খেলায়। চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনে মুহূর্তের রিমোট অন্যত্র বাড়াতে পারেনি টিভির মোট দর্শকের কৌতূহলী আগ্রহ। বরং ঠাকুরমার ফোকলা দাঁতের ফাঁকে লুকিয়ে থাকা রূপকাহিনির মতো তারা ভালোবেসেছে এফ.এম. রেডিয়ো সেটের সামনে বসে সারফেস

নয়েজযুক্ত সেভেনটি এইট আর. পি. এম. গ্রামোফোন রেকর্ডে পুরোনো দিনের গান শুনতে। রেডিয়োয় এফ. এম. অনুষ্ঠান সূচনায় যে এত জনপ্রিয় হয়েছিল, তা সম্ভব হয়েছিল এই সব গানের পুনরাবির্ভাবে, পরিশীলিত কিছু উপস্থাপকের অনুষ্ঠান সংযোজনার গুণে এবং আলোচ্য বিষয় নির্বাচনের অভিনবত্বে। তার পরে পরেই কিন্তু সেখানে আবাহন করা হল বাজারি সংস্কৃতির গ্যাঁজানো আসরের ককটেল—বুদবুদের ফেনায় ঢেকে গেল সার বস্তুটা-ই! রেডিয়ো-টিভির এই অসার ফেনিলতা কি তবে যুগের দাবি—নাকি হুজুগের?

যুগের দাবির অনিবার্য পরিবর্তনের খোলা হাওয়ায় হুজুগের দূষণ মিশে গেলেই সমাজের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা, যদিও তরুণ প্রজন্মও সমাজের বুকে জোর করে চাপানো এইসব বেলেল্লাপনা চোখেই দ্যাখে শুধু, অন্তর থেকে গ্রহণ করে না। প্রায় অনাবৃতা উগ্র আধুনিকার ঠমক-ঠামকে পুরুষের রক্তে ঝিলিক লাগে ঠিকই, কিন্তু তাকে ঘরনির আসনে বসানো হয় না। এই গ্রহণযোগ্যতার অভাবই এত কিছু আয়োজনের পরেও সম্প্রচার মাধ্যমকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছোতে দিচ্ছে না। এটাকে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির দোহাই দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলে কিন্তু ভুল হবে। যেমন হয়েছে এযুগের বাংলা গানের ক্ষেত্রে। দীর্ঘ অনুশীলনে নিজেকে তিলে তিলে প্রস্তুত করার প্রণালী আজ অনেক নবীন-নবীনার কাছেই পরিত্যাজ্য। উপযাচক হয়ে অভিজ্ঞের পরামর্শ দেওয়াটাও আজ বিপজ্জনক। এই সেদিন আকাশবাণী ভবনে, আমার পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য বসে রয়েছি স্টুডিয়োর ভেতরে। যে-অনুষ্ঠানটি তখন চলছে, তার সঞ্চালিকার একটি কথা আমার কানে প্রকটভাবে বাজল। কথা বলার ফেডার নামিয়ে তিনি যখন গান দিয়েছেন, সেই অবকাশে তাঁকে বললাম,—"কথাটি কিন্তু 'গড্ডালিকা' নয়, 'গড্ডলিকা'।" আরক্ত হল তাঁর দু-টি কান, স্ফীত হল গণ্ডদ্বয়। প্রীত হননি যে আমার কথা শুনে, বোঝাই গেল তা। তখনই মনে পড়ে গেল আকাশবাণীতে আমার কর্মজীবন শুরুর প্রথম দিককার একটি কথা। এক শনিবার (তখন দ্বিতীয় শনিবার অফিসে ছুটি থাকত) সকাল দশটা নাগাদ ডিউটিরুমে আমার কাছে সরাসরি চলে এলেন সে-সময়ের রেডিয়োর প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'কাল নাটকের অ্যানাউন্সমেন্ট কি তুমি করছিলে?' সম্মতিসূচক মাথা

নাড়তেই মৃদুস্বরে বললেন, ''অতখানি স্ট্রেস্ দিলে কেন 'র' উচ্চারণে? রবীন মজুমদার শোনাল 'ড়বীন মজুমদাড়'! ব-এ শূন্য 'র' আর ড-এ শূন্য 'ড়'—দু-টি উচ্চারণের তফাতটা জিভে ঠিক করে নেবে। মাইক্রোফোনে 'র'-কে বেশি স্ট্রেস্ দিয়েছ -কী মরেছ। মনে রেখো।''...আজও মনে রেখেছি বেয়াল্লিশ বছর আগের এই কথাগুলি! এসব বালাই নেই অবশ্য বর্তমান যুগে। টিভিতে শুনি—'তাড়কার মুখোমুখি'! কে হবেন—রামচন্দ্র, না লক্ষ্মণ? কৌতূহল থেকেই যায়। এখন উচ্চারণের যা 'লক্ষণ' দেখি প্রায় সকলেই 'লক্ষ্মণ রেখা' পার হয়ে যান। 'লক্ষণ' আর 'লক্ষ্মণ'—এর ভেদাভেদ রাখতে নারাজ এখনকার কালের অধিকাংশ উপস্থাপক-উপস্থাপিকাই। এঁদের 'দক্‌খতা'কে অস্বীকার করা মানেই রক্ষণশীলতা!

বাচিকশিল্পী নির্বাচনে যখন থেকেই কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ এবং বাগ্‌ভঙ্গি মার গুরুত্ব হ্রাস করে অগ্রাধিকার দেওয়া হল শুধু ঠাটবাট আর দর্শনদারিতাকে— এই সম্প্রচার মাধ্যমটির অবনমনের শুরু তখন থেকেই। ভুলে বসলেন সবাই যে, চলার মতো বলার মধ্যেও সবার আগে চাই সাবলীল স্মার্টনেস, এবং সেটা চাই আরও বেশি করে। কণ্ঠে কৃত্রিম বাচনভঙ্গি এনে তৈরি করা যায় না এ-স্মার্টনেস্। সম্প্রচারকের আসনে বসবেন যিনি, কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ ও বাক্‌শৈলীর সঙ্গেই, তাঁর গুণাবলীর আরও কয়েকটি শর্ত—উপস্থিত বুদ্ধি, অর্জিত জ্ঞান এবং অধীত বিদ্যা। আর সজাগ থাকা চাই ষষ্ঠেন্দ্রিয়ও। চেহারাটা সেখানে বড়ো-একটা ফ্যাক্টর নয়। উদাহরণ. বরখা দত্ত। কিন্তু তারই অনুকরণে একটি বাংলা প্রাইভেট টিভি চ্যানেলে সাম্প্রতিক এক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে এক অসাধারণ সুন্দরীকে নিয়ে এসেও তা ততটা সার্থক হয়নি বক্ষ্যমাণ বিষয়ে সঞ্চালিকার স্বচ্ছ জ্ঞানবুদ্ধির অভাবে।

উচ্চারণের স্পষ্টতা আর কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা ঈশ্বরদত্ত হলেও, নিবিড় অনুশীলনে কিছুটা হলেও, দূর করা যায় এ দু-টির খামতি। কিন্তু তা না করে শুধু 'রূপে তোমায় ভোলাব' ভাবলেই থেকে যায় গোড়ায় গলদ। আবার, উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বর ভাঙিয়েও বেশিদূর এগোনো কঠিন হয়ে পড়ে, যদি-না বলার কথাগুলো সাজিয়ে তুলতে ভাষার ওপর যথেষ্ট দখল থাকে। না, বঙ্কিমি নয়, বলছি চলিত বা চলতি ভাষার কথা-ই—যার যথোচিত প্রয়োগটা সহজ মনে হলেও সবচেয়ে কঠিন। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে এর রূপ

একরকম নয়। শব্দচয়নেও চাই বৈচিত্র্য। তবে কোনোটাই যেন 'মাত্রাছাড়া' হয়ে না ওঠে।

এই মাত্রাহীনতাই আজকের সম্প্রচার মাধ্যমের প্রধান গলদ। ইদানীংকার রেডিয়ো-টিভির নানা রঙের লাইভ্ টক-শো থেকে তার উদাহরণ মিলবে অগুনতি। একবারও কি প্রেজেন্ট্টাররা খতিয়ে দেখেন, যা বলতে চেয়েছিলেন ঠিকমতো বলা হল কি না, যেভাবে বলতে চেয়েছিলেন, সেভাবেই বলতে পারলেন কি না? হাতের তির আর মুখের কথা—একবার ছুড়লে আর কি ফিরিয়ে নেওয়া যায়? হাতের তির হয়তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে, কিন্তু মুখের কথা? লাইভ প্রোগ্রামে সেটি একবার খসালে আর তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না! রেডিয়ো-টিভিতে তাই বাচিক শিল্পীর মুখ খুলতে হবে আটঘাট বেঁধে। সেই আটঘাট বাঁধাটাই অনুশীলন আর হোমওয়ার্ক। উপস্থাপক বা সঞ্চালক-কে হতে হবে 'বাক্‌পটু', কিন্তু 'বাক্যবাগীশ' নয়। বাক্‌পটুত্ব এমনি এমনি আসে না। নিজেকে এর জন্য তৈরি করতে হয়। প্রয়োজন হলে বিষয়বস্তুর ওপর একটা খস্ড়া রচনা লিখে নিয়ে, সেটাকে বার বার ভেঙেচুরে, কোন্ কথাটি জুতসই হচ্ছে না সেটা চিহ্নিত এবং পরিহার করে, নতুন শব্দ সংযোজন-বিয়োজন করে, বার কতক পড়ে নিয়ে ঝালিয়ে নিতে হবে। রেডিয়োতে বলবার সময় স্ক্রিপ্টটা সঙ্গে রাখাই যায়, রাখা উচিতও। কিন্তু টিভির ক্ষেত্রে চলে না সেটা। সেখানে অবশ্য টুকরো কাগজে কিছু পয়েন্টস লিখে নিয়ে—রাজনৈতিক নেতারা ছোট্ট একটা চিরকুট সম্বল করে অনায়াসেই যেমন বক্তৃতা দিয়ে যেতে পারেন নানা প্রসঙ্গে—সঞ্চালকও সেই কায়দায় ক্যামেরাম্যানের সৌজন্যে দর্শকদৃষ্টির আড়ালে চোরা চাহনিতে চিরকুট থেকে বক্তব্যের সূত্রগুলি উদ্ধার করে সাজিয়ে যেতে পারেন একটার পর একটা প্রাসঙ্গিক কথার মালা। কেননা, এগুলির সবটাই ঢেকে দিতে পারে, উপস্থাপকের বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ। শুধু ঠোঁটের কথা আর চোখের ভাষা-ই নয়, তাঁর সারা অবয়বই যেন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, ফুটে ওঠে একটা ব্যক্তিত্ব। শ্রোতা-দর্শকের কাছে উপস্থাপকের মূলধন এই 'ব্যক্তিত্ব'ই!

কথা উঠতেই পারে, এমন ব্যক্তিত্ব যাঁর রয়েইছে অতশত কাঠখড় পোড়ানোর দরকারটা কী তাঁর? সম্প্রচার মাধ্যম তো গুরুমশায়ের পাঠশালা নয় যে সেখানে শুধু পাখিপড়া বুলিই আওড়াতে হবে! যিনি পারবেন তিনি

এমনি-এমনিই পারবেন। স্বভাবজ গুণ শেখাতে হয় না কাউকে।...কথাটি অর্ধসত্য—তাই মিথ্যের থেকে খুব-একটা দূরে নয়। চটুল অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় জটিলতা কম—এই ভ্রান্ত ধারণায় তাবড়ো উপস্থাপকদের মধ্যেও এসে যায় অযথা বাড়াবাড়ি ও ভাঁড়ামির একঘেয়েমি। মোটা দাগের সেইসব রসিকতা ক্রমশ গুরুত্ব হারায়। এ সত্ত্বেও মনোহরণে সার্থক হন যাঁরা, তাঁদের ভাবনায় থাকে নতুন নতুন উদ্ভাবনা। কিন্তু তেমন উদাহরণ অতীব বিরল। যাও-বা আছে ঘুরপাক খাচ্ছে আবার একই আবর্তে।

কালের নিয়মেই বিবর্তন আসবে সম্প্রচারেও। বস্তাবন্দি ধ্যান-ধারণাকে সেখানে টেনে এনে লাভ নেই। কিন্তু তার পরিবর্ত কি শুধুই ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানো? উৎকর্ষের অপকর্ষে আকর্ষণ? হীরকের সন্ধানে আগুয়ান না হতে পেরে সংস্কৃতির সুবর্ণযুগকে লোহার খাঁচায় বন্দি করা? অতি উত্তম কিছু গড়ে তোলার করুণ অক্ষমতায়, সুখস্মৃতির ছায়া ছায়া ছবিগুলো ছিন্নভিন্ন করে, চিন্তার দীনতাকে প্রকট করা?

আধুনিক উপস্থাপকদের সমস্যার কথাটা বুঝি। অন্তর সায় না দিলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাকে নেমে আসতে হয় শস্তা চটুলতার পথে। তবু এস. ওয়াজেদ আলির সেই 'ভারতবর্ষ' আজও, চিরদিনই, উন্মুখ স্বকীয় শিকড়ের সন্ধানে, যেখানে কৃত্রিম জোড়-কলমে নয়, মহান মহীরুহ গজিয়ে উঠবে নিজস্ব বীজ থেকেই। বর্তমান সম্প্রচার মাধ্যমের ব্যর্থতা এইখানেই—অধিকাংশ ভারতবাসীই তাকে ভেবেছে দূরের তামাশা, নেয়নি আপন করে। 'পলিসি-মেকার'দের চটজলদি মুনাফা অর্জনের এই কৌশল পরিণামে বর্জন করবে এরাই। আগাম তাই ভাবতে হবে সে কথা, কেননা 'পলিসি' কথাটির অনেক অর্থের মধ্যে 'কার্যপদ্ধতি' ও 'চাতুর্যে'র পাশাপাশি রয়েছে 'বিচক্ষণতা' এবং 'পরিণামদর্শিতা'ও।

তবু যতদিন-না মোহমুক্তি ঘটছে, কর্তার ইচ্ছেতেই কর্ম সম্পাদন করতে হবে উপস্থাপক উপস্থাপিকাদের। তাই পরিহাস-মগ্নতায় মাথা তুলে দাঁড়াতে, উপকরণে খাদ মেশানোর আগেই, শক্তপোক্ত করে নিতে হবে নিজস্ব বনিয়াদ। দেখেননি, সার্কাসে সেই জোকারটিই কৌতুকের যৌতুক সাজাতে সবচেয়ে দড়, আসল খেলাগুলিতেও পারদর্শী যিনি। সম্প্রচার মাধ্যমের পরিবেশককেও তেমনই শক্ত করে গড়ে তুলতে হবে তার ভিতটাও। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে সদাই থাকতে হবে

ওয়াকিবহাল। উচ্চমানের পত্র-পত্রিকার পাঠক হতে হবে তো বটেই, তারই সঙ্গে নিয়মিত পড়তেই হবে বাংলা-ইংরিজি সংবাদপত্র সারা বিশ্বের হাল-হকিকত জানতে। ধারণা থাকা চাই প্রতিবেশী প্রদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিরও। যাতায়াত করতে হবে নিকটবর্তী লাইব্রেরিতে। যতই-না কেন মিশেল ঘটুক হিন্দি-ইংরেজির বুকনিরও, মূল বাংলা ভাষার ওপর দখল না থাকলে বিপদ পদে পদে। বাংলার বানান-উচ্চারণ-সন্ধিসমাস এসব নিয়েও নিয়তই ভাবনা-চিন্তা বজায় রাখতে হবে। সঠিক উচ্চারণ একজন উপস্থাপকের সবল মেরুদণ্ড। অনুসরণ করতে হবে সর্বজনমান্য উচ্চারণ-বিধিও। জানতে হবে স্বরক্ষেপণ ও তার সঠিক ব্যবহার, আর মানানসই শব্দচয়ন ও কথ্যভাষার শৈলী। রাখতে হবে যথাযথ যতি বিন্যাসের প্রতিফলন। আর, থাকতে হবে সম্প্রচারোপযোগী কণ্ঠস্বর, বাগ্‌ভঙ্গি এবং ফোনেটিক সেন্স্।

ফোনেটিক সেন্স্-এর অভাবে কেমন বিভ্রান্তি ঘটে তার একটা উদাহরণ দিই। কলকাতা বেতারে একদিন সকালে অনুষ্ঠানসূচির আগাম ঘোষণায় রাত সাড়ে দশটার নাটকের নাম উল্লেখ করা হল—'বাব্‌লাকান্ত।' কিউ-শিটে ইংরেজির বড়ো হরফে লেখা—'BABLA KANTA' নামটি দেখেই ওই উচ্চারণটি করেছিলেন ঘোষক। আসলে কিন্তু নাটকটির নাম ছিল 'বাবলাকাঁটা' BABLA KANTA না লিখে তাঁর BABLA KNATA লেখা উচিত ছিল। সেই অজ্ঞানতার দায়ভার বহন করতে হল ঘোষককেই। 'বাবলাকাঁটা' হয়ে গেল 'বাব্‌লাকান্ত'! এর উলটো দিকে ঘোষক কিংবা উপস্থাপকও একই ভুল করে বসেন। সম্প্রচার-মাধ্যমে সবার কাজের মধ্যেই তাই সমন্বয় থাকাটা জরুরি। কর্তাব্যক্তি যাঁরা তাঁদেরও অনুধাবন করা দরকার যাঁরা লাইভ প্রোগ্রামে রয়েছেন তাঁদের কোথায় কোথায় অসুবিধে হতে পারে। খবর-পড়তে থাকাকালীন এক সংবাদ পাঠকের কাছে হঠাৎই একটি কাগজ ধরিয়ে দেওয়া হল তক্ষুণি সেটা পড়ে দেবার জন্য। প্রথম ক-টি কথায় চোখ বুলিয়ে সংবাদপাঠক ব্যথিত গম্ভীর সুরে পড়তে শুরু করলেন—"বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক ও প্রখ্যাত সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ"—এটুকু প'ড়েই পরের কথাগুলির দিকে নজর রাখতেই বুঝলেন এটি শোকবার্তা নয়, সুখবর। তখনই কণ্ঠস্বরে গরিমা-উপলব্ধির ভাব এনে বাকিটুকু পড়লেন তিনি—"গৌরকিশোর ঘোষকে আজ ম্যানিলা থেকে এবারের ম্যাগ্‌সাইসাই পুরস্কার দেবার কথা

ঘোষণা করা হয়েছে।" ...সংবাদপাঠের মধ্যে অভিপ্রকাশের এই দ্বিচারিতা এল কিন্তু যিনি সংবাদটি লিখেছেন তাঁরই অপারিণামদর্শিতায়। শুরুটা যদি এভাবে হত—"আজ ম্যানিলা থেকে এবারের ম্যাগ্‌সাইসাই পুরস্কার দেবার কথা...(ইত্যাদি, ইত্যাদি)", তাহলে কিন্তু এই খবরটি শ্রোতার কানে অমন হাস্যকর হয়ে উঠত না।

সংবাদপাঠককে পঠনীয় সংবাদের গভীরে প্রবেশ করতে হয়, শব্দগুলি সেখানে ঠিকমতো সাজানো হয়েছে কি না অনুধাবন করতে হয় তাও। সামান্য ক-টি শব্দও এদিক-ওদিক হলে যেমন বক্তব্যটি ঠিকমতো প্রকাশ করা কঠিন হয়, শব্দের মধ্যে একটি মাত্র অক্ষরের লুপ্তিও তেমনি বক্তব্যের অর্থ বদলে দিতে পারে। এই সংবাদটি শুনুন—"সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন, অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত, স্বাস্থ্য ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র-সহ বামফ্রন্টের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।" ...খবরটি শুনে তাহলে কি বুঝবেন শ্রোতা? মুখ্যমন্ত্রী সেখানে হাজির ছিলেন না? অথচ তিনিই ছিলেন পুরোভাগে! সঠিক বার্তা পৌঁছোতে সংবাদটি লিখতে হত এভাবে—"সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন...(ইত্যাদি, ইত্যাদি)।"

বাচিকশিল্পীর, বিশেষত সম্প্রচার মাধ্যমের ব্যক্তিদের, সঠিক-মান্য-উচ্চারণ অনুসরণ করা একান্তই কাম্য। এজন্য সন্ধি সমাস সম্পর্কে ধারণা থাকার কথা আগেই বলেছি। সমাসবদ্ধ 'প্রাতঃ' শব্দের শেষের ওই বিসর্গটির জন্য উচ্চারণে তারতম্য ঘটে সন্ধির প্রয়োগে। 'প্রাতঃকালীন' উচ্চারণে দাঁড়ায় 'প্রাতোক্ কালীন্'। বিসর্গের উচ্চারণ আনতে পরবর্তী 'ক' দ্বিত্ব হয়ে যায়। তাই বলে 'প্রাতোর্ রাশ' উচ্চারণ হবে না 'প্রাতরাশ'-এর। কেননা সেখানে 'প্রাতঃ' কথাটির সঙ্গে 'আশ' কথাটি মিলে বিসর্গটি উঠে গিয়ে 'অ' স্থলে 'র' অর্থাৎ 'আ'-র পরিবর্তে 'রা' হয়েছে। তাই আশ মিটিয়ে উচ্চারণে অযথা দ্বিত্ব আনা চলবে না এখানে।

একটা সময় ছিল কোনো উচ্চারণ নিয়ে সন্দিহান হলেই আমরা শরণাপন্ন হতাম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের, ইন্দিরা দেবীর, এমনকী এসব ব্যাপারে কট্টর সমালোচক অথচ 'খাঁটি বঙ্গজ' সরল গুহরও। বেশ কিছু ইংরিজি শব্দের উচ্চারণ নিয়ে দ্বিধায় পড়লে সহায়তা করতেন আরেক প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ্ এম্ এল. সিন্‌হা। খবরের মধ্যে অনেক সময় বিদেশীদের নাম,

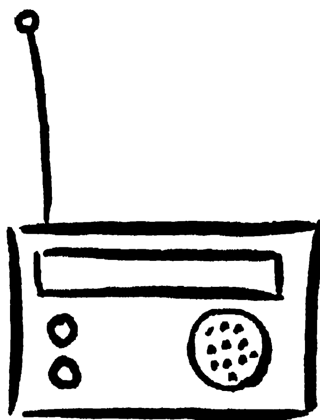
এবং ফ্রেঞ্চ-ল্যাটিন প্রভৃতি শব্দও উচ্চারণ করার প্রয়োজন হয়। এ তো মনে মনে কাগজ পড়ে যাওয়া নয় যে, চোখ বুলিয়েই তার সমাধান হয়ে যাবে। মুখে উচ্চারণ করতে হবে তা, এবং সঠিক হতে হবে সে-উচ্চারণ। খুঁতখুঁতে দেবদুলালদাকে দেখেছি এসব ক্ষেত্রে তিনি টেলিফোনে পরামর্শ নিচ্ছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের।

বেশ কিছু কমন ইংরিজি শব্দের ভুল উচ্চারণ সাধারণ মানুষ করতেই পারেন। কিন্তু বাচিক শিল্পীকে তো জানতেই হবে—Dataর প্রকৃত উচ্চারণ 'ডেটা' ('ডাটা' নয়), তেমনি Status হল 'স্টেটাস', Mania—'মেনিয়া', Volunteer—'ভলান্টিয়ার', Caterar—'কেটারার', Drought—'ড্রাউট্' Tier—'টিয়ার্'। Message—মেসেজ এবং Massage 'ম্যাসাঝ্'—শব্দ দুটির অর্থ এবং উচ্চারণ যে আলাদা—এ জ্ঞানটুকুও উপস্থাপকদের না থাকলে চলবে কেন? 'RADAR' কথাটির উৎস যখন 'RADIO DETECTION AND RANGING', তখন সেই শব্দ সংক্ষেপের সঠিক উচ্চারণটি-যে কী—সেটা বুঝতে হবে শুরুর ওই 'রেডিয়ো' কথাটি থেকেই। ...Telephone কে কেউ কেউ আবার বাংলা প্রতিশব্দ 'দূরাভাষ' বলে ফেলেন! 'দূরভাষ'-এ অসুবিধে থাকলে 'টেলিফোন' তো করাই যায়। আমজনতা তাকেই বেশি জানে। Wisdom Teeth-এর বাংলা নাম তাদেরই দেওয়া, কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির নয়। তাই তার প্রতিশব্দে 'জ্ঞান-দন্ত' না হয়ে, হয়েছে 'আক্কেল দাঁত'। সম্প্রচারকেরও আক্কেলটুকু বাঁধা আছে এই সাধারণ মানুষেরই দরবারে। তাঁদের পাত্তা না দিলেই নিজেদের দর বাড়ে বলে যাঁরা মনে করেন, সার্থক হবার পথে কণ্টক রোপণ করেন তাঁরাই, সন্ধিসমাসের জ্ঞান থাকাটাও যে প্রয়োজন—একথা বলতে গেলেই মুচকি হাসির অবহেলা ও অবজ্ঞা ফুটে ওঠে তাঁদের ঠোঁটে। কথাটি যে 'পর-মায়ু' নয়, 'পরম-আয়ু', 'বঙ্গোপ্সাগর' নয়, 'বঙ্গ-উপসাগর'—এসব বিভ্রান্তি ঘটত না উচ্চারণে, সন্ধিতে আগ্রহী থাকলে। আবার, বৎস (বত্শো) এবং মৎস্য (মত্শ্শো)—এ-দুটি উচ্চারণের সূক্ষ্ম তফাতটাও যে জিহ্বাগ্রে আনতে হয়, সেটির গুরুত্বও মানেন না বহু সম্প্রচারক। বহু বিশিষ্ট উপস্থাপককেও ছায়াছবির নামটি 'শঙ্খবেলা' (Shankho Bela)-র পরিবর্তে 'শঙ্খব্যালা' বলতে শুনেছি। এঁদের বেশিরভাগই বলে থাকেন অনসূয়াকে 'অনূসূয়া', অরুন্ধতী-কে 'অরুণ-ধুতি', সৌম্যেন-কে 'সৌমেন', প্রদ্যোত-কে 'প্রদ্যুৎ'। অদ্ভুত! এঁরা

'সাজসজ্জা' এবং 'ফুলশয্যা'—সমাসবদ্ধ দু-টি শব্দবন্ধেরই শেষ শব্দটি একইভাবে উচ্চারণ করেন। 'বাধা' এবং 'বাঁধা' ও 'যজ্ঞ' এবং 'যোগ্য'-এর তফাত বোঝার যোগ্যতাও এঁদের নেই! ...লাভ আছে কি আর উদাহরণ বাড়িয়ে?

যে সম্প্রচার কেন্দ্রগুলির হওয়ার কথা কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ললিতকলার পীঠস্থান, সেখানে অধিকাংশ অনুষ্ঠান জুড়েই রুচিবিকৃতির স্বীকৃতি। এতে না বাড়ে দেশের মান, না মেলে আন্তর্জাতিকতায় স্থান। কোথাও একটা মস্ত গোলমাল কি থেকে যাচ্ছে না তাহলে? জানি, আমার এ অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও অনুভবের কথা অন্যভাবে নেবার স্বাধীনতা রয়েছে সকলেরই। কিন্তু স্তুতি না থাকলেই কি প্রস্তুতির ইঙ্গিতগুলিও অগ্রাহ্য করে যেতে হবে! সিদ্ধান্তে আসতে হয় তো 'অগ্র-পশ্চাৎ' ভেবেই! সম্প্রচারের এখন-তখন অবস্থাটা পরখ করে আগামী প্রজন্মের কেউ কি পারবে না নতুন পথের সন্ধান দিতে?

লেখক আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের প্রবীণ অনুষ্ঠান পরিবেশক



সম্প্রচারে সম্বোধন

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

তরুণ ভাদুড়ি নামের এক ভদ্রলোক আমাকে মাঝে মধ্যে চিঠি লিখতেন। আসলে চিঠিটা লিখতেন আকাশবাণী কলকাতার বিজ্ঞানবিভাগকে। আমি তখন বিজ্ঞান-সম্পর্কিত অনুষ্ঠানগুলির দায়িত্বে ছিলাম। তিনি অনুষ্ঠানগুলির ভালোলাগা-মন্দলাগা চিঠিতে জানাতেন। একদিন একটি খাম পেলাম, খামের উপরে লেখা 'ব্যক্তিগত ও জরুরি'।

খামটা খুলে দেখি বেশ একটা বড়ো চিঠি। চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন—অমুক তারিখে তিনি অমুক হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। অমুক তারিখে তাঁর ওপেন হার্ট সার্জারি হবে। অপারেশনের অন্তত দু দিন আগে আমি যেন ওঁর সঙ্গে দেখা করি। পুনশ্চ: দয়া করে আসবেন, না এলে বিরাট ক্ষতি।

সুতরাং গেলাম। কেবিন। আত্মীয় পরিজন। আমার সঙ্গে ইতিপূর্বে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। উনি আমাকে চেনেন না। আমি

নিজের পরিচয় দিলাম, তরুণবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। হাসি দেখেই বোঝা যায় আন্তরিক। বসতে বললেন। পরিজনদের বললেন একটু বাইরে যেতে। আমার সঙ্গে একটু গোপন কথা আছে।

ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে বললেন—এটা হল একটা দরকারি কাগজ। আমি আমার দেহটা দান করেছি। এটা আপনার কাছে রাখুন। আকাশবাণীতে একটা দেহদান বিষয়ক অনুষ্ঠান শুনে আমার এই ইচ্ছেটা হয়েছিল। মিছিমিছি ছাই করে কার কি লাভ, বডিটা যদি কারোর কোনো কাজে লাগে...আমি বলি সে কি মশাই, আপনার অপারশেনই হল না...

উনি বললেন অপারেশনের আগেই তো সব ব্যবস্থা করে যেতে চাই। আমার যদি কিছু হয়ে যায়, আমার স্ত্রী-মেয়ে-জামাই দেহটা দাহ করে দেবে। আপনি তার আগে এই কাগজটা দেখাবেন, বলবেন তরুণ দেহটা দান করে গেছে।

আমি বড়ো ফ্যাসাদে পড়ে ইতস্তত করি। বলি এ গুরু দায়িত্ব আমাকে দিচ্ছেন কেন? এসব কাজ তো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবদের দিতে পারতেন...

ভদ্রলোক যেন তেড়েফুড়ে উঠলেন। বন্ধুকেই তো দিয়েছি। আপনি রেডিয়োতে আমাদের খুব তো বলেন শ্রোতা বো-ন-ধু-উ-উ...আপনি বন্ধু ডেকেছেন, দেহদানের অঙ্গীকার করার অনুরোধ করেছেন, আমি সাড়া দিয়েছি! প্রকৃত বন্ধুর মতো কাজ করেছি। এবার আপনি পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন কেন? আপনাদের ওই 'বন্ধু' ডাকটা কি তা হলে মিথ্যে ডাক? অন্তরের নয়?

কাগজটা আমাকে নিতে হয়েছিল। কাগজটা পকেটে পোরার পর নিরন্তর কামনা করেছি মানুষটি যেন ভালো হয়ে ওঠেন। এবং এই অনুভূতিটা সেতারেব মতো রিনরিন করছিল।

গল্প লেখার বদ অভ্যেস আছে বলেই সম্প্রচারের ভাষা বিষয়ে লিখতে গিয়ে খামোকা একটা গপ্‌পো ফেঁদে ফেললাম,—ব্যাপারটা এমন নয়। বলতে চেয়েছিলাম সম্প্রচারের ভাষা এখনো জীবন সাজায়, জীবন জাগায়।

হতে পারে ওই যে মানুষটা, তরুণ ভাদুড়ি, তাঁর রসায়নে আবেগের পরিমাণটা বেশি। সম্বোধনের 'বন্ধু' শব্দটা সত্য বলেই গ্রহণ করেছেন। যখন কাগজটা গ্রহণ করতে ইতস্তত করছিলাম, তখন তিনি বন্ধু শব্দটাকে নিয়ে

খেললেন। 'বন্ধু-উ-উ' বলে একটা টান দিয়েছিলেন যাতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন এই বন্ধু ভাবটা কি তবে নেহাত জার্গন?

আমি তো জানি এটাকে যদি জার্গন বলি তো জার্গনই। সেক্ষেত্রে লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, বন্ধুগণ, সুধীবৃন্দ, কমরেডস্ সবই জার্গন। কিন্তু আমরা সম্বোধন করব কীভাবে? শ্রোতারা আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না, আমরাও দেখতে পাচ্ছি না। অথচ একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে সম্বোধন একটা বড়ো ব্যাপার বই কী।

বাংলাদেশ বেতার থেকে 'সুধী শ্রোতাবৃন্দ' শুনে থাকি। কেমন যেন কানে লাগে। সম্ভবত 'বৃন্দ' শব্দটির জন্য। 'মাননীয় শ্রোতাগণ'ও শুনে থাকি। 'শ্রোতা বন্ধু' শব্দটা এফ. এম আসার আগে চালু ছিল না। কোনো কোনো এফ. এম চ্যানেলে আজকাল 'হ্যালো দোস্তোঁ' শুনি। 'আওয়ার বিলাভেড দোস্তস্'ও শুনেছি।

সম্বোধনটা একটা সমস্যা। যখন কোনো সভায় আমাকে কিছু বলতে হয়, তখন বিপাকে পড়ি। প্রচলিত নিয়মে—মঞ্চে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় সভাপতি অমুকচন্দ্র অমুক, প্রধান অতিথি অমুক, বিশিষ্ট কবি অমুক, মান্যবর জনপ্রতিনিধি অমুক...ইত্যাদির একটা লম্বা লিষ্টির পর "এবং সুধী শ্রোতাবৃন্দ"। এরকম বলাটা যে কী বিড়ম্বনা, বক্তামাত্রই জানেন। অনেক সময় ফিসফিস করে পাশের বক্তা, কিম্বা কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হয় মঞ্চে উপবিষ্ট কেষ্টাবিষ্টুদের নাম, হাতের চেটোয় কিম্বা চোথা কাগজে নোট করে নিতে হয়, এবং বলার সময় টেরা চোখে দেখে নিতে হয়।

অনেকে অবশ্য এত ঝামেলায় না গিয়ে, 'মঞ্চে উপবিষ্ট গুণীজন এবং মঞ্চের বাইরের সুধীজন'...ইত্যাদি বলেন। এখানে মঞ্চের উপর এবং নীচের মানুষদের মধ্যে একটা পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়। শ্রোতাদের মধ্যেও অনেক গুণীজন সুধীজন থাকতেই পারেন, কিন্তু বক্তাদের, মঞ্চের মানুষদের আলাদা করে সম্বোধন করার রেওয়াজ। কমিউনিস্টদের মিটিং-এও দেখেছি—মঞ্চে উপবিষ্ট ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিনিধি কমরেড অমুক, যুবনেত্রী কমরেড অমুক, সিটু নেতা কমরেড অমুক এবং কমরেড্স্ (মানে বাদবাকি সবাই)।

বেতারের বক্তাদের মঞ্চ নেই। সুতরাং মঞ্চে উপবিষ্ট এবং মঞ্চের বাইরের 'জনসাধারণ অতি সাধারণজন'—এরকম কোনো ভাগ নেই।

বেতারে সামগ্রিকভাবে সম্বোধন করা যেতে পারে। এই সম্বোধনটা কী হওয়া উচিত, কেমন হলে ভালো হয়?

যতদূর জানা যায়, বেতারের প্রথম যুগে সম্বোধনের কোনো রীতি ছিলনা। 'এখন শুরু হচ্ছে সাহিত্য মজলিশ, আজ আছেন...'। এইভাবেই শুরু হত। কিংবা 'শুরু হল মজদুর মণ্ডলীর আসর। আজকের আসরে প্রথমে শোনা যাবে...'।

শিল্পশ্রমিকদের দিকে লক্ষ রেখেই মজদুরমণ্ডলীর অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা বলেই 'শুনুন শ্রমিক ভাইয়েরা...এধরনের কোনো ঘোষণা হত না। এখন কৃষকদের জন্য যেসব অনুষ্ঠান হয়, তার একটির নাম *চাষিভাইদের বলছি*। এই ভাই সম্বোধনের মধ্যে অনেক সময় নৈকট্যের পরিবর্তে দূরত্বই তৈরি হয়। আমি যাদের ভাই বলছি, তাদের কাছে আমি যেন বড়ো, যেন শ্রেষ্ঠতর, এরকম একটা ভাব প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। চাষিভাই, মেথরভাই, কুমোরভাই—এগুলো আরোপিত।

কোনো এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন অফিসার গ্রামে গিয়ে আলের ধারে দাঁড়িয়ে জমিতে কর্মরত কৃষককে বলেন না—ও চাষিভাই, এদিকে শুনুন। কোনো শ্রমিক নেতা হাতে মাইক নিয়ে বলেননা—হে আমার শ্রমিক ভাইয়েরা। বেতারে কৃষি সম্পর্কিত অনুষ্ঠানটির নাম ছিল *পল্লিমঙ্গল আসর*। এই অনুষ্ঠানে কাশীনাথ ও গোবিন্দ নামের দুটি চরিত্র এবং মোড়ল নামের একটি চরিত্র ছিল। কিছুটা রঙ্গরসিকতার মাধ্যমে কৃষি সম্পর্কিত তথ্য দেয়া হত। কোনো উচ্চপদস্থ আমলার মনে হয়েছিল সোজাসুজি তথ্য সরবরাহ করাই উচিত। পল্লিমঙ্গল আসরের চরিত্র পরিবর্তন হয়ে গেল। চাষিভাইদের জন্য অনুষ্ঠানে, 'শুনুন চাষিভায়েরা' ইত্যাদি সম্বোধন, চাষিভাইদের জন্য জলহাওয়ার খবর, চাষিভাইদের উপদেশ, এবং বিকৃত গলায় 'ও চাষি ভাই...' হাঁক মেরে সারের বিজ্ঞাপন বাজতে লাগল।

চাষির মুখে বসিয়ে দেওয়া হতে লাগল অদ্ভুত সংলাপ। কলকাতা-কন্যার গলায় গোবর সারে আপ্লুত চাষি বউ-এর গোবরিত উচ্ছ্বাস।

আমার মনে হয় না মাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মানুষরা এসব ভালোভাবে গ্রহণ করেন। 'চাষিভাইদের বলছি' না বলে 'কৃষকরা শুনুন' অনেক ভালো সম্ভাষণ বলেই মনে হয়।

কলকাতা বেতারে এমন কিছু অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে যা কিছু নির্দিষ্ট ধরনের শ্রোতাদের উদ্দেশে প্রচারিত হয়। যেমন শিশু ও কিশোরদের জন্য যথাক্রমে *শিশুমহল* ও *গল্পদাদুর আসর*। *শিশুমহলে* ইন্দিরাদির সেই বিখ্যাত সম্বোধনটির কথা তো সবাই জানেন। 'ছোট্ট সোনা বন্ধুরা সব আদর আর ভালোবাসা নাও। কী, ভালো আছো তো সব...'। এই বাক্যবন্ধটি ইন্দিরাদির গলার সঙ্গে এমনভাবে ওতপ্রোত মিশে গিয়েছিল যে, ইন্দিরাদির পরে যারা শিশুমহল পরিচালনা করেছেন, কেউ ওই বাক্যটি ব্যবহার করতে সাহস পাননি। গল্পদাদুর আসর যখন জয়ন্ত চৌধুরী পরিচালনা করতেন—তখন কোনো সম্বোধন না করেই 'কী খবর?' বলে অনুষ্ঠান শুরু করতেন। শব্দপ্রেক্ষণের মধ্যে একটা আন্তরিকতা আশ্চর্যজনক ভাবে মিশিয়ে দিতে পারতেন ওঁরা। পরবর্তীকালে যারা শিশুমহল পরিচালনা করেছেন—তাঁরা কেউ কেউ বলেছেন 'মিষ্টি মিষ্টি বন্ধুরা আমার', কেউ বলেছেন 'দুষ্টু মিষ্টি বন্ধুরা', কেউ বলেছেন 'সোনা বন্ধুরা', কেউ বলেছেন 'ছোট্ট সোনামণিরা সব'...। এক একজন উপস্থাপক নিজের মতো করে ভেবে নিয়েছেন। গল্পদাদুর আসরও তাই। 'কী ছোট্ট বন্ধুরা, ভালো তো সব'?—এই ধরনের সম্বোধন চলে। এ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। দীর্ঘদিন মহিলামহল পরিচালনা করতেন বেলা দে। সিগনেচার টিউন শেষ হলে তিনি কোনো মনীষীর রচনা থেকে পাঠ করে বলতেন—'বলেছেন অমুক।' তারপর বলতেন 'মা বোনেদের বলছি'...ইত্যাদি। মহিলাদের ক্ষেত্রে মা বোন উচ্চারণ করা সহজ। পুরুষদের ক্ষেত্রে 'বাবা-ভাইদের বলছি' চলে না। বয়স্ক মানুষদের জন্য একটি অনুষ্ঠান আছে। সত্যি কথা বলতে গেলে বৃদ্ধদের জন্য অনুষ্ঠান। এখানে 'মাননীয় বৃদ্ধবৃন্দ'—এই সম্বোধন চলে না। বয়স্কদের জন্য যে অনুষ্ঠানটি (ইংরেজিতে যাঁরা সিনিয়ার সিটিজেন) তাদের অনুষ্ঠানটির আগে নাম ছিল 'জীবনসন্ধ্যা'। একদিন শোনা গেল উপস্থাপক বলছেন—'জীবন সন্ধ্যায় উপনীত মাননীয় শ্রোতারা'। এই সম্বোধনটি অতি কুৎসিত মনে হয়েছিল আমার। কর্তাব্যক্তিদের বলে অনুষ্ঠানের নামের পরিবর্তন করাই। এখন ওই অনুষ্ঠানটির নাম 'মাননীয়েষু'।

বিজ্ঞানের একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে। সমস্ত শ্রোতা এই অনুষ্ঠান শুনতে উৎসাহী নন। আমরা এই বিশেষ

শ্রোতাদের কী সম্বোধন করব? 'মাননীয় বিজ্ঞানমনস্ক শ্রোতারা' তা হলে শেয়ার বাজার নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান তৈরি হলে কী বলব? 'মাননীয় শেয়ার বাজারিরা'? অথবা 'যারা বাজারে টাকা খাটাতে চান, তাঁদের বলছি?' কিম্বা 'অর্থলোভী শ্রোতাবন্ধুরা?' খেলাধুলার আসর ক্রীড়াঙ্গনের শ্রোতাদের কী সম্বোধন করব? 'আমাদের ক্রীড়ামোদী শ্রোতারা'? তা হলে যাঁরা ক্রীড়ামোদী নন, তাঁদের কিন্তু পরোক্ষে বলা হচ্ছে যে এই অনুষ্ঠান আপনাদের জন্য নয়, আপনারা রেডিয়ো বন্ধ করে দিন। এ সমস্ত অসুবিধার কারণে একটা আপাত নিরাপদ সম্বোধন তৈরি হয়েছে। যেমন বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান অন্বেষায়—

'অন্বেষা অনুষ্ঠানে আপনারা স্বাগত'

'ক্রীড়াঙ্গন অনুষ্ঠানে আপনারা স্বাগত'

'মাননীয়েষু শ্রোতাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি'--ইত্যাদি।

এগুলো হল কোনো নির্দিষ্ট সম্বোধনকে এড়িয়ে যাওয়া। এই এড়িয়ে যাওয়ার কায়দাটার মধ্যেও একঘেয়েমি এসে গেছে। এড়িয়ে যাওয়ার নতুন কায়দা উদ্ভাবনও জরুরি হয়ে পড়েছে মনে হয়।

শ্রোতাদের সম্বোধনের পর শ্রোতাদের সামনে আমরা অনুষ্ঠানটির নাম ঘোষণা করি, অনুষ্ঠানটিতে কী আছে তার একটা ধারণা দিই, এবং শুনবার জন্য অনুরোধ করি। এই অনুরোধটাই কীভাবে করা যেতে পারে? কোন ভাষায়? এ নিয়েও একটা চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েই যায়। যদি বলি 'এবার শুনুন পশ্চিমবঙ্গের লোকনাট্য বিষয়ে একটি কথিকা, বলছেন অমুক...' এভাবে বলার মধ্যে একটা আদেশ আদেশ ভাব থেকে যায়। ফলে একটু অন্যরকম করে বলা হয়। যেমন, 'এখন শোনা যাবে পশ্চিমবঙ্গের লোকনাট্য বিষয়ে...কিংবা এখন প্রচারিত হচ্ছে, অথবা এখন শুনতে পাবেন বা 'এখন শুনবেন...' ইত্যাদি। এরকম করতে গিয়ে আবার শ্রোতাদের সঙ্গে একটা দূরত্বও তৈরি হয়, এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। হিন্দিতে বলা হয়—'আভি পেশ করতা হুঁ এক...'। কিংবা 'আভি পেশ হায় এক...'। অথবা 'লিজিয়ে শুনিয়ে এক বার্তা...'।

কিন্তু বাংলায় কখনোই বলা হয় না 'নিন, শুনুন দেখি একটা কথিকা...'। ঠিক এভাবে না হলেও একটু অন্তরঙ্গতা আমরা বাড়াতেই পারি সম্প্রচারের

ভাষা ও ভঙ্গি কিছুটা বদলে। যেমন ধরা যাক, এখন ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ চলছে। ডেঙ্গুজ্বর সম্পর্কিত কোনো অনুষ্ঠানের শুরুতে কি আমরা বলতে পারি না, 'আসুন, মন দিয়ে শুনুন ডেঙ্গুজ্বরের...'? এটা লিখেই মনে হল— না, ঠিক এভাবেও বলা যায় না। বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের এত গর্ব, কিন্তু সম্প্রচারের ভাষা ভাববার সময় ভাষার দৈন্যের দিকটা উঠে আসে অনেকটাই। কিছুতেই জুতসই শব্দ পাওয়া যায় না।

বাংলায় 'গো' শব্দটা অন্য শব্দের পরে জুড়ে গিয়ে একটা অন্তরঙ্গতা তৈরি করে। যেমন কী গো? এসো না গো, চলো গো ইত্যাদি। আমরা বেতারে কখনোই বলতে পারছি না, শুনুন গো কয়েকটি কীর্তন গান, ওড়িয়াতে 'গো'র ব্যঞ্জনা বহন করে 'ম' শব্দটি। অনুজ্ঞাবাচক শব্দের পর 'ম' জুড়লে বেশ একটা অন্তরঙ্গতার ভাব আসে। যেমন 'এ পাট আস ম', 'অল্প টিকে খাও ম', এখানে নিষেধটাকেও খুব মোলায়েম করে দেয় 'ম' শব্দটি। আমি কোনো কাজ করতে পারব না কথাটা ওড়িয়াতে খুব মোলায়েম ভাবে বলা যায়—'নাই ম, মু পারিবিনি'। সম্প্রচারে ম শব্দটার ব্যবহার হচ্ছে। 'আগন্তু, শুনন্তু ম, এবে এক নাটক...'। আমরা 'গো' শব্দটাকে সম্প্রচারে ব্যবহার করতে পারিনি।

বাংলা বেতার সম্প্রচার প্রথম থেকেই খুব ভারী চালে চলেছে। উঁচু পর্দায়। ১৯২৭ সালের রবীন্দ্রপরিমণ্ডলের মধ্যে আকাশবাণীর সূচনা। ব্রাহ্ম শালীনতাবোধের অবশিষ্টাংশকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বাঙালি মধ্যবিত্ত। হাল্কা চালে কথাবার্তা একটু খাটো করেই দেখা হয়েছে। তারল্যর পরিবর্তে একটা গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা থেকেছে, বহুকাল। সম্প্রচারের ক্ষেত্রে হাল্কাচালে কথাবার্তা বলার চেষ্টা হয়েছে এফ. এম আসার পর, যখন আমরা আরও একটু ঘনিষ্ঠ, আরও একটু অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেছি শ্রোতাদের সঙ্গে। বলার ভঙ্গি পালটেছি, সম্বোধন পালটেছি, কিন্তু যে অন্তরঙ্গতা হিন্দি বা ইংরাজি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে হয়েছে, বাংলায় সেটা হয়নি। কেন হয়নি সেটা ভেবে দেখা দরকার। বাংলা ভাষাকে অনেকেই বলেন মিষ্টি ভাষা, কিন্তু হিন্দির তুলনায় বাংলা ভাষার সান্দ্রতা কিছু কম মনে হয়। হিন্দির ফ্লুয়িডিটি অনেক বেশি। সহজে গড়িয়ে চলে যেতে পারে।

শ্রোতাদের আজকাল 'শ্রোতাবন্ধু' বলা হচ্ছে। আগে বলা হত না। এই বিবেচনায় বলা হত না যে মাইকের এপাশ থেকে যাদের 'বন্ধু' বলে সম্ভাষণ

করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে অনেকেই বয়স্কপ্রৌঢ় মানুষ থাকতে পারেন, যাঁরা 'বন্ধু' সম্বোধনটা পছন্দ করছেন না। অনেক প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, মানুষ আছেন যারা ভাবছেন 'আমাকে বন্ধু ডাকার স্পর্ধা কবে থেকে হল তোমাদের?' ওঁরা মনে মনে ভাবছেন ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মে বন্ধু থেকেই তো বঁধু। কয়েকজন বয়স্ক মানুষকে এই 'বন্ধু' সম্বোধন নিয়ে ব্যঙ্গ করতেও শুনেছি। এই নিবন্ধের প্রথমেই যে তরুণ ভাদুড়ি মহাশয়ের কথা বলেছিলাম, তিনিও 'বন্ধু' শব্দটাকে নিয়ে যে খেলা করেছিলেন, তার মধ্যে একটা ব্যঙ্গ প্রোথিত ছিল। বরং বলা ভালো আমাদের 'বন্ধু' সম্বোধনটির উপর আবিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন।

দেখুন এখানে মহাশয় শব্দটিকে অবলীলায় ব্যবহার করা হল, কিন্তু সম্প্রচারের ক্ষেত্রে...মহাশয় শব্দটি ব্রাত্য। শুনুন 'মহাশয়গণ, মহাশয়রা, এখন নাটক শুনুন...' এভাবে বলা যায় না। বলা যায় না কারণ, আমরা কাউকে এখন মহাশয় বা মশাই ডাকি না। ও মহাশয় কোথায় যাচ্ছেন— এরকম কথা কেবল নাটকেই রয়ে গেছে। অথচ আমরা চিঠিপত্রে অনায়াসে 'মহাশয়' লিখি। মঞ্চেও 'মহাশয়' সম্বোধন করি। গ্রামে সরকারি মিটিং-এ উপস্থিত থেকে দেখেছি—মিটিং-এর সম্বোধন পালটে গেছে। আগে মন্ত্রীমশাই বলা হত। গুপী গাইন বাঘা বাইনের 'ও মন্ত্রীমশাই ষড়যন্ত্রী মশাই' গানের প্রভাবে কিনা জানি না এখন আর 'মন্ত্রীমশাই' বলা হয় না। 'মন্ত্রীমহোদয়' বলা হয়। মন্ত্রী যদি মহোদয় হন, পঞ্চায়েত প্রধানও কি করে মহোদয় হবেন? সুতরাং প্রধান এর ক্ষেত্রে মশাই বহাল রইল। এদিকে গ্রামের মিটিং-এ বিডিও, ব্যাংক ম্যানেজার, একস্‌টেন (একস্‌টেনসন) অফিসার যাঁরা উপস্থিত থাকেন, ওঁদের সাহেব সম্বোধন করতে হয়। বিডিও সাহেব, ম্যানেজার সাহেব ইত্যাদি। প্রধান সভাধিপতিরাই বা কেন 'মশাই' তে পড়ে থাকবেন। এখন সবাই সাহেব। ডি.এম.সাহেব, এসডিও সাহেব, বিডিও সাহেব, সভাধিপতি সাহেব, প্রধান সাহেব, শুধু মেম্বার মহাশয়। আর মন্ত্রী 'মহোদয়'।

এঁদের স্ত্রী পরিচয়ে একটা সূক্ষ্ম প্রকারভেদ আছে। বিডিও এসডিও ইত্যাদিদের স্ত্রীরা স্বাভাবিক ভাবেই মেমসাহেব। বড়বাবু, ক্যাশিয়ার হেড ক্লার্কদের স্ত্রীরা মিসেস, কনিষ্ঠ কেরানিদের স্ত্রীরা ওয়াইফ, এবং গ্রুফ ডি, মালী, জমাদার পিওনদের স্ত্রীরা পরিবার। কোনো মেমসাহেব কোনো মালীকে ডেকে বলেন—'নে, এই শাড়িটা তোর পরিবারকে দিস'।

বাংলা ভাষায় নানা কূটকচালি আছে। শুধু মহিলা বললে যথেষ্ট সম্বোধন দেওয়া হয় না, তাই ভদ্রমহিলা বলতে হয়। ছেলেমেয়ে অতি নিরীহ শব্দ। মেয়েছেলে বললেই নারীরা অসম্মানিত হন। ঝি মানে কন্যা। দুহিতা শব্দজাত। কিন্তু এখন ঝি মানে গালাগাল। দেহজীবী বলা নাকি ঠিক নয়। যৌনকর্মী। এই যৌনকর্মী শব্দটা আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে, কিন্তু এটাই চালু হয়ে গেছে। ভীষণ শব্দটা এখন সুন্দর বোঝানোর বিশেষণের বিশেষণ। আপনার গানটা ভীষণ ভালো, ভীষণ সুন্দর। ভীষণ সুস্বাদু। ভালোত্বর ডিগ্রি বেড়ে যায় ভীষণ শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে। গানটা ভীষণ-ভীষণ-ভীষণ ভালো গাওয়া হয়েছে বললে বোঝা যাবে কতটা ভালো গাওয়া হয়েছে। বাংলা কখন যে সামাজিক সম্মতি দেবে আর কখন দেবে না বোঝা দুষ্কর।

একটু অন্যদিকে চলে যাচ্ছে আলোচনা। আমরা এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব সম্বোধন প্রসঙ্গেই।

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন' না বলে বলেছিলেন, 'ব্রাদারস্ অ্যান্ড সিসটারস্ অফ অ্যামেরিকা'। আর তাতে অনেকক্ষণ হাততালি বেজেছিল। আসলে শব্দ ব্যবহারের ভিন্নতাতেই নয়, আন্তরিকতায়। ওই নতুন শব্দ অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। সম্প্রচারের ভাষা আন্তরিক হবার জন্য, শ্রোতার হৃদয় ছোঁবার জন্য বারবার পালটেছে।

পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির আর্থিক উন্নয়ন হয়েছে গত ২৫/৩০ বছরে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় তৈরি হয়েছে।

এই সব স্কুলে হিন্দি ও ইংরাজিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন স্কুলগুলিতে ইংরাজি পঠনপাঠনে গুরুত্ব দিল না। ফলে প্রচুর প্রাইভেট ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল তৈরি হল। মধ্যবিত্ত বাঙালি তাঁদের সন্তানদের ওই সব স্কুলে ভর্তি করালেন। এই প্রজন্মের জন্য প্রমোদ সরবরাহ করার দায় বর্তাল মিডিয়ার উপর। প্রাইভেট চ্যানেলগুলি আসার আগে পর্যন্ত আকাশবাণী এবং দূরদর্শনই ছিল ইলেকট্রনিক মিডিয়া। তাঁরা তাঁদের সম্প্রচারের ভাষা পালটে ফেলে এই নব্য প্রজন্মের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করল। বাংলা-ইংরেজি-হিন্দির মিশেলে এক অদ্ভুত ভাষা তৈরি হতে লাগল।

এফ. এম ভাষা বা এফেমীয় ভাষা। যেমন—'আরে ভাই দোস্তোঁ, ফ্রেন্ডস্, বন্ধুরা, আপনাদের দরবারে হাজির আছি আপনাদের জান পহেচান্ কৌশিক'। 'হ্যালো। হাউ আর ইউ? ফাইন? ও ক্কে। আজ সকাল থেকে ঝিরিঝিরি বৃষ্ট পড়ছে। এরকম বৃষ্টিতে মনটা বিন্দাস হয়ে যায়। কি হবে বিন্দাস হয়ে, তার চেয়ে বেটার একটু মস্তি করি। আসুন একটা গান শুনি। পুরোনো দিনের গান। এভরিবডি নোজ ওল্ড ইজ গোল্ড। তাই আশা ভোসলের গোল্ডেন ভয়েস পেশ করব। লিরিক হ্যায় গুলজারকা, অর মিউজিক এস-ডি বর্মন। কাম অন...' (গান ফেড ইন)।

এই ধরনের ঘোষণা কলকাতা বেতারই শুরু করে, তারপর মিরচি, রেড. পাওয়ার ইত্যাদিরা এই ফরম্যাট গ্রহণ করে।

আজ প্রমথ বিশি, পরিমল গোস্বামী, সুকুমার সেন, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়রা কেউ নেই। কোনো প্রতিবাদও নেই। এই ধরনের ত্রিভাষিক ঘোষণা এ যুগের তরুণদের কতটা কাছে টানতে পেরেছে জানি না। কতটা সমীক্ষা হয়েছে তাও জানি না। এফ. এম-এ নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের উপস্থাপক—উপস্থাপিকা হিসেবে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁদের পরিচালনা করছি এবং ট্রেনিং দিচ্ছি গত প্রজন্মের মানুষ। গত কুড়ি বছর কোনো নতুন নিয়োগ নেই। অনুষ্ঠান পরিচালনা করার মানুষ জন সব গত যুগের। উপস্থাপক-উপস্থাপিকাদের সঙ্গে প্রযোজক পরিচালকদের একটা জেনারেশন গ্যাপ রয়ে গেছে। ফাঁক রয়ে গেছে বেতারের নীতিবোধের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার। সাধ ও সাধ্যের। তিনটে ভাষার অজীর্ণ খিচুড়ি যে এই প্রজন্মের খুব পছন্দের তার কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু অনেক মানুষের অপছন্দের। কলকাতা শহরের ১৬—৩৬ বছর বয়সিদের মধ্যে অনেক অবাঙালি আছেন এবং এই অবাঙালিরা ভালোই বাংলা বোঝেন। এবং ইংরেজি মাধ্যমে পড়া বাঙালিরাও নিশ্চই মাতৃভাষা ভুলে যাননি। তবে কি অনুষ্ঠানগুলি পুরোটা বাংলাতেই করা উচিত? আর একটু তরল বাংলায়? অন্য প্রদেশে এ ধরনের সমস্যা নেই। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত নব্য প্রজন্ম সব প্রদেশেই আছে। ওই সব প্রদেশে তিন ভাষায় খিচুড়ি বানাবার দরকার হয় না। দিল্লির সরকারি এফ. এম বেশ জনপ্রিয়। ওখানে ৯০ ভাগ হিন্দি এবং ১০ ভাগ ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

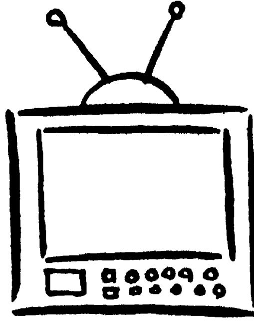
ওড়িশাতে ওড়িয়াতেই সম্প্রচার হয়। অসমে অহমিয়াতে। পশ্চিম বাংলাতেই যত সমস্যা। সমস্যা সমাধানের রাস্তা খোঁজা চলছে। আজ তিন ভাষার এই মিশ্রিত সম্প্রচার আমাদের অনেকের অনভ্যস্ত কানে খারাপ লাগছে, একদিন হয়তো এখান থেকেই বেরিয়ে আসবে সম্প্রচারের নতুন ভাষা। সম্প্রচারের ভাষায় এমন কিছু শব্দ ব্যবহার হচ্ছে যেখানে একটি শব্দ অনেক অর্থ বহন করে এবং এখনকার শ্রোতারা তাদের মতন করে মানে করে নেয়। যেমন 'মস্তি', ব্যাপক, বিন্দাস, ইত্যাদি।

বিদায় সম্ভাষণের ক্ষেত্রে একটা নতুন কথার প্রাদুর্ভাব হয়েছে। 'ভালো থাকবেন'। আমার ভালো থাকাটা যেন আপনার আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে, কিংবা আমার ভালো থাকাটা যেন আমার ইচ্ছাধীন, যেন আমি ইচ্ছা করেই ভালো নেই। 'ভালো থাকবেন'—এর সঙ্গে আজকাল জুড়েছে ভালো রাখবেন। এ বড়ো গুরু দায়িত্ব। ভালো থাকতে হবে আবার ভালো রাখতেও হবে? এখন সার বুঝে গেছি 'ভালো থাকবেন' এর অর্থ এবার বিদায় হন। কারোর সঙ্গে কথাবার্তা চলাকালীন যখন বুঝি এবার থামতে হবে, কিম্বা এবার যেতে হবে, বলে দিই, আচ্ছা, ভালো থাকব।

বাঙালি সংস্কৃতিতে বিদায় সম্ভাষণ সেভাবে ছিল না। হাত নাড়ানো, টা-টা, বাই বাই, ইত্যাদি সবই ইংরাজি প্রভাব। শুভরাত্রি ইত্যাদিও। সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান শেষে উপস্থাপকরা বলতেন, এবার বিদায় নিচ্ছি। ইংরাজি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'গুডনাইট' চলত। পরবর্তীকালে বাই বাই এসেছে। কলকাতা বেতারের প্রথম যুগে সম্প্রচারের শেষে একটা দীর্ঘ বিদায়বাক্য বলা হত। 'যারা প্রবাসে আছেন তাঁদের জন্য অমুক, যারা রোগ শয্যায় আছেন তাঁদের জন্য আরোগ্য কামনা, যারা পথে আছেন তাঁদের শীঘ্র পথপ্রান্তে উপনীত হওয়ার কামনা, যারা সংকটে রয়েছেন তাঁদের সংকটমুক্তির কামনা, রাত্রের সুনিদ্রা' ইত্যাদি অনেককিছু বলে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হত। ওটা বেশিদিন চলল না। কিন্তু এখন এফ. এম চ্যানেলে বিদায় জানানোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। 'শুভরাত্রি, আবার কথা হবে কাল'— এসবের সঙ্গে 'ভালো থাকবেন'ও জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। ইংরাজিতে 'টেক কেয়ার' শব্দটাও বলা হচ্ছে কখনো। 'হ্যাভ এ নাইস ডে'-র পর 'হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল ডে'-ও বলা হচ্ছে। এসবেরই বাংলা ভাবার্থ বোধ হয় 'ভালো থাকবেন'।

বাংলা বেতার সম্প্রচার ৮০ বছরের হয়ে গেল। এই ৮০ বছরে বেতার চারটি প্রজন্ম পার করেছে। সমাজ এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছে। সম্প্রচারের ভাষাও পালটেছে, কিন্তু ততটা পালটায়নি যতটা পালটানো দরকার ছিল। সম্প্রচারের ভাষা কি তবে রক্ষণশীল? আবার যদি হিন্দির সঙ্গে তুলনা করি, দেখব হিন্দিতে অনেকটাই পালটেছে। তবে কি বাংলা ভাষার মধ্যে অন্তর্নিহিত কিছু রক্ষণশীলতা আছে, যা সম্প্রচারের ক্ষেত্রে প্রকটিত।

লেখক গল্পকার, ঔপন্যাসিক, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ



সম্প্রচার: কথা আর বার্তা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

'সম্প্রচার কথাটার অর্থ যদি হয় ঘোষণা বা প্রচার, ভাষার কাজটাই তো এক অর্থে তাই। একটা শব্দ কিংবা বাক্য যখন বলা অথবা লেখা হয়, সেটা একটা সংকেত—তার ভেতর লুকিয়ে থাকে একটা বক্তব্য। আমরা যখন শুনি বা পড়ি, সেই সংকেতকে ভেঙে, তার ভেতরের বার্তাটা বের করে আনি। ভাষাতত্ত্বে একেই বলা হয় অর্থকরণ বা সিগনিফিকেশন। 'সম্প্রচারের ভাষা' কথাটার অর্থ তাহলে কী হতে পারে?

ভাষার পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়ে যেমন ভাষাতত্ত্ব, ভাষাচর্চা করতে করতে ভাষার ভাষাও তেমনি একটা গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। ইংরেজিতে বলা হয়: মেটাল্যাংগোয়েজ; আমরা বাংলা করে নিয়েছি 'অধিভাষা'। সম্প্রচারের কাজটাও ভাষা দিয়ে হয়, আর সেই ভাষার একটা বিশিষ্ট চরিত্র আছে। তা লিখিত ভাষার থেকে স্বতন্ত্র, এমনকী কথিত ভাষার থেকেও। প্রতিদিনের সাধারণ কথালাপের যে-ভাষা

তার সঙ্গে শিল্প সাহিত্যের, এমনকী সংবাদপত্রের লিখিত ভাষার যেমন একটা পার্থক্য আছে, আকাশবাণী, দূরদর্শনের প্রচারের ভাষাও তেমনি আমাদের দৈনন্দিনের বাচনের ভাষার থেকে স্বতন্ত্র। সম্প্রচারের ভাষা নিয়ে তাই পৃথক আলোচনা হতেই পারে।

আমরা জানি, লিখিত ভাষার তুলনায় কথিত ভাষা আলগা, অসম্বন্ধ। কথায় একটা ভুল হলে তা সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নেওয়া যায় : কোনো প্রসঙ্গ অকথিত থেকে গেলে ভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনায় তাকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় ; কথার টানে আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলে 'যাই হোক' বলে আবার কেন্দ্রীয় বিষয়ে ফিরে আসা যায়। কিন্তু লিখিত ভাষায় সেটা সম্ভব নয়। এক বার লেখা এবং ছাপা হয়ে গেলে তা একটা স্থায়ী রূপ পেয়ে যায়! এই কারণেই বোধ হয় 'অক্ষর' শব্দটির ভেতর একটা অমরত্বের দ্যোতনা আছে। অক্ষর মানে যার ক্ষয় নেই—অক্ষয়। যে-ভাষাকে সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন বা সংশোধন করে নেওয়ার সুযোগ নেই, সেই ভাষাকে অনেক সতর্ক থাকতে হয়। লিখিত ভাষার গঠন তাই অনেক সুসংহত, ঘনবদ্ধ।

সম্প্রচারের ভাষা মুখের ভাষা হলেও তারও এই সতর্কতার প্রয়োজন আছে। লিখিত বয়ান যখন পড়া হচ্ছে, তখনও শ্রোতারা পাঠকের মুখের বাক্যকেই অমোঘ বলে ধরে নেবেন। লেখার ভাষায় পরে 'ভ্রম সংশোধন' জুড়ে দেওয়ার মতো ঘোষকও কখনো কখনো 'মাফ করবেন' বলে ভুল সংশোধন করে নিয়ে থাকেন। কিন্তু এরপরও কিছু ভুল তাঁর অজান্তেই ঘটে যেতে পারে। বার বার মার্জনা চাইলে তা মঞ্জুর করার মতো সদয়তা শ্রোতার না-ও থাকতে পারে। ঘোষকের প্রতি শ্রোতার আস্থাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে এর ফলে।

সংবাদপত্রের ভাষার সঙ্গে আকাশবাণী দূরদর্শনের ভাষার এই যে প্রভেদ, এর সঙ্গে তুলনা চলতে পারে বোধ হয় থিয়েটারের ভাষা বনাম চলচ্চিত্রের ভাষার। চলচ্চিত্রের সংলাপ ভুল উচ্চারিত হলে কিংবা পরিচালকের পছন্দমতো না হলে, তা আবার রেকর্ড করে নেওয়া যায়। থিয়েটারে সেই সুযোগ থাকে না। এর ফলে থিয়েটারে কত ধরনের অনর্থ ঘটেছে, তার কিছু গল্প আমরা পড়েছি ও শুনেছি। আকাশবাণীর প্রথম যুগেও এই ধরনের বিভ্রাট যে ঘটত, তার উল্লেখ পাই নলিনীকান্ত সরকার এবং

আরও কয়েক জনের স্মৃতিকথায়। যতদূর মনে পড়ছে, ১৯৯৭ সালে আকাশবাণীর সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আকাশবাণীতেই এইরকম কিছু মজার গল্প শুনিয়েছিলেন কয়েক জন।

শুনতে মজা লাগলেও বিষয়টা কিন্তু শুধুই মজা বা কৌতুকের নয়। গ্রামোফোন, সিনেমা, রেডিয়ো এবং আরও পরে টেলিভিশনের মতো এক-একটা নতুন মাধ্যম আসছে, তার একটা নিজস্ব ভাষা তৈরি হচ্ছে। যাঁরা সেই ভাষাটা ব্যবহার করছেন, তাঁদের যেমন সযত্নে ভাষাটা শিখে নিতে হচ্ছে, শ্রোতা ও দর্শককেও ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে নিতে হচ্ছে সেই ভাষার প্রকার-প্রকরণ। কাজটা সহজ নয়। অক্ষর-পরিচয় আর শব্দ-বাক্য গঠনরীতি শেখার মতো এ-ও এক ধরনের ভাষাশিক্ষা।

কথা বলতে আমরা সবাই পারি। এটা আমাদের সহজাত ক্ষমতা। কিন্তু ভাষাকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, সীমিত সংখ্যক শব্দ দিয়ে অসংখ্য বাক্য কীভাবে নির্মাণ করা যায়, সেটা একটা অন্য দক্ষতা—নোয়াম চমস্কি একে বলেছেন 'পারফরম্যান্স'। তারপর আছে শব্দ-বাক্য পড়তে এবং লিখতে শেখার ক্ষমতা—সেটাও কষ্ট করে অর্জন করতে হয়। রেডিয়ো ও টেলিভিশনে সম্প্রচারের কাজটা যাঁরা করেন, তাঁদেরও একটা বিশেষ দক্ষতা আয়ত্ত করে নিতে হয়।

আমাদের শৈশবে, ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে, আকাশবাণী কলকাতায় বিজন বসু কিংবা ইভা নাগ যেভাবে সংবাদ পাঠ করতেন, তার ভেতর নিরপেক্ষতার সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশে থাকত একটা বিষয়োচিত গাম্ভীর্য। 'সবিনয় নিবেদন' অনুষ্ঠানের পরিচালক (সম্ভবত মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়) সরাসরি আত্মপক্ষ সমর্থন না করেও বিনম্র ভাষায় যেভাবে শ্রোতাদের প্রশ্ন কিংবা আপত্তির জবাব দিতেন, তাকে একটা বিশেষ ধরনের ভাষার চমৎকার নিদর্শন বলা যেতে পারে। এটাই হয়তো একমাত্র রীতি নয়। বিষয়ভেদে কখনো বা পঠনের চরিত্রও বদলে যেতে পারে।

সে-আমলে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হলে, সেই সংবাদ প্রচার করা হত 'আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি'—ঘোষণা দিয়ে। চলন্ত অনুষ্ঠান থামিয়ে যখন এই ঘোষণা করা হত (যেমন হয়েছিল জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর দিনে), নির্দিষ্ট সময়ের সংবাদও তেমনি শুরু হত এই প্রারম্ভিক ঘোষণা দিয়ে। ঘোষক/ঘোষিকার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকত একটা ভাবগম্ভীর শোকার্ত স্বর।

তবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সংবাদ, সমীক্ষা ও সংবাদ-পরিক্রমা পাঠ করতেন, তাতে উত্তেজনার আবেগ মোটেই প্রচ্ছন্ন থাকত না। কখনো-কখনো তা হয়ে যেত মাত্রাধিক; সেই পরিস্থিতিতে সেটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল। খেলার ধারাবিবরণীতে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে ভাষ্যকার নিজেই যেমন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর গলার স্বরের ভেতর দিয়ে সেই উত্তেজনা শ্রোতার মনেও সঞ্চারিত করে দিতে চান। নির্বাচনি জয়-পরাজয়ের ফলাফল ঘোষণার সময়েও ঘোষকের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা গোপন থাকে না। সংবাদের মাঝখানে কখনো কখনো 'এইমাত্র খবর পাওয়া গেল' বলে শ্রোতাদের উত্তেজনা আরও উসকে দেওয়া হয়।

এখন আরও অনেক নতুন পদ্ধতিরও উদ্ভাবন হয়েছে। ২৯ এপ্রিল, ২০০৬ সন্ধ্যায় একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সংবাদ দেখছিলাম। নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্র এখন দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন। বলার পরই ঘোষণা করা হল : আমরা এখন আপনাদের সোজা কাঠমান্ডুতে নিয়ে যাচ্ছি। মানসভ্রমণের মতো আমরাও যেন একবার নেপাল ঘুরে এলাম। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের সময় (এপ্রিল-মে, ২০০৬) আকাশবাণীও আমাদের কখনো বাঁকুড়া, কখনো বীরভূম, কখনো-বা পুরুলিয়া ঘুরিয়ে এনেছে। এর ফলে আমরা খুব নতুন কিছু যে জানতে পেরেছি, তা অবশ্য নয়। তবে এই প্রয়াসকে নিছক চমক বলে তাচ্ছিল্য করতেও রাজি নই।

দিন বদলাচ্ছে। নতুন প্রযুক্তি আসছে। সম্প্রচারের পদ্ধতিরও তো পরিবর্তন হবেই। বদলাচ্ছে তো শুধু পদ্ধতি নয়, ভাষাও। আমাদের শৈশবে সংবাদপত্রে 'ধর্ষণ' শব্দটা বড়ো-একটা ব্যবহার হত না। লেখা হত : পাশবিক অত্যাচার। এখন ধর্ষণ যেমন প্রতিদিনের ঘটনা, প্রচার-মাধ্যমেও শব্দটির নিত্য উপস্থিতি। এর ফলে এক দিক থেকে অবশ্য ভালোই হয়েছে, কারণ পশুরা যৌনক্রিয়ার নামে ধর্ষণ করে কি না, আমরা নিশ্চিত জানি না।

আকাশবাণী-দূরদর্শনের মতো সরকারি প্রচার মাধ্যমের ভাষাও যে কত নিঃসংস্কার হয়ে উঠেছে, তার একটা বড়ো প্রমাণ : এইড্স সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন। 'সঙ্গমের ইচ্ছা যেকোনো সময়ে জাগতে পারে। সঙ্গে কনডোম রাখুন।'—পাঁচ বছর আগেও আমরা আকাশবাণীতে এইরকম ঘোষণা

কল্পনা করতে পারতাম না। কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার আকাশবাণীতে এখনও নিষিদ্ধ বলে শুনেছি। সম্প্রচারের ভাষার একটা মান নির্ণয় করার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় একসময় কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল। আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকলে 'সমুদ্রে যাঁরা মাছ ধরতে যান'—তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া হয়। এই ভাষাটাও আসলে নিজে সতর্ক: কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতি অশ্রদ্ধা যেন প্রকাশ না পায়।

তবে এইড্স-সচেতনা প্রচারের জন্য বিদেশি টাকা এই বিধিনিষেধের বেড়া এক ধাক্কায় অনেকটাই ভেঙে দিয়েছে বলা যায়। একটি বিজ্ঞাপনে শুনি: এক নেশাগ্রস্ত পুরুষ তার নারীসঙ্গীকে বলছে, ঘরে ঢুকে আমি নেকড়ে বাঘ হয়ে যাব। 'নেকড়ে বাঘ' কথাটা নিশ্চয়ই অশ্লীল নয়; কিন্তু যে-প্রতিবেশ বা কনটেক্সটে কথাটা বসানো হয়েছে, তাকে খুব শোভন বলা চলে না।

ভাষার পরিবর্তন বলতে অবশ্য কেবল শ্লীল-অশ্লীলের প্রশ্নই তুলতে চাই না। ওই প্রশ্নের মীমাংসা তো কোনোদিনই হবার নয়। সম্প্রচারকে যদি একটা বিশেষ প্রচারক্রিয়া হিসাবে দেখি, তার একটা নিজস্ব ভাষা আছে স্বীকার করে নিই—তাহলে সেই ভাষার পরিবর্তনটা কীভাবে ঘটছে—সেই গঠনরূপের প্রলক্ষণটাই আমাদের বিচার্য। ভাষাতত্ত্বে যাকে বলে এককালিক বা 'সিনক্রনিক' বিচারপদ্ধতি, আমরা বিষয়টা বুঝতে চাইছি, কতকটা সেই দিক থেকে।

১১ মার্চ, ২০০৬ ইংরেজি সংবাদপত্রে আয়কর বিভাগের বিজ্ঞাপনে পড়লাম : 'পে ট্যাক্স, করো রিল্যাক্স।' এই ভাষাটা কি বাংলা না ইংরেজি? লটারির বিজ্ঞাপনের ভাষা নকল করে পুস্তক-প্রকাশকও এখন লিখছেন : 'ফোন করুন, বই পান।' এটা কী ধরনের বাংলা? এ-রকম বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে থাকে, দূরদর্শনেও দেখা যায়। ২২ এপ্রিল (২০০৬) বাংলা দৈনিক পত্রে পড়ি, একটি ওষুধ কোম্পানি জানাচ্ছে, তাদের তৈরি ওষুধ খেলে অম্বল-গ্যাস বদহজম ইত্যাদি 'এক মিনিটে গায়েব।' এখানে 'গায়েব' শব্দটির অর্থ কী? ভাষা তো সময়ের সঙ্গে তাল রেখে বদলাবেই। কিন্তু সেই বদলের ধরনটা কোন দিকে যাচ্ছে? বিষয়টা ভাববার মতো, কারণ বিজ্ঞাপনের ভাষা, সম্প্রচারের ভাষা এবং উচ্চারণ মানুষের মুখের ভাষা এবং বাচনভঙ্গিকেও প্রভাবিত করে। উচ্চারণরীতির প্রশ্নটাই আগে বিচার করে দেখি।

টেলিভিশনে একটা দৃশ্য দেখানো হয়, সঙ্গে থাকে ঘোষণা বা ভাষ্য। বেতারে আমরা কেবল কণ্ঠস্বরটাই শুনতে পাই। কণ্ঠের ভূমিকা—মাধুর্য, শুদ্ধ উচ্চারণ, বিষয়োপযোগী স্বর—দু-টি ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি আকাশবাণী কলকাতায় সন্ধ্যার স্থানীয় সংবাদের আগে ও মাঝে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে ; তার প্রতিপাদ্য হল শিশুর কাছে মাতৃদুগ্ধের বিকল্প আর কিছু নেই। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু ঘোষিকা বার বার উচ্চারণ করেন: 'স্তোন্য'। ধরে নিচ্ছি, বিজ্ঞাপনটি এক বার রেকর্ড করা হয়েছিল। তারপর প্রতিদিনই সেই রেকর্ড বাজানো হয়। ভুল উচ্চারণটি কিন্তু এখানে লিখিত ভাষার মতোই স্থায়ী হয়ে গেল। এটা কি কোনোভাবেই সংশোধন করে নেওয়া যায় না?

কেউ বলতে পারেন, উচ্চারণের শুদ্ধতা নিয়ে এত নিক্তিমাপা বিচার না করলেও চলবে। আঞ্চলিক উচ্চারণরীতির প্রসঙ্গও এসে পড়তে পারে। ভাষাতত্ত্বে এটা আজ স্বীকৃত যে, কোনো ভাষাই অন্য একটি ভাষার থেকে নিকৃষ্টতর নয়। উচ্চারণের আঞ্চলিক রূপকেও আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না, কারণ সেটাই একটি অঞ্চলের স্বাভাবিক বাচনভঙ্গি। এই পর্যন্ত কোনো বিতর্ক থাকার কথা নয়। কিন্তু অভিনয়ের মতো, প্রচারমাধ্যমে ঘোষণার কাজটাও তো এক বিশেষ দক্ষতা, একটা পারফরম্যান্স। সেখানে মোটামুটি মান্য ভাষা এবং শুদ্ধ উচ্চারণ কি আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না?

'মান্য' আর 'শুদ্ধ' বিশেষণ দুটি নিয়ে অবশ্য এরপরও তর্ক থেকে যাবে এবং সে-তর্কও সহজে নিরসনযোগ্য নয়। তবে ব্যবহারের ভেতর দিয়ে সংস্কার হতে হতে একটা মোটামুটি মান যে দাঁড়িয়ে গেছে, সম্প্রচারের ভাষায় সেই মানটিই প্রত্যাশিত—এটা বোধ হয় আমরা অস্বীকার করতে পারব না। উচ্চারণরীতি অবশ্য সম্প্রচারের ভাষার একটা ক্ষুদ্র অংশ; তার চেয়েও বড়ো হল ভাষার গঠন আর তার রূপান্তরের চরিত্রটা।

কালে কালে ভাষার বদল হয় ; কিছু শব্দ শুকনো পাতার মতো ঝরে যায়, নতুন শব্দ গজিয়ে ওঠে ; পুরনো শব্দে নতুন অর্থের মাত্রা যুক্ত হয়—এ তো সকলেই জানেন। ভালো অথবা মন্দ যাই হোক, সমাজজীবন আর রীতিনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও পরিবর্তন হয়। জালভোট যদি রাজনৈতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটা অঙ্গই হয়ে উঠে থাকে, বেতার সংবাদে 'ছাপ্পাভোট'—জাতীয় শব্দবন্ধ যে এখন স্বচ্ছন্দে ব্যবহার হচ্ছে—তা একরকম স্বাভাবিকই বলতে হবে।

চালু ভাষা যেমন সম্প্রচারের ভাষাকে প্রভাবিত করে, রেডিয়ো-টিভি আর সংবাদপত্র থেকেও আমরা দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় নতুন নতুন শব্দ আহরণ করতে থাকি। খেলার মাঠের বেশ কিছু শব্দ যেমন আমরা একসময় শিখেছিলাম বেতার-ভাষ্যকার অজয় বসুর কাছ থেকে। প্রচারমাধ্যমকে তার নিজের প্রয়োজনেই নানা ধরনের পরিভাষা তৈরি করে নিতে হয়। ক্রমে সেই পরিভাষাগুলোও আমাদের মুখের ভাষার ভান্ডারে ঢুকে পড়ে। একজন নিরক্ষর মানুষও এখন হঠাৎ অকালবর্ষণ হলে ধরে নিতে পারেন : কোথাও একটা 'নিম্নচাপ' হয়েছে।

মিডিয়াতত্ত্ববিদ মার্শাল ম্যাকলুহানের কল্যাণে 'মিডিয়া' শব্দটারই যেমন অর্থবিস্তার হয়েছে। ইলেকট্রনিক লিটারেসি বলে একটা ধারণাও তৈরি হয়ে গেছে। টিভি-ভিডিয়ো, ইন্টারনেট-ওয়েবসাইট শিক্ষকের ভূমিকাকে ক্রমে গৌণ করে দেবে—এই মত মানতে পারি না ; তবে রেডিয়ো-টিভি যে এক ধরনের সাক্ষরতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে—এটা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছি। বোর্ডে 'সংবাদ' লিখে দিয়ে দেখেছি, বয়স্ক নারীরা দিব্যি বলে দিচ্ছেন, এর মানে খবর। তারা হয়তো সংবাদ শব্দটি পড়তে পারেন না ; কিন্তু প্রতিদিনের দেখার অভিজ্ঞতা থেকে শব্দটি চিনে নিয়েছেন এবং জানেন, পর্দায় ওই লেখাটা ফুটে ওঠা মানে 'এরপর খবর হবে'। ইংরেজিতে 'দি এন্ড' লিখে দেখেছি, কিশোর-কিশোরীরা বলে দিচ্ছে, 'এর মানে শেষ'।

সম্প্রচার শুধু সংবাদই সরবরাহ করে না। সেইসঙ্গে পৌঁছে দেয় একটা বার্তা। আমরা আগেই বলেছি, সাধারণভাবে ভাষার কাজটাও তাই। এই বার্তা কখনোই নিরপেক্ষ-নিরঞ্জন নয়। শব্দের অর্থ সব সময়ই প্রতিবেশ নির্ভর। বিজ্ঞাপনের ভাষায় এটা সহজেই ধরা যায়। কিন্তু সম্প্রচারের ভাষায় তা অনেকসময় প্রচ্ছন্ন বা সংগুপ্ত হয়ে থাকে। বেশ মনে আছে, ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের সময় আকাশবাণী কলকাতায় দু-টি অনুষ্ঠানের ফাঁকে শোনানো হত কিছু উদ্দীপক বাণী। তার একটি ছিল এ-রকম: 'মেটাও, মেটাও, মেটাও / যুদ্ধ যারা চাইছে তাদের / যুদ্ধ নেশা মেটাও।' একটা দেশ যখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, জাতীয়তাবোধ অতিমাত্রায় প্রবল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্ত হবার পর সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এই প্রবণতা স্বাভাবিক। তবে স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত

করার নামে ওই বাণী যে যুদ্ধের সপক্ষে একটা প্রচারও হয়ে উঠছে, এই বার্তাটি অনেক সময় আমাদের নজর এড়িয়ে যায়।

আবার উদ্দেশ্য মহৎ হলেও প্রচারের বার্তায় অবাঞ্ছিত ইঙ্গিত থেকে যেতে পারে। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর আকাশবাণী এবং দূরদর্শন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে কিছু রূপকানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অতি নিম্নমানের সেই অনুষ্ঠানগুলি কার্যত বিষয়টির গুরুত্ব লঘু করে দেয়। শ্রোতা বা দর্শক কেউই নির্বোধ নন। নিছক উপদেশমূলক অনুষ্ঠান বা সুনীতিবচনের ক্রমাগত প্রচার একটা কঠিন, গুরুতর বিষয়কে কৌতুককর করে তুলতে পারে।

এটা ঠিকই যে, সংবাদপত্রকে যেমন প্রতিদিন নিয়ম করে সম্পাদকীয় লিখতে হয়, সম্প্রচার মাধ্যমকেও তেমনি একের পর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যেতে হয়। সব রচনা ও অনুষ্ঠান উন্নত মানের করে তোলা সহজ কাজ নয়।

সাক্ষরতা, শিশুশ্রম, রোগ নিবারণ ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞাপন এবং অনুষ্ঠানগুলি অনেক সময়ই নিছক প্রচারমূলক হয়ে ওঠে। এর ফলে বার্তাটা উদ্দিষ্ট দর্শক ও শ্রোতার কাছে পৌঁছোয় না, অথবা এমন একটি বার্তা থাকে যার আড়ালে রয়েছে একটি অন্য স্বর। শিশুশ্রমের জন্যে যেমন অনেকসময় দায়ী করা হয় পিতামাতাদের, যেন তাঁরা সাধ করে সন্তানদের স্কুল ছাড়িয়ে কাজে পাঠিয়েছেন। কুষ্ঠ-রোগ গোপন রাখা উচিত নয়—এই প্রচারবার্তায় রোগী যেন অপরাধী ; প্রচারক যেন তার গোয়েন্দাচোখ দিয়ে সেই লুকিয়ে রাখার 'অপরাধ'-কে ধরে ফেলেছেন। সর্বশিক্ষা অভিযানের প্রচার এমনভাবে চলছে যেন পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার একটা বিরাট সুযোগ হঠাৎ এসে গেছে ; অথচ প্রাথমিক স্তরে অবৈতনিক শিক্ষা তো একেবারে নতুন কোনো উপহার নয়।

অবশ্য প্রচারের অনুষ্ঠান প্রচারধর্মীই হবে, আর সরকারি বিজ্ঞাপনে আমরা শুনতে পাব রাষ্ট্রের কণ্ঠস্বর—এটাই স্বাভাবিক। তাই সম্প্রচারের ভাষায় যে উপদেশের কিছু বাঁধাবুলি বার বার শুনতে পাই, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। শুধু বাঁধাবুলিই নয়, রাষ্ট্রের একটা অভিভাবকোচিত কণ্ঠস্বরও কখনো কখনো সরব হয়ে ওঠে। জন্মমৃত্যুর দিনক্ষণ রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিতে হবে, শিশুকে পোলিয়ো-প্রতিষেধক খাওয়ানো

অবশ্য কর্তব্য—এইসব বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় প্রায় ধমকের সুরে।

টেলিভিশনের ভাষার একটা বিরাট সুবিধা এই যে, দৃশ্যটাই সেখানে মুখ্য। বক্তা যা বলছেন, তার সঙ্গে অন্যদের মুখের অভিব্যক্তি—সেও এক সংকেতময় ভাষা—তা থেকেও আমরা অনেক কিছু বুঝে নিতে পারি। কিন্তু বেতারে সেই সুযোগ নেই। ভাষাকে এখানে ধ্বনি দিয়ে ছবি তৈরি করে যেতে হয়।

সব ধরনের ভাষাই অবশ্য এই কাজটাই করে। ১৯২৮ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শব্দের মধ্যে ধ্বনি আর অর্থ দুই-ই আছে ; কিন্তু অর্থ শুধু সংবাদই দেয় না : 'সে যদি ছবি দেয়, যদি রস দেয় তাহলেই রূপসৃষ্টির সহায়তা করে।' লিখিত ভাষায় আমরা একটি বা একগুচ্ছ শব্দ বার বার পড়ে মনে মনে একটা ছবি গড়ে নিতে পারি। কিন্তু মুখের ভাষায় বা সম্প্রচারের ভাষায় সেই সুযোগ কম। তাকে নির্ভর করতে হয় প্রধানত স্বরভঙ্গির ওপর। আর এটা করতে গিয়ে, ইদানীং লক্ষ করি, কেউ কেউ কথনকে অতিনাটকীয় করে তুলছেন। এটা বিশেষ করে লক্ষ করা যায় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি বা মনীষীর স্মরণ অনুষ্ঠানে।

ধরা যাক, সুভাষচন্দ্র বসুর স্মরণে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। এক জন ভাষ্য পাঠ করছেন, আর তারই মাঝে মাঝে সুভাষচন্দ্রের কথাগুলি শোনা যাচ্ছে অন্য একটি কণ্ঠে। সেই কণ্ঠই এখানে সুভাষচন্দ্রের প্রতিনিধি। এক্ষেত্রে পাঠ বা কথন যদি অতিনাটকীয় হয়ে যায়, তা বিষয়েব গাম্ভীর্যকে ক্ষুণ্ণ করে এবং স্মরণীয় মানুষটির অনুকৃত কণ্ঠস্বরকে প্রায় ব্যঙ্গাত্মক করে তোলে। সৌভাগ্যবশত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রকৃত কণ্ঠস্বর আমরা রেকর্ডে শুনেছি। তাই কৃত্রিমতাটা সহজেই ধরা যায়। যাঁদের ক্ষেত্রে এই সুযোগ আমরা পাইনি, সেখানেও মানুষটির জীবনকথা পড়ে তাঁর চলন-কথনের ভঙ্গি সম্পর্কে আমাদের মনে একটা ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। অভিনয় যদি একেবারে তার বিপরীতে চলে যায়, তাহলে রূপসৃষ্টির কাজটাই ব্যর্থ হয়।

কথনের অতিনাটকীয়তা, বিশেষত এফ. এম. চ্যানেলের বাচালতা ক্রমশই পিত্তপ্রদাহকর হয়ে উঠছে। 'আজ রাতে' বা 'জলসাঘর' অনুষ্ঠানে গানের ফাঁকে ফাঁকে যা বলা হয়, তা কয়েকটি ব্যাকরণসম্মত বাক্য ; কিন্তু ভেতরে কোনো পদার্থ নেই। টেলিফোনে যাঁরা কথা বলেন, সেই শ্রোতাদের

ভূমিকাও কিছু কম নয়। অনেকেই একটি স্কুলপাঠ্য রচনা আগে লিখে নিয়ে সেটি দূরভাষে পাঠ করে যান। 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের শয়নেস্বপনেজাগরণে মিশে আছেন'—ইত্যাদি অতিকথন অলৌকিকের স্তরে চলে যায়।

সম্প্রচার-মাধ্যমে 'লাইভ ফোন-ইন' বা 'টক-শো'-জাতীয় অনুষ্ঠান এখন এক বিশেষ ধরনের ভাষা তৈরি করে ফেলেছে। একটাও সারগর্ভ কথা না বলে কীভাবে বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে তোলা যায়—তার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই ভাষা। সম্প্রচারের সীমানা ছাড়িয়ে এই ভাষার ছাপ এখন আমাদের প্রতিদিনের মুখের ভাষাতেও এসে লেগেছে। পাড়ায় জলসার ঘোষণা প্রচারমাধ্যমের ভাষাকে নকল করে চলে। 'আজ সন্ধ্যার অনুষ্ঠান' বললে বড়ো মেঠো শোনায়! বলতে হয়: আজকের এই শুভসন্ধ্যায় আমাদের বিনম্র নিবেদন...।

'আনুষ্ঠানিক ভাষা' বলে অবশ্য একটা বর্গ বা ক্যাটিগরি আছে। সেটা সাধারণ চলতি ভাষার থেকে আলাদা। তবে ভাষার এই আনুষ্ঠানিক চরিত্র ক্রমেই বড়ো বেশি কৃত্রিম এবং অতিনাটকীয় হয়ে উঠছে। ঘোষণা বা পাঠ শুনলেই বোঝা যায়, বক্তা শব্দগুলোর অর্থ বুঝে সেই অনুভূতি থেকে বলছেন না; একটি বিশেষ ঢঙে কিছু শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছেন; কখনো-বা পাঠকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অকারণে একটি শব্দের ওপর স্বরাঘাত করছেন।

বেসরকারি এফ. এম চ্যানেলে সঞ্চালক যখন স্বচ্ছন্দে এক ভাষা থেকে টপকে আর-এক ভাষায় চলে যান—তাঁর কুশলতার প্রশংসা করতেই হয়। কিন্তু এর ফলে একটি ভাষার বাগ্‌ভঙ্গি অন্য আর একটি ভাষাকে প্রকটভাবে অনুভাবিত করে। বাসে বসে আমাদের এখন প্রতিদিন শুনতে হচ্ছে ইংরেজি অ্যাকসেন্টে উচ্চারিত বাংলা। হিন্দি সিনেমা তো এই দৌরাত্ম্য আগেই শুরু করে দিয়েছিল ; অমিতাভ হয়ে গিয়েছিল অমিতাভ্। এবার রবীন্দ্রসংগীতেই শুনছি, ফুল হয়ে যাচ্ছে ful ; কি ভাগ্যি fool নয়!

এইসব এফ. এম. চ্যানেল বাংলা উচ্চারণেরই একটা নতুন কায়দা তৈরি করে দিয়েছে, বলা যায়। প্রতিটি বাক্যই উত্তেজনাময় ; যেন দৌড়োচ্ছে, লাফ দিচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে। ঠিক যেমন টিভির বিজ্ঞাপনের দৃশ্য। কেউই স্থির হয়ে বসে নেই, এমনকী সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। তারা সমানেই হেলছে, দুলছে, নাচছে। এক অদ্ভুত শরীরী ভাষা। শ্রাব্য মাধ্যম বেতারও

পিছিয়ে নেই। 'ধরার আঙিনা হতে' একদিন উঠেছিল যে-আকাশবাণী, তা এখন এই গ্রহের সীমানা পার হয়ে উপগ্রহের ভেতর দিয়েও বার্তা বয়ে আনে। এই নতুন প্রযুক্তি-প্রকরণের চাপে-উত্তাপে ভাষার ছাঁচও তো কিছুটা বেঁকেচুরে যাবেই। সম্প্রচারের ভাষা এখন বাজারচলতি ভাষাকেও ক্রমে অন্তরস্থ করে নিচ্ছে। বেতার-সংবাদে শক্তিশালী-র জায়গায় শুনতে পাচ্ছি: জোরদার ; প্রাণপণের বদলে: হাড্ডাহাড্ডি। 'অনুরোধ করছেন' না বলে 'অনুরোধ আপনাদের' (শুনতে শুনতে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি একটা কোলন চিহ্ন)। রাজনৈতিক স্লোগানের অনুকরণেও চলছে: '১১ মে আসছে দিন, আকাশবাণী সঙ্গে নিন।'*

ভাষা একটা সামাজিক প্রচল। সময় আর সমাজের চাল বেয়েই তার চলন। ভাষার এই চালবদল তাই অনিবার্য। আজ যে-ভাষাকে বিকৃত মনে হচ্ছে, উত্তর-প্রজন্মের কাছে সেটাই হয়তো একটা প্রতিমান হয়ে উঠবে। তবে চলনের ধারাটা যেদিকে যাচ্ছে, তা নিয়ে একটা আশঙ্কা বা উদ্‌বেগের কারণও থেকে যায়। ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি তার নিজের কাছে তো অন্তত অবান্তর নয়।

লেখক প্রাবন্ধিক এবং গবেষক। ছোটো গল্পও লেখেন

* ১১মে, ২০০৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়।



‘ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রাম’

ঊর্মিমালা বসু

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নিজেকে ‘হাঁসজারু’ প্রজাতিরই একজন বলে মনে হয়, যিনি না আবৃত্তিকার, না অভিনেত্রী, না উপস্থাপিকা—এককথায় ‘মাস্টার অব্ নান’। আড্ডায়, মজলিশে আমি যে কখনো কখনো সার কথা বলে ফেলি না, এমন অবশ্য নয়। কিন্তু সেই ভরসায় আমি একটি গুরুগম্ভীর নিবন্ধ লিখে ফেলতে পারব—এ ব্যাপারটা আমার একটু অস্বাভাবিক লাগছে। যদিও বিষয়টির সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সংযোগ বহুকালের। কারণ সম্প্রচার বিষয়টির প্রথম ও শেষতম অলংকার—স্বাভাবিকতা, স্বাভাবিকতা এবং স্বাভাবিকতা। মাইক্রোফোন বা ক্যামেরার সামনে কাজ করার সময় একটা সহজ প্রবৃত্তি আমাদের ৯০ শতাংশের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চায়, সেটি হল—‘অতিসচেতনতা’। কণ্ঠ, চেহারা সাজপোশাক, ভাষা-ভঙ্গি সবকিছু সম্পর্কেই একটা বাড়তি মনোযোগ নিজের

অজান্তেই আমাদের অধিকার করে বসে। তাই গরমকালের ভরদুপুরে প্রেস-ক্লাবে ক্যাসেট রিলিজের অনুষ্ঠানে উপস্থাপিকা চড়া রঙের সাউথ-সিল্ক পরে আসেন, সঞ্চালক শুধুই 'বেস' ভয়েসে, কথায় সাধু-চলিত, প্রচলিত অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারে একধরনের ওভারস্মার্ট হয়ে ওঠেন। পাকা রাঁধুনিদের ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটে—একই কারণে তাঁরাও হঠাৎ অতিথির আগমনে তাঁদের নিজস্ব রান্নায় অতিরিক্ত তেলমশলা দিয়ে রান্নার স্বাভাবিক স্বাদ নষ্ট করে ফেলেন।—এখন তো আবার দৃশ্যমানতার কাল, তাই বেতারে মেঘের আড়ালের যে সুবিধা পাওয়া যায়, মঞ্চ বা পর্দায় তা সুলভ নয়—তখন 'কাঁধটাই করে যত গোলমাল'—কখনো অতিরিক্ত সোজা, অনড়ও বলা চলে, কখনো কৃত্রিম সঞ্চালনে অস্থির, অনেক সময়েই যা বক্তব্য-বিষয়, তা সাজগোজের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন মনে হয়। এক্ষেত্রে শ্রোতা দর্শকের চরিত্র বা মান বুঝে যদি সঞ্চালনা করা যায়—তাহলে যোগাযোগটি নিবিড় হয়।

আসলে এখন চ্যানেলে চ্যানেলে প্রতিযোগিতা, এফ-এমের বাজার সরগরম। সর্বত্রই TRP নামক এক অদৃশ্য ঈশ্বরের নজরদারি। অথচ আমরা যখন শোনা শুরু করেছিলুম, তখন 'ঘরের কাছে আরশিনগর' ছিল বেতারই, সিনেমা-থিয়েটারের যতই বাড়-বাড়ন্ত থাক না কেন, সেখানে প্রবেশ সহজ ছিল না মোটেই। কাজেই বেতারের কাছ থেকে তখন আমরা দু-হাত ভরে পেয়েছি। আয়োজনও কিছু কম ছিল না সেখানে। ছিল কলকাতা *ক খ*, *বিবিধ ভারতী* আর তাদের সম্মিলিত প্রতিযোগী রেডিয়ো সিলোনের *বিনাকা গীতমালা*। কলকাতা *ক*-এর জয়ন্ত চৌধুরী বা ইন্দিরাদি, মিউজিক্যাল ব্যান্ডবক্সের বি. কে তথা বরুণ হালদার আর *বিনাকা গীতমালার* আমিন সায়ানী—স্বাভাবিক সম্প্রচারের পাঠ তো এঁদের কাছ থেকেই নেওয়া। এঁদের ভুলতে পারা গেছে কি? আজকের সফল রেডিয়ো-জকিরা কি এইসব মহীরুহদের ছায়ায় লালিত নন?—এখন যে বেতারে এবং পর্দায় অনর্গল, অনায়াস, শব্দতরঙ্গে শ্রোতাদের ভাসানো, কাঁপানো, আছড়ানো হয় চব্বিশঘণ্টা—তা সেদিনও ছিল, আজও আছে। কিন্তু তখন প্রসঙ্গ শুধুই 'তরল' এবং ভঙ্গি কেবলমাত্র 'চটুল' ছিল না। আমাদের বালিকা বয়সে জয়ন্তদা বিকেলবেলা তাঁর কণ্ঠের একটি নিরাভরণ মাদকতা দিয়ে

খেলাপাগল ছেলেমেয়েগুলোকে রেডিয়ো সেটের পাশে জড়ো করে ফেলতেন কোন মন্ত্রবলে কে জানে? ইন্দিরাদিকে না দেখতে পেলেও তাঁর গলায় মা-মা গন্ধ পাওয়া যেত। আর বি. কে? তিনি আমাদের সকলের T.D.H. (Tall dark handsome) ছিলেন শুধুমাত্র কণ্ঠস্বরের কারণে। ভালো চায়ের সুগন্ধের মতো ছিল তাঁর সফিস্টিকেশন। তখনকার পরিভাষায় "অ্যাফেক্টেড" বাচনভঙ্গি ছিল পরিশীলনের মোড়কে অনায়াস কথোপকথনের দৃষ্টান্ত। এঁদের পরে-পরেই আরো একজনের কথা না বললে অন্যায় হবে। তিনি আমাদের সমসাময়িক শ্রাবন্তী মজুমদার। সেই সময় তিনি বিজ্ঞাপনী অনুষ্ঠানে যে স্বরভঙ্গির জন্য TRP-সফল হয়েও বিতর্কিত ছিলেন, আজ আরও অতিমাত্রায় সেই ভঙ্গি-সর্বস্বতার জন্যই সঞ্চালক/সঞ্চালিকা পূজিত হচ্ছেন।

আসল সমস্যা আমার মতে কিন্তু এই 'বিবিধ সর্বস্বতা'। কেউ কণ্ঠ, কেউ পোশাক কেউ বা অনুকরণ। চ্যানেলের কর্তারাও ইদানীং 'তারল্য সর্বস্বতা'য় আক্রান্ত। অনেক সময়ে "দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে"— রবীন্দ্রসংগীতটির সঙ্গে সঞ্চালক চোখে হাত দিয়ে দূরে তাকানোর মুদ্রা করেন। এই 'সর্বস্বতা'র ভাইরাসের ফলে স্মরণ-অনুষ্ঠানে সাজ-সজ্জার বাহুল্য ঘটে, ধ্রুপদি অনুষ্ঠানে পোশাকের উগ্রতা দেখা যায়। ছোটো পর্দায় বিশেষ করে সঞ্চালিকাদের পোশাক-আশাক নিয়ে একটা SMS Poll করা যেতেই পারে। শুনতে পাই Male Viewership বাড়ানোর জন্যই নাকি এই আয়োজন। কখনো-বা খেলার মাঠের অনুষ্ঠানে আঁটোসাঁটো টি-শার্ট পরে সঞ্চালিকা পর্দায় আসেন। তাঁরা কিন্তু এ-সব খুব স্বাভাবিকভাবেই জড়তামুক্ত হয়ে করেন। তাঁদের বিষয় এবং ভঙ্গির মধ্যে চটুলতার ছাপ স্পষ্ট, যুগ বা হুজুগ বলে আমরা তা মেনেও নিই। মনে প্রশ্ন আসে এই তারল্যের বাড়াবাড়িই কি শেষ কথা?

ক'দিন আগে কোনো একটি চ্যানেলে সমকামিতা সম্পর্কে একটি অত্যন্ত সাহসী, সময়োচিত আলোচনা সম্প্রচার করা হচ্ছিল। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বিজ্ঞাপনী ভাষায় সেক্স সিম্বল পূজা বেদী। পোশাক সম্পর্কে তাঁর কোনোরকম রাখ ঢাক না থাকা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানটি বিষয়ের গভীরতায়, পর্যালোচনার মুনশিয়ানায় একটি অনুভবী স্তরে পৌঁছে যাচ্ছিল,

সমাজের একটি বাস্তব দিক সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ঋদ্ধ হচ্ছিলাম, সঞ্চালিকার আবেদনই একমাত্র ও অমোঘ হয়ে উঠছিল না। প্রতিটি কথোপকথনে তাঁর সঠিক প্রতিক্রিয়া, শরীরী-ভাষা, মুখের অভিব্যক্তি, স্বরমাত্রার ব্যবহার কখনো একে অন্যকে ছেড়ে বা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল না। সমকামিতা সম্পর্কে প্রচলিত লঘুতার ধারও না মাড়িয়ে তিনি ক্রমশ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মানুষজনের স্বজন হয়ে উঠছিলেন। এই স্বজন হয়ে ওঠাটাই আমার মতে মোক্ষ। মহালয়ার সকালে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয় এই হয়ে ওঠার জন্যই আজ আমাদের বাঙালিয়ানার, সমাজ-জীবনের শরিক হয়ে উঠেছেন। কালের সাধ্য কী তাঁকে দূরে সরায়?—আবার এই না হতে পারার জন্যই অনেক অনুষ্ঠান আমাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। অতিকথনের আড়ম্বরে সত্য-মিথ্যার প্রভেদ করতে শিখেছি আমরা। শুধুমাত্র স্বরের একটি বিশেষ অংশের প্রক্ষেপণে 'ছোট্ট সোনা বন্ধুরা ভাই, কেমন আছ-সব' বললেই যে তা আন্তরিক শোনাবে এমন গ্যারাণ্টি নেই, যদি না তাতে সত্যি স্নেহের পরশ মেশে। বেতারে অনেক ভালো জিনিসের সঙ্গে কৃত্রিম কণ্ঠে, আবেগসর্বস্বভাবে রবীন্দ্রনাথের *ছিন্নপত্র* আর কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থার ত্রুটির সমালোচনা একই স্বরক্ষেপণে শোনার দুর্ভাগ্য আমাদের বহুবার হয়েছে। অনেক বছর আগে যখন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রয়াত হলেন, তখন মনে পড়ে কলকাতা 'ক'-এর *পল্লিমঙ্গল* আসরে বলা হয়েছিল: 'এ যেন হিমালয়ের চূড়া নড়ে উঠল।' অতিকথনের কারণে এই আলোচনায় সেদিন শোক অনুভবও করিনি—অস্বাভাবিক আর স্বাভাবিকের হিসেব কষেছি মনে মনে। এই অতিকথন দোষও সঞ্চালনার আরেকটি বড়ো ফাঁক। মাঝে মাঝে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মঞ্চে বা দর্শক আসনে বসে মনে হয়, সংবর্ধিত ব্যক্তিটি জীবিত তো? যেভাবে আবেগ-তাড়িত বিশেষণে, শুধুই ভালো ভালো, ভারী ভারী শব্দে মঞ্চ 'ধন্য' এবং 'আলোকিত' হয়—তাতে একধরনের অস্বস্তিই শুধু নয়, অসহিষ্ণুতাও তৈরি হয় মনের মধ্যে। এরই পাশাপাশি আছে দ্রুত, অতি দ্রুত ভঙ্গিতে 'ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রাম' শব্দে "Hi Folks—welcome to this চমোত্কার সন্ধ্যায় for listening (হঠাৎ বেমক্কা উঁচু পর্দায়) Music—Music and only Music— গান শুধু গান—ইয়ে ফরমাস, আপ সবকো

লিয়ে—আপনাদের সবার জন্য—Yes, for you all"—তখন শঙ্খ ঘোষের মতো 'এ কলকাতার মাঝে আছে আরেকটা কলকাতা' মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভাবতে হয়, তাহলে এই শতকের কথ্য ভাষায় মানটা ঠিক কোথায়? প্রকাশভঙ্গি কোনটি সঠিক?—ভাবগম্ভীর স্তবগাথা—না গাম্ভীর্য খান্‌খান করা শব্দরাজি।

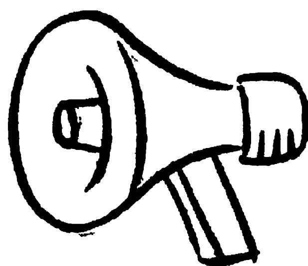
তৎসম শব্দে-ভরা বঙ্কিমি বাংলা কথ্যভাষায় যেমন অচল, তেমনই 'আমার মা সব জানে'-র মতো সমস্ত ভাষা জগা-খিচুড়িও বিরক্তিকর। যুগের হাওয়ায় ভেসে না গিয়ে আমি কোন্ পথ নেব? কোনো রসদ ছাড়াই পুরুষ দর্শক সংখ্যা বাড়াবার জন্য উন্মুক্ত হাত-পা নাড়াব, না কি সর্বার্থে তরলীকরণের পথে না গিয়ে কথায়, প্রকাশে শব্দচয়নে আরো একটু মনোযোগী হব?

আসলে এখন স্বাভাবিকতা বোধহয় ফাস্ট, ফাস্ট এবং ফাস্ট। এই গতিই বোধহয় চালিকা শক্তি। সবাই দৌড়োচ্ছি। বিবিধ চ্যালেঞ্জ চারপাশে। বেসরকারি চ্যানেলে সবসময় পাঞ্জা কষা, কে-কাকে ফেলে দেবে? সরকারি চ্যানেল একটু আধটু মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করলেও সেখানে নিয়মকানুন সর্বনেশে। তাঁরা ঐতিহ্যের স্ফীত ধ্বজাধারী। ফলে 'খাচ্ছি কিন্তু গিলছি না' স্টাইলে এফ. এম এবং ছোটো পর্দার সঞ্চালকেরা গপ্ গপ্ করে খাওয়াচ্ছেন শ্রোতা-দর্শকদের। এইসব এফ. এম এবং ছোটো পর্দার সঞ্চালক, মীর, জিমি, রাকেশ-প্রজ্ঞা, কাঞ্চন, রিমঝিমের জনপ্রিয়তা আমাদের কালের মানুষদের চেয়ে কম কিন্তু নয়,—এবং কাজের দায়িত্ব, তা তরলীকরণের হলেও মোটেই সামান্য নয়। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক একটা ঘোষণার কথা মনে পড়ছে। সংবাদপত্রেই সম্ভবত দেখলুম, চলতি ট্রেনেও এবার এফ. এম. সঙ্গ দেবে। নির্জনতার, নৈঃশব্দ্যের অধিকার কি তাহলে নেই? প্রতিবাদী মন বলছে, ট্রেনে আবার নৈঃশব্দ্য? 'এ যে সোনার পাথর বাটি'। ঠিকই। কিন্তু এমন তো হতেই পারে, ট্রেনে তখন কোনো পরীক্ষার্থী আছে, যারা সেই সময় শেষ মুহূর্তে পড়াটা একটু ঝালিয়ে নিতে চাইছে। অথবা যদি ট্রেনের ভেতরে থাকেন কোনো অসুস্থ মানুষ? যাঁর কিঞ্চিৎ ঘুমের প্রয়োজন? এমনিতেই উচ্চগ্রামে মোবাইল-এ বাক বিনিময়ে মানুষের ব্যক্তিগত বলে আজ আর কিছুই নেই—তারপর আবার এফ. এম-এর কলতান সংযোজিত হলে সবার কেমন লাগবে?

মোদ্দা কথা, এখন সময় বড়ো অল্প, আয়োজন অ-নে-ক। কোয়ালিটি আর কোয়ান্টিটির মারামারিতে কিছু রস-বিকৃতির পীড়া সইতেই হবে। সঞ্চালক খেলার মাঠের সেলিব্রেটিকে জিজ্ঞেস করবেন—'কোন কোন ক্যাপ্টেনের নীচে আপনি খেলছেন?'—ভুল নেই under এর বাংলা তো 'নীচে'ই। এফ. এম-এ misunderstanding -এর বঙ্গানুবাদ 'মেয়েটি নীচে দাঁড়িয়ে আছে'—এ জাতীয় jokes নতুন কিছু নয়। বিষয়ের নাম যদি হয় ফুলুরির নানারকম নাম—কিম্বা মহিলাদের অনুষ্ঠান—'আস্তে, লেডিজ'—তা'হলেও ভ্রূ-কুঞ্চনের কিছু নেই। *পরমা, মানবী, নারী*-র চেয়ে তো নিঃসন্দেহে চেনা শব্দ। কে না জানে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্যই সম্প্রচারের এই দিক্‌গুলির এত আয়োজন। নিত্যদিন SMS-এ ur লিখে যে অভ্যস্ত সে your বানানটি ভুল ভাবতেই পারে। আর ইনিয়ে বিনিয়ে অপ্রচলিত বাংলায়, কৃত্রিম ভঙ্গিতে অনুষ্ঠান শোনা তো সত্যিই শ্রমসাধ্য। কাজেই মিনিটে ১২৫ থেকে ১৪০টি শব্দ অন্যের বোধগম্য করে অর্থপূর্ণভাবে বলতে হবে। বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে ভালোভাবে। আলপিন থেকে হাতি নিয়ে সরস আলোচনায় মাতাতে হবে জনমন। তখন 'ঘন' ডাল ফুরিয়ে গেলে জল মেশাতেই হবে, গরম বা ঠান্ডা। ইতিহাসে 'দেখনদারি'র দিনকালে এই সময়টা তার নিজস্ব ভাষা, ভঙ্গি, আলাপচারিতায় একটা অন্যরকম সময় বলেই চিহ্নিত থাকবে।

পরিশেষে বলি, এ সব সত্ত্বেও, চ্যানেলগুলির লড়াইয়ের মঞ্চের বাইরে যে সিংহদুয়ারটা আছে, যেখানে যে যার মাতৃভাষা নিয়ে স্বমহিমায় আসীন—সেই মাতৃভাষা বাংলা, হিন্দি, উর্দু যাই হোক্ না কেন, সেখানে তা অবিকৃত রাখার দায় যে সকলেরই এ কথা ভুললে চলবে না। বিষয় ভাষা যতই জল মিশিয়ে তরল করি না কেন, গভীর কথা গভীর স্বরেই বলতে হবে। তা না হলে একদিন মনে হবে, Wordsworth এর উদ্ধৃতি দিয়েই বলি : Poetry is a language spoken by men in a state of vivid sensation. এই vivid sensation টাই মরে গেছে। কারণ জীবনটা তো রেডিয়ো-জকি, টিভি-অ্যাঙ্কার, সঞ্চালক, উপস্থাপক হওয়ার পরও জীবনের জন্যই থাকবে—আজীবন ও সর্বজনীন।

লেখক বাচিক শিল্পী, শ্রুতিনাটক ও মঞ্চের অভিনেত্রী



মাইক্রোফোনের আড়ালে

নৃপেন্দ্র মজুমদার

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ,

মাঝে মাঝে আপনারা আমার কথা শুনতে চান এটা আমার সৌভাগ্য। কথা বলবার আর্ট আমি জানি না এবং জীবনের অধিকাংশ সময় অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে জড়িত থাকাতে কী করে কথা বলে সকলকে মুগ্ধ করতে হয় তাও শিক্ষা করিনি। আমার এ ত্রুটি আমি স্বীকার করতে মোটেই লজ্জিত নই, কারণ অক্ষমতাকে ওপর-চালাকি দিয়ে ঢাকতে গিয়ে নিজের অন্তর্নিহিত দৌর্বল্যকেই প্রকাশ করে দেওয়া হয়।

যাই হোক তবু কথা বলতে হবে। কথা নিয়েই আমাদের কারবার, এবং আপনাদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা কথার মধ্য দিয়েই। আজ দীর্ঘ চার বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল বেতার ভারতের নরনারীকে আনন্দ বিতরণ করে আসছে। সে যদি তার প্রাণ দিয়েও এক দিনের তরেও আপনাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে থাকে

তা হলেই সে নিজেকে সার্থক বিবেচনা করবে। এর মধ্যে কত দোষ ত্রুটি হয়ে গেছে, কত অমার্জনীয় অপরাধ ঘটে গেছে তা আপনারা অনেকেই সহানুভূতি দেখিয়ে ক্ষমা করেছেন সে কথা আমরা আজও ভুলিনি, কখনও ভুলবোও না।

কিন্তু আমাদের এই যে দোষ ত্রুটি ঘটে—কেন ঘটে যায় তার মূল, সেই সব কথা নিয়ে সামান্য কিছু আজ আলোচনা করতে এসেছি। অবশ্য বিশদভাবে প্রকাশ্যে সব কিছু বলা চলে না—কেন চলে না সেটা আপনারা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আপনাদের কাছে এইগুলো আমরা বলছি এইজন্যে যে খানিকটা আমরা এর দ্বারা হাল্কা হব এবং সুবিচারের প্রত্যাশাও আমরা অনেকের কাছ থেকে হয়তো করতে পারি।

আমরা চিরকালই ব'লে আসছি যে যদি গঠনমূলক সমালোচনা কেউ করে পাঠান তা হলে আমরা তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সে-রকম সমালোচনা আমরা আজ পর্যন্ত দুটি তিনটির বেশি পাইনি এবং যাঁরাই আমাদের সদ্‌যুক্তি দিয়েছেন তা বিনা দ্বিধায় আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা চাই সকলে আমাদের বন্ধুভাবে পরামর্শ দিন, কিন্তু এ আবেদন কত সময় নিষ্ফল হয়ে গেছে। অকারণ অনেকের কাছ হতে নিন্দা, বিদ্রূপ, নিষ্ঠুর আঘাত বারবার আমরা পেয়েছি যা আমাদের নিতান্ত অসহায়ের মতোই সহ্য করতে হয়েছে। তার প্রত্যুত্তর দেবার মতো শক্তি আমাদের ছিল না, যেন ভগবান আমাদের কখনও তা না দেন আমরা যেন তারি মধ্যে থেকে যাত্রার আশীর্বাদ খুঁজে নিতে পারি—এইটুকুই চিরকাল ওপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করে এসেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা'ও বলব যে আপনাদের অজস্র আশীর্বাদ ও সহানুভূতি না পেলে আজ বেতার-শিশু তার সূতিকাগারেই প্রাণ পরিত্যাগ করত।

আজ সারা ভারতবর্ষের বুকের ওপর দিয়ে যে ঝড়ের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে সে হাওয়ার সংঘাতে বেতার প্রতিষ্ঠানের চূর্ণ বিচূর্ণিত হয়ে যাবার কথা কিন্তু আপনাদের দরদি প্রাণের স্পর্শে সে শুধু বেঁচে নেই তার মধ্যে শক্তির সঞ্চার হচ্ছে। মানুষের প্রথম প্রয়োজন শিক্ষা, সে শিক্ষা-বিধানের অনেক উপায়, অনেক পথ আছে, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে একাধারে আনন্দ ও শিক্ষার ব্যবস্থা মাত্র সাহিত্য ও বেতার ছাড়া আর কোথাও নেই। সাহিত্য আবার শিক্ষিত লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু বেতার শিক্ষিত, অশিক্ষিত,

ধনী, নির্ধন সকলেরই আনন্দ বিধায়ক। অসীমের বুকে বেতারের ঢেউ উঠে চলেছে সীমাহীন প্রদেশের অসংখ্য মানবকে অজস্র আনন্দধারায় অভিষিক্ত করতে। যে আনন্দ ভোগ করতে কারুর বাধা নেই, বোঝবার কষ্ট নেই, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা দ্বিপ্রহর সে আনন্দময়ীর আরতি করে চলেছে। আপনারা সেই বোধন আরতির শঙ্খ বাজিয়ে চলুন এইটুকুই আমাদের বার বার অনুরোধ। হয়তো পূজার উপচারে ডালি সাজাতে গিয়ে দু' একটি ফুলের অভাব ঘটেছে আপনারা শুধু আদেশ করুন, কী সে ফুল যা আমাদের চয়ন করে আনতে হবে।

বেতারের অভিজ্ঞতা আমাদের এই প্রথম। হাতে খড়ি যার হল তার নিজেকে যদি প্রথমভাগ তৈরি করে নিয়ে পড়তে হয় তা হলে যে দুরূহ ক্লেশ সহ্য করতে হয়, তা আমাদের সহ্য করতে হচ্ছে। শুধু তাই নয় তার ওপরে অসংখ্য শিক্ষকের রোষকষায়িত নেত্র ও উদ্যত বেত্র চোখের সামনে ভেসে উঠছে—অথচ প্রথম ভাগটি যে কী জিনিস তা তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই অভিজ্ঞতা নেই; তবু আমাদের মানতে হবে—না মানলে কঠোর শাস্তির নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা এড়িয়ে যাবার কোনো পথ আমাদের নেই।

আজ আমরা আমাদের শাস্তিদাতাদের প্রতি শুধু এই আবেদনটুকু করছি যে কী আপনারা চান স্পষ্ট বলুন। কীভাবে আমরা চলব তার পথ-নির্দেশ করে দিন। আমরা তো চলেছি—যতটুকু ক্ষমতা তা তো করছি—এর বেশি যদি কিছু করা সম্ভবপর হয় তা কীভাবে হতে পারে—তাই প্রকাশ করে বলুন এইটুকু আমাদের অনুরোধ! ত্রুটি কি নেই?—নিশ্চয় আছে। কিন্তু ত্রুটি সংশোধন করবার চেষ্টা কি আমরা করতে নারাজ মনে করেন? আপনারা কীসে সন্তুষ্ট হবেন—কীসে আপনারা খুশি হবেন তাই সাধন করবার ব্রত যে আমাদের! সে ব্রত সাধনের জন্য আমাদের এতটা অবহেলা বা কার্পণ্য নেই নিশ্চয় জানবেন।

মাইক্রোফোনের আড়ালে আমার সমস্ত সহকারী এ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ যে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তা হয়তো আপনারা জানেন না। বেতারকে যদি তাঁরা ভালো না বাসতেন তা হলে তাঁদের এই দুঃসাধ্য কষ্ট সহ্য করা অসম্ভব হত। আপনারা মাইক্রোফোনের সামনে সেরকম দু-একজনের পরিচয় পেয়েছেনও। অভুক্ত অবস্থায় অতি দূর হতে সকালবেলায় এসে গভীর রাত্রে সমস্ত নগরী যখন সুপ্ত হয়ে গেছে তখন তাঁরা বাড়ি

ফিরেছেন—এমনি একদিন নয়, বহুদিন। তবু বার বার তাঁদের কণ্ঠ আপনাদের অভিবাদন জানিয়েছে, আপনাদের আনন্দবিধানের জন্য হাসিমুখে তারা শারীরিক সমস্ত ক্লেশ অগ্রাহ্য করেছেন—কিন্তু যদি জানতেন কী অমানুষিক পরিশ্রম তাঁরা করেন—তাঁদের হাসির অন্তরালে নীরবে কী অজস্র অশ্রুর ধারা বয়ে যাচ্ছে, তা হলে হয়তো অনেকেই তাঁদের আঘাত করতে একটু কুণ্ঠিত হতেন।

অনেকে হয়তো বলবেন তাদের খাটুনি কমাও না কেন? তাদের চেয়ে ভালো লোকই বা আন না কেন? লোক বৃদ্ধিই বা করনা কেন? এর উত্তরে শুধুমাত্র আর একটা প্রশ্নই জেগে ওঠে যে কোথায় তেমন লাইসেন্সের অর্থ, যার দ্বারা এ সমস্ত হওয়া সম্ভবপর? আর কোথায় বা সেরকম দরদি উপযুক্ত কর্মী যারা বছরের পর বছর নিজের জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয় করে, সংসারের অনেক কিছু আনন্দ থেকে নিজেদের নির্বাসিত করে এর জন্যে ছুটে আসবেন—এই কটি তুচ্ছ টাকার মোহে?

খুঁজেছি—পাইনি! এঁদের চেয়ে বহু নামজাদা লোককে আমন্ত্রণ করে এনেছি, বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে যা পেলে এঁরা হয়তো আরো উৎসাহিত হয়ে উঠতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনারাই তাঁদের চাননি এবং এঁদের চেয়ে সকল-কিছু-বেশি সম্পদের অধিকারী হয়েও তাঁরা সে রকম দরদ দিয়ে বেতারকে ভালোবেসে কাজ করেননি।

দিনের পর দিন কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতা বাড়ছে। আগের দোষ-ত্রুটি থেকে দিনে দিনে আমরা মুক্ত হচ্ছি। আবার বেড়ে উঠছে কাজ—আবার তারই পাশাপাশি অন্যান্য ত্রুটিও পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

আপনারা হয়তো ভাবছেন নিজেদের সুখ্যাতি করতে আমরা পঞ্চমুখ এবং আপনাদের চোখে ধুলো দিয়ে যা হয় কিছু বুঝিয়ে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তা নয়। আমি যে কথাগুলো বলছি তার প্রত্যেকটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

তারপর প্রোগ্রাম সম্বন্ধে। গ্রামোফোন নিয়েই রেকর্ড আরম্ভ করি। অনেকে বলেন যে, গ্রামোফোন সবই মশাই সেই থোড় বড়ি খাড়া—কিন্তু আপনাদেরই জিজ্ঞাসা করি আজ প্রায় চার বৎসর যেখানে প্রত্যহই আধ ঘণ্টা তিনকোয়ার্টার করে রেকর্ড চলেছে সেখানে আর কত রেকর্ড দিতে পারা যায়। আজ পর্যন্ত কত রেকর্ডই বা গ্রামোফোন কোম্পানি তুলেছেন? তাঁদের

যত রেকর্ড আছে এমনকী বহু পুরনো রেকর্ড যা কেউ কখনও শোনেননি তাও সংগ্রহ করে আমরা শুনিয়েছি কিন্তু কিছুতেই এই একঘেয়েমিকে আমরা দূর করতে পারলাম না। গ্রামোফোন রেকর্ডে তাই আপনাদের বার বার একই গান বহুবার শুনতে হয়েছে।

এরপর গানের কথা। গান বাংলায় খুব কম এবং গাইয়েদের সহস্রবার অনুরোধ করলেও তাঁরা এই কথা বলেন যে একটা লোক কত গান নিত্য নতুন শোনাতে পারে বলুন—কত নতুন সুরই বা আছে। বাস্তবিক তাঁরা যা বলেন তা ভেবে দেখলে অন্যায় নয়। নিত্য নতুন সুর ও গান সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য, তবু তাঁরা নিজের সুনামের জন্যও নতুন গান শেখবার জন্যে খুবই চেষ্টা করছেন; এবং আমরা অবিরত চেষ্টা করছি নানান উপায়ে যাতে তাঁরা নতুন গান পান ও নতুন গান আপনাদের শোনাতে পারেন। অনেকে বলেন, অ্যামেচার আর্টিস্ট আনাও! অ্যামেচার আর্টিস্ট যদিও এখানে অনেক আছেন কিন্তু অনেক আনাই একটু মুশকিল কারণ সৌখিন ভালো গায়ক-গায়িকা বাংলাদেশে যা আছেন তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং তাঁদের মধ্যে অনেককেই এখানে আপনারা দেখতে পান। তা' ছাড়া যাঁরা আসেন অধিকাংশ সময়ে দেখা যায় যে, সত্যিকারের গান শিক্ষা অনেকেই করেননি অথচ বেতারে গান গাইবার জন্য চেষ্টা করছেন বেশি। বাধ্য হয়ে তাঁদের আমরা বিমুখ করেছি এবং এঁর ফলে তাঁরা এবং তাঁদের আত্মীয় স্বজন হয়তো অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়ে আমাদের ওপর রুষ্ট হয়েছেন কিন্তু এখানেও ওই প্রশ্ন—"কী করব?"—তাঁরাই বলুন। সৌখিন আর্টিস্টদের বিমুখ করায় আমাদের বরং লোকসান কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তা করি কেন?—এই কারণে। নিজেদের চেনা-লোককে, আত্মীয়-স্বজনকে হয়তো কেরানিগিরির চাকরি দেওয়া যায় কিন্তু আর্টিস্টরূপে সাধারণের সামনে প্রকাশ করে বেশিদিন রাখা চলে না। তবে একটা কথা আপনারা বলতে পারেন যে আমাদের সব আর্টিস্টই কি খুব উঁচুদরের গাইয়ে বাজিয়ে?—তা নয় এবং সেটা কখনও কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে না। শ্রেণিবিভাগ সব জায়গাতেই হয়ে থাকে এবং আমাদের এখানেও তা যে হয় না এমন কথা বলিনা। কিন্তু তত্রাচ এটা জানবেন যে ভালো আর্টিস্টদের বাছাই করবার চেষ্টা আমরা ওরই মধ্যে যথাসাধ্য করে থাকি।

তারপর প্রোগ্রামে নাম থাকা সত্ত্বেও আর্টিস্টদের অনুপস্থিতি। এর কোনো প্রতিকার আমরা আজও করতে পারলাম না। এক করা যেতে পারে—বারবার অনুপস্থিত হলে তাঁদের বিদায় দেওয়া। কিন্তু আর্টিস্ট হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়লো, কিম্বা কোনো দুর্ঘটনায় আসতে পারলো না—সে ক্ষেত্রে কী করি? তুচ্ছ কারণে তাদের চট করে বিদায় দেওয়াও চলে না। তত্রাচ যথেষ্ট কঠোরতা আমাদের অবলম্বন করতে হয়েছে এবং আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি যাতে সমস্ত শিল্পীরা যথাসময়ে এসে হাজির হন।

সময় নেওয়া কেন হয় তা আপনারা জানেন। একজন আর্টিস্ট আসবেন আর একজন স্টুডিয়োর বাইরে যাবেন এবং প্রত্যেকে তবলার সঙ্গে সুর ঠিক করে নেবেন এর জন্য সময় নেওয়া দরকার। বাজাতে বাজাতে তবলা নেমে পড়ে তাও আপনাদের অবিদিত নেই, সে সমস্ত ঠিক করতেই সময় নেওয়া হয়। যাঁরা ভালো গায়ক গায়িকা তাঁরা তবু একটু চটপট সুর ঠিক করে নেন কিন্তু অধিকাংশেরই তবলা ও হারমোনিয়াম ধাতে আনতে আনতে আমাদের পর্যন্ত তাঁরা কাহিল করে ফেলেন।

এরপর অভিনয়ের কথা, বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা ছেড়েই দিলাম—বছরে বাহাত্তরটি অভিনয় আয়োজন করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তা যাঁদের অভিনয় সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে তাঁরা বুঝতে পারবেন। রঙ্গমঞ্চেরই মতো মাত্র পোশাক-আশাক ও দৃশ্যপট ছাড়া সব কিছুরই মহলার প্রয়োজন এবং প্রতি সপ্তাহে নিত্য নূতন আয়োজন করা যে কি কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা আমরা বুঝতে পারি। মাঝে মাঝে বাংলা রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্‌দেরও আমরা এখানে আহ্বান করে আনি, কিন্তু এ সমস্ত করতে গেলে প্রচুর অর্থের দরকার, যা বর্তমান সময়ে নিয়মিত ভাবে ব্যয় করবার সামর্থ্য আমাদের নেই।

বাংলাদেশের গুণী সমাজের বহু শিক্ষিত সজ্জনকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি যে তাঁরা অনেকেই অর্থ না নিয়ে কেউ সামান্য অর্থ নিয়ে তাঁদের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে মাঝে-মাঝে আমাদের অনেক-কিছু দিয়ে যান। এজন্য বেতার প্রতিষ্ঠান চিরকালই তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

মহিলা মজলিশ ও ছোটোদের বৈঠক সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই এর সমস্ত ভার আপনাদের ওপর। আপনাদের সঙ্গে এ দুটি বিভাগের আত্মীয়তা সকলের চেয়ে বেশি।

আজ অনেক কথা উচ্ছ্বাসের মুখে বলে ফেলেছি। যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে আমি বিশ্বাস করি আপনাদের কাছে সেজন্য ক্ষমা চাইবার আমার অধিকার আছে। কারণ আমি জানি এ অধিকারের দাবি আপনারা নিজেরাই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

আর বেশি বলে আপনাদের সহনশক্তির ওপর অত্যাচার আমি করব না। আমি শুধু এইটুকু বলে যাই যে বেতারকে উন্নত করবার জন্য আপনারা চেষ্টা করুন ও আমাদের সাহায্য করুন। আশীর্বাদ করুন যেন জয়ী হই।

শব্দের সাহায্যে মানুষের নিঃশব্দ অন্তরের প্রীতি ও সহানুভূতি যেন আমরা পাই এইটুকুই আমার চিরন্তন কামনা!

লেখক ছিলেন বেতার জগৎ পত্রিকার সূচনা-যুগের সম্পাদক। ক্ল্যারিওনেট-শিল্পী। বেতারে সম্প্রচারিত এই কথিকাটি লেখক সম্পাদিত বেতার জগৎ-এ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩১ সালের ১৯ জুন তারিখে, ২য় বর্ষ ২০ সংখ্যায়



বেতারের পুরোনো কথা

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

আজকের দিনে ছেলেমেয়েদের কাছে বেতারের প্রোগ্রাম শোনা বা বেতারে প্রোগ্রাম করার মধ্যে আর কোনো অভিনবত্ব নেই। কিন্তু বছর উনত্রিশ আগে কলকাতার বেতার স্টেশন এক বিচিত্রলোক বলে পরিগণিত হত। এর তখন বাইরের সাজসজ্জা কিছু ছিল না বটে, কিন্তু ভেতরটায় সাজের খুব বাহার ছিল। এর ইতিহাস অভিনব, এর অভিজ্ঞতাও সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। সমস্ত কাহিনি বলতে গেলে একটি ইতিহাস বলতে হয়, সেকথা থাক, দু'চারটে পুরোনো দিনের ছোটোখাটো কাহিনি বলি।

নীচে ছিল কোনো এক বিলিতি ব্যাবসায়ীদের অফিস— দোতলা ও তেতলায় আমাদের বেতার অফিস ও স্টুডিয়ো। অফিসটা বেশ নির্জনই থাকতো—কারণ প্রথম প্রথম চট করে কেউ ওখানে ঢুকতে সাহস করত না। চতুর্দিকে বড়ো বড়ো বোর্ড আঁটা— 'সাইলেন্স' ! বাইরের লোকেরা ভাবত বেতার অফিসের লোকেদের

চেয়ে ভালো অবস্থায় বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেউ নেই। নৃত্যগীতাদি এদের নিত্যসঙ্গী। বেতারের বর্তমান স্টুডিয়ো ও প্রোগ্রাম অফিসের সেদিনকার রূপের সঙ্গে আজকের রূপ মেলে না। সব বদলে গেছে। তবে এটা ঠিক, এখন অতি-পরিচয়ে রহস্যালোকের বিস্ময়ের রোমাঞ্চ অনেকটা কেটে গেছে। তখন অফিসের বাঙালি কর্মীর সংখ্যা বোধ হয়, সবশুদ্ধ অফিসার কেরানি, ইঞ্জিনিয়ার মিলিয়ে জন আট দশের বেশি নয়—বাকি টাইপিস্ট কেরানি, অফিসার, টেলিফোন ক্লার্ক সবই ইউরোপিয়ান ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ান।

ঘড়ির মতো কাজ চলে—প্রত্যহ নতুন নতুন প্রোগ্রাম কীভাবে হয় তার জন্য আমরা মাথা ঘামাই। শ্রোতার সংখ্যা বোধ হয় সবশুদ্ধ গুটি পঞ্চাশ—হেডফোন কানে দিয়ে লোকে বেতারের প্রোগ্রাম শোনে—দু একটি লাউড স্পিকার তখন বাজারে আসতে শুরু হয়েছে। আজকে লোকে বড়ো বড়ো গাইয়ে বাজিয়ের গান হলেও সেট্ বন্ধ করে দেয়, সকালে আমরা একটু কাশলে আনন্দের সাড়া পড়ে যেত শ্রোতৃমহলে। কত চিঠি যে আসত তার জন্যে অভিনন্দন জানিয়ে 'কী বলব! কাল স্যার গ্রান্ড কাশির আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।' কেউ লিখেছেন 'মহাশয়, মাঝে মাঝে কাশিয়া আনন্দ দান করিবেন।' কেউ লিখেছেন 'মশাই, কাল একজন খুক্ করে কেশেই থেমে গেলেন কেন বুঝতে পারলুম না, আমার ভগ্নীকে কাশিটা শোনবার জন্যে কানে রিসিভার দিলাম। তার পূর্বেই কাশি শেষ হয়ে গেছে।' একজন লিখলেন, 'স্টুডিয়ো হইতে আপনাদের কাশির আওয়াজ শুনিলে তবু মনে হয় যে কয়েকজন জীবন্ত প্রাণী বেতার চালাইতেছেন, নচেৎ মনে হয় সকলেই প্রাণহীন—বেতার, ভূতে পরিচালনা করিতেছে।' বুঝুন তাহলে সেকালে বেতারে কাশির আওয়াজের কি দাম ছিল!

আবার পরবর্তীকালে সেই কাশি প্রায় আমাদের ফাঁসির আসামিও করে তুলেছে। শীতকালে গলা খুস্খুস্ করে অনেকেরই—দু'একজন কেশেও ফেলেছেন, তখন শ্রোতারা মার্ মার্ করে উঠেছেন টেলিফোনে চিঠিতে।

আমরা তখন স্টুডিয়োয় শিল্পী ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দিতুম না—কেউ শিল্পীদের মধ্যে কাশলে ঘোষকরা এমন কট্মটিয়ে তার দিকে তাকাতো যাতে কাশি চাপতে লোকটা গলদঘর্ম হয়ে মারা পড়ে আর কি! রুমাল চেপে, চাদর চেপে লোককে স্টুডিয়োর বাইরে সময় সময় চালান করতে হয়েছে। সে এক কাণ্ড!

আর স্টুডিয়োয় নতুন শিল্পী এলেই ভয়ে তাঁরা আরো কাশতে শুরু করতেন। আজকের শিল্পীরা সে অবস্থার কথা কল্পনা করতে পারবেন না। প্রথম প্রথম দু-একজন গান গাইবেন কি ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপেই অস্থির। স্টুডিয়োর মধ্যে ঢুকে গানের যন্ত্রটি নিয়ে শিল্পী বসলেন—পাশে রইলেন তবলচি, সামনে ঘোষক দাঁড়িয়ে। তখনকার দিনে ঘোষকের জন্যে আলাদা স্টুডিয়ো বা হাতের কাছে ইচ্ছে করলেই প্রোগ্রামটা বন্ধ করার যন্ত্রপাতি ছিল না—একটি স্টুডিয়োতেই সবাই থাকতেন। লাল আলো জ্বললেই গান বা বাজনা শুরু।

একবার একজনকে সহজ সরল সুরে একটি গান গাইতে হবে—ভদ্রলোক বেশ গাইতেনও, স্টুডিয়োতে এসেছেন, ঘোষক আলো জ্বলে উঠতেই তাঁর নাম ঘোষণা করে দিয়েছেন যে অমুক এইবার গাইবেন কিন্তু ভদ্রলোক গান আর গান না—পাথরের মতো বসে আছেন। তাকে যত হাত দিয়ে ইশারা করা হচ্ছে শুরু করুন তিনি ক্রমশ দারুভূত জগন্নাথ মূর্তিতে পরিণত হতে শুরু করেছেন, এক মিনিট সব চুপ! কী ব্যাপার?

মাইক্রোফোন বন্ধ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, 'কী মশাই, আপনি গাইলেন না কেন?' তিনি তখন যেন দম ছেড়ে বলে উঠলেন, 'না মশাই, আমার কে যেন গলা টিপে ধরলে, আমি পারলুম না।' —তখন তাড়াতাড়ি রেকর্ড দিতে হল আমাদের।

একজন সহজ গান গাইতে এসে অবিরত গিট্‌কিরি দিতে লাগলেন—অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষর উচ্চারণ করছেন আর থর্‌থর্ করে গলা কাঁপছে। ভগবৎমূলক গান একেবারে হাসির গানে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

একজন শিল্পী একদিন 'বাঁধ না তরীখানি আমারই নদীকূলে' গাইতে গাইতে হঠাৎ ভিরমি লেগে আমাদের অকূলে ভাসিয়ে একেবারে স্টুডিয়োয় কাত্। তখন তাঁর মাথায় জল দিয়ে হাওয়া করব কি গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাব বুঝতে পারি না।

তারপর আবার অতি স্মার্টদের নিয়েও বিপদ হয়েছে। একজন দশ মিনিট বক্তৃতা দিতে এলেন, তিনি খুব মনের জোর নিয়ে এমন বক্তৃতা পড়তে শুরু করলেন যে একবর্ণ বোঝে কার সাধ্যি? দশ মিনিটের মাল তিন কি সাড়ে তিন মিনিটে খতম। আপিস যাবার সময় ঠিক নাকের সামনে দিয়ে ট্রামখানা বেরিয়ে গেলে যেমন সেটাকে ধরবার জন্যে লোকে আকুলি-বিকুলি করে ছোটে তিনি ঠিক সেই দমে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন।

কীভাবে মাইক্রোফোনের সামনে পড়া দরকার—কেটে কেটে কথা বললে, যথাযথ থামলে তা যে কত ভালো শোনায় তা বহুবার এক একজনকে বলা হয়েছে, কিন্তু অনেকে সেদিনও অভ্যাস ছাড়তে পারেননি আজও পারেন না। আবার এই কেটে কেটে কথা বললে ভালো শোনায় উপদেশ দিতে গিয়ে একসময় মহাবিপদে পড়তে হয়েছিল।

বিপদটা বলি। একবার একজন মাইকেল মধুসূদনের *মেঘনাদ বধ কাব্য* আবৃত্তি করতে এলেন। তাঁকে বারবার আমরা বলে দিলুম, দেখুন মেঘনাদ বধ কাব্য খুব দ্রুত পড়বেন না একটু যাতে লোকে বুঝতে পারে সেই রকম স্পিডে থেমে থেমে পড়বেন বেশ শুনতে লাগবে। তিনি আমাদের উপদেশ শুনে বলে উঠলেন, মশাই, আমাকে আর বলতে হবে না, এরকম পড়ার ডিফেক্ট অনেকের আছে শুনেছি, আমি বেশ স্পষ্ট করে কেটে কেটে বলব দেখবেন।

হ্যাঁ—তারপর কাটলেন বটে। এমনভাবে পড়লেন যে পরে তাঁকে মাইক্রোফোনের সামনে হাজির করানোব দরুন শ্রোতারা আমাদের মাথা কাটেন আর কি! তিনি পড়তে লাগলেন এই ভাবে—সম্মুখ...পাঁচ সেকেন্ড চুপ...সমরে...আবার চুপ...পরি...বীরচূড়ামণি...আবার পাঁচ সেকেন্ড বন্ধ...বীরবাহু...থামা...এইভাবে সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি—বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে' পড়তে তিনি ঠিক মিনিট দেড়েক টাইম নিয়ে আমাদের যমপুরে পাঠানোর বন্দোবস্ত করলেন—প্রাণ যায় আর কি! তোত্‌লারাও অত থেমে থেমে কথা বলে না। অবশ্য তারপর আর তাঁকে বেতারের ত্রি-সীমানায় আসতে দেওয়া হয়নি।

আর একবার এক মহিলা ও তাঁর স্বামী টেলিফোনযোগে বললেন, হ্যাঁ মশাই, মহিলামহল পরিচালনা করেন বিষ্ণুশর্মা, এখানে মহিলাদের বক্তৃতার আয়োজন করা হচ্ছে না কেন? বলা বাহুল্য, মজলিশ সে সময় সত্যিই বিষ্ণুশর্মা চালাতেন। পূর্ণ ছ-বছর তিনি প্রত্যহ এক ঘণ্টা করে ওই বিভাগ চালিয়ে এসেছিলেন। এর কারণ তখনকার দিনে মহিলারা এসব কাজে আজকালকার মতো এগিয়ে আসতে চাইতেন না, তারপর ছ-বছর পরে সত্যি মহিলা পরিচালক পাওয়া যেতে বিষ্ণুশর্মার হাত থেকে মহিলা মজলিশের ভার তুলে নিয়ে তাঁর হাতে দেওয়া হয়। সেই থেকে আজও মহিলারাই এর পুরো ভার নিয়ে আছেন।

যাই হোক, প্রথম বছরেই সেই মহিলা ও তাঁর স্বামী বললেন যে বাইরে যোগ্য মহিলারা রয়েছেন অথচ আপনারা তাঁদের গল্প বলার জন্য বা বক্তৃতা করার জন্য মাইক্রোফোনে সুযোগ দিচ্ছেন না এ কী কথা? তার উত্তরে জানানো হল, আমরা রাজি—কে ভার নেবেন বলুন। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি বললেন—আমি।

তৎক্ষণাৎ তাঁকে বলা হল, বেশ আপনি কাল দুপুরে এসে কোনো গল্প বা কাহিনি মহিলা মজলিশে শুনিয়ে যান—আমরা তারপর আপনাকেই পরিচালনা করতে দেব। তিনি বললেন—আচ্ছা।

তখনকার সময় বক্তৃতা বা গল্প লিখে আনবার জন্য বক্তাদের ওপর চাপ দেওয়া হত না। পূর্বাহ্নে বক্তৃতা পরীক্ষা করবার রেওয়াজও অত ছিল না—এটা অবশ্য মাত্র বক্তাদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য ছিল। অভিনেতা বা গাইয়ে বাজিয়েদের পরীক্ষার নিয়ম বরাবরই ছিল। যাই হোক তিনি গল্প বলতে এলেন, সঙ্গে এলেন তাঁর স্বামী।

জিজ্ঞাসা করা হল কতক্ষণ গল্প বলবেন?

তিনি বললেন, আধঘণ্টা।

মাইক্রোফোনের সামনে তাঁকে বসিয়ে দিলাম, দেখুন লাল আলো জ্বললে আর কোনো কথা কইবেন না। আমি আপনার নামটি ঘোষণা করে দিয়েই, হাত দিয়ে ইশারায় বলতে জানাবো—আপনি তখনি শুরু করবেন।

তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। যথা সময়ে বাতি জ্বলল, তাঁর নাম ঘোষণা করা হল, কিন্তু তিনি আর কথা বলেন না, অবিরত ঢোঁক গিলতে থাকেন। আমি যত ইশারা করি, তিনি তত স্থির নেত্রে আমার দিকে চেয়ে থাকেন।

এক মিনিট কেটে গেল—আমি তখন ঘামছি, বক্তা তখন কাঁদো কাঁদো। হঠাৎ তাঁর স্বর বেরুল—এক রাজা ছিলেন—তার পরেই দেখি ঠোঁট কাঁপছে, চোখে জল টলটল করছে। এ কি রে বাবা, এবার কাঁদতে শুরু করে দেবে নাকি? আমিও সভয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি।

কোর্টপ্যাণ্ট পরিহিত তাঁর স্বামী কখন আমার পাশে এসে দুটো হাত নেড়ে কেবল ঊর্ধ্বদিকে উঠিয়ে উঠিয়ে তাঁকে প্রাণপণে ইশারা করছেন, ওগো বল। ফিস্ ফিস্ করে ও রকম কথা আমার কানে আসতে তার দিকে

আমি বিরক্তিপূর্ণভাবে চেয়ে নিজের মুখে তর্জনী ঠেকিয়ে জানিয়ে দিলুম, চুপ্। তখন ভদ্রমহিলা আর এক ঢোক গিলেই বলে উঠলেন—তাঁর তিন রানি ছিল। আবার চুপ্ চোখ দিয়ে হু হু করে জল পড়ছে।

তাঁর স্বামী দেবতা তখন পেছন থেকে গিয়ে চেয়ারের পাশে বসে সম্ভবত জোর একটা চিমটি কাটলেন তাঁকে চিয়ার্ আপ্ করার উদ্দেশ্যে—ব্যাস্ একেবারে ফোঁপানি কান্না।

তাড়াতাড়ি মাইক্রোফোন বন্ধ করে বক্তা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ঘোষণা করে একখানা রেকর্ড বাজাতে শুরু করলুম। ইতিমধ্যে রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছে, ভাবছি এরপর ওদের দুজনকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব। কিন্তু রেকর্ডটি বাজবার বন্দোবস্ত করার সময় ঘর থেকে তাঁরা চম্পট দিয়েছেন। আমি বাইরে এসে দেখি উভয়ে দুড়্ দুড়্ করে ছুটে পালাচ্ছেন।

সেই থেকে আর অজানা লোকদের বিনা লেখায় মাইক্রোফোনের সামনে বসতেই দেওয়া হত না—আজও হয় না।

এছাড়া অভিনয়ের সময় যে কত কাণ্ড হয়েছে তার কত গল্প বলব। একবার *অশোক* নাটক অভিনয় হচ্ছে। নাটকটি লেখা ক্ষীরোদপ্রসাদের। একটি জায়গায় অশোক ও তাঁর সেনাপতি ধুন্ধুবর কথা কইছেন। ধুন্ধুবর সেজেছেন একজন নতুন অভিনেতা, যথারীতি মহলাও দিয়েছেন তিনি—কিন্তু অভিনয়ের সময় নার্ভাস হয়ে গেলেন। সেনাপতি অশোক আদেশ দিলেন, ধুন্ধুবর, তুমি অবিলম্বে কলিঙ্গে চলে যাও, সেখানে গিয়ে সমস্ত নগর তুমি অবরোধ কর, তারপর আমি গিয়ে কলিঙ্গ ধ্বংস করব।

গম্ভীর রাজকীয় ভঙ্গিতে অশোক আদেশ দিলেন: জায়গাটি বেশ জমেও উঠল কিন্তু এই নতুন অভিনেতা সেটিকে জমজমাট করে দিয়ে গেলেন আরও। অশোকের আদেশের উত্তরে তিনি বলে উঠলেন: 'যথা আজ্ঞা মহারাজ, কলিঙ্গকে আমি অবরোধ করতে চললাম, ধুন্ধুবরের প্রস্থান।'

অশোক নাটকের এই শোকাবহ পরিণতি দেখে সবাই হাস্য সংবরণ করতে পারে না। আমি তাঁকে স্টুডিয়োর বাইরে ডেকে নিয়ে বললুম, আপনার আক্কেলটা কি মশাই, আজেবাজে কথা বললেন কেন?

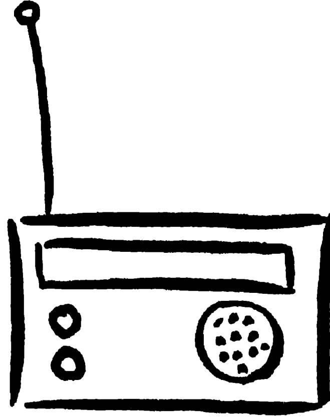
তিনি প্রত্যুত্তরে একটু চটেই বলে উঠলেন, আজেবাজে কি বললুম আবার। যা লেখা আছে তাই তো বলেছি দেখুন না।

দেখলুম ব্র্যাকেটের মধ্যে 'ধুন্ধুবরের প্রস্থান' লেখা রয়েছে। তাঁকে সেইটে দেখিয়ে বললুম, 'এতো আপনাকে চলে যাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি ফট করে না ভেবেচিন্তে 'ধুন্ধুবরের প্রস্থান' বলে সিনটাকে মাটি করে দিলেন!'

তিনি তখন সেইটে দেখে ভুল বুঝতে পারলেন, আর আমাকে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন: কিছু মনে করবেন না স্যার্, ফ্লো-র মুখে ও রকম লেখা থাকলে বেরিয়ে যায়ই।

এ রকম 'ফ্লো' যে কতজন মাঝে মাঝে বইয়েছেন তার ঠিক নেই। এছাড়াও এত মজার কাণ্ড ঘটেছে যে সে-সব কাহিনি আজকের দিনে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কিন্তু তখনকার দিনে নতুন নতুন ভাবে প্রায়শই এরকম ব্যাপার ঘটত।

লেখক ছিলেন আকাশবাণীর স্বর্ণযুগের জনপ্রিয় সম্প্রচারক, অভিনেতা. প্রযোজক এবং নাট্যকার। রচনাটি ১৯৫৬ সালে *বেতার জগৎ*-এর শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল



রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষিতে সম্প্রচারের পরিবর্তমান ভাষা: বাংলাদেশ

মফিদুল হক

বাংলাদেশে সম্প্রচারের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। কেবল বাংলাদেশে নয়, বিশ্বব্যাপী আমরা প্রত্যক্ষ করছি তথ্য বিস্ফোরণ এবং তার এক প্রধান অবলম্বন হয়েছে সম্প্রচার-প্রযুক্তির বিকাশের ধারা। সম্প্রচারের প্রধান দুটি বাহু হিসেবে আমরা দেখি বেতার এবং টেলিভিশনকে, যদিও বলা যায় সম্প্রচারের দেবী ইন্টারনেটের যুগে হয়ে উঠেছেন দশভুজা। অবিভক্ত ভারতের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ অঞ্চল প্রথম বেতার সম্প্রচারের আওতায় আসে এবং পরবর্তীকালে চল্লিশের দশকে পা দেওয়ার পূর্বক্ষণে ঢাকায় বেতারকেন্দ্র চালু হয়। আর ঢাকায় টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৬৪ সালে। এরপর থেকে মূলত প্রযুক্তিগত বিকাশের কারণে বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচারের অনেক বিকাশ সাধিত হয়েছে, সারা দেশ সম্প্রচারের আওতায় এসেছে, নতুন নতুন বেতার ও

টেলিভিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সঙ্গতভাবেই বেতার কেন্দ্রের সংখ্যা বেশি এবং টেলিভিশন কেন্দ্র বেড়েছে কেবল একটি, চট্টগ্রামে, সেটাও ক্ষুদ্রাকারে। তবে রেডিয়োর তুলনায় আরেক দিক দিয়ে টেলিভিশন কেন্দ্রের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে, বেসরকারি স্যাটেলাইট সম্প্রচারের অনুমোদন পেয়ে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাতটি নতুন টেলিভিশন চ্যানেল, আর দেশের বাইরে কেন্দ্র-সম্পন্ন দুটি বাংলা টেলিভিশন চ্যানেল ঢাকাতে তাদের দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় সম্প্রচারের অংশী হয়েছে। সেই বিবেচনায় বেতার এখনও থেকে গেছে সাবেক, সরকার ছাড়া আর কারও এখানে নাক গলাবার অবকাশ নেই। কমিউনিটি রেডিয়োর অনুমোদনদান বিষয়ে বহু বছর ধরে কথাবার্তা চলছে, সরকারও দিচ্ছি-দেব করে যাচ্ছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। এফ-এম তরঙ্গে সংগীত ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচারের অনুমোদন দিয়ে দু-একটি প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে দেওয়া হয়েছে, তবে তারাও নানা বিধিনিষেধে জর্জরিত হয়ে রয়েছে। এই হচ্ছে বাংলাদেশের সম্প্রচার পরিস্থিতির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

উপরোক্ত বাস্তবতার নিরিখে আমরা এখন সম্প্রচারের ব্যাপ্তি ও ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা নিতে পারি। ২০০২ সালে বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম পরিচালিত জাতীয় গণমাধ্যম জরিপ থেকে দেখা যায় রেডিয়ো হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান একটি সম্প্রচার মাধ্যম। জরিপভুক্তদের ৩০ শতাংশ রেডিয়ো শোনেন, যদিও এর মধ্যে মাত্র ১১ শতাংশ নিয়মিত শ্রোতা, তবে তাদের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে বেতার সম্প্রচারের শ্রোতাসংখ্যা কমছে। ১৯৯৫ (৩৬ শতাংশ) থেকে শ্রোতা বেড়েছিল ১৯৯৮ সালে (৩৯ শতাংশ), কিন্তু তার পর থেকে শ্রোতাসংখ্যা হ্রাস পেয়ে চলে এবং ২০০২ সালে ৩০ শতাংশে এসে ঠেকে। হ্রাসের এই প্রবণতার পেছনে নগরায়ণের রয়েছে প্রত্যক্ষ ভূমিকা, ১৯৯৮ সালে নগরে বেতার-শ্রোতার হার ছিল ৪২ শতাংশ এবং ২০০২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৪ শতাংশে।

বেতারের জনপ্রিয় প্রোগ্রামগুলো, জরিপ থেকে যা প্রাপ্ত, শ্রোতৃচাহিদার একটি পরিচয় মেলে ধরে। জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে *ছায়াছবির গান*, এরপর সকাল সাতটার খবর, পল্লিগীতির আসর *বাঁশরী*,

অনুরোধের আসর *নিবেদন*, বাণিজ্যিক কার্যক্রম *দুর্বার*, রাত সাড়ে আটটার খবর এবং নাটক।

এর পাশাপাশি টেলিভিশন সম্প্রচারের ব্যাপ্তি বিবেচনায় নিলে দ্রুত বিকাশের পরিচয় আমরা পাই, জরিপের অন্তর্ভুক্ত জনসমষ্টির ৬১ শতাংশ টেলিভিশনের দর্শক, এদের মধ্যে নগরীর ৮৩ শতাংশ এবং পল্লীর ৫০ শতাংশ টেলিভিশন দেখে থাকেন। জরিপকালে বাংলাদেশে টেলিভিশন কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল চারটি এবং দেখা গেছে এর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশনের দর্শকসংখ্যা ছিল ৫৮ শতাংশ এবং একুশে টিভির ৫০ শতাংশ। এটিএন বাংলা ও চ্যানেল আই-এর ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ৭ শতাংশ ও ৫ শতাংশ। বেসরকারি চ্যানেল একুশে টেলিভিশন অত্যন্ত দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার প্রধান কারণ ছিল এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উচ্চ মান এবং টেরিস্টেরিয়াল সম্প্রচারের সুবিধা লাভ, যার ফলে কেব্‌ল সংযোগ ছাড়াই একুশে টিভি দেখতে পারতেন সারা দেশের দর্শক।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রোগ্রামের জনপ্রিয়তা জরিপে দেখা যায় এক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে বাংলা ছায়াছবি, পরবর্তী ক্রমে আছে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান *ইত্যাদি*, *ছায়াছন্দ*, বুধবারের নাটক, সোমবারের সিরিয়াল ইত্যাদি। একুশে টেলিভিশনের প্রোগ্রামের জনপ্রিয়তার ধরনও অনেকটা একই রকম, তবে এক্ষেত্রে সংবাদের বিশেষ উচ্চ স্থান রয়েছে। বস্তুত সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ পরিবেশনার প্রচারধর্মিতা ও আড়ষ্টতার বিপরীতে বেসরকারি চ্যানেলের সংবাদ পরিবেশনা খোলা হাওয়ার আমেজ বয়ে এনেছে।

অতি সম্প্রতি এ. সি নিলসন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশের ৬৫ শতাংশ মানুষ সপ্তাহে অন্তত একদিন টেলিভিশন দেখেন। গত দশ বছরে টেলিভিশন দর্শকের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে ৩৩ শতাংশ, এর পাশাপাশি বেতারশ্রোতার বর্তমান সংখ্যা হয়েছে ২৪ শতাংশ।

বেতার সম্প্রচারের ভাষা: ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

পরাধীন ভারতবর্ষে কড়া সরকারি নিয়ন্ত্রণে বেতার তার সম্প্রচার শুরু করেছিল। ফলে গোড়া থেকেই বেতার সম্প্রচারে একটা কপটগাম্ভীর্য ও

পোশাকি ভাব বিদ্যমান ছিল। ব্রিটিশ আমলে বেতারের কোনো অনুষ্ঠানের জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তির এক পক্ষে থাকতেন গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল, আরেক পক্ষে শিল্পী বা কলাকুশলী। এর জের বেতার সম্প্রচারে এখনও কিছুটা রয়ে গেছে এবং বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে যে-কোনো শিল্পীর চুক্তিনামার এক পক্ষে থাকেন রাষ্ট্রপতি স্বয়ং, অপর দিকে শিল্পী এবং রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাক্ষরদান করেন কোনো বেতার কর্মকর্তা।

এই পোশাকি ভাবের ফলে বেতার সম্প্রচারের ভাষা ও কথনভঙ্গিতে স্পষ্টভাবে বিভাজিত দুটি ধারা গড়ে উঠেছে। আনুষ্ঠানিক-ভঙ্গির গুরুগম্ভীর প্রোগ্রামের বিপরীতে আছে নির্বাচিত কতক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান। এছাড়া এফএম রেডিয়োর বাণিজ্যিক প্রোগ্রামে একটি খোলমেলা ঘরোয়া কথ্যভঙ্গির চল রয়েছে, যা প্রোগ্রামগুলোর জনপ্রিয়তার কারণও বটে।

১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বেতার সম্প্রচার শুরু হয়। অনেকে এই সূচনাকে বলেছেন 'অকালবোধন', কেননা ১৯৪০ সালে যে সম্প্রচার শুরুর কথা ছিল যুদ্ধের কারণে তার দিনক্ষণ এগিয়ে এনে তাড়াহুড়োর মধ্যে ঘটে সম্প্রচারের উদ্বোধন। তবে উদ্বোধনের সঙ্গে পরিবেশিত অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তি ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গীতা, কোরান, বাইবেল ও ত্রিপিটক থেকে পাঠের মাধ্যমে সম্প্রচার সূচিত হয়। গীত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান *জনগণমন অধিনায়ক*, বিদ্রোহী কবি নজরুল কর্তৃক ঢাকা বেতারের জন্য বিশেষভাবে রচিত সংগীতালেখ্য *পূর্বাণী* পরিবেশিত হয়। প্রচারিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু রচিত নাটক *কাঠঠোকরা* এবং *খেলাঘর* নামের শিশুতোষ অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেছিলেন শিশুশিল্পী লায়লা আরজুমান্দ বানু। আরও উল্লেখ্য, বেতারের তৎকালীন রীতি অনুযায়ী পরিবেশিত হয়েছিল পল্লি অনুষ্ঠান *গ্রামের পথে*। তৎকালীন এক বেতার কর্মীর ভাষ্যে, "এর পরিকল্পনা করা হলো, যেন গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে পল্লির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তার দুরবস্থা, তার উন্নয়নের ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা চলছে, তারপর গ্রামের এক তরজা ও কবিগানের আসরে হাজির হওয়া—এই ভাবে।"

আমরা অনুমান করতে পারি বেতার সম্প্রচারের প্রমিত ভাষা ও উচ্চারণের পাশাপাশি এই একটি অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক ভাষা ও উচ্চারণের স্থান হয়েছিল। তবে শুরুতেই যে অনুষ্ঠানটি জনপ্রিয় হয়েছিল সেটা বলা

যাবে না। ঢাকা থেকে প্রকাশিত *শান্তি* পত্রিকার ১৩৪৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বেতার সমালোচক লিখেছিলেন, "গ্রামের পথে অনুষ্ঠানটি যথেষ্ট পরিমাণে পল্লিমঙ্গল, পল্লিশিক্ষা ও পল্লি-উন্নয়নে সাহায্য না করিয়া বরং পল্লিবাসীদের হাসির উদ্রেক করে।" এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, 'গ্রামের ভাষার ছিচকাঁহনে ব্যর্থ অনুকরণ নিতান্তই অসহ্য বলিতে হইবে।' এই সমালোচনার যথার্থতা মেনে নিলেও এর মধ্যে আঞ্চলিক ভাষার প্রতি একটি অবজ্ঞার মনোভাবও লক্ষ করা যেতে পারে। তবে বেতারে আঞ্চলিক ভাষার কৃষিকথা অনুষ্ঠান দেশভাগ-পরবর্তীকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার সহজিয়া রূপ ও কুশলি উপস্থাপনার কারণে। এরপর মুক্তিযুদ্ধকালে ঢাকাইয়া ভাষার কথিকা দ্বারা যুদ্ধরত বাঙালিদের মন জয় করে নিয়েছিলেন এম.আর. আখতার মুকুল তাঁর *চরমপত্র* অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

পাকিস্তান আমল

কিন্তু ১৯৪৭-পরবর্তীকালে, পাকিস্তান আমলের সূচনা থেকে বেতারের পোশাকি ভাষায় একটা কৃত্রিম পরিবর্তন আনবার সচেতন প্রচেষ্টা শুরু হয়। ঢাকায় রেডিয়োর সূচনার অল্পকাল পরেই ঘটে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এবং দ্বি-জাতিতত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তান নামক কিম্ভূত রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে পূর্ববঙ্গ যাত্রা শুরু করে। দ্বি-জাতি তত্ত্ব হাজির করে পাকিস্তান রাষ্ট্র হাসিল করেছিলেন নেতারা, আর তাই ভারত ও পাকিস্তানের দুই পৃথক জাতিসত্তা প্রদর্শন ছাড়া পাকিস্তানে তাদের গত্যন্তর ছিল না। অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর ঢাকা কেন্দ্রকে তাদের নাম পালটে করতে হল রেডিয়ো পাকিস্তান, কিন্তু নামের সঙ্গে পরিচয় পালটাবার প্রশ্নও উঠে এল। দেশভাগ-পূর্ববর্তী যে ধারায় সম্প্রচার চলছিল তার বিপরীতে চাই এখন পাকিস্তানি ধারা এবং এই ধারা প্রবর্তনের একটি বড়ো অবলম্বন হল ভাষা, ফলত বাংলা ভাষার একটি পাকিস্তানিকরণ হয়ে উঠল শাসকগোষ্ঠীর বড়ো কর্তব্য। অপরদিকে বেতারের ওপর কর্তৃত্ব প্রাদেশিক সরকারের নয়, কেন্দ্রের। ফলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গির নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল বেতার সম্প্রচারের ওপর এবং নানাভাবে শুরু হলো ভাষার ওপর বলাৎকার, কেননা দ্বি-জাতি তত্ত্ব যেমন কৃত্রিম, তেমনি সেই তত্ত্বভিত্তিক ভাষা প্রবর্তনের

চেষ্টা করলে তা কৃত্রিম হতে বাধ্য। ফলে রাষ্ট্রপতির বদলে রেডিয়ো পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র বলত 'সদরে রিয়াসাত', 'উজিরে আলা' বলতে বোঝাত প্রধানমন্ত্রী, স্বাগতমের বদলে তারা বলত 'খোশ-আমদেদ' এবং চলছিল এমনি অনেক ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। এই অভিনব ভাষা ক্ষেত্রবিশেষে নির্মল কৌতুকের জন্ম দিয়েছে এবং শ্রোতৃমণ্ডলী তা প্রত্যাখ্যান করেই চলেছিল।

সম্প্রচারে নতুন বুলি প্রবর্তনের প্রধান আশ্রয় হয়েছিল কথিকা এবং বেতারে প্রচারিত সংবাদের ভাষা, সেইসঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উৎসাহী পাকিস্তানপন্থী সাম্প্রদায়িক কূপমণ্ডূক চিন্তাচ্ছন্ন সাহিত্যিক-গীতিকারদের রচনা। সেই সময়কার কয়েকটি গানের নমুনা এখানে দাখিল করা যায়। লেখা হয়েছিল :

'ভাঙিল জিন্দান টুটিল জিঞ্জির
আগে চল্, আগে চল্, আজাদ রাহাগীর।
জিন্দা গাজী ওরে ভুলিয়া ভয় ডর
ঝাণ্ডা হেলালী দু' হাতে তুলে ধর।'

এমনি আরেকটি গান :

'কলিজার খুনে ওয়াতানের ধূলি করিয়া লাল
আজাদির তরে শহীদ হলে যে বীর দুলাল,
তাহারা মোদের সালাম নাও।'

আরো গাওয়া হয়েছে :

'পাকিস্তানের গুলিস্তানে আমরা বুলবুলি
মোরা সালওয়ার পরি
মোরা ওড়না ওড়াই।'

কিন্তু এমন গান লেখা হতে পারে, সরকারি বেতারে সজোরে গীতও হতে পারে, তবে মানুষের অন্তরে তার ঠাঁই করে নেওয়া দুঃসাধ্য। আর সেজন্যই ভাষার আধকার ক্ষুণ্ণ ও ভাষাকে বিকৃত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গবাসীর অনুপম প্রতিরোধের প্রকাশ ঘটে উনিশ শো' বাহান্নোর

একুশে ফেব্রুয়ারিতে। বাহান্নোর ভাষা আন্দোলন দ্বি-জাতি তত্ত্বের অসারতার বিরুদ্ধে বাঙালির উদার অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটাতে শুরু করে এবং মেকি ভাষা তৈরির অপচেষ্টাকে প্রতিহত করে। সেই সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করেন অনেক প্রতিভাবান তরুণ-কবি-সাহিত্যিক-গীতিকার-সুরকার এবং তাঁদের প্রতিভাস্পর্শে বাংলাভাষা নতুন প্রাণ ফিরে পায়। ফলে সম্প্রচারে ভাষাবদলের আয়োজন পূর্বের জোর হারিয়ে ফেলে, তবে অপপ্রয়াস অব্যাহত থাকে সুকৌশলে, ভিন্ন পথে।

পাকিস্তান আমলে বেতারে যে-বিশেষ ভাষা তৈরির প্রয়াস ছিল সেক্ষেত্রে সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের সামনে একটি বাস্তব বাধাও ছিল, লিখিত ভাষায় আরবি-ফারসি-উর্দুর বাহুল্য এনে তার খোল-নলচে যথেষ্ট পরিমাণে পালটে দেয়া যায়, কিন্তু সম্প্রচারের ভাষাকে শ্রোতার কাছে বোধগম্য করে তোলাটাও জরুরি। লিখিত রূপ বারবার পাঠ করা যায়, না-বোঝা অংশকে ফিরে বুঝে নেয়া যায়, কিন্তু শ্রাব্যরূপকে তাৎক্ষণিকভাবে বুঝে নিতে হবে। ফলে প্রমিত বাংলা থেকে বিচ্যুত হওয়ার একটি সীমা তাদেরকেও মান্য করতে হয়, যদিও এই সীমাকে যথাসম্ভব প্রসারে কর্তৃপক্ষ ছিল বিশেষ তৎপর। তাই এর বিপরীতে লক্ষ্য করা যায়, বেতার সম্প্রচারের সৃজনশীল অংশে ভাষার মেকিত্ব বিশেষ জায়গা করে নিতে পারে না। সংগীতে শ্রোতার মনজয়ী গানগুলোকে বাংলা গানই হয়ে উঠতে হয়, তা সে চিরায়ত, আধুনিক কিংবা লোকজ যে গানই হোক না কেন। সম্প্রচারের ভাষাকে সুস্থ ও সৃজনশীল ধারায় বহমান রাখতে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে বেতার নাটক। আমরা দেখেছি বুদ্ধদেব বসুর *কাঠঠোকরা* নাটক দিয়ে ঢাকা ধ্বনিবিস্তার কেন্দ্র (এই নামে সেকালে অনেকে ঢাকা বেতারকে অভিহিত করেছেন) যাত্রা শুরু করেছিল এবং এক হিসেবে দেখা যায় ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭ সময়ে ঢাকা কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা ছিল ১৫২টি।

নাটকের এই সমৃদ্ধ ধারা পাকিস্তান আমলেও বহমান থাকে এবং বৈরী শাসকগোষ্ঠীর অধীনে সমসাময়িক রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা নিয়ে নাটক করা না গেলেও রূপকথা, লোককাহিনি, ঐতিহাসিক ও

সামাজিক বিষয় নিয়ে বহু নাটক সম্প্রচারিত হয়েছে এবং নবীন-প্রবীণ প্রতিভাবান নাট্যকার, নাট্য প্রযোজক ও কলাকুশলীদের অবদানে নাটক বেতারের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এক হিসেবে দেখা গেছে ১৯৪৭-'৭১ সময়ে বেতার প্রচারিত পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা ১১৫২টি এবং এর মধ্যে মৌলিক রচনা ছিল এক হাজার।

ষাটের দশকে সম্প্রচারের ভাষা নিয়ে পাকিস্তানি ও জাতীয়তাবাদী এই দুই ধারার দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে। এই দ্বন্দ্ব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তীব্র হয়ে উঠতে থাকে, একদিকে সরকার রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ওপর বাধা আরোপ করে, অন্যদিকে নাগরিক সমাজের উদ্যোগে গৃহীত হয় রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালনের ব্যাপক আয়োজন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের পটভূমিকায় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বেতার-টিভিতে রবীন্দ্রসংগীত সম্প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, আর এর বিপরীতে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ হয়ে ওঠে দ্বিগুণ বলশালী। বাঙালি জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধজনেরা এমনকী বেতার সম্প্রচারেও কতটা পরিবর্তন বয়ে আনতে পারেন তার প্রকাশ মেলে শান্তিনিকেতনে শিক্ষণপ্রাপ্ত আবদুল আহাদ সুরারোপিত দেশাত্মবোধক গান, ষাটের দশকে যা বেতারের সিগনেচার টিউনে পরিণত হয়, এর বাণীরূপ ছিল, 'আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন।' পাকিস্তান আমলের সূচনায় বেতারে যেসব গান গীত হয়েছিল তার বিপরীত মেরুর এই গানে দেশমাতার আঁচলের ছায়াশ্রয় খুঁজে পাওয়া যায় যেন। বস্তুত, সাংস্কৃতিকভাবে দেশ ততদিনে পাড়ি দিয়ে এসেছিল দীর্ঘ পথ। তারই ফলে আমরা দেখি একাত্তরের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গমালায় ভেসে যায় পাকিস্তানিদের বানোয়াট ভাষা-সংস্কৃতি আরোপের সকল আয়োজন, বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর আগেই বেতার ও টেলিভিশনে বাঙালির অধিকার কায়েম করে স্থানীয় কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। এক নতুন ভাষায় কথা বলে বেতার-টেলিভিশন, গায় নতুন গান, আর সেখানে যুক্ত হয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ, পঞ্চকবি থেকে সুকান্ত-সলিল চৌধুরী কেউ বাদ থাকেন না।

বিশাল ও অভূতপূর্ব এক জাতীয় আন্দোলনের অংশী হয়েছিল বেতার ও টেলিভিশন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র সফলতার

সঙ্গে পরিচালনা করলেন পূর্ব পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশনের পূর্বতন কর্মকর্তারা, নতুন ধারায়, মুক্তভাবে। এর ফলে বেতার সম্প্রচারে পূর্বতন মেকি ও পোশাকি ভাব বর্জিত হয়ে একটি আটপৌরে ভঙ্গি গৃহীত হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে চরমপত্র, ঢাকার আদি বাসিন্দা কুট্টি তথা ঢাকাইয়াদের কথনধারা অবলম্বন করে রসবোধপূর্ণ এই কথিকা বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে সম্প্রচারের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা হয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ আমল

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে ভিত্তিতে অর্জিত হয়েছিল, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয় চেতনার সেই ভিত্তি অক্ষুণ্ন থাকেনি। রক্তাক্ত আঘাত হেনে স্বাধীনতার ধারাকে পথভ্রষ্ট করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেছিল যে ঘাতকদল তারা প্রথম যে পরিবর্তনের কাজ করে তা হল বাংলাদেশ বেতারের নাম পালটে পূর্বতন *রেডিয়ো পাকিস্তান*-এর আদলে *রেডিয়ো বাংলাদেশ* করা। এই পরিবর্তন পরবর্তীকালে বহাল না থাকলেও এর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ঘাতকেরা আঘাত করেছিল বঙ্গবন্ধুকে।

পরবর্তী দীর্ঘকালের সামরিক শাসন অথবা সামরিক শাসকদের কল্যাণে বিকশিত বেসামরিক শাসনকালে নানাভাবে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে। এর জের পড়েছে বেতার-টিভির সম্প্রচারের ওপর। সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করে সামরিক শাসক তাদের ধর্মচেতনা নয়, রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশের বেতার টিভির সম্প্রচারেও এর প্রভাব পড়েছে। যেমন বেতার টেলিভিশনে আজান প্রচারের রীতির প্রবর্তন, যা মুসলমানের ধর্মপালনের সহায়ক হিসেবে শাসকগোষ্ঠী প্রতিপন্ন করতে চান, কিন্তু নামাজ আদায়ের সঙ্গে দিনের যে ক্ষণের যোগ তা তো অঞ্চল নির্বিশেষে একই রকম নয়, ঢাকায় যখন সন্ধ্যাব আজানের সময় হবে খুলনায় হবে না, অপর দিকে টেলিভিশন সম্প্রচার তো ঢাকা-খুলনার ফারাক করতে অক্ষম। ধর্মচেতনাকে

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রকাশ হিসেবে এখন দেখা যাচ্ছে মৌলবাদীদের চাপে কিংবা কূটচালে পরাভূত হয়ে বেতার টেলিভিশনে সংবাদপাঠ শেষে পাঠক-পাঠিকা *খোদা হাফেজ* বলে বিদায় জানাতে পারছেন না। কেননা কট্টর মৌলবাদীদের কাছে 'খোদা' পারসিক শব্দ হিসেবে পরিত্যাজ্য, তাঁই বাংলার মুসলমানদের ঐতিহ্যিক রীতি পালটে তারা প্রবর্তন করেছেন আরবি-সম্মত *আল্লাহ হাফেজ* বলবার রীতি। এসবই ক্ষমতাসীনদের দ্বারা সম্প্রচার মাধ্যমের ওপর নিজ ক্ষুদ্র মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার উদাহরণ। সম্প্রচারের ভাষায় স্বাভাবিকভাবে আসবে অনেক আরবি-ফারসি কিংবা অন্যান্য শব্দ, কিন্তু মৌলবাদীরা শব্দের স্বাভাবিক প্রবাহ রোধ করে এক ধরনের ধর্মসিদ্ধ শব্দ-ব্যবহারে অবতীর্ণ হয়েছে। এর ফলে সমাজের নিত্যকার ভাষা সহজিয়া আটপৌরে রূপ হারিয়ে অর্জন করছে আড়ষ্ট মেকিত্ব।

বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচারের যে বিশাল ব্যাপ্তি তা' থেকে এর প্রভাব বিষয়ে একটা আন্দাজ আমরা করতে পারি। এই ব্যাপ্তি ক্রমে বাড়ছে বই কমছে না। সরকারের পক্ষ থেকে সম্প্রচারের ওপর যে চাপ প্রয়োগ করা হয় তার পাশাপাশি এখন নতুন চাপ এসে পড়ছে বাণিজ্য তথা ভোগবাদের মানস প্রসারের তাগিদ থেকে। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং একই দর্শকের মন জয় করতে একাধিক চ্যানেলের মধ্যে প্রতিযোগিতা একটা ভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক বলয় তৈরি করছে। বেসরকারি চ্যানেলগুলোকে আয়ের জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে বিজ্ঞাপন বাবদ অর্জিত অর্থের ওপর। আবার বিজ্ঞাপনদাতারা অর্থ ব্যয়ের আগে দেখে নিতে চাইছেন চ্যানেলের দর্শকপ্রিয়তা কিংবা প্রচারিত অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা। ফলে জনতুষ্টি হয়ে উঠেছে বেসরকারি চ্যানেলের প্রধান লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য অর্জনে বিনোদন হয়েছে তাদের প্রধান অবলম্বন। এই কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে একটা বড়ো আঘাত এসে পড়ছে ভাষার ওপর। চ্যানেলগুলো নিজেদের সবকিছু বিনোদনমূলক করে নিচ্ছে, সেইসঙ্গে ভাষাকেও হতে হচ্ছে বিনোদনমূলক। এই কাজে তাদের সামনে একটা আদর্শ মেলে ধরছে বিজ্ঞাপনদাতারা স্বয়ং, তাদের বিজ্ঞাপনের ভাষা তৈরি করছে এই নতুন প্রবাহ এবং ক্রমে বিজ্ঞাপন বেয়ে তা নেমে আসছে অনুষ্ঠানের শরীরেও।

যেমন বলা যায় গ্রামীণ ফোনের বিজ্ঞাপনের কথা, বাংলাদেশে গ্রামীণ ফোন প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল গ্রামীণ নারীর সঙ্গে বাইরের সমাজের যোগাযোগ ঘটাবার, তাঁর স্বনির্ভরতা অর্জনের অবলম্বনের প্রতীক হিসেবে—বিজ্ঞাপনেও ছিল সেই আমেজ। ক্রমে বিজ্ঞাপনের গ্রামীণ আবহ কমে আসতে লাগলো, আধুনিক যুবা ও আধুনিকা তরুণীর হাতে গ্রামীণ ফোনের শোভা প্রকাশ পেতে লাগল। এরপর দশ লক্ষ গ্রাহকসংখ্যা অর্জনের পর গ্রামীণ ফোন তার বিজ্ঞাপন নীতিতে বড়ো রকম বদল আনল। কেননা বাজার জরিপ করে তারা বুঝে গেছে আগামী দিনের সম্ভাব্য ব্যবহারকারী হচ্ছে শহুরে উঠতি-বয়সী ছেলে-ছোকরার দল। তাদের মুখের ভাষা, অর্থাৎ বাংলা-ইংরেজি বোলচাল এখন গ্রামীণ ফোনের বিজ্ঞাপনের নিত্যকার ভাষা হয়ে উঠেছে, তাদের জন্য চলছে 'এক্সট্রা খাতির', বের হয়েছে 'ডিজুস' নামক অদ্ভুত শব্দ, আওয়াজে শ্রুতিময় হলেই হল, অর্থ নিয়ে তেমন মাথা ঘামাবার নেই। এর সঙ্গে আবার মাঝে-মধ্যে ফোড়ন হিসেবে যোগ হচ্ছে মাতৃপ্রেম, দেশপ্রেম, ইত্যাদি উচ্চ ভাবের বাণিজ্যিক ব্যবহার, হঠাৎ হঠাৎ যা উদিত হয়ে বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে চকিতেই বিদায় নেয়। সবই পাসিং শো, যেমন টেলিভিশনের সিরিয়াল, মহানন্দে দেখে যাবার এবং দেখে যাবার এবং দেখে যাবার এবং দেখে যাবার—কোনোরকমেই ভাববার নয়। এর প্রভাব সম্প্রচারের ভাষাকে বহুরকমে পালটে নিচ্ছে, একটা বড়ো প্রভাব তো বলা যায়, ভাষার সুন্দর সাজানো-গোছানো কেতাদুরস্ত হালফিল হয়ে ওঠা এবং এর সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগ বিচ্ছিন্ন করা, শব্দকে অর্থ থেকে আলাদা করে ফেলা, তবেই বুঝি শব্দ বিনোদন হিসেবে সার্থক হয়ে উঠতে পারবে। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা তাই ডেভলপারের বিজ্ঞাপন চিত্রে সেজেগুজে আবির্ভূত হয়ে জানান, প্রকৃতির সবুজ ঘেরা গৃহনির্মাণ পরিকল্পনায় তাঁর মুগ্ধতার কথা, পেছনে স্বকণ্ঠের গান ভেসে আসে, *আনন্দধারা বহিছে ভুবনে*, সত্যিই আনন্দের এক সর্বগ্রাসী আয়োজন, তবে এ-আনন্দরসের সঙ্গে জীবনরসের সম্পর্ক যেন কেউ খুঁজে না পান, সে-ব্যবস্থাও থাকে প্রবল।

একাত্তর-পরবর্তী যে তিন দশকের অধিক সময় আমরা পার হয়েছি এই সময়ে বিশ্ব ও দেশজ পরিসরে অনেক বড়ো ধরনের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে গেছে। এর একটি বড়ো অভিঘাত হচ্ছে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বেতারের ব্যাপ্তি

ও প্রভাবকে পিছু ফেলে টেলিভিশনের অব্যাহত জয়যাত্রা। স্যাটেলাইট প্রযুক্তির কল্যাণে টেলিভিশন সম্প্রচার ক্রমেই দেশজাতির সীমানা পার হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে টেলিভিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রযুক্তিও সহজলভ্য হয়ে টেলিভিশন কেন্দ্রের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছে। গণমাধ্যমের ব্যাপ্তি এক্ষেত্রে অনেক মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ করে দিচ্ছে। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে চুক্তি করে নাগরিককে গণমাধ্যমে প্রবেশের অধিকার অর্জন করতে হচ্ছে না, আপন দক্ষতা ও যোগ্যতা বলেই এটা, অন্তত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাগরিকের ক্ষেত্রে, ঘটতে পারছে। ফলে সম্প্রচারে আগের সেই পোশাকি ও আড়ম্বরপূর্ণ ভাবটি আর থাকছে না। এমন কি সংবাদপাঠক পরিপাটি সাজগোজ করে আসনে জেঁকে বসলেও তাঁকে মুহূর্তেই চলে যেতে হচ্ছে সংবাদদাতার কাছে, মাঠ পর্যায়ে, যেখানে সাজপোশাকের বাহুল্যের অবকাশ থাকে না, সংবাদদাতারাও সংবাদ-পাঠক হিসেবে নয়, সংবাদসংগ্রাহক হিসেবে ভূমিকা পালনে থাকেন অধিক তৎপর, ফলে টেলিভিশন সংবাদের পোশাকি ভাবও অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়ছে।

দ্রুতই পালটে যাচ্ছে সম্প্রচারের জগৎ এবং তার ফলে কেবল টিভির সুবিধাপ্রাপ্তদের হাতে বা রিমোটে এখন দেশ-বিদেশের অনেক বাংলা চ্যানেল চলে এসেছে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সম্প্রচারিত নানা ভাষাভঙ্গি ও শৈলীর পরিচয় পাচ্ছেন দর্শক-শ্রোতা, এসব মিলিয়ে ভাষার প্রমিত রূপ বলে আর কিছু থাকছে না। বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ছে সম্প্রচারের ভাষারীতি, সেটা যেমন শব্দচয়ন ও ব্যবহারে, তেমনি উচ্চারণেও। অর্থাৎ গণমাধ্যমের প্রসারের সাথে সাথে ভাষাবিবেচনায় সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ছে। অতীতে একক বেতার ও একক টেলিভিশনের একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগে ভাষার একক রূপ তৈরিতে গণমাধ্যমের ছিল বিশাল ভূমিকা। বর্তমানে গণমাধ্যমের প্রসারের ফলে বহু গোষ্ঠী, ব্যক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমাবেশ ঘটছে এখানে, ফলে সম্প্রচারের ভাষাও হয়ে পড়ছে বহুধা-বিভক্ত। এই বিভক্তির মধ্যে সম্প্রচারের ভাষায় যে ঐক্যরূপ তা একমাত্র প্রতিফলিত হচ্ছে বিজ্ঞাপনে, কেননা সম্প্রচার-ধারা যত বিভিন্ন ধরনের হোক না কেন, বিজ্ঞাপন থাকছে একই, সব চ্যানেলে সব সময়ে, ফলে ভোগবাদী ওপর-দুরস্ত এক পাঁচমিশেলি ভাষা, কখনও-বা বাজারি ভাষা, পাচ্ছে বিশেষ প্রাধান্য।

সমাজের ঐক্যসূত্র ও সংহতি আরো অনেকভাবে ভেঙে পড়ছে। পূর্বতন গ্রামসমাজের যে বন্ধন ছিল, সমস্ত নেতিবাচকতা সত্ত্বেও গ্রাম যেভাবে সমাজ হয়ে উঠতে পেরেছিল তা এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। নগর জীবন তো বরাবরই নাগরিকের বিচ্ছিন্নতার জন্ম দিয়ে এসেছে। বর্তমানের বিশাল বিপুল নগরায়ণের হা-এর মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে নাগরিক, প্রত্যেকে আলাদাভাবে সংগ্রাম করছে বাঁচার জন্য কিংবা আলাদাভাবে বেঁচে-থাকার আনন্দ বা সুখ খুঁজে পেতে চাইছে, তাদের অভিন্ন মিলনক্ষেত্র বিশেষ থাকছে না। এই পরিস্থিতিতে নগরীতে টেলিভিশনের আবেদন হয়ে উঠেছে বিশেষ প্রবল, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নাগরিকজনের বিনোদনের মহাকর্ষক মাধ্যম। বিনোদনের সূত্রেই নাগরিকসমাজ এক হয়ে উঠছে এবং এই বিনোদন পরিবেশনা সম্ভব হয়ে উঠছে বিজ্ঞাপনের সূত্রে। অপরদিকে পণ্যবাহকদের জন্য বিনোদন প্রত্যাশী নাগরিক হয়ে উঠেছে আরাধ্য দেবতা। এই ঘূর্ণিপাকে ভাষার সামাজিক রূপটি ক্রমেই বাজারি রূপ ধারণ করছে, হারিয়ে ফেলছে এর সংহতি। ভাষার বিবর্তনের সুরটি বেঁধে দিচ্ছে বিজ্ঞাপন ও বিনোদন, জিঙ্গল ছেড়ে তা এখন সিরিয়ালের গায়ে ভর করেছে এবং টেলিভিশন সম্প্রচারের সিংহভাগ জায়গাই দখল করে নিয়েছে নতুন এই বাজারি ভাষা।

এভাবে সম্প্রচার ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রতিনিয়ত পালটে দিচ্ছে ভাষাকে, বদলে দিচ্ছে শব্দের অর্থ এবং এক নতুন ভোগবাদী ভাষার আনন্দ-আয়োজনে যুক্ত করতে চাইছে সবাইকে। যেমন দেখা গেছে বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত দুটি বেসরকারি মিউজিক চ্যানেলের একটির নাম হচ্ছে *রেডিয়ো ফুর্তি*। কিন্তু এসবই সব নয়। সম্প্রচার মাধ্যমে ভাষার প্রমিত রূপ ও শীলিত উচ্চারণের আদর্শ তুলে ধরতে সচেষ্ট রয়েছে অনেক তরুণ। তারা যখন চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত ভাষাসম্পদ মেলে ধরে দর্শক শ্রোতাদের সামনে তখন তো অন্য এক দোলায় হৃদয় আলোড়িত হয়। বাংলাদেশ গণমাধ্যম ইন্সটিটিউট থেকে জামিল চৌধুরীর উদ্যোগে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'বাংলা উচ্চারণ অভিধান', সম্প্রচারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আবশ্যক হ্যান্ডবুক হিসেবে। এরপর নরেন বিশ্বাসের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে আরেকটি উচ্চারণ অভিধান।

বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত আরো কিছু উচ্চারণ অভিধান বাজারে মিলবে। সম্প্রচারে ভাষাচর্চার প্রতি প্রদত্ত গুরুত্ব এতে প্রকাশ পায়। ভাষাচর্চার এই ধারা শক্তি রাখে অশেষ, কিন্তু এর প্রসারে প্রচারে চাই উপযুক্ত সমর্থন ও সুযোগ। এই সুন্দরের পরিচয় মেলে বিশাল এক তরুণগোষ্ঠী সংবাদ পাঠক-পাঠিকা, উপস্থাপকদের ভেতর, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে। আরো নানাভাবে এর বিচ্ছুরণের দেখা মেলে। বোঝা যায় একটা লড়াই চলছে ভেতরে ভেতরে। ধর্মান্ধকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ একত্রে যে আঘাত হেনে চলেছে তার আছে ক্ষমতার দাপট। এর বিপরীতে সুস্থ স্বস্থ ভাষা-সংস্কৃতির আলোকশিখা জ্বালিয়ে রাখবার আরেক সাধনা বজায় রয়েছে। বাংলাদেশে সবকিছু এখনও হারিয়ে যায়নি।

লেখক প্রাবন্ধিক, প্রকাশনা কর্মের সঙ্গে যুক্ত ও ঢাকায়
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-এর ট্রাস্টি

পরিমল গোস্বামীর রচনা

লেখক পরিমল গোস্বামীর ভাবনা ও মনোযোগের বিষয় ছিল বহুমাত্রিক। বেতারের শব্দ ও ধ্বনি-তরঙ্গেও তাঁর কান ছিল সতর্ক। সুর কেটে গেলেই কানে বাজত। নানা সময়ে নানা প্রসঙ্গে তা প্রকাশ করেছেন। একসময়ে *যুগান্তর* পত্রিকার ইতশ্চেতঃ কলমে, এমনকী *বেতার জগৎ* পত্রিকাতেও লিখেছেন কিছু সোজাসাপটা কথা। একই ভ্রান্তি একাধিকবার নজরে এনেও সম্প্রচারকদের সতর্ক করতে পারেননি তিনি। তাই একই প্রসঙ্গ সরস যুক্তির ছলে নানাভাবে এনেছেন একাধিকবার। আজও প্রাসঙ্গিক এই নির্বাচিত রচনাগুলিতে তার প্রমাণ মিলবে।

বেসুরো বেতার

আকাশবাণী থেকে বাংলায় যেসব দৈনন্দিন বা সাপ্তাহিক বিষয় ব্রডকাস্ট করা হয়, তার শেষে বলা হয় আজকের মতো ... এখানেই শেষ হল। নিয়মিত বিষয় না হলে অথবা বিষয়টি আকাশবাণীর পক্ষ থেকে প্রচারিত না হলে প্রচার শেষ হলে ওরকম কিছু বলা হয় না। এবং ইংরেজি কোনো বিষয়ই শেষ হলে বলা হয় না যে আপাতত এখানেই শেষ হল বা আজকের মতো এখানেই শেষ হল।

তাহলে বাংলায় প্রচারের বেলায় ওরকম বলা হয় কেন তার অর্থ বোঝা যায় না। আমাদের প্রতিদিনের ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে কখনো কেউ ওইভাবে বলি না। ধরা যাক সূর্যাস্তের কথা। আমরা যদি এখন সূর্য অস্ত গেল এ-কথা কাউকে বলার প্রয়োজন মনে করি তাহলে কখনো এমন কথা বলি না যে সূর্যদেব আপাতত এখানেই বিদায় নিলেন, অথবা তিনি আজকের মতো এখানেই শেষ হলেন। 'আপাতত' বা 'আজকের মতো' যোগ করলে মিথ্যা বলা হয় না। কিন্তু যা সবার জানা, সে-বিষয়ে প্রতি প্রোগ্রাম শেষে উচ্চারণ করার সার্থকতা কোথায়?

আমাদের প্রকৃতির উপর বিশেষ করে তার ইউনিফর্মিটির উপর বড়োই বিশ্বাস। তাই আজকের সূর্যাস্ত দেখে আমরা কখনো ভাবতে পারি না যে আগামীকাল সূর্যাস্ত হবে না। বহুপুরুষের অভিজ্ঞতা আমাদের মনে গেঁথে গেছে, তাই জন্ম হলে যেমন মৃত্যু হবেই মনে মনে জানি, তেমনি সূর্যোদয় হলে সূর্যাস্তও হবে জানি, এবং আজ যা হচ্ছে কালও তা-ই নির্ঘাৎ হবে, এবং জানি এর কোনো ব্যতিক্রম দেখা যাবে না। অবশ্য আমাদের পার্থিব কালের কথাই বলছি—মহাজাগতিক কাল বা মহাকাল বা অ্যাস্ট্রনমিক্যাল টাইমের কথা আমরা ভাবি না, ভাবা সম্ভব নয়, কারণ তা ধারণার প্রায় বাইরে। আর মহাকালের সবকিছু পৌনঃপুনিকভাবে পার্থিব কালের মতো একই শব্দে এবং তালে ঘটে কি না সে-বিষয়ে নিশ্চিত আমাদের কিছু জানা নেই। অতএব পৃথিবীতে বসে যা ঘটতে দেখি, সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, কিংবা আকাশে নক্ষত্রের অবস্থান, জন্ম-মৃত্যু—এসব আমরা কোটি কোটি বছর ধরে মেনে নিয়েছি, এবং এর কোনোটারই শেষে বলি না যে বিষয়টি আপাতত বা আজকের মতো শেষ হল।

যাঁরা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন তাঁদেরও কেউ মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে বলেন না যে "আমার জীবন আপাতত এইখানেই শেষ হল"—তাঁর মৃত্যু খবরের কাগজে ঘোষিত হলে এমন কথা লেখা হয় না যে তিনি আপাতত পরলোক গমন করেছেন। আকাশবাণীতেও বাংলা সংবাদে বলা হয় না অমুকের জীবন আপাতত শেষ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু প্রচার আমি শুনেছি ১৯৪১ সালে। ঘোষণায় বলা হয়নি যে তাঁর জীবন আপাতত এখানেই শেষ হল, বা আজকের মতো এইখানেই শেষ হল। কোনো ব্যক্তি সম্পর্কেই এমন কথা বলা হয় না। তবে আপাতত বা আজকের মতো মানে কী?

বলা যেতে পারে মৃত্যুর পর কী হয় জোর করে বলা যায় না, বলা গেলে নিশ্চয় ওইরকম ঘোষণা করা হত। কিন্তু জোর করে বলা যায় এমন আর কোনো বিষয়েই তো ওভাবে বলা হয় না। আগে বলেছি প্রকৃতির ছন্দ-তালে আমাদের এমনই বিশ্বাস যে আজকের সূর্যাস্ত আজকেই শেষ, এমন কথা কখনো মনে হয় না। জানি কালও সূর্যাস্ত হবে। তবে কেন বলি না আজকের মতো উনি এইখানেই শেষ হলেন? আমরা প্রায় সবাই রাত্রে শুই এবং ঘুমোই। কিন্তু কেউ ঘুমালে তো কখনো বলি না যে, আপাতত বা আজকের মতো তার জাগরণ এইখানেই শেষ হল।

রেডিয়োতে কোনো শিল্পী যখন গান করেন, তখন তাঁদের অনেকে একই দিনে দু-বার অথবা তিন বার গান। এ-রকম ক্ষেত্রে প্রথম বার গানের পর যদি বলা হত আপাতত এঁর গান এইখানেই শেষ হল, তাহলে তার একটা অর্থ হতে পারত। যদি প্রথম আসরের শেষে বলা হত আপাতত এঁর গান শেষ হল, ইনি আবার—টার সময় গাইবেন, তাহলে সে-খবরটি শ্রোতার কাজে লাগত। কিন্তু তা করা হয় না। শুধু বাংলা খবর বা অন্যান্য রেডিয়োর তরফ থেকে নিয়মিত প্রচারিত বিষয় "আপাতত" বা "আজকের মতো এইখানেই শেষ" হয়। এক দিনে তিন বার গাওয়ার প্রোগ্রাম থাকলে প্রথম ও দ্বিতীয় বার "আপাতত এইখানেই শেষ" যদি বলা সম্ভব না হয়, যদি মনে হয় অতটা অবান্তর কথা বলে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়, তাহলে যেসব শিল্পী আকাশবাণীর এবং শ্রোতাদের প্রিয় এবং আকাশবাণী যাঁদের সম্পর্কে নিশ্চিত জানেন যে ভবিষ্যতেও তাঁদের ডাকা হবে, তাঁদের কারো প্রোগ্রাম শেষ হলেও তো বলা যায় আপাতত এঁর গান (বা বক্তৃতা) এইখানেই শেষ হল?

'আপাতত' বা 'আজকের মতো' ক্রিয়া-বিশেষণটির সাহায্যে ভবিষ্যতের যে-আশা শ্রোতার মনে জাগানো হয়, তার কি সত্যিই দরকার আছে? ওই কথা না বললে আজকের বাংলা খবর শুনে (আমি অবশ্য ভুল ভাষা ও চিৎকারের জন্যে কদাচিৎ শুনি) কেউ সন্দেহ করত কি যে তার পরে আর বাংলা খবর হবে না? আকাশবাণীর নিয়মানুবর্তিতা এবং সুনিয়ন্ত্রিত পৌনঃপুনিকতাকে আমরা ইউনিফর্মিটি অব নেচারের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করা অভ্যাস করে ফেলেছি। কাজেই ওই দু-টি ক্রিয়া-বিশেষণ আপাতত পরিত্যাজ্য মনে করে আমার ইতশ্চেতঃ আজকের মতো এইখানেই শেষ করছি। (১৯৬১)

রেডিয়োর সংবাদ দূষণ

আকাশবাণীর দায়িত্বজ্ঞান সবচেয়ে বেশি থাকবে, এটা যাদের টাকায় আকাশবাণী চলে, তাদের আশা করা অন্যায় নয়। এটি সরকারি, অর্থাৎ আমাদের সবার টাকায়-চলা প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে যে-বাংলা প্রচারিত হবে তা শ্রোতারা আদর্শ রূপে নেবে এটা নিশ্চয় আশা করা যেতে পারে। কিন্তু

কাজের বেলায় আমরা কী দেখছি? আকাশবাণীর 'বাংলা' আদর্শ হলে, এবং তা যদি দৈবাৎ ছাত্ররা শুনে মান্য করে চলে, তাহলে স্কুল কলেজ থাকার আর দরকার হবে না।

দিল্লিতেযাঁরা বাংলা বলেন, তাঁদের অধিকাংশের বাগ্‌ভঙ্গি বাতিল হওয়া উচিত। বাংলা সংবাদের কথা বলছি। যিনি অনুবাদ করেন, তাঁরও ভাষার উপর খুব দখল আছে মনে হয় না। আর কলকাতা দিল্লির সঙ্গে এ-বিষয়ে প্রতিযোগিতা করতে পারে।... বাংলা ভাষার নমুনা কিছু কিছু নোট করেছি। যথা 'ভস্মধার', 'শ্রষ্ঠা' (৩০-৫-৬৪ সকালের বাংলা সংবাদ)। কলকাতার অপরাহ্ন ২ : ২৬-এর পর আবহাওয়া সংবাদে শুনেছি—"তাপমাত্রা শুষ্ক থাকবে।" অনেককাল ধরে শুনেছি। শেষ শুনেছি গত ৩-৬-৬৪ তারিখে। তাপমাত্রা অর্থাৎ বিশেষ ডিগ্রির তাপ শুষ্ক থাকবে, এ কোন ইংরেজির বাংলা, অথবা কোন আবহাওয়া অফিসের বাংলা? ২৯-৬-৬৪ (১২ : ৪৫)-এর খবরে—"কল্যাণীমূলক প্রতিষ্ঠান"—মানে কী?

৩-৬-৬৪, ৭টা ৫০-এর স্থানীয় সংবাদ—"শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কলকাতায় প্রত্যর্পণ করেন।" ৪-৬-৬৪-এর দিল্লির বাংলা সংবাদ—দেহাবশেষের "কিয়দ্দংশ", "রাষ্ট্রপতি রাধাকিষণ"। ২৯-৬-৬৪, কলকাতায় অপরাহ্নের আবহাওয়া সংবাদ—"বঙ্গোপ্‌সাগর"। ৫-৬-৬৪-এর ১২টা ৪৫-এর বাংলা সংবাদেও "ভস্মধার" প্রচারিত হয়েছে। তা ছাড়া "হাঙ্গামা বাঁধা", শত্রুকে "বাঁধা দেওয়া" এবং মজদুরমণ্ডলীতে ' "ঘাঁটতি", "আঁটকে রাখা" প্রভৃতি যে-আদর্শ বাংলা প্রচারের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, তা থেকে শ্রোতারা বাঁচে কেমন করে?

একটি শব্দ খুব চলে। অবশ্য দিল্লিতে নয়, শুধু কলকাতায়। শব্দটি "কার্যকরী"। দিল্লিতেও বলা হত কিন্তু বন্ধ হয়েছে। কিন্তু কলকাতাকে বন্ধ করবে কে? কার্যকর বলা হয় দিল্লি থেকে এবং ঠিকই বলা হয়। কার্যকরীর মতন লজ্জাকরী এবং অপমানকরী কথা আর কি আছে? সবটাই অবশ্য হাস্যকরী। সর্বশেষ গত ১৭ই জুলাই রাত ৭ : ৫০-এর স্থানীয় সংবাদে শুনেছি "অত্যাধিক"। হিন্দি ওড়িয়া—এই দু-টি ভাষাতেই সংবাদ শুনেছি, প্রশংসাযোগ্য বলা। পাকিস্তানের বলাও (বাংলা সংবাদ) অনুকরণীয়। শুধু বাংলার বেলাতেই এই অবহেলা। এর প্রতিকার কী? (১৯৬৪)

রেডিয়োর রেকর্ড

পুরোনো ভাঙা শিশি-বোতল, দুধের, তেলের, পাউডারের টিন কিনতে এসেছিল একটি লোক। ওসব কিছু নেই শুনে বলল. পুরোনো রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বিক্রি আছে?

মনে পড়ল আছে বটে কয়েকখানা. কিন্তু সে তো অনেক পুরোনো। কলে চাপিয়ে দিলে গান বাজে না তাতে, শুধু ঘস্ ঘস্ আওয়াজ বেরোয়। লোকটি কিছু ভেবে বলল, ঘস্ ঘস্ আওয়াজের ভিতরে-ভিতরে একটি কথাও কি বাজে না? আমি বললাম. তা হয়তো বাজে। কিন্তু তা তোমার কি কাজে লাগবে? লোকটি বলল, ওই রেকর্ড রেডিয়োতে বিক্রি করব, বাবু। ওঁরা চালাবেন।

পাঁচ-ছখানা রেকর্ড ছিল, লোকটি সবগুলোই কিনে নিয়ে গেল। এতদিন এ-জাতীয় রেকর্ডের ব্যবহার কীভাবে হয়, খেয়াল করিনি। কিন্তু গত ২৯শে জুন সাড়ে বারোটার রেকর্ড প্রোগ্রাম শুনতে শুনতে হঠাৎ খেয়াল হল, তাই তো, এ তো সেই আমারই কাছ থেকে কেনা রেকর্ডের একখানা বাজছে! কিন্তু আসলে বাজানো গেল না, আর সেই জন্যই তো ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। রেকর্ডখানা মাঝপথে গিয়ে থেমে গেল। তখন তাড়াতাড়ি যন্ত্রসংগীতের রেকর্ড দিয়ে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া হল। ৩০শে জুন দুপুরে 'গানের সুরের আসনখানি'ও প্রায় ওইরকম পাথুরে পথেই বিছানো হল। এ-খানাও আমার রেকর্ড। কিন্তু এই জাতীয় ত্রুটির জন্য রেডিয়ো থেকে কোনো কৈফিয়ত দেওয়ার দরকার হল না অবশ্য। শ্রোতারা এসব নীরবে সহ্য করা অভ্যাস করে ফেলেছে। তাছাড়া এর একটা বড়ো দিক আছে। নতুন রেকর্ড কেনা মানে তা আমাদেরই অর্থ অপচয় করা। যেখানে খাদ্যদ্রব্য দুর্লভ. সেখানে জনসাধারণের অর্থ রেকর্ডে ব্যয় করা বিলাসিতা ভিন্ন আর কী?

এ-রকম অচল রেকর্ড এখানে চলে। নিড়লকে কোনোরকমে রেকর্ডের লাইনগুলি পার করিয়ে দেওয়া। আমি এ-জিনিসটাকে প্রশংসাই করি। পরে খেয়াল করে দেখেছি ত্রিশ বছরের পুরোনো রেকর্ডও বাজানো হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এতে কতই-বা টাকা বাঁচে। কিন্তু সমস্ত ভারতের প্রতি স্টেশনে যদি এই পদ্ধতি অনুসরণ করে, তবে তার যোগফল কম হবে না।

কিন্তু তবু যদি কোনো শ্রোতা আপত্তি করেন, বলেন, লাইসেন্সের টাকাটা তো দিতেই হচ্ছে, তবে তার বদলে আমরা এই দুঃখ সহ্য করব কেন? কিন্তু তাঁদের অবগতির জন্য জানাই, এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রেডিয়োতে নতুন ব্যাকরণের প্রবর্তন ঘটছে, সেদিকে বুঝি কেউ খেয়াল করেননি?

কোনো গায়ককে পরিচয় করিয়ে দিয়ে রেডিয়ো থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় পুরোনো ব্যাকরণ মেনে যা বলা উচিত, সে হচ্ছে, এখন শ্রী ক রবীন্দ্রসংগীত গাইবেন, এঁর প্রথম গান--। এঁর পরবর্তী গান—। অথবা রেকর্ডে শ্রী ক-এর রবীন্দ্রসংগীত শুনুন, এঁর প্রথম গান—। এঁর দ্বিতীয় গান—। কিন্তু রেডিয়োর নতুন ব্যাকরণে অধিকাংশ সময়েই শুনি—"এখন শ্রী ক-এর রবীন্দ্রসংগীত শুনুন, ইনি প্রথমে গেয়েছেন—। ইনি এর পরে গেয়েছেন—।"(রেকর্ড প্রতিষ্ঠানই জানেন পরে ঠিক ওই গানই তিনি গেয়েছেন কি না।)

এই ব্যাকরণের সুবিধা এই যে, এর অনুকরণে এখন বলা চলবে—"এখন শ্রী ক ভোজ খাবেন, ইনি প্রথমে খেয়েছেন —। ইনি এর পরে খেয়েছেন —। কিংবা এখন শ্রী ক-এর সঙ্গে শ্রীমতী খ-এর বিবাহ অনুষ্ঠান দেখুন। এঁদের সন্তানের নাম —, এবং তার পরের সন্তানের নাম —। অথবা এখন ফুটবল ম্যাচের ধারাবিবরণী শুনুন। প্রথমে ক দল এক গোল দিয়েছে, এবং পরে খ দল দুই গোল দিয়েছে! অথবা এখন শ্রী ক-এর চিত্রাঙ্কন দেখুন--ইনি প্রথমে এঁকেছেন নিসর্গ দৃশ্য, পরে এঁকেছেন মানুষের মূর্তি। অথবা আপনারা শ্রী ক-এর জলে ঝাঁপ দেওয়া দেখুন। ইনি জলে ডুবে মারা গিয়েছেন।

'বেতার-জগৎ'-এ রেকর্ডের প্রোগ্রাম লেখা থাকলেও 'ইনি গেয়েছেন" বলা পুরোনো ব্যাকরণসংগত নয়। বলা উচিত, এঁর প্রথম গান, এঁর পরবর্তী গান—। আর যেখানে স্টুডিয়ো রেকর্ডে গৃহীত কথাটি গোপন করতে হবে, সেখানে "অশ্বথামা হত ইতি গজঃ" নীতি চালাবার চেষ্টাতেই কি এই উদ্ভট ব্যাকরণ? এবং যদি কখনোও "স্টুডিয়ো রেকর্ড শুনুন" বলার সাহস থাকে তা হলেও কি 'ইনি গেয়েছেন" বললে ঠিক হবে? এঁর প্রথম গান এই, এঁর পরবর্তী গান এই বললে কি অপরাধ হয়? রেকর্ড-করা বক্তৃতার বেলায় তো 'ইনি বলেছেন" বলা হয় না?—তবে এই নব্য ব্যাকরণ কেন? (১৯৬৪)

আকাশবাণীর বিকৃত শব্দ এবং উচ্চারণ

... দিল্লির বাংলা খবরে নতুন কণ্ঠের নিযুক্তি প্রশংসাযোগ্য হয়েছে। কিন্তু আর যে দু-টি কণ্ঠ বিকৃত শব্দ এবং উচ্চারণ দিয়ে সংবাদকে শোনার প্রায় অযোগ্য করে তোলেন, তাঁদের কোনো উন্নতি লক্ষ করা গেল না। আগে কিছু কিছু নমুনা দিয়েছি। এখনও কদাচিৎ মন খারাপ থাকলে মজা অনুভব করার জন্য তাঁদের কণ্ঠ কিছুক্ষণ শুনি। একজন প্রায় প্রথম অক্ষরের উপর অবাঙালিসুলভ চাপ দিয়ে বসেন। 'ভারত' এমনভাবে উচ্চারণ করেন যাতে মনে হয় 'ভায়ারত'। মাত্রা হিসাবে ভাগ করলে বাংলা উচ্চারণে ভারত— 'ভা' এক মাত্রা, 'র' এক মাত্রা, ও 'ত' আধ মাত্রা। কিন্তু আকাশবাণীর সেই বিশিষ্ট উচ্চারণে দাঁড়ায় 'ভা' তিন মাত্রা, অন্যগুলি অবশ্য ঠিকই থাকে। এই উচ্চারণে 'তিনি'র 'তি' দুই মাত্রা ও 'নি' এক মাত্রা হয়। অর্থাৎ শোনা যায় 'তীইনি'। ওখানে প্রত্যেকের উচ্চারণ রেকর্ড করিয়ে শোনালে এবং ভুল দেখিয়ে দিলে তবে তার সংশোধন হতে পারে।

গত ২৮ আগস্ট, ১২ : ৪৫-এর খবরে শুনলাম "লকার্সগুলি", "খাদ্য মন্ত্রণালয়", "গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা দেশগুলি"। কেউ কেউ 'ফুট'-এর বেলায় বহুবচন হলেই ফিট বলেন—যথা তিন ফিট বা চার ফিট। অথচ তাঁরাই মাইলের বেলায় তিন মাইলস বা চার মাইলস বলেন না। বলেন না গাড়িখানা ঘণ্টায় ৬০ মাইলস বেগে ছুটছিল। অথচ ফুটের বেলায় বিড়ম্বনা। "সৈন্য" কথাটি যখন প্রায় সবাই রেডিয়োতে "সৈন" বলেন, তখন ও কথাটা সংবাদ বা নাটক থেকে বাদ দেওয়া উচিত। শান্তিনিকেতনে রিহার্সালে তৎকালীন এক ছাত্র (নাম সবাই জানেন) 'মেঘ' কে 'ম্যাঘ' বলাতে রবীন্দ্রনাথ কথাটি বদলে দিয়েছিলেন। এখানেও সৈন্যের জায়গায় 'সেনা' (সেনাদল) সৈনিক (সৈনিকদল), অথবা ফৌজ ইত্যাদিতে বদলে নেওয়া ভালো। সৈন্য বা দৈন্যকে সৈন বা দৈন উচ্চারণ করার অর্থ কী বোঝা যায় না। কারও কানেই কি লাগে না?

একই ভুল বেশিদিন চললে সেটা এমন ছড়িয়ে পড়বে যে তা থেকে শ্রোতাদের ছাড়ানো শক্ত হবে। ...দিল্লি ও কলকাতা দু-জায়গা থেকেই বলা হয় "অত্যাবশ্যকীয়"। অত্যাবশ্যক কথাটিই তো বিশেষণ। তার উপরে আবার অনাবশ্যক (অনাবশ্যকীয় নয়!) লেজুড় সংযোগে ডবল বিশেষণ করা কেন? আবশ্যক বিশেষণ, আবশ্যকতা বিশেষ্য। 'অনাবশ্যকীয়' যখন বলি না, তখন 'অত্যাবশ্যকীয়' কেন? (১৯৬৪)

আকাশবাণীর দিল্লি কেন্দ্রের বাংলা

আকাশবাণীর দিল্লি কেন্দ্রের বাংলা সম্পর্কে আমি এই চিঠিখানি * পেয়েছি—

"আকাশবাণীর সংবাদ প্রচারে জানা হিন্দবাংলা শব্দ ও তদনুরূপ উচ্চারণ শুনে শুনে অসহ্য বোধ হওয়ায় আজ দিল্লি স্টেশন ডাইরেক্টরকে একটা চিঠি দিলাম এবং চিঠিব খসড়াটা আপনার অবগতির ও মতামতের জন্য পাঠাচ্ছি। ..."

পত্রলেখক যে যে ভুল সম্পর্কে দিল্লির কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেছেন তা সংক্ষেপে এই :

১ অ্যাটমস্ফিয়ারের প্রতিশব্দ রূপে "বাতাবরণ" ব্যবহার ঠিক হয়নি, এর প্রকৃত বাংলা আবহাওয়া অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

২ ইন্ডাস্ট্রি শব্দের বাংলা করা হয়েছে উদ্যোগ। বাংলায় ওর প্রতিশব্দ শিল্প। কারণ বাংলায় উদ্যোগ মানে আমরা কোনো কিছুর আয়োজন বা প্রস্তুতি বুঝি।

৩ প্ল্যানিং অর্থে পরিকল্পনা বলা হয় বাংলায়,—যোজনা নয়। যোজনা অর্থে বাংলায় বোঝায় দু-টি জিনিসের সংযোগ—যথা সার যোজনা। এর অর্থ সার পরিকল্পনা নয়।

পত্রলেখকের ইচ্ছা, যা বাংলায় স্বাভাবিক, তা-ই ব্যবহৃত হোক। হিন্দির সাহায্যে বাংলা শব্দ হটিয়ে দিলে তা বাংলা হবে না, অতএব হাস্যকর হবে।

কিন্তু পত্রলেখকের প্রথম আপত্তিটা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত হয়নি। বাতাবরণ কথাটি সংস্কৃত। বাত (মানে বায়ু) + আবরণ। যে-বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তাকে বাতাবরণ বলা চলে। আবহাওয়া আর অ্যাটমস্ফিয়ার এক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অ্যাটমস্ফিয়ার হচ্ছে আবহ। আর আবহাওয়া হচ্ছে ওয়েদার বা ক্লাইমেট। আজকের আবহাওয়া খারাপ বললে, আজকের ওয়েদার খারাপ বোঝায়, অ্যাটমস্ফিয়ার খারাপ বোঝায় না। যদি বোঝায় তাহলে তা পারিপার্শ্বিক অর্থেই বোঝাবে। পটভূমি অর্থে বোঝাবে। অর্থাৎ খানিকটা ভাবার্থে। কোথাও কোথাও হট্টগোল হচ্ছে সেখানে কেউ এসব মন্তব্য করতে পারে যে অ্যাটমস্ফিয়ার বড্ড খারাপ মনে হচ্ছে। অবশ্য শব্দালংকার রূপে সেখানে 'ওয়েদার'ও ব্যবহার করা

* পত্রলেখক হাজারিবাগের শ্রীভবানীচরণ সেন। পত্রটি আংশিক মুদ্রিত হল :—লেখক।

চলে—কিন্তু তা পারিভাষিক রূপে কখনো নয়। আকাশবাণী থেকে যদি ওয়েদার খারাপের বদলে আবহাওয়া খারাপ না বলে বাতাবরণ খারাপ বলা হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই ভুল হয়েছে। অতএব কথাটা ঠিক কোন স্থলে ওরা ব্যবহার করেছে, তার উপর তা ভুল হয়েছে কি না নির্ভর করছে।

পত্রলেখকের দ্বিতীয় আপত্তি—'উদ্যোগ', শিল্পের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহারের বিরুদ্ধে এটি ন্যায়সংগত আপত্তি। বাংলাতে ইন্ডাস্ট্রি উদ্যোগ নয়। বাংলায় এই অর্থে উদ্যোগ ব্যবহার নিন্দনীয়। কলকাতা শহরে গ্রামোদ্যোগে খাদির দোকান খুলে উদ্যোগ প্রচার হচ্ছে আগে থেকেই। এটি শিল্পের বদলে বাংলায় বীভৎস। কারণ মহাভারতে উদ্‌যোগ (বা উদ্যোগ) পর্ব নামক একটি পর্ব আছে, এবং তাতে কোথাও শিল্প প্রতিষ্ঠানের বা শিল্পোদ্যোগের কথা নেই। সেটিকে পরামর্শ বা আয়োজন পর্ব বলা চলে। যদি কেউ দেখাতে পারেন মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে অর্জুন দুর্যোধন শল্য যুধিষ্ঠির ইত্যাদি সমবেতভাবে (বা আকাশবাণীর নতুন ভাষায় বৃন্দভাবে) অথবা একা, কোথাও তাঁত প্রতিষ্ঠা করছেন অথবা ধাতু শিল্প বা অন্য কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠা করছেন অথবা কৃষ্ণ পুষ্পক রথ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডাইরেকটর হয়েছেন, তাহলে কৃতজ্ঞ হব। কিন্তু যদি কেউ উদ্যোগপর্বে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ খুঁজে না পান তাহলে বাংলায় ব্যবহৃত 'শিল্প' শব্দটির স্থলে উদ্যোগ যাতে না ব্যবহৃত হয় তার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করা দরকার। অভিযোগকারী পত্রলেখক তাঁর এই অভিযোগে প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়েছেন, সন্দেহ নেই।

তাঁর তৃতীয় আপত্তি, পরিকল্পনার বদলে যোজনা ব্যবহারের বিরুদ্ধে। এটিও যুক্তিসংগত আপত্তি। যোজনার বাংলা মানে হচ্ছে একত্র-করণ, সংঘটন। আবার যোজক সেই অর্থে ইস্‌মাস বা ইসথ্‌মাস—ভূগোলের ছাত্ররা জানে। হিন্দি যোজনা অর্থে যদি পরিকল্পনা হয়, তাহলে তাদের ভাষায় ইসমাসকে কী বলে জানি না, হয় তো তারা বাংলায় ভূগোল পড়তে গেলে যোজক মানে পরিকল্পনাকারীকে বুঝবে। বাংলা সংবাদে বাংলায় ব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগই অত্যাবশ্যক বিবেচিত হওয়া উচিত। না হলে অবিরাম প্রতিবাদ দরকার এবং 'বৃন্দ' কণ্ঠে 'বৃন্দ' উদ্যোগে। 'বৃন্দ' শব্দও এইভাবে বাংলা ভাষায় ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়। বীভৎস শোনায়।

বাংলা ভাষায় কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ নেই এখন। যাঁরা ভাষার পণ্ডিত তাঁরা ভাষা-প্রেমিক নন। তা যদি হতেন তাহলে আকাশবাণীর সাধ্য কি

দেশময় ভুল ভাষা প্রচার করে? আরও মজার কথা এই যে, ভুল বাইরের কেউ দেখিয়ে দিলেও তা অগ্রাহ্য করা হয়। আবার ইংরেজি উচ্চারণ এবং ভাষাতেও এখন যথেষ্ট ভুল প্রচার করা হয়। যুদ্ধে ব্যবহৃত বোমার ইংরেজি বম্ব নয়, বোমারু বিমানও বম্বার নয়, এবং বোমা ফেলা বম্বিং নয়। হবে বম্, বমার এবং বমিং। কিন্তু অনেকেরই মুখে 'ব' উচ্চারিত হচ্ছে। কয়েক দিন আগে এক্সটারনাল সার্ভিসে ৩-৪০-এর আলোচনায় "আর্চিপিলেগো" শুনলাম। কলকাতা স্টেশনকে সংশোধন করা যায়নি কয়েকটি ব্যাপারে। ১১ই নভেম্বর ৭ : ৪৫-এর সংবাদ সমীক্ষায় পারমাণবিকের স্থলে আণবিক বলা হয় কয়েক বার। বীরগাথার স্থলে বীরগাঁথা, গাইছেন বা বাজাচ্ছেন-এর বদলে গেয়েছেন বা বাজিয়েছেন ব্যবহার একেবারেই চলে না। অথচ এখানে চলে। এর প্রতিকারে 'ডিফেন্স অফ বেঙ্গলি রুল' জাতীয় কিছু হওয়া উচিত।

আর একটি শব্দের অপব্যবহার অত্যন্ত বেশি শোনা যাচ্ছে আকাশবাণীতে। শব্দটি—"অবদান"। যেকোনো ব্যাপারে বলা হয় তিনি অবদান রেখে গেলেন, বা এ-বিষয়ে তাঁর অবদান অনেক। দান আর অবদান এক নয়। দান কথাটা জাতিচ্যুত হল কেন? অবদান মানে কী তা জেনে লিখলেই তো হয়। চাঁদাও দান, চাঁদা কখনো অবদান নয়। বিক্রম প্রকাশ, সাহসের কাজ, জয়লাভ, মহৎ কীর্তি এই সব বোঝাতে অবদান ব্যবহৃত হয়।

'বেতার-জগতে' মূল হরফ থেকে গানের লাইন বাংলায় লিপ্যন্তর করা হয়। বেশিরভাগ সময় রবীন্দ্রসংগীত মার খায়। অন্য সংগীতও বাদ যায় না। সম্প্রতি দেখছি অন্য বিভাগেও সেই একই কাণ্ড। বাই-ধৈর্যং এর স্থলে রাই ধার্যং। এসব সহ্য হয়ে গেছে এবং রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম কথাগুলো আর ছাপা হচ্ছে না । এটা ভালোই। (১৯৬৫)

পরিলক্ষিত

ছোটো ছেলের জ্বর হয়েছিল। মা তার মুখে থার্মোমিটার লাগিয়ে তাপমাত্রা দেখছিলেন, ছেলেও তাপমাত্রা দেখায় ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, মা, জ্বর কত ডিগ্রি পরিলক্ষিত হল? মা তো এমন ভাষা শুনে অবাক। বললেন, পরিলক্ষিত হল, এ আবার কী কথা? 'কত দেখলে'? বললে ভালো হত না? ছেলে বলল, অন্য সব ব্যাপারে ভালো হত, কিন্তু তাপমাত্রা দেখার বেলায় পরিলক্ষিত হল বলতেই হবে। কারণ কথাটা শুনতে বেশ, এবং

শিক্ষিত পণ্ডিত লোকের কথা। এতে তুমি আপত্তি করছ কেন? মা বললেন, সবসময় বললে আপত্তি নেই, কিন্তু বেছে বেছে তাপমাত্রার বেলায় বললে আপত্তি করব না কেন?

ছেলে তখন জ্বরের কথা ভুলে মাকে বোঝাতে লাগল। বলল মাথার কাছে রেডিয়োতে আর সব জিনিসের বেলায় বলে, 'দেখা গেল' কিন্তু আবহাওয়ার খবরে সবসময়েই বলে তাপমাত্রা "পরিলক্ষিত হল" এত ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাই আমিও ঠিক করেছি তাপমাত্রার বেলায় "পরিলক্ষিত" বলব। তুমি যে বললে, কথাটা সবসময় সবার বেলায় ব্যবহার করলে আপত্তি হত না। কিন্তু আমি যদি বলি আমার জন্য যে-বিস্কুট রেখেছ টেবিলে তাতে অনেকগুলো পিঁপড়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাহলে তোমার আপত্তি নেই? যদি বলি বাইরের পথে একটা ষাঁড় পরিলক্ষিত হচ্ছে তাহলে আপত্তি নেই? কিংবা যদি বলি আকাশে মেঘ পরিলক্ষিত হচ্ছে, বৃষ্টি হবে বোধ হয়, তাহলে আপত্তি নেই? যদি বলি ওই দেখ পথে বাবাকে পরিলক্ষিত হচ্ছে তাহলে আপত্তি করবে না তো?

২৩শে মে সকালবেলা ৬-২০তে বাংলা সংবাদে শুনলাম 'সমৃদ্ধশালী', দিল্লির খবরেও দু-এক বার শুনেছি। কার শালী সমৃদ্ধ তা বলা হয় না। তা যদি নিষেধ থাকে তবে সমৃদ্ধিশালী নামক বাংলা কথাটা বলায় ক্ষতি কী? কারও শালী সম্পর্কে এমন পক্ষপাত ভালো মনে হয় না। রেডিয়োতে কোনো স্থানের 'উদ্দেশ্যে' বলা, কোনো লোকের 'উদ্দেশ্যে' বলা—এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়ায় যেমন, "বই কেনার উদ্দেশ্যে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি।" এর দ্বিতীয়টা 'উদ্দেশে' হবে। উদ্দেশ্যে ইংরেজি টু বা টুয়ার্ড-এর ঠিক বাংলা নয়। উদ্দেশ্য 'পারপাস' রূপেই ব্যবহৃত হয়। বই কেনার উদ্দেশ্যে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করছি, তাহলে ঠিক হয়। উদ্দেশ্য মতলব। কলকাতার উদ্দেশ্যে বললে কলকাতার মতলবে বোঝায়। যদিও বাংলা দু-টি শব্দের অর্থে সামান্যই ভেদ আছে। তবু ব্যবহারে সেটুকুই রাখা উচিত। তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য (মতলব) কী, বলা চলে। কিন্তু তোমার এখানে আসার উদ্দেশ কী বলা চলে না।

"আমি যে গান গাই জানিনে সে কার উদ্দেশে"—রবীন্দ্রনাথের একটি গান। উদ্দেশে বলা হয়েছে উদ্দেশ্যে নয়। কোনো স্থান বা কোনো ব্যক্তির উদ্দেশে। কিন্তু কোনো কাজের উদ্দেশ্যে নয়। সে কোথায় তার উদ্দেশ নেই

অর্থাৎ সে নিরুদ্দেশ। কিন্তু সে কোথায় গেছে তার উদ্দেশ্য নেই বললে সে নিরুদ্দেশ্য বোঝায় অর্থাৎ লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন। রেডিয়োর সংবাদ বিভাগ এদিকে মন দিলে ভালো হয় না কি? (১৯৭২)

ব্যাকরণ আক্রান্ত

সেদিন অবদান সাপ্লাইয়ের কথা বলেছি। আমি কয়েক প্যাকেট অবদান সংগ্রহ করতে চাই, কিন্তু কীভাবে পাওয়া যাবে জানি না। রেডিয়োর মারফত শুধু কথাটি শোনা যায়। বলা হয়, 'এই কাজটি বা এই বন্দোবস্ত এ-বিষয়ে যথেষ্ট অবদান জোগাবে।' এই শব্দটি কি তা হলে কেবল উচ্চারণের সুবিধার জন্য? অর্থ যাই হোক?

রেডিয়ো অনেক শব্দ ও ইডিয়ম, তার কারখানা ঘরে তৈরি করে বাঙালি শ্রোতাকে উদ্ভ্রান্ত করছে। যেমন যার গান শুনলাম, শোনামাত্র বলা হল গান শুনলেন, গেয়েছেন অমুক। গেয়েছেন মানে কী? তখুনি তো গাইলেন? গায়ক বা গায়িকা অদৃশ্য থাকলেই কি ব্যাকরণের কাল উলটে যাবে? তিনি টেপের ভিতর দিয়েই গান বা মাইক্রোফোনের ভিতর দিয়েই গান—বর্তমান কাল অতীত কাল হল কেন? গেয়েছেন অন্য কথায় শুনিয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীত শুনলেন, শুনিয়েছেন অমুক। এরকম বললে ব্যাকরণকে অমান্য করা হয়। গেয়েছেন বা শুনিয়েছেন একই অর্থবহ। এরই মধ্যে যে দু-এক জন ঘোষকের কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাঁদের মুখে শুনেছি—(৪মে, ৯ : ৫-এর রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে) প্রথমে বলেছেন, শোনাচ্ছেন এবং গান শেষে বললেন শোনালেন অমুক। ভালো লাগল শুনে। কিন্তু প্রকাশ করে অন্যায় হল না তো? ঘোষক তিরস্কৃত হবেন না তো? উদ্‌যোগ শব্দটি এখনও মাত্র এক জনের মুখে উদ্‌যোগ রয়ে গেছে।

শুনিয়েছেন অমুক বা গেয়েছেন অমুক এই অতীতকালে বোঝানোর যে কী দরকার তা খুব দুর্বোধ্য নয়। আমার প্রতিপাদ্য : রেডিয়ো বাংলা ভাষাকে নানা দিক থেকে আক্রমণ করবে বলে প্রস্তুত হয়েছে। ইংরেজি উচ্চারণও বিকৃত করা হয়ে থাকে এখানে। সে-কথা পরে বলছি। গান শুনলেন শুনিয়েছেন বা গেয়েছেন অমুক এরকম এক উদ্ভট ব্যাকরণ অন্য কেউ উচ্চারণ করতে সংকুচিত হতেন, কিন্তু রেডিয়োর অধিকাংশ ঘোষণাকারী (মেয়ে বা পুরুষ) অম্লানবদনে ব্যাকরণ বধ করে থাকেন। হয়তো-বা

ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের দোষ নেই, হয়তো আদেশ আছে ওইরকম বলতে হবে। মশা যেমন ম্যালেরিয়ার অথবা ফাইলেরিয়াসিস নামক ব্যাধির জীবাণু নিজ দেহে বহন করে, অথচ এ তার ইচ্ছাকৃত বলে নয়, এও তেমনি। যাঁরা অন্যায় ঘোষণা করেন তারা বাহক মাত্র, নিজেরা নির্দোষ। তবু যিনি ৪ তারিখে ৯ : ৫-এর ঘোষণায় রবীন্দ্রসংগীত শুনলেন, গাইলেন শ্রীমতী অমুক—বললেন, তিনি নিশ্চিত রেডিয়ো আইন ভঙ্গ করেছেন সাহসের সঙ্গে। মনে হয় গেয়েছেন না বলে যদি ওখানকার ভাষা বদল করে বলা হয় রবীন্দ্রসংগীত শুনলেন, গেয়েছিলেন বা শুনিয়েছিলেন অমুক তাহলে আর কেউ সহসা আইন ভঙ্গ করতে সাহস পাবেন না। অথচ গেয়েছিলেন অতীত কাল রূপে আরও স্পষ্ট হতে পারে।

বহু দিন আগের ডিস্‌ক রেকর্ড বাজিয়ে তো অনায়াসে বলা যায় এই যে গান শুনলেন এটি গত বছর বা এক যুগ আগে গেয়েছিলেন অমুক। দূর অতীত আরও স্পষ্ট হবে তাতে। যাঁর নিজকণ্ঠ শুনলাম তিনি গাইলেন। গেয়েছেন নয়, গেয়েছেন বলা ব্যাকরণকে ভ্যাংচানো। গানটার লেখককে সবসময়েই বলা যায় লিখেছেন অমুক। সংবাদ সমীক্ষায় বলা হয় এটি লিখেছেন অমুক তেমন বলা ঠিকই হয়, কারণ সেই লেখা পড়ছেন আর একজন। লেখক নিজে লিখে যদি নিজে শোনান, তা হলেও কি ঘোষণা করা চলবে লিখেছেন এবং পড়ে শুনিয়েছেন অমুক? না কি লিখেছেন এবং পড়ে শোনালেন হবে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজ কণ্ঠে আবৃত্তি-সহ সিনেমার ছবি দেখেছিলাম বহুদিন আগে। নিউ থিয়েটার্সের তোলা সে-ছবি। চমৎকার আবৃত্তি ও ছবি। দাঁড়িয়ে দু-টি কবিতা আবৃত্তি করলেন। তার একটি 'মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে'। সেই আবৃত্তি শেষে যদি কেউ ঘোষণা করতেন এটি পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাহলে কতখানি হাস্যকর হত তা বোঝা কি এতই কঠিন? ঘোষক বলবেন ও তো রবীন্দ্রনাথ নন, ওটি তাঁর ছায়ামাত্র। তাই আবৃত্তি করলেন কী করে বলি? আবৃত্তি করেছেন বললে আদালতে তা গ্রাহ্য হবে। রেডিয়োতেও তা-ই হচ্ছে।

একটি ছেলে এসে বলল, আমাদের সুবডিভিশনের স্কুল সুবইন্সপেক্টর এসেছিলেন। তিনি স্কুল পরিদর্শন করে খুশি হয়েছেন। সে-সময়ে এক খবরের কাগজের সুব-এডিটর উপস্থিত ছিলেন, তিনি একটি কাজে

এসেছিলেন হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে। আমি বললাম 'সুব' উচ্চারণ করছ কেন? এস ইউ বি তো সাব হয়। ছেলেটি বলল রেডিয়ো থেকে শিখেছি। ওখানে সবসময় সাব্‌আরব্যানকে সুবআরব্যান বলে। রেডিয়ো এতবড়ো সরকারি প্রতিষ্ঠান কি আর না জেনে বলে?

কিছু আর বলবার ছিল না। বললেই হয়তো গণ্ডগোল বাধবে পুলিশ সুবইন্সপেক্টরের ডাক পড়বে। কাজ কী হাঙ্গামায়। কিন্তু গত ৯ই মে, কৃষ্ণনগরের বাস দুর্ঘটনায় আহতদের এক জন হাসপাতালের পথে নিহত হয়েছেন বলা হল (রাত ৭ : ৫০ মিনিটের স্থানীয় সংবাদে)। কে আহত লোকটাকে মার্ডার করল তা বলা হল না। নিহত হওয়া মানে তো তাই। এ-কথা যদি মিথ্যা হয় যদি কেউ তাকে হত্যা করে না থাকে তবে খবরটি পুলিশের দৃষ্টি এড়াল কী করে?

জনৈক জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেণি) আমাকে জানিয়েছেন, 'কলিকাতা ও শিলিগুড়ি দু-টি স্টেশনেই ঘোষিত হয় শুনেছি মহকুমা শাসক ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা জারি করেছেন।' আমি নিজে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, ওটা ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা হবে ভারতীয় দণ্ডবিধির নয়। দু-টি স্থানেই লিখেছিলাম, কেউ জবাব দেননি। (১৯৭৪)

আরও কিছু অসঙ্গতি

অবদান

এই শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ 'দান' অর্থে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে "প্রেরণা" অর্থে অন্যায় ভাবে ব্যবহৃত হয়।

অবশ্য অবদানের একটি অর্থ দান, কিন্তু তা গিফ্‌ট বা উপহার। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে অবদান অর্থে—

১। পূজা বা অর্চনার্থে দান

২। দান, উপহার বা গিফ্‌ট

৩। সম্পাদিত কর্ম

৪। বিক্রম প্রকাশ, সাহসের কার্য

৫। কীর্তি

৬। ছিন্নাংশ

৭। শোধন

৮। পালন

৯। খশখশ

কাজেই যখন বলা হয় এ কাজ যথেষ্ট অবদান জোগাবে তখন অর্থ স্পষ্ট হয় না। দান শুনতে খারাপ সেজন্যও অনেকে অবদান লেখেন। তাহলে এই যুক্তিতে মানকে অবমান বলতে হয় এবং মানপত্রকে বলতে হয় অবমান পত্র। অবদান শব্দের অপব্যবহার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশ'-এ কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ বর্ষণ করেছেন। এর সঙ্গে আরও কয়েকটি শব্দ—যেমন সংস্কৃতি অর্থে কৃষ্টি, এডিটোরিয়াল কলমের বাংলা সম্পাদকীয় স্তম্ভ, কম্পালসরি (সাবজেক্ট) বাধ্যতামূলক। যথা—

গোলাম। না মহারাজ, এ (কৃষ্টি) মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন, নবতম অবদান...

রাজা। তোমার পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভ আছে তো?

গোলাম। দুটো বড় বড় স্তম্ভ।

রাজা। সেই স্তম্ভের গর্জনে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিতে হবে।...

গোলাম। বাধ্যতামূলক আইন চাই।

রাজা। ওটা আবার কী বললে? বাধ্যতামূলক আইন।

গোলাম। ...এও নবতম অবদান। ('বাধ্যতামূলক' কথাটি পরে পরিবর্তিত হয়ে 'আবশ্যিক' শব্দটি এসেছে।)

অবদানের অপপ্রয়োগ নিয়ে এককালে শনিবারের চিঠিতে খুব ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। ভিখারি এসে বলবে, আমাকে কিছু অবদান করুন?

অংশগ্রহণ

ইংরেজি 'টু টেক পার্ট'-এর প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। এই শব্দটিও সর্বত্র কানে বাজে। "এই ব্যক্তিগণ খেলায় যোগ দিচ্ছেন" না বলে অংশগ্রহণ করছেন বলা হয়। যোগ দেওয়া কথাটা প্রায় উঠেই গেল। বিশ্বভারতী পত্রিকায় নিয়মিত ভাষার অপপ্রয়োগ বিষয়ে শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী এককালে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর মুখে শুনেছি এক অভিনেতা তাঁকে বলেছিলেন তিনি রামের অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সুধীরকুমার জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোন্ অংশ? এই ভাষায়, ভোজনে রত যদি কেউ বলেন, আমি এখন মাছের অংশ গ্রহণ করছি, অথবা সন্দেশের অংশগ্রহণ করছি তা হলে তা হাস্যকর শোনাবে। রামের 'ভূমিকা গ্রহণ' বলাটাই প্রচলিত, অংশগ্রহণ প্রচলিত নয়। কোনো সভায় যাঁরা বক্তৃতা দেবেন, তাঁদের বিষয়ে অনায়াসে বলা যায় তাঁরা সভায় যোগ দেবেন। "অংশগ্রহণ" করবেন কথাটা বড্ড ইংরেজিগন্ধী। খেলায় যোগ দেবেন ক্ষতি কি? অংশগ্রহণ কথাটা বলতেই হবে কেন? যোগ দেওয়া বাতিল হবে কেন? একটা নতুন কথা পেলে তাকে ছাড়া শক্ত।

দ্বিতীয়া বা চতুর্থীতে বহুবচনে 'কে' নতুন যোগ হল

এ জিনিস গত ১৯৭১ সন থেকে অতিমাত্রায় বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে, চলতি ভাষায় এ জিনিস ছিল না। যেমন, 'শেয়ালদের কুকুরে তাড়া করেছে' না বলে 'শেয়ালদেরকে কুকুরে তাড়া করেছে', বলছেন অনেকে। "কে" যোগের নজির বাংলা সাহিত্যে নেই। 'তাদের' খেতে দাও না বলে, 'তাদেরকে' খেতে দাও পূর্ববঙ্গীয় প্রাদেশিকতা। সৎসাহিত্যে এদেশে "কে" নেই। উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

- তাদের যেমন এক একটি স্বতন্ত্র লোকের মত মনে হয়, ছন্দের দ্বারা কবিতা সেইরূপ এক একটি মূর্তিমান অস্তিত্বের মতো। (তাদেরকে নয়)—ছিন্নপত্র ১৮৯৩।
- কোনো সামান্য শক্তি তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। (তাদেরকে নয়)—ছিন্নপত্র।
- তাদের, আগাগোড়া সেই উদ্দেশ্যে গঠিত করে দিয়েছে। (তাদেরকে নয়)—ছিন্নপত্র ১৮৯৬।
- ঋষিরা যাদের বলেছেন...
  —অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাগেশ্বরী প্রবন্ধ ১৯২১-২৯। (যাদেরকে নয়)।
- রিদয় তোদের একবার...
  —অবনীন্দ্রনাথ, বুড়ো আংলা (তোদেরকে নয়)।
- নিজেদের সকলপ্রকার ত্রুটির জন্য পূর্বপুরুষদের দায়ী করি।......
  —প্রমথ চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের নবযুগ (পূর্বপুরুষদেরকে নয়)

খুব সামান্যই উদ্ধৃতি দিলাম, এবং মনে হয় এই যথেষ্ট। এই "কে" ল্যাজটি অবিলম্বে কর্তন দরকার।

আকর্ষণীয়

এই শব্দটি বর্তমানে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাকরণে অনীয় প্রত্যয় সম্পর্কে লিখছেন—যোগ্য বা কর্তব্য অর্থে ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয়। যেমন করণীয়, শ্রবণীয়, শোচনীয়, দর্শনীয়, ভোজনীয়, স্মরণীয়, রমণীয়, রক্ষণীয়, ভক্ষণীয় ইত্যাদি।

যোগ্য বা কর্তব্য অর্থে : ভোজনীয়—ভোজনের যোগ্য, স্মরণীয়—স্মরণের যোগ্য, বা স্মরণ কর্তব্য, ভক্ষণীয়—ভক্ষণের যোগ্য। অতএব আকর্ষণীয় মানে আকর্ষণের যোগ্য বা আকর্ষণ কর্তব্য—এই অর্থে ধরতে হবে।

পশুশালায় একটি নতুন জীব এসেছে, আমরা লিখি একটি আকর্ষণীয় জীব এসেছে। নাটকের অভিনয় বিশেষ আকর্ষণীয়। অথবা বক্তার ভাষণ বিশেষ আকর্ষণীয়। ঠিক উলটোটাই লিখি। যা আমাদের আকর্ষণ করবে বা করছে, তা আমাদের আকর্ষণীয় হয় কেমন করে? চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ

করে। সে ক্ষেত্রে চুম্বক আকর্ষক না হয়ে আকর্ষণীয় হয় কি করে? বাঘ নরখাদক হলে বাঘ নরের ভক্ষণীয় হয় কি করে? বাঘ ভক্ষক, ভক্ষণীয় নয়, তেমনি আকর্ষক বা চিত্তাকর্ষক না লিখে আকর্ষণীয় লিখি কেন? অলঙ্কারের শো-কেসে লেখা আছে, 'আমাদের আকর্ষণীয় ডিজাইনের অলঙ্কার'। এই অলঙ্কার দর্শককে আকর্ষণ করছে, না দর্শক অলঙ্কারকে আকর্ষণ করছে? কোনো চোর যদি সুনীতিকুমারের ব্যাকরণ পড়ে ঐ অলঙ্কারগুলি কাঁচ ভেঙে আকর্ষণ করে, তবে সে আত্মপক্ষ সমর্থনে অবশ্যই বলবে—লেখা আছে আকর্ষণের উপযুক্ত অথবা আকর্ষণ কর্তব্য, তাই আমি কর্তব্য করেছি। আমি ব্যাকরণের ছাত্র।

উদ্দেশ্যে—উদ্দেশে

এই দুটি শব্দের ব্যবহারে বিভ্রান্তি ঘটে। খুব সহজ একটি সূত্র বলি। "উদ্দেশ্য" মানে যদি মতলব ভাবা যায়, তা হলে আমি কখনই লিখব না আমার বইখানা আমার বন্ধুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি। "মতলব" ভাবলে মনে রাখা সহজ হতে পারে। কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ ভাবলে "উদ্দেশ্যে" লেখা চলে। কেনার উদ্দেশ্যে, ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ মতলবে।

দেবতা বা ব্যক্তি বা স্থানের 'উদ্দেশে'। উদ্দেশে নিবেদন করা, কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করা। খুব সহজ মনে রাখা। রবীন্দ্রনাথের গান— "আমি যে গান গাই জানিনে সে কার উদ্দেশে।" এখানে 'উদ্দেশ্য' লিখলে ভুল হত। 'কিসের উদ্দেশ্যে' বলা যায়, কিন্তু 'কার উদ্দেশ্যে' কদাপি নয়।

কার্যকরী কার্যকর কার্যকারী

'কার্যকর' অথবা 'কার্যকারী' লেখা উচিত। কিন্তু কে স্ত্রীলিঙ্গে কার্যকরী লিখেছিলেন, সেই থেকে অনেকেই সর্বত্র "কার্যকরী" ব্যবহার করেন। এমনকি "কার্যকরিতা"ও দেখেছি। 'কার্যকারিতা' এই শুদ্ধরূপ রেডিয়োতে শুনেছি অনেকের মুখে।

ভ্রমণটা সুখকর হয়েছিল না বলে যদি বলি ভ্রমণটা সুখকরী হয়েছিল, অথবা দুঃখকরী হয়েছিল তা হলে কি ঠিক হয়? ভাস্করকে ভাস্করী বলা কি ঠিক? কিংবা সুখজনককে সুখজনকী? মার্কিনকে মার্কিনী বলা হয় কেন?

মার্কিন মানে 'অ্যামেরিকান'। অযথা, দুজন মার্কিনী ভদ্রলোক এসেছিলেন মানে কি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "অ্যামেরিকা" যুক্তরাষ্ট্র নয়, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। তবে অযথা কোনো ভদ্রলোককে দেখলেই মার্কিনী ভদ্রলোক বলা হবে কেন?

এন্ড এ্যান্ড য়্যান্ড অ্যান্ড

বহু পূর্বে 'অ্যান্ড'কে 'এন্ড' লেখা হয় তাতে অসুবিধা বেশি হয়নি। কিন্তু আধুনিক কালে ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত উচ্চারণের দিকে ঝোঁক পড়েছে। অতএব এখন 'অ্যান্ড' লেখাই যুক্তিসঙ্গত। এ্যান্ড বা য়্যান্ড কদাপি নয়। 'এ্যান্ড' লেখা অন্যায় কেন বলি। বাংলা উচ্চারণের দিক থেকে "ধ্যান" শব্দের 'ধ্' বাদ দিলে অ্যান থাকে। ম্যান শব্দের 'ম্' বাদ দিলে অ্যান থাকে। ধ্যানকে ধ্যোন বা ম্যানকে ম্যোন লিখি না। 'গ্র্যান্ড' থেকে 'গ্র' বাদ দিলে অ্যান্ড থাকে। আগেই বলেছি এটি বাংলা উচ্চারণের ব্যাপার। অতএব and কে 'অ্যান্ড' লেখাই ভালো। য়্যান্ড কদাপি নয়। 'য়'-এর উচ্চারণ ইয়। য়ুরোপযাত্রীর পত্রকে অনেকে পড়েন উরোপযাত্রীর পত্র। য়্যান্ড-এর উচ্চারণ "ইয়ান্ড"।

দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ

ইংরেজি নাম বা শব্দের প্রতিলিপিতে সংস্কৃত ষত্ব ণত্ব চলে না। যদি চালাতেই হয় তবে ষত্ব ণত্ব মান্য করা উচিত। সংস্কৃত শব্দরূপে :

নরঃ নরৌ 'নরান্' (দন্ত্য ন)

নরেণ নরাভ্যাং নরৈঃ ইত্যাদি।

এখানে নরান্ রয়ের পরে ন আছে মূর্ধণ্য 'ণ' হয় নি। কিন্তু নরেণ-এ মূর্ধন্য 'ণ' হয়েছে। অতএব জার্মান লিখতে মূর্ধন্য 'ণ' ভুল। 'ন' যখন হসন্তক হয়, তখন তার পূর্বে 'র' থাকলেও সেটি দন্ত্য 'ন' হয়। সেই জন্য 'নরান্' হয়েছে, "নরাণ" হয়নি। জার্মান শব্দে হসন্তক দন্ত্য 'ন', তাই জার্মান শব্দে দন্ত্য 'ন'। এটি না জেনে 'র' দেখলেই যিনি বিচলিত হয়ে তারপর মূর্ধন্য 'ণ' বসান—তিনি ভুল করেন। ফলে অনেক কাগজে হরেণবাবু, নরেণবাবুও দেখেছি।

সাথে—সঙ্গে

'সাথে' শব্দটি সম্পূর্ণভাবে পদ্যের ভাষা। গদ্যে 'সঙ্গে' ব্যবহার করাই সৎ সাহিত্যের রীতি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী—কেউ গদ্যে 'সাথে' ব্যবহার করেননি। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় মনে হয় তাঁর চরিত্রগত ঔদাসীন্যের ফলে 'ইছামতী' উপন্যাসে গদ্যে 'সাথে' ব্যবহার করেছেন। অথচ তিনি মোহিতলাল মজুমদারের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। মোহিতবাবু 'সাথে-সাহিত্য' নাম দিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গীয় ভাষার। গদ্যে 'সাথে' ব্যবহারের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং দেখলে উত্তেজিত হতেন। "সাথে" একমাত্র পদ্যে ব্যবহার হওয়াই বিধিসংগত—গদ্যে নয়। বাংলাভাষার বিখ্যাত যাবতীয় গ্রন্থে এই বিধি পালিত হয়েছে।

শব্দ ব্যবহারে বিচারের অভাব

'ফল' অর্থে 'ফলশ্রুতি' ব্যবহার এখনও চলছে। 'ফল' অর্থে যদি 'ফলশ্রুতি' হয় তবে আমি ফলশ্রুতি খাচ্ছি চলবে না কেন? ফলের সঙ্গে শ্রুতি যুক্ত আছে কেন কেউ কি বিচার করে দেখেন শব্দটি ব্যবহারের সময়? তারপর 'নীতীন্দ্র' নামটি কজন এই বানানে লেখেন? নীতি + ইন্দ্র = নীতীন্দ্র হয় নীতিন্দ্র কদাপি নয়। তেমনি জীবী—বুদ্ধিজীবীর 'জীবী' লেখেন অনেকে 'জীবি' রূপে। ধারণা : দুটি দীর্ঘ 'ঈ' পরপর হয় না. একটি নিশ্চয় হ্রস্ব 'ই' হয়। তাই নীতীনবাবুকে নীতিনবাবু রূপে দেখি। কিন্তু 'কৃতি' ছাত্র মানে কি? 'কৃতি' অর্থ কর্ম বা কুশলতা। যে ছাত্র কৃতিত্ব দেখায় সে 'কৃতী' ছাত্র, কৃতি ছাত্র নয়। অথচ প্রায় সর্বত্র দেখছি কৃতি ছাত্র বা কৃতি ছাত্রী। অর্থাৎ কর্ম ছাত্র বা কর্ম ছাত্রী। মানে হয় না।

গ্রীষ্মের দাবদাহ মানে কী?

সহজ কথা আমাদের কলমে সহজে আসে না। তাই ফলকে ফলশ্রুতি বানিয়েছি, দানকে অবদান বানিয়েছি, এবং শেষ পর্যন্ত গ্রীষ্মের দাহকে দাবদাহ বানিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। রাজশেখরবাবু আমাকে প্রথম এই দাবদাহ (forest fire) শব্দের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বলেছিলেন, বাধা দেবার উপায় নেই। গ্রীষ্মের ফরেস্ট ফায়ার মানে কী? "দাহ" কি

পোড়ানো অর্থে চলে না? যেমন যেখানেই ডাকাতি হোক, লেখা হয় দুঃসাহসিক ডাকাতি। আমি তো এমন ডাকাতি জানি না, যে ডাকাতিতে ডাকাতরা মুখে পাউডার মেখে, ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে গিলেকরা পাঞ্জাবি ও কোঁচানো ধুতি পরে শিস দিতে দিতে নিশ্চিন্ত মনে এসে ডাকাতি করে যায়। তা যদি না হয়, তা হলে ডাকাতি মাত্রেই 'দুঃসাহসিক' ডাকাতি হয় কেন? শুধু ডাকাতি লিখলে বড্ড নেড়া নেড়া লাগে? তাই কি ফল ফলশ্রুতি হল?

দ্বিত্ব বর্জনেও ঐ একই চিন্তার অভাব। তাই আমি যদি লিখি ধিক্কার, তবে অনেক স্থলেই তাকে 'ধিকার' করা হয়। ''তত্ত্ব'' হয় তত্ব, ''মহত্ত্ব'' হয় মহত্ব! ''ধিক্কৃত'' লিখলে ধিকৃত সর্বত্র করা হয়।

ইংরেজি উচ্চারণের কথা বলেছি আগে। একটি বাকি আছে। এর উচ্চারণ 'ব্রন্‌জ', ব্রোনজ নয়। একমাত্র লীলা মজুমদারের বাংলায় ঠিক উচ্চারণটি দেখেছি—ব্রন্‌জ। এ উচ্চারণ স্পঞ্জের (Sponge) মতন। স্পোঞ্জ নয়। যেমন, তেমনি 'ব্রোনজ' বা 'ব্রোঞ্জ' নয়। 'মেনিয়া' (mania) শুদ্ধ উচ্চারণ, ম্যানিয়া নয়।

ঢেলে সাজানো

মেয়ের পোশাক পরানোর ভার যার উপর তার কাজে মা খুশি হলেন না। বললেন, যে পোশাক পরিয়েছ, ওটা 'ঢেলে ফেল', তারপর ভালো পোশাকে মেয়েকে সাজাও। বাগানের প্ল্যানটা পছন্দ হল না, মালিক মালি-কে বললেন, যা প্ল্যান করেছ, ওটা ঢেলে ফেল।

কিন্তু এ রকম কেউ বলে কি? এ কী বাংলা?

যদি না হয় তবে সব ব্যাপারেই কেন বলা হয় ঢেলে সাজানো দরকার?

ঢেলে সাজানো নয়, 'ঢেলে সাজা'। ওটা কলমের পোড়া তামাক ঢেলে সাজার (সাজানোর নয়) ব্যাপার। যদি 'ঢালা' ব্যবহার করতেই হয় তবে 'সাজা দরকার' বলতে হবে, 'সাজানো' নয়। কারণ ইডিয়মটি 'তামাক সাজা,' তামাক সাজানো নয়। তামাক সেজে আন, পান সেজে আন। তামাক সাজিয়ে আন, পান সাজিয়ে আন—বাংলা নয়। 'ঢেলে সাজা দরকার, হাজারে একটি হয় তো দেখেছি। এ সবই বিনা বিচারে ভাষার বা ইডিয়মের অপব্যবহার।

কয়েকটি মাত্র বলা গেল। অনেক আছে। যেমন sluice gate-কে স্লুইস গেট বলা হয়। ওটা "স্লুস" হবে। cruise, cruiser, 'ক্রুজ' 'ক্রুজার,' ক্রুইজ, ক্রুইজার নয়।

নারী চোরাচালানীরা কি সব মহিলা

খবরের কাগজে মাঝে মাঝে পড়ি চালের চোরাচালানে যারা ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে দুজন বা একজন মহিলাও ছিল। আমার কথা হচ্ছে এ রকম স্থলে মহিলা শব্দ ব্যবহার করা ঠিক কিনা। আবার স্কুলের মেয়েরা যখন খেলাধূলায় মাতে তখনও তাদের বিষয়ে বলা হয় মহিলাদের ক্রিকেট বা অন্য কোনো খেলা। অভিধানে 'মহিলা' মানে ভদ্ররমণী (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস) ; মদমত্তা স্ত্রী (আশুতোষ দেব)। মহিলার আর এক অর্থ নারী। কিন্তু ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে (ব্যবহার—ব্যাবহারিক) মহিলা ও স্ত্রীলোক অথবা নারী পৃথক অর্থে ব্যবহার করলে ভাষার মান বাঁচতে পারে। আমাদের কোনো কিছুই যেন খুব দৃঢ় নয়, শিথিল। ভাষা ব্যবহারে এই শিথিলতা লক্ষণীয়। শব্দে শব্দে ভেদ তুলে দিলে নানা অসুবিধা আছে। নারী অর্থে ললনা, রমণীও হয়। কিন্তু নারীদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে কেউ ললনা শিক্ষা, ললনা স্বাধীনতা বা রমণী শিক্ষা, স্বাধীনতা বা মহিলা শিক্ষা, স্বাধীনতার কথা তোলেননি, সব সময় নারী শিক্ষা বা নারী স্বাধীনতা অথবা স্ত্রী শিক্ষা বা স্ত্রী স্বাধীনতার কথা উঠেছে। কাজেই 'উইমেনস ইয়ারে'র অনুবাদ নারীবর্ষ করাই ঠিক হয়েছে। কিন্তু তবু মহিলাবর্ষ অনেকেই বলেন। ইংরেজিতে দু'রকম বলে না, কারণ তাদের ভাষা ব্যবহারে শিথিলতা নেই। বাংলা ভাষায় মহিলা অর্থে ভদ্র রমণী ভেবে নেওয়াই ঠিক, এবং তাতে চালের চোরাচালানে স্ত্রীলোক বা নারী ধরা পড়েছে লেখা উচিত। মহিলা বলতে যে ভদ্র রমণী বোঝায় এ কথা মনে রাখতেই হবে। এবং তা হলে সত্যই যাঁরা মহিলা নন, তাঁদের নাম মহিলা শুনলে মনে আঘাত লাগবে। কোনো মহিলার চোর হতে বাধা নেই, কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাঁকে সত্যই ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মহিলা হওয়া চাই। পার্থক্যটা রাখতে। ইংরেজিতে উওম্যান সাধারণভাবে চলে, কিন্তু লেডি বললে তাদের ভাষায়:

- A female head of a household : mistress.
- A woman having proprietary right or authority specially as a feudal superior.
- A woman of superior social position.
- Woman, female.
- A woman of refinement.
- Wife etc.

একটি অর্থ স্ত্রীলোক বা স্ত্রী সম্প্রদায়ের লোক হওয়া সত্ত্বেও যেকোনো স্ত্রীলোককে ইংরেজরা লেডি বলে না। চাল চুরির ক্ষেত্রে যে সব স্ত্রীলোক ধরা পড়ে তারা ইংরেজ মেয়ে হলে কখনও 'লেডি স্মাগলার' বলত না। উওম্যান বলত। শব্দের ব্যবহার বিষয়ে তারা খুব সাবধান। একটু এদিক ওদিক হলেই হই হই। খবরের কাগজে চিঠি বেরোয়। কৌতুককর ভুলের কলমে তার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে আমাদেরও শেখবার আছে। আমরা যেন "মহিলা" ভদ্ররমণী অর্থেই ব্যবহার করি। সব ভদ্ররমণীই নারী, কিন্তু সব নারী ভদ্রমহিলা নয়। নারী বর্ষে শুধু লেডিদের উন্নতিই আলোচিত হয়নি, উওম্যান শ্রেণির (যার মধ্যে লেডিও আছে) উন্নতি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অতএব মহিলাবর্ষ এটা ছিল না। ছিল কলকাতায় একটি নারীবর্ষ। মেয়েদের কলেজ আছে তার নাম উইমেনস কলেজ,—লেডিজ কলেজ নয়। উইমেনস কলেজ সঙ্গত নাম। নারী শিক্ষায়তন, নারী কর্মমন্দির—প্রভৃতি সঙ্গত নাম। শব্দ ব্যবহারের বেলায় যার যা খুশি, বাংলা ভাষার স্বার্থে বন্ধ করা উচিত।

পদবি ও তার সঙ্গে শ্রী-র ব্যবহার কি অত্যাবশ্যক?

বাঙালিদের মধ্যে শুধু নয় বাংলার বাইরেও হিন্দুদের নামের সঙ্গে 'বাবু' ব্যবহৃত হত এবং তা সম্মানজনক ছিল। কিছুদিন হল নাম বাদ দিয়ে পদবির সঙ্গে ইংরেজের অনুকরণে 'শ্রী' ব্যবহৃত হচ্ছে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিখ্যাত কংগ্রেস কর্মী ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। তাঁকে সবাই সম্মান দেখাতেন রাজেন্দ্রবাবু বলে, শ্রীপ্রসাদ বলে নয়। শ্রী যদি ব্যবহার করতেই হয়, তবে নামের সঙ্গে করা সঙ্গত, পদবীর সঙ্গে নয়। শ্রীঅরবিন্দ যেমন। তিনি কখনোই শ্রীঘোষ ছিলেন না। আমাদের এক একটা পদবি

হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের পদবি। যদি পাঁচ জন দে বা পাঁচ জন ঘোষ একত্র হয়ে কিছু আলোচনা করেন, তবে তার রিপোর্ট লিখতে হবে কীভাবে?

"শ্রীঘোষ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। শ্রীঘোষ তার প্রতিবাদ করলেন। শ্রীঘোষ শ্রীঘোষের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কিন্তু শ্রীঘোষ বললেন শ্রীঘোষ যা বললেন তাই ঠিক। প্রস্তাবটি প্রতিবাদযোগ্য। শ্রীঘোষ বললেন দু'জনের বক্তব্যই বিবেচনা করে দেখা উচিত।"

পদবির আগে 'শ্রী' ব্যবহার করলে বিশেষ করে বাঙালি হিন্দুদের বিষয়ে কিছু রিপোর্ট এই রকমই হাস্যকর হয়ে উঠবে। এক পরিবারের ব্যাপার হলে আরও জটিল। ঠাকুর পরিবারের পনেরো ষোলজন বসে আলাপ করলে তার পরিণাম কী? বর্ণনাটা কীভাবে হবে? এখানে সহজেই শ্রী বাদ দিয়ে শুধু নাম ব্যবহার ন্যায়সংগত। যেমন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ। কেউ শ্রীঠাকুর নন।

অন্যান্য নামের বেলাতেও তা করা চলে। শ্রী ব্যবহার করতেই যদি হয় (কেন হবে, ভগবান জানেন) তা হলে পদবির আগে নয়, নামের আগে শ্রী ব্যবহার করলে ইংরেজদের হাস্যকর অনুকরণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শ্রী শঙ্কর—মিস্টার শঙ্কর

তিমিরবরণ শ্রীবরণ বা মিস্টার বরণ হয়েছেন কি না আমার জানা নেই, কিন্তু উদয়শঙ্কর শ্রীশঙ্কর বা মিস্টার শঙ্কর হয়েছেন। নলিনীকান্ত, নিশিকান্ত এঁরা কি শ্রীকান্ত হবেন? রজনীকান্ত সেন কান্ত হয়েছিলেন সম্ভবত নিজের ইচ্ছায়, তাঁকে 'কান্তকবি' বলা হত সে জন্য। কিন্তু তিনি শ্রীকান্ত হননি। শ্রীবিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি ক্ষেত্রে 'শ্রী' নামের সঙ্গে, পদবীর সঙ্গে নয়। এটাই বিধিসংগত। সার উপাধি পেলে তা নামের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, পদবির সঙ্গে নয়। সার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি নয়। সার যদি নামের সঙ্গে চলে তবে শ্রী চলবে না কেন? তা ছাড়া শ্রী না জুড়লে ক্ষতি কী? রবীন্দ্রনাথ বললেই সম্মান দেখান হয়, তাঁকে শ্রীঠাকুর বলবে না কেউ। শ্রীনাথও হননি তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রও তাই। বিলেতে পদবির সঙ্গে মিস্টার হয়, কিন্তু তাদের শুধু পদবিও আমাদের অপরিচিত নয়। শেক্সপিয়র, মিস্টার শেক্সপিয়র নন। উইলিয়াম বললে কেউ চিনবে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নামটিই যথেষ্ট—শ্রীনাথ

বা শ্রীঠাকুর বললে কেউ চিনবে না। অতএব আমাদের ভেবে দেখা উচিত আমরা অন্ধভাবে ইংরেজদের অনুকরণ করে কি লাভ করেছি? কি লাভ করছি শ্রী-কে মিস্টারের সমার্থক করে? এদিকে ব্যায়ামবীরেরাও শ্রী জুড়ছেন স্থানের নামের সঙ্গে : ইংরেজদের অনুকরণ না করলে যেন আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।

মনোই তাহা জানে

রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি শব্দের উচ্চারণ নিয়ে ভাবছিলাম। গানের প্রথম ছত্র—কত যে তুমি মনোহর মনই তাহা জানে। রেডিয়োতে গাওয়া এ গানের "মনই" শব্দের উচ্চারণ শুনেছি 'মনোই' তাহা জানে। রেকর্ডেও তাই শুনেছি। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এ উচ্চারণ কি ঠিক? তিনি বললেন 'ঠিকোই' তো মনে হয়। আর একজন বললেন, কেন ও রকম বিকৃত উচ্চারণ করা তা 'ভগবানোই' জানেন। ভগবানকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। রবীন্দ্রনাথ কি নিজে ঐ উচ্চারণ হবে বলে গেছেন? এঁর উত্তর যাঁরা দিতে পারেন তাঁরা দেবেন। কিন্তু আমার মনে হয় এটি অকারণ বিকৃতি। রবীন্দ্রনাথ যদি 'মন' কে 'মনো' উচ্চারণ করতেন তা হলে ঐ বিকৃতি সম্ভব হত। কিন্তু আরও গান আছে—যেমন 'মনরে ওরে মন'। ১৯৩৭, ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে রবীন্দ্রনাথের বোটের মধ্যে ভাষণ ও উচ্চারণ নিয়ে নানা আলোচনা হয়। তার মধ্যে আমিও ছিলাম। সেদিন সেই তাঁর কাছে প্রথম শুনি যে 'ম্লান' শব্দটি তিনি 'ম্লানো' উচ্চারণে পড়েন, এবং একজনের কবিতায় প্রাণ-এর সঙ্গে ম্লানের মিল দেখে সেটি ভুল মনে করেছিলেন। বলেছিলেন 'ম্লানো' উচ্চারণটা তাঁদের পারিবারিক উচ্চারণ। কিন্তু 'মন' সম্বন্ধে তো সে কথা ওঠে না। মনোমোহন হলে সন্ধি করে মনো হয় (মনঃ + মোহন), কিন্তু অন্যত্র কেন হবে?

'মন রে ওরে মন, তুমি কোন্ সাধনার ধন'—এ গান যদি 'মনো রে ওরে মনো তুমি কোন সাধনার ধনো' গাওয়া হত, তা হলে তার শ্রুতিফল কি দাঁড়াত? কত যে তুমি মনোহর মনই তাহা জানে—এ গানের মনই, 'মন্ই' উচ্চারণে গাওয়া আমি শুনেছি কয়েক বছর আগে। গায়কের নাম মনে পড়ছে না। কিন্তু গত ৫ই মে তারিখে গীতা ঘটকের কণ্ঠে এবং এণাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ২১শে মে ঐ গানটিই শুনলাম "মন্ + ই" উচ্চারণে।

এটাই ঠিক মনে হল, যদি না রবীন্দ্রনাথ নিজেই নির্দেশ দিয়ে থাকেন "মনোই" গাইতে হবে। ৫৫ বছর আগে মিস্ মানদার কণ্ঠে একটি রেকর্ড শুনেছিলাম—কী সুর বাজে আমার প্রাণে আমি জানি (আমার) মনই জানে। তিনি 'মন্ + ই' জানে গেয়েছিলেন। রেকর্ডখানি আমার ছিল তাই মনে আছে। অবশ্য তখন উচ্চারণে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। এখনও তো দেখছি না।—যেমন প্রাণ চায় চক্ষু না চায়—গানে।

প্রাণ চায় চক্ষু না চায়,
মরি এ কী তোর দুস্তর লজ্জা
সুন্দর এসে ফিরে যায়,
তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা।

এ গানের 'সজ্জা' শব্দটির অর্থ আভরণ, বিছানা নয়। কিন্তু আমি একখানা রেকর্ডে আগে শুনেছি সজ্জাকে "শয্যা" উচ্চারণে গাওয়া। সজ্জাকে কলকাতার প্রাদেশিক (কক্নি) উচ্চারণে শয্যা বলা হয়—যেমন সাজশয্যা। মহিলামহলে এটি পুনঃপুন বলতে শুনেছি। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতে প্রাদেশিক উচ্চারণ অসঙ্গত। পরে আর একখানি রেকর্ডে 'সজ্জা' উচ্চারণই শুনেছি কিন্তু কণ্টকশয্যাকে কণ্টকসজ্জা উচ্চারণে আর এক অন্যায় করেছেন গায়ক।

বজ্র বজ্-রো নয়—অগ্র অগ্-রো নয়

"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি"—যাঁরা সমবেত কণ্ঠে গেয়েছেন তাঁদের উচ্চারণ ঠিক আছে। কিন্তু অন্য কণ্ঠ শুনেছি, 'বজ্‌রে' তোমার বাজে বাঁশি। 'অগ্র' বলতে বা 'বজ্র' বলতে আসলে বলা উচিত 'অগ্-গ্র' বা 'বজ্-জ্র'। 'অগ্‌রো' নয় 'বজ্‌রো নয়। কণ্ঠে বজ্ + জ্র বা অগ্ + গ্র উচ্চারণ যাঁদের হয় না, তাঁরা একটু অভ্যাস করলেই এটি সংশোধন করতে পারেন। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব বর্ণের গুরু উচ্চারণ। কাজেই 'ব' কিংবা 'অ' (বজ্র ও অগ্র) এই দুটি অক্ষরের উপর ঝোঁক দিলেই উচ্চারণ সহজ হতে পারে।

অবদান জোগানো এখনও চলছে

"উল্লেখযোগ্য অবদান জোগানো" হয় কি কৌশলে তা আমার ধারণার বাইরে। জোগানো মানে যদি ইংরেজি সাপ্লাই করা হয়, তবে জানতে ইচ্ছা

করে উক্ত অবদান কিভাবে সাপ্লাই করা হয়? টিনে, ব্যারেল না শিশিতে? এই প্রশ্নের উত্তর পেলে ওর অর্থটাও হৃদয়ংগম করা সহজ হবে। কিন্তু কার দায় পড়েছে উত্তর দিতে। দুনিয়া যেমন চলছিল, তেমনি চলছে এবং চলবে। এবং আরও বেশি তেজের সঙ্গে। দেখছি তো তাই। একটা গল্প মনে পড়ল। নদীতীরে একখানা খালি নৌকার উপর একটা পরিচিত পাগলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ডাঙা থেকে একজন চেঁচিয়ে বলল, ওরে পাগলা, নৌকোটা ডুবোসনে। পাগল তা শুনে বলল, 'ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস'— বলে নৌকোটা ডুবিয়েই দিল।

সতর্কবাণী উচ্চারণ না করলে নৌকোটা হয়ত রক্ষা পেত।

কিন্তু 'সাব্' 'সুব্' হয় কী করে?

ইংরেজি 'সাব্' বাংলায় 'উপ' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সাব্ মানে 'আন্ডার', অথবা 'নিয়ার্লি'। সাব-কন্টিনেন্ট—-উপমহাদেশ। সিটি থেকে বিশেষণ— আর্ব্যান। আর্ব—শহর (ল্যাটিন ভাষায়)। তা থেকে সাব্-আর্ব এসেছে মানে শহরতলি। শহরতলির স্কুল, শহরতলীর রেলপথ—সাবার্ব্যান স্কুল, সাবার্ব্যান রেলওয়ে। সাব ইনসপেক্টর, সাব ডিভিশন, সাব জুডিস, ইত্যাদি। হঠাৎ সাব 'সুব' হল কেন সুবার্বন রূপে? সাউথ সাবার্ব্যান রেলওয়ে কেন সুবার্বন রেলওয়ে হল? ফার্স্ট অফেন্ডার কে যিনি সাবকে 'সুব' লিখেছিলেন? তাঁকে অন্ধভাবে নকল করা হচ্ছে কেন?

[১৯৭৬ বেতার জগৎ]

প্রণবেশ সেন-এর রচনা

বেতারের সার্থক কথাকার ছিলেন তিনি। তাঁর সংবাদ রচনায়, বিশ্লেষণের ভেতরে ছিল শ্রোতাকে উৎকর্ণ রাখার ধ্বনিমন্ত্র। ষাট-সত্তর-আশির দশকের জনপ্রিয় সংবাদ-ভাষ্য *সংবাদ পরিক্রমা* প্রতিদিন কীভাবে নির্মিত হত সৃষ্টির আনন্দে, তারই এক ঐতিহাসিক সময়সন্ধির স্মৃতিনন্দিত রূপকাহিনি তিনি তুলে ধরেছেন এই পর্বের প্রথম প্রবন্ধে। আর সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত মোট ৩৮টি *সংবাদ পরিক্রমা*। আমরা যে এই গ্রন্থ জুড়ে সম্প্রচারের ভাষা নিয়ে এত কথা বলে চলেছি, প্রণবেশ সেন-এর রচনাতেই হয়তো পেতে পারি তার ফলিত রূপ, যা অন্তরালের একজন ভাষ্য-লেখকের একান্ত হলেও সম্প্রচারকের কণ্ঠে ঘটেছে তার সর্বজনীন মুক্তি।

সময় ও স্বপ্নের যৌথ শিল্প
একাত্তরের সংবাদ পরিক্রমা

হঠাৎই অনুরোধটা এল। লিখুন-না, একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের সেই দিনগুলোর কথা। অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। এখন তো শেষ পারানির কড়ি গুনছি। মগজের কোষে কোষে বিস্মৃতির পলিও জমেছে ঢের। ভাবছি এখন কি ফিরে যাওয়া সম্ভব ২৯ বছর আগের সেই দিনগুলোয়? ভরসা একটাই---উসকে দিলে হয়তো স্মৃতিগুলো নিজেরাই নিজেদের কথা বলবে।

আশ্চর্য সেই একাত্তরের দিনগুলো---বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সেই দিনগুলো। কাজ করতাম আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগে। তাই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম সেই আগুন-ঝরানো দিনগুলোর সঙ্গে। আজ এই শেষবেলায় এসে মনে পড়ছে, যখন অসংখ্য অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা এখানে-ওখানে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে, তখন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর বিরল গৌরবও তো বহু ভাগ্যে মিলেছিল। লিখতাম 'সংবাদ পরিক্রমা', লিখতাম 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের নিউজ'। এটা যদি একটা বিরল গৌরব হয়, কিংবা একটা সাফল্য, তবে তো পটভূমিটাও মনে রাখা দরকার হয়ে পড়ে। তাই শুরু করছি একেবারে গোড়ার কথা দিয়ে।

গোড়ার কথা

গোড়ার কথার মানে *সংবাদ পরিক্রমার* গোড়ার কথা। ১৯৬৫ সাল। ভারত-পাকিস্তান লড়াই সবে শেষ হয়েছে। তাসখন্দে স্বাক্ষরিত হয়েছে মৈত্রীচুক্তি। কিন্তু মৈত্রী কোথায়? বাতাসে তো বারুদের গন্ধ ছড়ানো। মৈত্রী সম্প্রীতি—এসবের নাম-গন্ধ নেই কোথাও। না পাকিস্তানে, না

ভারতে। দু-দেশের মন মেজাজে তখনও বিদ্বেষবিষ ছড়ানো। কলকাতার রেড রোডের ধারে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পঁয়ষট্টির লড়াইয়ের স্মারক হিসাবে রাখা প্যাটন ট্যাঙ্কটার পাশ দিয়ে যাবার সময় চড়-চাপড় মেরে, পাদুকাঘাত করে অনেকেই গায়ের ঝাল মেটাতেন। শান্তির ললিত বাণী কেউ বরদাস্ত করতে রাজি নন। এমনি সময় ভারত সরকারের হুকুম এল ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ঐতিহ্য ও মৈত্রীর দিক নিয়ে অনুষ্ঠান করতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে বন্ধুত্বের বাতাবরণ। স্বাভাবিক, কারণ শত্রুতা নয়, বন্ধুত্বই মানুষের শেষ পরিচয়।

ছেষট্টি সালের গোড়ার দিকে আকাশবাণীতে পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য একটি বিশেষ বেতার-তরঙ্গ চালু হল। আমি বার্তা বিভাগে যোগ দিলাম ছেষট্টির ফেব্রুয়ারিতে। এর আগে পর্যন্ত কলকাতা-'ক'য়ে স্থানীয় সংবাদ ও সংবাদ সমীক্ষা প্রচারিত হত। আর প্রচারিত হত সংবাদ বিচিত্রা—রেডিয়ো নিউজ রিল। ভারত-চীন লড়াই এবং তারপর ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ের সময় দেশপ্রেম-উদ্দীপক বহু সংবাদ ও সংবাদভাষ্য প্রচারিত হয়েছে ওই অনুষ্ঠানে। বহুশ্রুত ছিল ওই অনুষ্ঠান। যুদ্ধের পটভূমিতে একটু লড়াকু মেজাজের।

কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য অনুষ্ঠান চালু হওয়ার সময় ঠিক হল যে রাত দশটা থেকে দশটা পাঁচ পর্যন্ত একটি সংবাদভাষ্য প্রচারিত হবে, আর তার পরেই প্রচারিত হবে খবর, আন্তর্জাতিক খবর। ঠিক হল এই অনুষ্ঠান দু-টিও পূর্বাঞ্চলীয় বেতার-তরঙ্গের সঙ্গে যুগপৎ প্রচারিত হবে কলকাতা-'ক'তে। সংবাদভাষ্যমূলক অনুষ্ঠানটির নাম রাখা হল 'সংবাদ পরিক্রমা'। ঠিক হল ওই অনুষ্ঠানে ভারত-পাকিস্তান মৈত্রীর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। বলতে হবে দু-দেশের ঐতিহ্যের কথা, দু-দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। তুলে ধরতে হবে দু-দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনের কথা। আমারই ওপর দায় বর্তাল সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে ওই সংবাদভাষ্য রচনারও।

লিখতাম। সপ্তাহে পাঁচ দিন লিখতাম আমি। কিন্তু কী আশ্চর্য পরিবেশ! কেউ শুনতে রাজি নন ভারত-পাকিস্তান মৈত্রীর কথা, বন্ধুত্বের কথা। শত্রুতার কথা বলুন, পাকিস্তানের বিষদাঁত ভেঙে দেবার কথা বলুন—এসব কথা শুনব। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান এই দু-দেশের মানুষের বন্ধুত্বের

কথা বলুন, ঐতিহ্যের কথা বলুন, ভাষাগত মিলের কথা বলুন, আত্মিক সম্পর্কের কথা বলুন,—না, কেউ শুনতে রাজি নন এইসব মিষ্টি মিষ্টি কথা। অথচ দায় বর্তেছে এই মিষ্টি মিষ্টি কথা বলারও। বলছিও। দু-দেশের মৈত্রীর কথা, দু-দেশের মানুষে মানুষে বন্ধুত্বের কথা, পড়শিই যে আরশির মুখ—এসব কথা। তখন পরিক্রমায় লেখকের নাম থাকত অঘোষিত। যিনি পড়তেন তাঁর নামও বলা হত না। তবে তখন সংবাদ বিভাগে পাঠক বলতে ছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেবাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁদের নামও প্রচারিত হত না। কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনেই শ্রোতারা ওঁদের চিনে ফেলতেন। চুটিয়ে চিঠিপত্র আসত শ্রোতাদের কাছ থেকে। কখনো-বা দেবদুলালের নামে, কখনো দেবাংশুর নামে, আবার কখনো-বা বার্তা বিভাগের নামে। প্রায় সব চিঠিই ভর্ৎসনামূলক। কত যে গালাগালি খেয়েছি শ্রোতাদের কাছ থেকে। হতাশা গ্রাস করতে চাইত। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই দেখলাম ধীরে ধীরে অবস্থাটা পালটে যেতে লাগল। জনমতের জোয়ার বইতে লাগল উলটো খাতে। শত্রুতার রুক্ষ কথায় মন ভেজে না, মন ভেজে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর নরম আর্দ্র কথায়। মানুষ যত কঠিনই হোক-না কেন, বুকের গভীরে প্রেম ও ভালোবাসার একফালি সবুজ জমি থেকেই যায়। পরিক্রমায় শ্রোতারা তাঁদের মনের কথা শুনতে পেলেন। ভর্ৎসনার বদলে শ্রোতাদের প্রশংসাসূচক কিছু কিছু চিঠিপত্র আসতে লাগল আমাদের দপ্তরে। এবার একটু বলতে হয় আমার নিজের কথা। নিজের ঢাক নিজে পেটানোর জন্য নয়, সংবাদ পরিক্রমাকে বুঝতে এবং মূল্যায়ন করতে।

আমার কথা

আমি বাংলাদেশের ছেলে। জন্ম সিরাজগঞ্জে। আজ থেকে তেষট্টি বছর আগে। তবে আমার বড়ো হওয়াটা পাবনা শহরে। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে চলে আসি কলকাতায়। বাকি পড়াশোনা, স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা এবং সংবাদপত্রে হাতেখড়ি—সবই এই কলকাতায়। '৫৮ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ আয়ুব খানের স্বৈরাচারের দশক শুরু হওয়া পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে আমার যাতায়াত ছিল। নিজের চোখে দেখেছি ভাষা-আন্দোলন গড়ে উঠতে, দেখেছি মুসলিম লিগের পতন, দেখেছি 'আওয়ামি মুসলিম লিগ'-এর 'আওয়ামি লিগ' হওয়া। দেখেছি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি।

দেখেছি গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে তছনছ করে সামরিক শাসনের আবির্ভাব। এককথায়, পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবোধের স্ফুরণের মুহূর্তগুলির আমিও ছিলাম অন্যতম সাক্ষী। সে-সময় পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকেই হয় আমার পিতৃবন্ধু, নাহয় আমার নিজের বন্ধু। আমি ছিলাম একটু ভীতু প্রকৃতির। এ-দল সে-দল থেকে থাকতাম একটু দূরে দূরে। তবুও পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাদেশ হওয়ার গতিপথটি চিনতে পেরেছিলাম সেই প্রথম প্রহরেই। এই ব্যাপারটা খুবই কাজে লেগেছিল। অবিনয়ের অপরাধ নেবেন না, এই প্রত্যক্ষ যোগসূত্রের ফলেই সংবাদ পরিক্রমা হয়ে উঠেছিল এমন একটা জানালা, যার খিল খুললেই দেখা যেত এ-পারে যে বাংলাদেশ ও-পারেও সেই বাংলা। তখন তো বিধিনিষেধের ডোরে আমরা বাঁধা। দু-দেশের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। চিঠি পাঠাতে হত ভিন দেশের ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে। বাংলাদেশের ভেতরে কী ঘটছে, না ঘটছে তা জানবার সুযোগ ছিল না। লিখতাম। এইসব কথাই লিখতাম 'পরিক্রমা'তে। বাংলাদেশের বন্ধু, আত্মীয়স্বজনদের জন্য মন-কেমন-করা কথা। আর এই মন-কেমন-করা কথার মধ্যেই মনের কথা খুঁজে পেলেন এদেশের মানুষ।

একদিনের একটা পরিক্রমার কথা মনে পড়ছে। ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে কিছুদিন আগেই। তবুও শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকত একটা সবুজ রঙের ট্রেন। ওই ট্রেনটাই আসত পূর্ব পাকিস্তান থেকে। আমার নিজেরই একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই ট্রেনটির সঙ্গে। কথার লড়াই চলছে তখন ভারত-পাকিস্তানের আকাশে-বাতাসে। এরই মধ্যে স্ত্রী-পুত্রকে রেখে এসেছি পাবনায় বাবার কাছে। ইচ্ছে ছিল নভেম্বর-ডিসেম্বরে পাবনায় গিয়ে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে আসব। তারিখটা মনে নেই—সেপ্টেম্বরের একদিন। হঠাৎ বাবার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম—'অ্যাটেন্ড শিয়ালদহ স্টেশন ...।' নির্দিষ্ট দিনে স্টেশনে গেলাম। যথারীতি পূর্ব পাকিস্তান থেকে সবুজ রঙের ট্রেনটা এসে দাঁড়াল। স্ত্রী-পুত্র-বোন নামল ট্রেন থেকে। ওদের কাছ থেকে জানলাম আমার কয়েক জন মুসলিম বন্ধু গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিল যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভারত-পাকিস্তান লড়াই বাধবে। আর পাকিস্তানে

যেসব ভারতীয় নাগরিক ছিলেন, তাঁদের গ্রেপ্তার বা অন্তরিন করা হবে। ওরা তাই তড়িঘড়ি করে আমার স্ত্রী-পুত্র ও বোনকে দর্শনা পর্যন্ত এসে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেছে। দর্শনা হল বাংলাদেশের সীমান্ত স্টেশন। এইসব কথাবার্তা শুনতে শুনতে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে পৌঁছোলাম, আর তখনই মাইক্রোফোনে ঘোষণা করা হল যে, ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ট্রেন চলাচল ওইদিন থেকেই বন্ধ রইল। রাতে রেডিয়োতে খবর শুনলাম ভারত-পাকিস্তান লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে একসময়। তাসখন্দ চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতা কাটল না। যাতায়াতের তো কথাই নেই। চিঠিপত্র লেখালেখি—সেও তো এক দুষ্কর ব্যাপার। আমাদের ঠিকানাটাই যেন হারিয়ে ফেললাম। বিদেশে বসবাসকারী পরিচিত কাউকে পূর্ব পাকিস্তানের ঠিকানা লেখা চিঠিটা পাঠিয়ে দিতে হবে, তিনি আবার সেই চিঠি পুনরায় পোস্ট করবেন নির্দিষ্ট ঠিকানার লক্ষ্যে। তখনও আমি আকাশবাণীতে যোগ দিইনি। পাবনায় চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে মা-বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের থেকে যাওয়ার উদ্‌বেগ আর আমার বাড়িতে না-যেতে পারার বেদনা—দুই মিলেমিশে মনটা কেমন ভারী হয়ে রয়েছে।

এই যে অবস্থাটা, এই অবস্থাটা তো আমার একার ছিল না, ছিল অধিকাংশ মানুষের। আকাশবাণীতে যোগ দিলাম ছেষট্টির ফেব্রুয়ারিতে। থাকতাম পাইকপাড়ার বাসাতে। অনেকদিন আকাশবাণী ফেরত শিয়ালদা হয়ে দমদম ছুঁয়ে বাড়ি পৌঁছোতাম। তখনও সেই সবুজ গাড়িটা প্ল্যাটফর্মেই পড়ে থাকত। কেমন যেন মলিন, ধূলিধূসর। সব গাড়ি যাচ্ছে-আসছে, ওই গাড়িটাই অনড়। সেই সময় গিরিন চক্রবর্তীর একটি গান খুব চালু ছিল। যতদূর মনে পড়ছে গানের লাইন ছিল এইরকম—'শিয়ালদহ গোয়ালন্দ আজও আছে ভাই/আমি যাব আমার বাড়ি সোজা রাস্তা নাই।' গাড়িটা দেখেই ওই গানটা মনে পড়ত। পুজোর কয়েকটা দিন আগে মহালয়া। আর মহালয়া মানেই তো বীরেন ভদ্র, বাণীকুমার, পঙ্কজ মল্লিক ও সহযোগী শিল্পীরা। ওঁদের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভোরের আকাশে ছড়িয়ে পড়তেই ছুটির মেজাজ এসে যেত। এবারও সেই ছুটির মেজাজ এল, কিন্তু বাড়ি যাওয়া হবে না। পরিক্রমা লিখলাম—মহালয়া, ছুটির মেজাজ, সবুজ রেলগাড়ি

আর গিরিন চক্রবর্তীর গানের পঙ্‌ক্তিগুলোর সূত্র ধরে। দেবু পড়ল। দেবুর পড়ার একটা মজা আছে। ও যখন স্ক্রিপ্ট পড়ে, তখন স্ক্রিপটা অন্য কোনো লেখকের থাকে না। ওটা যেন পুরোপুরি ওর নিজের কথা হয়ে যায়। একটা আশ্চর্য একাত্মতা তৈরি হয়ে যায় স্ক্রিপ্টের ভাবনার সঙ্গে ওর কণ্ঠস্বরের। সেদিনও তা-ই ঘটল। দেবু পড়ছে, নিউজ রুমে বসেই আমি শুনছি। ধীরে ধীরে মনটা যেন কেমন ভারী হয়ে উঠল। বেতার অনুষ্ঠানের এই এক মজা। ইথার তরঙ্গে ভেসে গেল, কোথায় পৌঁছোল, আদৌ পৌঁছোল কি না, সাড়া জাগাল কি না—তার হদিশ পাওয়া ভার।

পরের দিন সকালবেলার শিফ্‌টে আমার আর দেবুরই ডিউটি ছিল। সেদিনও সকালের খবর পড়া শেষ করে দেবু কেবল ওপরে উঠে এসেছে। ক্যান্টিনে চায়ের অর্ডার গেছে। এমন সময় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের এক ভদ্রলোক এসে হাজির। উসকোখুসকো চুল, চোখ দুটো লালচে। একটা অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে ওর সর্বাঙ্গে। ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন—আমি একটু দেবদুলালবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই। দেবু তখন ওর পুরু লেন্সের চশমা দিয়ে খবরের কাগজের হরফগুলোকে ধরবার চেষ্টা করছে। আমি দেবুকে ডেকে বললাম, দেবু, ইনি তোকে খুঁজছেন। দেবু মুখ তুলতেই ভদ্রলোক নমস্কার করে বললেন, একটু কথা ছিল। যদি একটু বাইরে আসেন ...। দেবু বারান্দায় গেল। আমি তখন চোখ রেখেছি খবরের কাগজের পাতায়। চার-পাঁচ মিনিট পরেই দেবু ঘরে ফিরে এল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—কী লিখেছিস রে কাল পরিক্রমায়? ভদ্রলোক কেঁদেকেটে একশা। বার বার দু-হাত ধরে বলছিলেন আমার মনের কথা আপনি জানলেন কী করে? জানেন, এইবারই প্রথম পুজোর ছুটিতে বাড়িতে যেতে পারব না, মাকে দেখতে পাব না। ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল সব পরিক্রমার ক্ষেত্রে। আমার কথা কেমন করে যেন সকলের কথা হয়ে যেত।

মধ্যিখানে চর

এমনি করেই চলতে চলতে সংবাদ পরিক্রমা পা দিল সত্তর দশকে। কত বিষয় নিয়েই-না লেখা হয়েছে পরিক্রমা—রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য, স্থাপত্য,—হেন বিষয় নেই যা স্থান পায়নি সংবাদ পরিক্রমার পাতায়। কিন্তু সত্তর দশকে এসে তার নতুন চেহারা। সংবাদ

পরিক্রমা তখন কোটি কোটি মানুষের সংগ্রাম-সাথি। রাজনৈতিক পশ্চাৎপটটা একটু জেনে নেওয়া যাক এই সুযোগে।

১৯৬৫ সালেই আয়ুব খান প্রবর্তিত বুনিয়াদি গণতন্ত্রের নির্বাচন হল। এই বুনিয়াদি গণতন্ত্র ব্যাপারটা নির্বাচনি কারচুপির একটা সুসভ্য রূপ। পাকিস্তানের তো দু-টি খণ্ড—পশ্চিম এবং পূর্ব। মাঝখানে হাজার যোজন ফারাক—মানসিকতায়, ভাষায়, রুচিতে। এই দুই খণ্ডের মধ্যে পূর্ব খণ্ডটি অখণ্ড হলেও পশ্চিম খণ্ডটি গোটা চার-পাঁচ প্রদেশের সমষ্টি। তা আয়ুব খান নির্বাচনিক স্বাস্থ্য মাথায় রেখে প্রাদেশিক হিসেব ঘুচিয়ে দিয়ে 'ওয়ান ইউনিট' ব্যবস্থা চালু করলেন। এই ব্যবস্থায় আমজনতা নির্বাচনে ভোট দিয়ে ইলেক্টোরাল কলেজ গঠন করবেন। যতদূর মনে পড়ছে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ছিল ৮০ হাজারের মতো। পশ্চিম পাকিস্তানেও এর কাছাকাছি। এরাই হল বুনিয়াদি গণতন্ত্রী এবং এরাই হল প্রেসিডেন্টের নির্বাচকমণ্ডলী। আয়ুব খান নির্বাচনে দাঁড়ালেন, আর সম্মিলিত বিরোধী পক্ষের প্রার্থী হলেন কয়েদ-ই-আজম-এর ভগিনী ফতিমা জিন্না। এই মুষ্টিমেয় নির্বাচকমণ্ডলীকে টাকা দিয়ে ভয় দেখিয়ে কিনে নেওয়া তো খুব কঠিন ব্যাপার নয়। হলও তাই। ফতিমা জিন্না পরাজিত হলেন। আয়ুব খান আবার প্রেসিডেন্ট হলেন। পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের আন্দোলন কিন্তু ভেঙে গেল না। সিকান্দার আবু জাফর কবিতা লিখলেন—'জনতার সংগ্রাম চলছেই চলবে'। কবিতা গান হল, স্লোগান হল, ছড়িয়ে পড়ল বাংলার এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলা

পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যকামিতা, নিষ্ঠুর শোষণ ও সামরিক শাসন রুখতে ৬০-এর দশকে শেখ মুজিবর রহমান তুলে ধরলেন তাঁর ছ-দফা দাবি, শুরু করলেন তাঁর স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলন। ততদিনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাঁদের দেশকে বলতে শুরু করেছেন পূর্ব বাংলা। ওদিকে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের তুঘলকি কাণ্ডকারখানারও যেন শেষ নেই। তিনি ফতোয়া দিলেন বাংলাও নয়, উর্দুও নয়, বাংলা এবং উর্দুকে মিলিয়ে একটি মিলিজুলি জবান তৈরি করে তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে

তাঁর দেশের দু-খণ্ডের ঐক্য সুদৃঢ় করতে। আরবি হরফে বাংলা লেখার মতো এ-প্রয়াসও ব্যর্থ হল। রবীন্দ্রনাথও নতুন করে আক্রান্ত হলেন '৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর। রেডিয়ো পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রতিবাদের ঝড় উঠল। পূর্ব বাংলার কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রস্তাব নিলেন— 'বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে পদ্মা-মেঘনা-যমুনাকে যেমন নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় না, তেমনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে রবীন্দ্রনাথকে পৃথক করা সম্ভব নয়।'

এই যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে!

শেখ মুজিবের ছ-দফা দাবি যখন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, পূর্ব বাংলার মানুষ যখন সেই দাবির সমর্থনে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন আয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে এক মিথ্যা মামলা সাজালেন। সামরিক ও অসামরিক কিছু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বলা হল এরা পাকিস্তানকে ভাঙবার জন্যে ভারতের সঙ্গে চক্রান্ত করেছে। প্রথম দিকে ষড়যন্ত্রকারীদের নামের তালিকায় শেখ মুজিবরের নাম ছিল না। পরে ওই নামটি ঢুকিয়ে দিয়ে শেখ মুজিবকেও গ্রেপ্তার করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে শেখ মুজিবের ছ-দফা দাবি-সহ মোট ১১ দফা দাবিকে সামনে রেখে গঠন করলেন ছাত্র সংগ্রাম কমিটি। তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রব, সিরাজুল ইসলাম, নূর-এ-আলম সিদ্দিকি প্রমুখের নেতৃত্বে শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। ছাত্র-জনতা ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এল। এত মানুষ রাস্তায় যে সৈন্যদের রাইফেল তুলে ধরবার জায়গাটুকুও নেই। উনসত্তরে উঁকি দিল বাহান্নর মুখ। উদ্‌বেলিত জনস্রোতে ভেসে গেল মিথ্যা ও সাজানো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ২৩ ফেব্রুয়ারি রুদ্ধ কারার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলেন শেখ মুজিবর রহমান। ছাত্র সংগ্রাম কমিটি তাঁকে সংবর্ধনা জানাল। তাঁকে অভিহিত করা হল 'বঙ্গবন্ধু' হিসাবে। এই সময়ই শোনা যেতে লাগল 'জয় বাংলা' স্লোগান। ঘরে ঘরে গীত হল 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। এই যৌবন জলতরঙ্গে খড়কুটোর মতো ভেসে গেলেন আয়ুব খান।

পূর্ব বাংলা থেকে বাংলাদেশ

আয়ুব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন আরেক জেনারেল, ইয়াহিয়া খানের কাছে—১৯৬৯-এর ২৫ মার্চে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে জানালেন যে, তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য হল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন করে নির্বাচিত সরকারকে শাসনক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া। বাতিল করা হল সংবিধান। বাংলাদেশের মানুষ তখন থেকে বলতে আরম্ভ করলেন, সংবিধান যখন নেই, তখন পূর্ব পাকিস্তান নামটাও নেই। কাজেই এখন থেকে 'আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ'।

ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা

নির্বাচনের দিন ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর হবে এই নির্বাচন। ১২ নভেম্বর শতাব্দীর প্রচণ্ডতম ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হল বাংলাদেশ। সেই ঘূর্ণির প্রচণ্ড তাণ্ডবে নিহত হলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। ধূলিসাৎ হল কয়েক লক্ষ বাড়িঘর। উপকূলবর্তী এলাকাগুলি হয়ে উঠল এক বিস্তীর্ণ গোরস্থান। শামসুর রাহমান লিখলেন—'কাঁদো বাংলাদেশ, কাঁদো।' কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন তুললেন, 'এ লাশ আমরা রাখব কোথায়।' ত্রাণকার্যে শৈথিল্য দেখালেন পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ। ভারত সরকার বিমানে পাঠালেন ত্রাণসামগ্রী, পাঠালেন ওষুধপত্র। সিকান্দার আবু জাফর ততদিনে তাঁর কবিতায় সরাসরি বলে দিয়েছেন, 'এবার তুমি বাংলা ছাড়ো'। শেখ মুজিব বললেন, 'শৈথিল্য না দেখালে হাজার হাজার মানুষকে বাঁচানো যেত।' মৌলানা ভাসানি বললেন—'পাকিস্তানের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানের কর্তৃত্বের আর কোনো অধিকার নেই।'

এই পটভূমিতে ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন হল। আর সেই নির্বাচনে জাতীয় সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামি লিগ, অনুমোদিত হল শেখ মুজিবের ছ-দফা দাবি।

এবার ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে একটু অন্য কথা বলি। বলি সংবাদ পরিক্রমার কথা। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন, পরিক্রমার কথা বলতে গিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে এত কথা বলা কেন? হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে।

কারণ পরিক্রমা সেই মুহূর্তে ইতিহাসের কণ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির প্রতিটি দিক তাতে প্রতিফলিত হত। রেডিয়ো পাকিস্তান পাকিস্তানিদের কথা বলত। কিন্তু বাংলাদেশের বঙ্গ ভাষাভাষী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরবার মুখপাত্র হয়ে ওঠে এই পরিক্রমা। কারণ আমরাও যে বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে, বিশ্বাস করি উদার মানবিকতার আদর্শে। এই পরিক্রমা এপারের সঙ্গে ওপারের এক আশ্চর্য সেতুবন্ধন রচনা করেছিল।

আরও একটা রেনেসাঁস

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু বলতে গেলে আরও একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত বলে মনে করি। বাংলাদেশে যে-রাজনৈতিক আন্দোলন—যে-ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আন্দোলন, তার সূচনা হয়েছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভিতর দিয়ে। যে-মুহূর্তে বাংলা ভাষা আক্রান্ত হল ঠিক সেই মুহূর্তেই শুরু হল বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। পাকিস্তানের খোয়াব গেল মুছে। নতুন করে চেনা শুরু হল বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে। আর ঠিক সেই জন্যই সে-দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন হাত ধরাধরি করে চলেছে। একটা কথা অনেকসময়েই ভাবি—দেশবিভাগের নানা অসুবিধার আমরা সম্মুখীন হয়েছি। আমাদের অনেকেরই পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেছে, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা নানারকম সামাজিক ব্যাধির কারণ হয়েছে। পুরোনো মূল্যবোধগুলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও যেটুকু যা অবশিষ্ট ছিল, তা-ও ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি অন্য একটা চিত্রও আছে। ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে বাংলাদেশে যেন আর একটা রেনেসাঁস হয়ে গেল। 'আ মরি বাংলাভাষা'কে ঘিরে অসংখ্য নতুন বই লেখা হল, নতুন নতুন কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ লেখা হল। গবেষণার ধারা বয়ে চলল নতুন নতুন খাতে। সবমিলিয়ে বলা যেতে পারে যে, ওপার বাংলায় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটল। এপারেই হোক, ওপারেই হোক, মোদ্দা কথা হল একটাই যে, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাটি স্ফীত ও বহুমুখী হল। দেশভাগের এই সুফলটি সংস্কৃতিসেবী হিসেবে আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। কিন্তু এটা তো

আলাদা প্রসঙ্গ। আমি যেটা বলতে চাইছি, তা হল এই—বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের খুঁটিনাটি বিষয়েরও চটজলদি প্রভাব পড়েছে সে-দেশের কবিতায়, সে-দেশের গল্প-উপন্যাসে, সে-দেশের প্রবন্ধসাহিত্যে। নানাভাবে ওইসব রচনা আমার হাতে এসে পৌঁছোত। তার কিছু কিছু অংশ, বিশেষ করে কবিতার অংশ সংবাদ পরিক্রমায় ব্যবহার করা হত। এদেশের কবি-সাহিত্যিকরা তো ছিলেনই। যে-সময়ের কথা বলছি, সেই সময় শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, কাজী সব্যসাচী—এরকম আরও দু-চার জন কবিতা আবৃত্তিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু অবিনয়ের অপরাধ নেবেন না, রেডিয়োতে, বিশেষ করে সংবাদ পরিক্রমায় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম বসু, তরুণ চক্রবর্তীর কণ্ঠে কবিতাংশ উচ্চারিত হতে হতে স্বতন্ত্র শিল্প হিসাবে আবৃত্তি পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আগে বিচিত্রানুষ্ঠানে এক-আধ জন কবিতা পড়তেন। কিন্তু এখন কবিতা নিজেই হয়ে উঠল একটি অনুষ্ঠান। টিকিট কেটে শ্রোতারা যোগ দিতে লাগলেন আবৃত্তির অনুষ্ঠানে। বেরিয়ে এলেন প্রদীপ ঘোষ, পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, নীলাদ্রিশেখর বসুর মতো আরও অনেক আবৃত্তিকার। বিভিন্ন জায়গায় আবৃত্তির ক্লাসও হতে থাকল। কী! একটু বেশি দাবি করে ফেললাম কি? বোধ হয়, না। একুশে ফেব্রুয়ারিকেও এ-বঙ্গের মানুষের চেতনায় জাগ্রত করেছিল এই সংবাদ পরিক্রমাই—প্রতি বছর এই দিনটিকে স্মরণ করে।

আরও একটি বাঁক

ইতিহাসের আর একটি মোড়ে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরে পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। আশ্চর্য সেই নির্বাচন। প্রাদেশিক সভায় এবং জাতীয় সভায় শেখ মুজিবরের আওয়ামি লিগ পেল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন ছ-দফার ভিত্তিতেই সংবিধান রচনা করা হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও বললেন মুজিবই হবেন দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী।

ঘূর্ণিঝড়ের জন্য যেসব আসনে নির্বাচন স্থগিত ছিল সেগুলিতেও জিতল আওয়ামি লিগ।

জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকা নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বার শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আর একবার পাকিস্তান পিপলস পার্টির

প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। কখনো ঢাকায়, কখনো-বা করাচিতে এই আলোচনা চলতে থাকল।

একাত্তরের তিরিশে জানুয়ারি একটি ভারতীয় বিমানকে ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হল লাহোরে। ঢাকা থেকে লাহোরে উড়ে গিয়ে ভুট্টো আন্তর্জাতিক আচরণবিধি লঙ্ঘন করে বিমান ছিনতাইকারীদের অভিনন্দন জানালেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও ২ ফেব্রুয়ারি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওই বিমান ধ্বংস করা হল। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ আবার শুরু করলেন ভারতবিরোধী প্রচারণা।

বাতাসে বারুদের গন্ধ

১৯৭১-এর ৩ ফেব্রুয়ারি। ভারত তার আকাশসীমার ওপর দিয়ে পাকিস্তানি বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে দিল।

ওদিকে জেনারেল ইয়াহিয়া-ভুট্টোর শলাপরামর্শ চলতেই থাকল। একসময় শেখ মুজিব জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকতে বিলম্ব হওয়ায় উদ্‌বেগ প্রকাশ করলেন। ওদিকে ভুট্টো জানালেন দুই প্রদেশের দু-টি দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন জাতীয় সভার অধিবেশন তেসরা মার্চ ঢাকায় বসবে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো জানালেন, ছ-দফা সূত্র তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন তিনি জাতীয় সভার অধিবেশনের আগেই সমস্ত নেতাদের সঙ্গে ছ-দফা সূত্র নিয়ে কথা বলতে রাজি আছেন।

২২ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর অসামরিক মন্ত্রী পরিষদ বরখাস্ত করলেন। মার্শাল ল প্রশাসক ও প্রাদেশিক গভর্নরদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন যে, নির্বাচনের রায় বানচাল করবার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে। ১ মার্চ জাতীয় সভার অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হল। ঢাকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হাঙ্গামা ঘটতে থাকল। সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনতার সংঘর্ষও ঘটল। সেন্সরশিপ আরোপ করা হল। কার্ফু জারি করা হল। ২ মার্চ থেকে শুরু হল আওয়ামি লিগের অসহযোগ আন্দোলন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান

১০ মার্চ সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন। শেখ মুজিব সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। অসহযোগ আন্দোলন চলতেই লাগল।

৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেতার মারফত জানালেন যে, ২৫ মার্চ জাতীয় সভার অধিবেশন বসবে। ওই দিনই জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হল।

এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম

বলেছি আগেই, সে-সময় দু-দেশের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের খবর এসে পৌঁছোতে লাগল ইতস্তত ও বিক্ষিপ্তভাবে। কোন খবর কতটা বিশ্বাসযোগ্য, তা-ও তো বোঝার উপায় নেই। তবুও নিয়মিতভাবে মনিটর করা হত রেডিয়ো পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। মার্চ মাসের গোড়া থেকে ওই বেতারের অনুষ্ঠান প্রচারের ধারাও যেন একটু বদলে গেল। কিছু কিছু গান প্রচারিত হত, যা দেশাত্মবোধক, কিন্তু পাকিস্তানি ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মেলে না।

তারিখটা এখনও মনে আছে। ৮ মার্চ, সকাল তখন আটটা। কান রয়েছে ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের দিকে। ভেসে এল এক ঘোষকের কণ্ঠস্বর : গতকাল অর্থাৎ ৭ মার্চ রমনা ময়দান থেকে আওয়ামি লিগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের যে-ভাষণ সরাসরি প্রচার করার কথা ছিল, কিন্তু প্রচার করা যায়নি, আজ সকাল সাড়ে আটটায় রেকর্ড-করা সেই ভাষণ প্রচারিত হবে। চমকে উঠলাম। এ কী ব্যাপার! শেখ মুজিব তো বিরোধীপক্ষের নেতা, তাঁর ভাষণ রেডিয়ো পাকিস্তান থেকে প্রচারিত হবে, অন্য কোনো সময় নয়, এমন এক সময়, যখন বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক শাসন চলছে। বাসা থেকে বেরিয়ে আকাশবাণী কলকাতার নিউজ রুমে একটা ফোন করলাম। সহকারী বার্তা সম্পাদক বিভূতি দাশ ছিলেন তখন ডিউটিতে। তাঁকে অনুরোধ করলাম ওই ভাষণ 'অফ্ দ্য এয়ার' রেকর্ড করতে। ফোন করেই বাড়ি ফিরে এলাম। নির্দিষ্ট সময়ে ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হল রেকর্ড-করা সেই ভাষণ। ভাষণ তো নয়, একটা মুক্তিকামী দেশের কণ্ঠস্বর। আর সেই কণ্ঠস্বর আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ঘোষণা করল— 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেই প্রথম স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম এক নয়া ইতিহাসের সম্মুখীন হতে চলেছে উপমহাদেশের মানুষ। দুপুর বারোটা নাগাদ অফিসে পৌঁছোতেই

বিভূতিদা জড়িয়ে ধরলেন। ওই ভাষণ নিয়ে তখন হইচই চলছে—একে কপি করে দাও, তাকে কপি করে দাও—এইসব।

৮ মার্চ তো ওই ভাষণ ঢাকা থেকে রিলে করা হল। মৌলানা ভাসানিও দাবি জানালেন পূর্ব বাংলাকে স্বাধীনতা দেওয়া হোক। ১৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে আর এক দফা আলোচনা করার জন্য। একদিকে আলোচনা চলতে লাগলো, অন্যদিকে সেনাবাহিনী অসামরিক ব্যক্তিদের ওপর গুলি চালাল জয়দেবপুরে। ভুট্টোও এলেন ঢাকাতে। সেই সময় খবর আসতে থাকল যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা আনা হচ্ছে ঢাকায়।

২৩ মার্চ—পাকিস্তান দিবসে শেখ মুজিবের নির্দেশে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হল।

অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন

২৫ মার্চ, ১৯৭১। দুপুর থেকেই বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে বারুদের গন্ধ। দেড়টা নাগাদ ঢাকায় খবর পৌঁছোল চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ ঘটেছে। নিহত হয়েছেন বহু মানুষ। সৈয়দপুরে এমনি সংঘর্ষে কুড়ি জন নিহত ও শতাধিক আহত হলেন। রংপুরে কার্ফু জারি করে ডেপুটি কমিশনারের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। ঢাকায় তখন চাপা উত্তেজনা। বিকেলের দিকে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যেতে আরম্ভ করল যখন ঢাকায় রাজপথে সামরিক বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়িগুলি একটি-দুটি করে বেরিয়ে পড়তে শুরু করল। সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বিশেষ বেতারভাষণে শেখ মুজিব ও আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা ও চক্রান্তের অভিযোগ আনলেন। শেখ মুজিব তাঁর অনুগামী নেতৃবৃন্দকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ঘরে ঘরে 'প্রতিরোধের দুর্গ' গড়ে তোলার নির্দেশ দিলেন। রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে এল ছাত্র-জনতা, তৈরি করা হল ব্যারিকেড। ঘড়িতে তখন রাত দশটা। ভুখা নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকিস্তানি বাহিনী। ট্যাঙ্ক, মেশিনগান স্টেনগান প্রভৃতি অতি আধুনিক অস্ত্র থেকে অবিরত গোলাগুলি বর্ষিত হতে থাকল নিরস্ত্র একটি জনপদের ওপর। আক্রান্ত হল পুলিশ লাইন, ছাত্রদের হোস্টেল, অধ্যাপকদের কোয়ার্টারস, বুদ্ধিজীবীদের বাড়িঘর, মন্দির-মসজিদ, সংবাদপত্রের অফিস, আক্রান্ত হল শহর, আক্রান্ত হল গ্রাম। এককথায় যা কিছু বাংলার, যা কিছু বাঙালির।

এখন যেভাবে লিখছি, তত বিশদভাবে তখনও তো খবর এসে পৌঁছোয়নি। সংবাদের সমস্ত সূত্রগুলিকে ছিন্ন করে দিয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনী। মানবতার বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সুসভ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে হানাদারবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা ফিরে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। গণহত্যার খবর গোপন রাখতে বিদেশি সাংবাদিকদের বিমানবন্দি করে ঢাকা থেকে ফেরত পাঠানো হল। ২৬ মার্চ বাংলাদেশের ভিতরে এক গোপন বেতারকেন্দ্র থেকে এক বিবৃতি প্রচার করে জানানো হল যে, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং বিশ্ববাসীর কাছে সাহায্য ও স্বীকৃতি দানের আবেদন জানিয়েছেন।

২৫ মার্চ যদি হয়ে থাকে কালো দিন, তবে ২৬ মার্চ, ১৯৭১ তারিখটি বাংলাদেশে সোনার জলে লেখা একটি দিন—স্বাধীনতা দিবস।

চট্টগ্রাম মুক্তাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র থেকেও ২৭ মার্চ বিদ্রোহী পাকিস্তানি বাহিনীর মেজর জিয়া-উর-রহমানও শেখ মুজিবের ঘোষণার সূত্র ধরেই হানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে পালটা আঘাত হানবার আহ্বান জানালেন।

বোঝা গেল, শেখ মুজিবের নির্দেশমতো স্বাধীনতার সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে।

প্রথম খবর

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া কিছু কিছু টুকরো খবরের ভিত্তিতে ২৬ মার্চ সকালে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হল ছোট্ট এক টুকরো খবর—পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আর এর সঙ্গে বাজানো হল 'চল চল চল/ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল' গানটির যন্ত্রসংগীতে নিবদ্ধ সুর। স্মৃতি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে, তবে বলব, সম্ভবত গৌরী ঘোষ পড়েছিলেন এই সংবাদকণিকা। না, এর আগে বা এর পরে আর কখনো আকাশবাণী থেকে এভাবে প্রচারিত হয়নি কোনো খবর।

দিন এগোচ্ছে, বিধি-নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে ছিটেফোঁটা করে খবর আসছে বাংলাদেশের গণহত্যার। সংবাদ লিখছি, পরিক্রমাও লিখছি। কিন্তু

লিখতে বসে চোখ ফেটে জল আসছে। গলার কাছে একটা আবেগ জমাট বেঁধে আছে। আরও অনেকের মতো আমারও আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব রয়েছেন বাংলাদেশে। তাঁদের কোনো খবর পাচ্ছি না। কিন্তু এটা তো শুধু আমার একার অবস্থা নয়। অসংখ্য মানুষের এই অবস্থা। ধীরে ধীরে আমার ব্যক্তিসত্তা যেন মুছে গেল। আমিও সেই অসংখ্য মানুষের একজন হয়ে গেলাম। হয়ে গেলাম বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের একজন শব্দ-সৈনিক। পরিক্রমার প্রথম পর্যায়ে আমার কথা সবার কথা হতে দেখেছিলাম, কিন্তু এখন দেখলাম সবার কথাই আমার কথা হয়ে যাচ্ছে।

এই তো বাংলাদেশ

দিন গড়িয়েছে আরও অনেকগুলি। বাংলাদেশে যে-গণহত্যা চলছিল, তার রূপ হয়েছে আরও স্পষ্ট। আমার কাজ ছিল নিউজ ডেস্কে, তবু সময় ও সুযোগমতো 'সংবাদ বিচিত্রা'র প্রযোজক উপেন তরফদারের সঙ্গে বার বার ছুটে গিয়েছি সীমান্ত অঞ্চলে। সংগ্রহ করেছি সেই গণহত্যার খবর। উপেন তরফদার দিনের পর দিন রেকর্ড করেছেন হানাদার বাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত মানুষের কথা, আর মুক্তিপিয়াসি মানুষদের সুদৃঢ় প্রত্যয়ের কথা। এমনি একদিন পরিচয় ঘটল ছোট্ট মেয়ে আয়েষার সঙ্গে। পৃথিবীতে যত রকমের লাঞ্ছনা ও অবমাননা আছে, তার সব ক-টিই সহ্য করতে হয়েছে ওই কিশোরী কন্যাকে। অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে মেয়েটি। আর সেই কান্না-ভেজা গলাতেই সে গেয়ে উঠেছে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।'—এই তো বাংলাদেশ, এই তো বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির সংগ্রাম। লিকলিকে বেতের ডগার মতো, মাথা নোয়ায়, কিন্তু ভেঙে পড়ে না, আবার খাড়া হয়ে ওঠে।

একটি ঐতিহাসিক ইঙ্গিত

যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুল, খবর যাচাই করবার কোনো উপায় নেই। একটা অস্পষ্টতার আবরণ চারিদিকে ছড়িয়েছিটিয়ে। এরই মধ্যে পরিক্রমা লিখছি। এক দিন নয়, দু-দিন নয়, প্রায় প্রত্যেক দিন। সংশয় দেখা দিচ্ছে মনে—কি, ঠিক লিখছি তো? ধরতে পারছি তো ইতিহাসের ইঙ্গিত।

২৭ মার্চ দিল্লিতে সংসদে সদস্যদের উদ্‌বেগের ভাগীদার হয়ে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি পাকিস্তানের ঘটনাবলি সম্পর্কে

জানালেন। বঙ্গানুবাদ থেকে লিখছি: 'আমরা আশা করেছিলাম পাকিস্তানের নির্বাচন প্রতিবেশী দেশে একটা নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে—যার ফলে আমরা আরও ঘনিষ্ঠতর হয়ে নিজেদের জনগণের আরও সেবা করে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারব, তা হয়নি। পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার একটা অপূর্ব সুযোগ হারিয়ে গেছে। হৃদয়বিদারকভাবে এবং দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই সেই সুযোগ হারিয়ে গেছে। এ-সম্পর্কে বলবার মতো যথেষ্ট শক্ত ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। এই পরিস্থিতিতে যতদূর সম্ভব আমরা ঘটনাবলি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছি।'

বুঝতে পারলাম ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রাম সম্পর্কে সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। আমাদের পরিক্রমায় তারই প্রতিফলন ঘটতে থাকল স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর রূপে।

দুই বেতারের লড়াই

দিন যায়। গণহত্যার শিকার হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশের এখান থেকে সেখান থেকে আশ্রয় ও নিরাপত্তার সন্ধানে ভারতে চলে আসতে শুরু করলেন। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের গণহত্যা এবং মুক্তিসংগ্রামের কিছু কিছু টাটকা খবর এসে পৌঁছোতে আরম্ভ করল। রেডিয়ো পাকিস্তান ঝিঁঝি পোকার মতো একটানা বলে চলেছে পূর্ব পাকিস্তানে সবকিছুই স্বাভাবিক, গণহত্যার খবর মিথ্যে। আর আমরা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের কাছ থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সংবাদ ও সংবাদ পরিক্রমায় হানাদার বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন তুলে ধরতে লাগলাম।

এক-একটা দিন আসছে, আর বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হবার খবর পৌঁছোচ্ছে। এমনি করেই খবর এল অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মফজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব প্রমুখের নিহত হবার খবর। এমনি করেই একদিন খবর এল কবি বেগম সুফিয়া কামালও নিহত হয়েছেন। সংবাদে সে-খবর প্রচার করাও হল। তখন আকাশবাণীতে পাকিস্তানি বেতার মনিটর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিমলা থেকে শংকর দাশগুপ্ত এসেছেন এই মনিটরিং ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত অফিসার হয়ে। আকাশবাণীর এই মনিটরিং

ইউনিটটি ছিল স্টুডিয়ো চত্বরে। স্টুডিয়ো একতলায় আর আমাদের নিউজ রুম ছিল দোতলায়। যে-দিন বেগম সুফিয়া কামালের মৃত্যুর খবর প্রচারিত হল, তার পরদিন রাত ন-টা নাগাদ শংকর হাঁপাতে হাঁপাতে নীচ থেকে ওপরে উঠে এল। আমার সঙ্গে দেখা হতে চাপা গলায় বলল—একেবারে বেইজ্জতি কাণ্ড। কাল আমরা বলেছি বেগম সুফিয়া কামাল নিহত হয়েছেন, আর আজ ঢাকা থেকে একটু আগে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচার করা হল। চল শুনবি। ছুটে গেলাম নীচে। টেপটা প্লে-ব্যাক করে শুনলাম তিরিশ-চল্লিশ সেকেন্ডের একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান। এক জন বললেন—বেগম সুফিয়া কামাল, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে আপনি নাকি নিহত হয়েছেন। তা এ-সম্পর্কে আপনি কি কিছু বলবেন? বেগম সুফিয়া কামাল জবাব দিলেন—দেখছেন তো আমি মারা যাইনি!—ব্যস্ এইটুকুই অনুষ্ঠান আর এই অনুষ্ঠানটিই ওরা কিছুক্ষণ অন্তর বেশ কয়েক বার প্রচার করল। উদ্দেশ্য স্পষ্ট—আকাশবাণীর খবর যে মিথ্যে, তা প্রমাণ করা। রাগে লজ্জায় প্রচণ্ড রকম আলোড়িত হলাম। অত রাতে এই প্রচারের কোনো জবাব দেওয়া গেল না। রাতের বুলেটিন শেষ করে যখন বাড়ি এসে পৌঁছোলাম, তখন রাত প্রায় বারোটা। মাথায় আগুন জ্বলছে, খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠল। গিন্নিকে বলে এক কাপ কফি খেয়ে দু-প্যাকেট সিগারেট সামনে রেখে ওই রাতেই বসে গেলাম জবাবি পরিক্রমা লিখতে। অনেক কাটাছেঁড়ার পর লেখা যখন শেষ হল, তখন প্রায় রাত তিনটে। কোনো কপি রাখিনি কিন্তু এখনও মনে আছে পরিক্রমাটা। তখন চলছে মিনি সাইজের যুগ। এখানে-ওখানে বেরোচ্ছে মিনি পত্রিকা, মিনি গল্প, মিনি কবিতা ইত্যাদি। আমিও এই জায়গাটি থেকেই শুরু করলাম। অভিনন্দন জানালাম রেডিয়ো পাকিস্তানকে চল্লিশ সেকেন্ডের এই মিনি সাক্ষাৎকার প্রচারের জন্য। ধন্যবাদ জানালাম বেগম সুফিয়া কামাল যে মারা যাননি—এই তথ্যটি উপস্থাপন করে সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের মনের উদ্‌বেগ লাঘব করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্ষোভও প্রকাশ করলাম বেগমা সুফিয়া কামালের টাটকা কোনো কবিতা প্রচার করা হল না বলে। বেগম সুফিয়া কামাল এবং বাংলাদেশের অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকরা তখন মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে গল্প-কবিতা লিখে চলেছেন। অপ্রকাশিত সেইসব কবিতার কিছু কিছু সীমান্তের এপারেও চলে আসছিল। এসব কথা জানবার পর রেডিয়ো পাকিস্তানকে

আবার ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম যে, বেগম সুফিয়া কামালের সাক্ষাৎকার প্রচার করে তারা যেমন আমাদের উদ্‌বেগ লাঘব করেছেন, তেমনি আশা করব অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব, অধ্যাপক মফজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী প্রমুখের সাক্ষাৎকারও তেমনি করে প্রচার করা হবে। পরের দিন রাত দশটায় এই সংবাদ পরিক্রমা প্রচারিত হল। তার পরে যে কী হল, আর তো কিছু জানবার উপায় নেই।

কিন্তু দিন দশ-বারো পরে একটি ঘটনা ঘটল। নিউজরুমে বসে কাজ করছি, হঠাৎ দ্বীপেশ ভৌমিক, আমাদের বার্তা সম্পাদক, আমাকে ডেকে পাঠালেন। ভৌমিকের ঘরে গিয়ে দেখি এক প্রৌঢ় বসে আছেন। আমি ঢুকতেই ভৌমিক বলে উঠলেন, ইনিই প্রণবেশ সেন। ওই পরিক্রমাটি এঁর লেখা। ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আমার নাম সৈয়দ আলি আহসান। আপনার ওই পরিক্রমা আমাদের যে কী বাঁচান বাঁচিয়েছে। রেডিয়ো পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার আমার এবং অন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিলেন। ওই সাক্ষাৎকারে আমাদের বলতে হত যে আকাশবাণী দিনের-পর-দিন বেগম সুফিয়া কামালের মৃত্যুর মতো বাংলাদেশের গণহত্যা ও মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রচার করে চলেছে। কিন্তু আপনার এই পরিক্রমা প্রচারিত হওয়ার পর ওরা ওই কর্মসূচি বাতিল করে। কারণ ওরা ততক্ষণে বুঝতে পারে একটি মিথ্যা দিয়ে শত শত সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না। চিত্রপরিচালক সুভাষ দত্তও এই ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন। কিছুদিন পর রেডিয়ো পাকিস্তানের কয়েকজন কর্মী যখন এপারে চলে এলেন তখন তাঁদের কাছে শুনেছিলাম যে, বেতারের ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার, নাম সম্ভবত ব্রিগেডিয়ার সালে, ঢাকা বেতারের সমস্ত কর্মীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোমরা আকাশবাণী শোনো? তোমাদের ওই দেবদুলালের মতো লিখতে হবে। সত্যি একটি বেতার অনুষ্ঠান জনগণকে যে কতটা প্রভাবিক করতে পারে, ওই সময়েই তার প্রমাণ পেয়েছিলাম।

শোনো একটি মুজিবরের থেকে ...

তখন তো এদেশে সকলের মনে শয়নে-স্বপনে-জাগরণে বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ। বাংলাদেশ নিয়ে গল্প লেখা হচ্ছে, নাটক লেখা হচ্ছে, প্রবন্ধ লেখা

হচ্ছে, লেখা হচ্ছে কবিতা, লেখা হচ্ছে নতুন নতুন গান। বাংলাসাহিত্যের পশ্চিম খণ্ডে ততদিনে একটা নতুন উপশাখা সংযোজিত হয়ে গেছে, যাকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম শাখা।

একটা গানের কথা মনে পড়ছে। এই গানটি প্রথম প্রচারিত হয়েছে রেডিয়োতে, রেকর্ড হয় তার পরে। লোকসংগীত শিল্পী দীনেন্দ্র চৌধুরী, অংশুমান রায় এবং গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার থাকতেন গড়িয়া অঞ্চলে। একটা চায়ের দোকানে ওদের আড্ডা বসত। সেদিনও বসেছে। কথার পিঠে কথা জমছে। কিন্তু গৌরীদা কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক। একসময় পকেট থেকে একচিলতে কাগজ বার করে কী একটা লিখতে লাগলেন, আর মাঝেমাঝেই টুকরো টুকরো কথা ছুড়ছিলেন আড্ডাটাকে তেজি রাখতে। কিছুক্ষণ বাদে গৌরীদা অংশু আর দীনেনকে বললেন, দেখো তো গানটা চলবে কি না। পড়া শেষ হতেই লাফিয়ে উঠল অংশু। বলল—গৌরীদা, এটা আপনি কাউকে দিতে পারবেন না। গানটায় সুর দেব আমি, গাইবও আমি। কিছুক্ষণ সুর ভেঁজে টেবিলে তবলার বোল বাজিয়ে অংশু গেয়ে উঠল—'শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে-বাতাসে ওঠে রণি ...।'

এর ক-দিন পরে দেবুদের বাড়িতে আড্ডা জমছে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পী কামরুল হাসানের সঙ্গে। উপেন তরফদারও সেখানে হাজির তাঁর টেপ-রেকর্ডার সমেত। গিয়েছিল কামরুল ভাইয়ের সাক্ষাৎকার নিতে। এমন সময় অংশু এসে পৌঁছোল পূর্ণদাস রোডের ওই বাড়িতে। কামরুল ভাইয়ের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। অংশু সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠল 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে ...'। টেবিলে তাল ঠুকতে থাকল দীনেন। উপেনের টেপ রেকর্ডারও চালু হয়ে গেছে ততক্ষণে। ওই আড্ডার শেষে উপেন ও অংশু চলে এল রেডিয়োতে। আমাকেও ডেকে নিল উপেন। তিন জনে বসলাম নিউজ-রিলের কক্ষে। গানটা বার দুয়েক শোনা হল। ঠিক হল এই গানটা আমরা এখনই প্রচার করব না। প্রচার করব একটা বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। আরও ঠিক হল গানটির সমে যখন 'বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ' কথাটা ফিরে আসবে তখন ওই ইন্টারলুডে শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণের কিছু কিছু অংশ ইনসার্ট করা হবে। গানটা সযত্নে নিউজ-রিলের লকারে রেখে দেওয়া হল।

চলো মুজিবনগর

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের এক পর্যায় এল ১২ এপ্রিল। গঠিত হল স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার। শেখ মুজিবর রহমান হলেন রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী, খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন মনসুর আলি হলেন অর্থমন্ত্রী এবং এ. এইচ. কামরুজ্জামান হলেন ত্রাণমন্ত্রী। এর পরের দিন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এক ভাষণে বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

তারিখটা মনে আছে। ১৬ এপ্রিল। রাতে নিউজরুমে কাজ করছি, বুলেটিন শেষ হল, এবার ঘরে ফেরার পালা। প্রস্তুত হচ্ছি। হঠাৎ বার্তা সম্পাদক দ্বীপেশ ভৌমিক ডেকে বললেন—আপনি আর উপেন আজ রাতে বাড়ি ফিরবেন না। কেন? পরে বলব।

সবাই চলে যাবার পর তিনি জানালেন গাড়ি প্রস্তুত রয়েছে, রাত তিনটেয় প্রেস ক্লাবে যেতে হবে। সেখানে বি. এস. এফের পি. আর. ও. সমর বসু থাকবেন। সমর বসু যা বলবেন তা-ই করতে হবে। বাড়িতে না ফেরার খবরটা দিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছে গেলাম প্রেস ক্লাবে। গিয়ে দেখি একের পর এক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে দেশি-বিদেশি বহু সাংবাদিকের ভিড়। সমরদাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার। এই মাঝরাতে তলব? সমরদা উত্তর না দিয়ে প্রায় না চেনার ভান করে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। একটু অবাক হলাম তাঁর ব্যবহারে। সমরদা আমাদের বহু পরিচিত। কিন্তু আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। কয়েক মিনিটের মধ্যে রাস্তায় কয়েকটা গাড়ি থামার শব্দ। সমরদা এগিয়ে গিয়ে দু-জনকে স্বাগত জানিয়ে আনলেন ঘরের ভিতরে। যতদূর মনে পড়ছে তাঁদের একজন ছিলেন যশোরের জেলা প্রশাসক। তিনি সমবেতভাবে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বললেন—বাংলাদেশ সরকার আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। আপনারা ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে বাংলাদেশ যেতে পারেন। কথা শেষ। বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। গাড়িতে চাপলেন। গাড়ি ছুটল হু হু করে। আমরাও তার পিছু নিলাম। প্রচণ্ড গতিতে গাড়িগুলো এগিয়ে চলেছে। এক ফাঁকে আমাদের ড্রাইভার ভবতোষবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছি? কোথায় যাচ্ছি, কেন

যাচ্ছি—আমরা কি তা জানি? ভবতোষবাবুকে বললাম, কোনো কিছু জানার দরকার নেই, শুধু এই গাড়িগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাড়ি চালান। রাত্রির নৈঃশব্দ্যকে খান খান করে দিয়ে গাড়ি ছুটছে। স্পিডোমিটারের কাঁটা ৮০-৯০-এর মাঝে থরথর করে কাঁপছে। অন্ধকার ফিকে হতে আরম্ভ করল। বোঝা গেল আমরা কৃষ্ণনগরে এসে পড়েছি। ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে এবার আমাদের এগোবার পালা। বেশ কয়েক কিলোমিটার এগোবার পর গাড়িগুলো থামল। বলা হল, এবার পায়ে হেঁটে একটু এগিয়ে যেতে হবে। কত কী যে ভাবনা চলছে মাথায় কী ঘটতে পারে তা নিয়ে। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর পৌঁছোনো গেল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে। ওই গ্রামের নাম তখন মুজিবনগর। বিশাল এক আম্রকুঞ্জে বেশ কয়েক হাজার মানুষ সমবেত হয়েছেন। আনাগোনা করছেন এমন কিছু কিছু মানুষ যাঁদের হাতে রাইফেল, এল. এম. জি. প্রভৃতি। বাংলাদেশের পতাকা চারিদিকে পতপত করে উড়ছে। জানা গেল বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীরা সেখানে শপথ নেবেন।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল অনেক অনেক বছর আগে পলাশির এক আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। সেই পলাশি থেকেই কিছু দক্ষিণে আর এক আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন হল।

১৭ এপ্রিল, বেলা এগারোটা। বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ এলেন। 'জয় বাংলা' আর 'জয় মুজিব' ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল অনুষ্ঠানস্থল। সশস্ত্র আনসার দল উপরাষ্ট্রপতিকে অভিবাদন জানাল। এরপর সকলে আসীন হলেন মঞ্চে। অনুষ্ঠান শুরু হল 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি দিয়ে।

আওয়ামি লিগের চিফ হুইপ ইউসুফ আলি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন : বাংলাদেশের পটভূমি বিশ্লেষণ করে ওই ঘোষণাপত্রে বলা হল—সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যে-ম্যান্ডেট দিয়াছেন. আমরা সেই বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা একটি গণপরিষদে গঠিত হইয়া পারস্পরিক আলোচনা করিয়া বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার বলবৎ রাখিবার জন্য বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে

ঘোষণা করিতেছি এবং তদ্দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।...

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

এর পর অধ্যাপক ইউসুফ আলি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর ভাষণে বললেন— পৃথিবীর মানচিত্রে আজ যে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হল, তা চিরদিন থাকবে। পৃথিবীর কোনো শক্তিই তা মুছে দিতে পারবে না। এখন যুদ্ধ এসে গিয়েছে। এই যুদ্ধ স্বাধীনতার অস্তিত্বের যুদ্ধ। পৃথিবীর মানচিত্রে বাঙালির অস্তিত্বের যুদ্ধ। হাটে-বাজারে নদী-নালায় আমাদের সৈনিকরা লড়েছেন, লড়ছেন আর লড়বেন। তাঁরা এই দেশের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক বেড়াজাল ভেঙে জয়লাভ করবেন। আমরা পরাজিত হওয়ার জন্য যুদ্ধে নামিনি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন বললেন, পাকিস্তানের জনগণের বহু কষ্টার্জিত বিদেশি মুদ্রার বিনিময়ে অতীতের পাকিস্তান দেশের প্রতিরক্ষার জন্য বহু অর্থমূল্য দিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও সমরসম্ভার সংগ্রহ করেছে। অত্যন্ত দুঃখের কথা সেই অস্ত্র এখন নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তিনি বিদেশি রাষ্ট্রগুলির কাছে পুনরায় কূটনৈতিক স্বীকৃতির আবেদন জানিয়ে বললেন, পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য মানবসন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে। পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, পূর্ব বাংলার কতটা অঞ্চল তাঁদের অধিকারে? তাজউদ্দিন সাহেবের জবাব—সবটাই, খানিকটা সামরিক ঘাঁটি বাদে। তিনি জানান যে, কর্নেল ওসমানিকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং কর্নেল আবদুর রবকে চিফ অব্ স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষ হল। অর্থমন্ত্রী জনাব মনসুর আলির সঙ্গে একটু আলাদাভাবে দেখা করলাম। তিনি আমার পিতৃবন্ধু। পাবনা-সিরাজগঞ্জের মানুষ। মনসুরকাকার সঙ্গে আমাদের প্রায় পারিবারিক সম্পর্ক। তাঁর কাছেই প্রথম খবর পেলাম আমার বাবা-মায়ের।

এর পরেই কলকাতা সংবাদ শিরোনামে চলে এল। দিল্লির দুই পাকিস্তানি কূটনীতিক বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন আগেই, এবার কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলি বাংলাদেশের প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করলেন এবং পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশনকে রূপান্তরিত করলেন বাংলাদেশ মিশনে। আমার মনে আছে এই দু-টি ঘটনা একটি 'সংবাদ পরিক্রমা'য় এবং 'সংবাদ বিচিত্রা'য় 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে' গানটি ব্যবহার করা হয়েছিল। তুমুল হইচই পড়ে যায় বাংলাদেশে। দাবানলের মতো গানটি ছড়িয়ে পড়ে। কুষ্টিয়া অঞ্চলে একদল মুক্তিসংগ্রামী এসে এই গানটির জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। বলেন, তাঁদের যখন হতাশায় ভেঙে পড়ার উপক্রম তখন এই গানটিই মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সংবাদ পরিক্রমার মতো এই গানটির অবদানও অবিস্মরণীয়। বাংলাদেশের মুক্তির পর বাংলাদেশ সরকার এরই স্বীকৃতিতে পরিক্রমা-লেখক প্রণবেশ সেন, পরিক্রমা-পাঠক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শোনো একটি মুজিবরের' গানটির শিল্পী অংশুমান রায় এবং গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। ভারত সরকার দেবুকে সম্মানিত করেন 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে। একটি দেশের বেতারের, অন্য একটি দেশের মুক্তিসংগ্রামে এভাবে সহায়ক হবার ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে বলে জানা নেই।

২৫ মে চালু হল স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার, মুজিবনগর থেকে। তখন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার যেখানে থাকতেন সেটিই হত মুজিবনগর। কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে ছিল এই স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারের স্টুডিয়ো। আকাশবাণী পেল আর এক সংগ্রামের সাথি। এই দুই বেতারই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অমানবিকতার বিরুদ্ধে। লড়েছে গণতান্ত্রিক অধিকারের সপক্ষে।

দুই বেতারের কর্মী ও শিল্পীদের মধ্যেও গড়ে উঠল সখ্য। আকাশবাণীর নিউজ-রুমের পিছনে—বিধানসভার দিকে যে ছোট্ট একফালি বারান্দা ছিল, প্রায় প্রতিদিনই বিকেলে সেখানে আমাদের আড্ডা জমত, আসতেন হাসান ইমাম, কামাল লোহানি, শহীদুল ইসলাম, আসরাফ-উল-আলম, আমিনুল

হক বাদশা, গাজিউল হক, আলমগীর কবীর, অজিত রায়, রথীন্দ্রনাথ রায়, আপেল মামুদ, এম. আর. আখতার এবং আরও অনেকে। এদের সঙ্গে কথা বলেও বাংলাদেশের ভেতরকার অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি।

যতদূর মনে পড়ছে এই মে মাসের গোড়ার দিকেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে লাগল সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' পত্রিকা। ওই পত্রিকায়ও পাওয়া যেত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের তথ্যনিষ্ঠ চিত্ররূপ।

এত রক্ত মধ্যযুগও দেখেনি কখনো

তারিখটা ঠিক মনে নেই। ডায়েরির পাতায় একটা পরিক্রমার খসড়া দেখতে পাচ্ছি। লেখাটা শুরু হয়েছিল এইভাবে—"ওরা আসছে। আসছে তো আসছেই। শহর থেকে, গ্রাম থেকে, নদীনালা-খালবিল পেরিয়ে, অরণ্য-পর্বত ডিঙিয়ে। ওরা আসছে নৌকায়, গাড়িতে পালকিতে, পায়ে হেঁটে, কোলে-কাঁধে চেপে। ওরা আসছে নাৎসি জার্মানদের কবল থেকে পালিয়ে-আসা ইহুদিদের মতো। ওরা আসছে ইজরায়েল অধিকৃত প্যালেস্টাইন থেকে হটিয়ে দেওয়া আরবদের মতো। ওরা আসছে ভিয়েতনামি শরণার্থীদের মতো। কিন্তু না, কোনো শরণার্থী সমাগমের সঙ্গেই তুলনা হয় না বাংলাদেশ থেকে চলে-আসা এইসব শরণার্থীদের। আর এই শরণার্থীরা শিকার হয়েছিল নৃশংসতম এক নারকীয় অভিযানের। এদের কেউ কেউ আহত, কেউ কেউ সর্বস্ব-খোয়ানো, কেউ কেউ স্বজন হারানোর বেদনায় মুহ্যমান। কেউ কেউ অপুষ্টিতে এবং অসুস্থতায় ভুগছে। সবাই প্রায় আতঙ্কগ্রস্ত। মানবিক মর্যাদার এতটুকু অবশেষও তারা দেখতে পায়নি, এতদিন যাদের ভাই বলে ভেবে এসেছে সেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে।

একজন জার্মান সাংবাদিক এই বিশাল শরণার্থী শিবিরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—এ তো ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এক ভয়ংকর আক্রমণ। এক-দুই নয়, হাজার-হাজার নয়, লক্ষ-লক্ষ নিরস্ত্র সৈন্য পাঠাল তারা সীমান্তের ওপার থেকে। এদের বিরুদ্ধে তো অস্ত্র দিয়ে লড়াই করা চলে না, স্নেহ দিয়ে মানবিকতা দিয়ে এবং মমতা দিয়ে এদের গ্রহণ করতে হয়। এক-একজন শরণার্থী নিপীড়ন, নির্যাতন ও অত্যাচারের এক-একটি করুণ

কাহিনি। আবার এদের মধ্যেই দেখেছি প্রগাঢ় দেশপ্রেম এবং দেশভূমিকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করবার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না, কিন্তু দরজা খোলা ছিল সীমান্ত এবং মনের। ফলে যে যেখানে পেরেছেন, আশ্রয় নিয়েছেন। ত্রিপুরা, মেঘালয়, অসম-সহ পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, অন্য সব রাজ্যেও তিল ঠাঁই আর নাইরে। ভারতের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা খুব-একটা সুবিধের নয়। হিংসা ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের প্ররোচনাও রয়েছে দাঙ্গা বাধানোর। এই সময় সহায়-সম্বলহীন পুষ্টিহীন রোগজীর্ণ আহত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দায় বহন করা খুব একটা সহজ কাজ নয়।

নিউজউইক পত্রিকায় টনি ক্লিফটন লিখেছেন—যেকেউ ক্যাম্প বা হাসপাতালে গেলে বিশ্বাস করবে যে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যেকোনোরকম অত্যাচার করতে সক্ষম। গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, এমন বহু শিশুকে আমি দেখেছি, বেত মেরে একেবারে রক্তাক্ত করা হয়েছে। চোখের সামনে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করা হয়েছে, কিংবা নিজের মেয়ের ওপর পাশবিক অত্যাচার দেখে একেবারে মূক হয়ে গেছেন এমন লোকও আমি দেখেছি। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে পূর্ব পাকিস্তানে শত-শত *মাইলাই* ও *লিডিসেস* অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শরণার্থী শিবিরগুলি দেখে এইসব অভিজ্ঞতার কথা দিনের পর দিন লিখেছি সংবাদ পরিক্রমায়। এ তো যাঁদের দেখেছি তাদের কথা। যাঁদের দেখিনি, যাঁরা বাংলাদেশের ভিতরেই হানাদারবাহিনীর হাতেই নিহত হয়েছেন, তাড়া খেয়ে এখানে-ওখানে পালিয়ে বেড়িয়েছেন, আক্রান্ত হয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন, বহু শ্রমে এবং স্বপ্নে গড়ে তোলা একচিলতে বাড়িতে যাঁরা শবদেহ হয়ে পড়ে থেকেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা বলব কেমন করে? সীমান্তের এপার থেকে তো তাদের দেখা যায় না। তবু যেটুকু দেখেছি, যেটুকু শুনেছি, তা থেকে মনে হয় মধ্যযুগও এত রক্ত দেখেনি কখনো। খোজাডাঙা শিবির থেকে আকাশবাণীতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন 'ইত্তেফাক'-এর সাংবাদিক আবেদ খান। তাঁর কাছেও শুনেছি বাংলাদেশের ভেতরের মর্মান্তিক অবস্থা।

আগত শরণার্থীদের একটা মোটা অংশেরই মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছিল সীমান্ত এলাকায়। এই শরণার্থীদের অবস্থা সরেজমিনে দেখতে এসেছিলেন সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, ব্রিটিশ এম. পি. ব্রুস ডগলাসম্যান, আর্থার বটলমি, এসেছেন রাষ্ট্রসংঘের উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন কমিশনার প্রিন্স সদরউদ্দিন আগা খান এবং আরও অনেকে। তাঁরা নিন্দা করেছেন পাকিস্তানের অত্যাচারের, প্রশংসা করেছেন ভারতীয় ত্রাণ-প্রয়াসের। বহু বিদেশি সাংবাদিকও এসেছেন। এঁদের কথা নিয়ে, এঁদের অভিজ্ঞতা নিয়ে, এঁদের অনুভব নিয়েও পরিক্রমা লিখেছি একের পর এক।

আমি তোর জন্ম-সহোদর

বার বার গেছি এই শিবিরগুলিতে, লক্ষ করেছি মানবিক চেতনার এক আশ্চর্য প্রকাশ। এইসব অঞ্চলে যাঁরা বাস করতেন, তাঁদের অনেকের গায়েই ছিল দেশভাগের ক্ষতচিহ্ন। ভারত-পাকিস্তানের ইতিহাস---সে তো অবিশ্বাসের ইতিহাস, সন্দেহ-বিদ্বেষ ও দাঙ্গার ইতিহাস। অথচ সবাই এক লহমায় সেই পূর্ব ইতিহাস মুছে ফেলে বুকের দরজা খুলে দিয়ে, ধর্মের বেড়াকে টপকে গিয়ে আগত শরণার্থীদের আলিঙ্গন করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, শুশ্রূষা দিয়েছেন। হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, বৌদ্ধ নয়, খ্রিস্টান নয়, এপার-ওপার নয়—সবার পরিচয় এক—মানুষ নামধারী এক দল ভুখা নেকড়ের হাতে আক্রান্ত আর এক দল মানুষ এসেছেন একটু আশ্রয় পেতে। এক-একজন শরণার্থী যেন এক-একটি কাহিনি। সেই কাহিনি কখনো শৌর্যের, কখনো বীর্যের, কখনো চোখের জলের। কখনো অত্যাচার সহ্য করবার অপরিসীম ক্ষমতার।

ভারতের সাধ্য ছিল সীমিত। ত্রাণসাহায্যের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি মিলেছে যতটা সহায়তা মেলেনি ততটা। ভারতীয় অর্থনীতি বিপর্যয়ের কিনারায় গিয়ে পৌঁছেছিল, তবু এই শরণার্থী পুনর্বাসন এদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে ছিল একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। ভারতের ছাত্র-জনতা, শিল্পী-বুদ্ধিজীবী, শ্রম ও কৃষিজীবী মানুষ---যে যেমন করে পেরেছেন এই পুনর্বাসন প্রয়াসে শামিল হয়েছেন অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে, মমতা দিয়ে। যা ছিল পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের লড়াই তা এই অভূতপূর্ব শরণার্থী সমাগমের ফলে হয়ে দাঁড়াল ভারতের সমস্যা। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি, জয়প্রকাশ নারায়ণ, সর্দার স্বরণ সিং,

ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ও অন্য নেতৃবৃন্দ পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে গিয়ে পাকিস্তানের মিয়াওয়ালি কারাগারে বন্দি শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করেছেন, সমস্যার রাজনৈতিক ও মানবিক সমাধানের সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত করবার কথা বলেছেন।

এইসব ঘটনা, এইসব কাহিনি, এইসব প্রয়াসের বৃত্তান্ত দিনের পর দিন পরিক্রমায় তুলে ধরেছি। আশ্চর্য ছিল সেই সময়টা, যখন ভারত সরকার, ভারতীয় জনগণ এবং বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা একটা অভিন্ন বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছিল। আকাশবাণী হয়ে উঠেছিল মুক্তিপ্রেমী, গণতন্ত্রপ্রেমী এবং অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর। পরিক্রমায় লিখতাম বিশ্বের এই বৃহত্তম ত্রাণ অভিযানের একথা-সেকথা। আর সব কথার শেষ কথা ছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি কবিতার অন্তিম পঙ্‌ক্তি—'আমি তোর জন্ম-সহোদর।'

লড়াইয়ের মুখোমুখি আমরা

উত্তেজনায় উদ্দীপনায় শপথে অঙ্গীকারে কেটে গেল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের আট মাস। শুরু হল নভেম্বর মাস। তখনও জানা নেই কীভাবে কোন লগ্নে বাংলাদেশের মুক্তি হবে। দিনের পর দিন কাটছে এক অপরিসীম প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে, মুক্তিসংগ্রামীদের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে।

সেদিন ছিল তেসরা ডিসেম্বর। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি এসেছেন কলকাতায়। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে তাঁর সভা হবে বিকেলে। সকাল থেকেই কলকাতা এক স্লোগান নগরী। পশ্চিমবঙ্গের এমন কোনো স্থান নেই যেখান থেকে মিছিল করে মানুষ আসেনি ওই সভায় যোগ দেবার জন্য। এঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে নানা স্লোগান। কখনো 'ইন্দিরা গান্ধি জিন্দাবাদ', কখনো 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ', কখনো আবার 'বাংলাদেশের মুক্তি চাই/ভারত-বাংলাদেশ ভাই-ভাই'। সকলের মনেই জল্পনা-কল্পনা চলছে—কী বলবেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশকে কি কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন, নাকি বলবেন আর কিছু? ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড তখন জনসমুদ্র। প্রধানমন্ত্রী এলেন নির্দিষ্ট সময়েই। ভাষণ শুরু করলেন—সেই

ভাষণে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন যেমন পুনর্যোজিত হল, তেমনি পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে বলা হল, 'আমরা যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'। মন ভরল না শ্রোতাদের। তাঁরা যে শুনতে চান বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত সাফল্যের কথা। বাংলাদেশকে ভারতের কূটনৈতিক স্বীকৃতিদানের কথা। প্রধানমন্ত্রীও কেমন যেন খানিকটা আচমকাই তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করলেন।

ফিরে এলেন রাজভবনে। যতদূর মনে পড়ছে সেদিন তাঁর কলকাতায় থাকবার কথা ছিল, কিন্তু সভা থেকে ফিরে রাজভবনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তিনি সাংবাদিকদের জানালেন যে, তিনি তক্ষুনি দিল্লি ফিরে যাচ্ছেন, কারণ পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে। আসলে এটাই ছিল পাকিস্তানের কবরের শেষ পেরেক। ভারত পালটা আক্রমণ চালাল। পশ্চিম ও পূর্ব দু-খণ্ডই হয়ে উঠল রণাঙ্গন।

দিল্লিতে ফিরে গিয়ে রাতে আকাশবাণীর অনুষ্ঠান শেষ হবার ঠিক আগেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি জাতির উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত বেতারভাষণে বললেন—দেশ ও জনগণের একটা বিরাট বিপদের মুহূর্তে আমি আপনাদের সামনে কথা বলছি। কয়েক ঘণ্টা আগে তেসরা ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে পাঁচটার পরই পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে সার্বিক যুদ্ধ-ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানি বিমানবাহিনী আকস্মিকভাবে অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, যোধপুর, আম্বালা ও আগ্রায় আমাদের বিমানঘাঁটির ওপর আক্রমণ হেনেছে। তাদের স্থলবাহিনী সোলাই মানকি, ক্ষেমকারান, পুঞ্চ ও অন্যান্য সেক্টরে আমাদের অবস্থানের ওপর শেল নিক্ষেপ করেছে। ... আজ বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। ... দেশকে যুদ্ধের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি করা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই।

এই লেখা যখন লিখছি স্পষ্ট বুঝতে পারছি একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা নতুন করে গজিয়ে উঠছে মনের ভিতর, সেদিনের সেই রাত্রের উত্তেজনা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ওই ভাষণের একটু পরেই ভাষণটির বঙ্গানুবাদ প্রচার করা হবে। রাতের ট্রান্সমিশন কিছুক্ষণের জন্য এক্সটেন্ড করা হল। বার্তা বিভাগের সবাই তখন চলে গেছেন। রয়েছি আমি, বিভূতিদা আর দেবু। রেকর্ড করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা। সেই রেকর্ড একটু একটু শুনে আমি তা অনুবাদ করে বলছি, বিভূতিদা চটপট করে তা লিখছেন, আর সঙ্গে

সঙ্গে সেই পৃষ্ঠাটি চলে যাচ্ছে স্টুডিয়োয় দেবুর কাছে। থরথর করে কাঁপছি ভয়ে, উত্তেজনায়। ভয়—এত তাড়াতাড়ি অনুবাদ করতে গিয়ে যদি ভুল হয়ে যায়। কিন্তু না, তা হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেবুর কণ্ঠে ইথার তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সেই ভাষণের বঙ্গানুবাদ। দেবুর পড়া শেষ হল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কারও যেন চলাফেরার শক্তি নেই। মাথা ঝিমঝিম করছে। বাড়ি ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন ঘুমোতে পারিনি।

পাকিস্তান তেসরা ডিসেম্বর বিকেলে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিল। ভেবেছিল হঠাৎ আক্রমণ করে আমাদের শক্তিকে ভোঁতা করে দেবে। কিন্তু সজাগ ভারতীয় বাহিনীর পালটা আঘাতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পরিক্রমা সেই সময় যেন এল. এম. জি.-র গুলি। কোনো দ্বিধা নেই, কোনো সংশয় নেই, কোনো অস্পষ্টতা নেই। নির্ভুল লক্ষ্যে বর্ষিত হচ্ছে, শত্রুকে লক্ষ্য করে।

জয় দিকে দিকে

যুদ্ধ হয়ে উঠল জোরালো। মুক্তিবাহিনী ততদিনে হয়ে উঠেছে সুসংগঠিত ও শাণিত। জয় করছে এক-একটি ক্ষেত্র। তাদের অপূর্ব বীরত্বগাথা ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। বাংলাদেশের ভিতরে এতদিন যারা পাকিস্তানি হামলায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন মুক্তিবাহিনীর সাফল্যে তারাও তেজি হয়ে উঠলেন। পশ্চিম পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত অঞ্চলগুলিতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকল বাংলাদেশের অসামরিক প্রশাসন। অন্য দিকে ভারতীয় বাহিনীর লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটিগুলিকে ঘিরে রেখে কম সংখ্যক হতাহতের ঘটনা ঘটিয়ে বাংলাদেশকে মুক্ত করা। প্রথম রাতেই বাজিমাত করল ভারতীয় বিমানবাহিনী। মিগের পরাক্রমে সাবাড় হয়ে গেল পাকিস্তানের স্যাবার জেটগুলি। বাংলাদেশের আকাশ হল শত্রুমুক্ত। ভারতীয় নৌবাহিনী আক্রমণ চালাল চট্টগ্রাম, চালনা, কক্সবাজার এবং চাঁদপুরের ওপর। বন্দর বিধ্বস্ত হল। স্তব্ধ হল পাকিস্তানের রণতরির আনাগোনা এবং সেইসঙ্গে তাদের পালাবার পথ।

সেদিন ৬ ডিসেম্বর। নিউজরুমে ডিউটি করছি আমি আর দেবু। সকাল বেলায় বুলেটিনগুলোর প্রচার সব শেষ হয়েছে। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে গল্প করছি নিজেদের মধ্যে। বেলা তখন সাড়ে দশটা। টেলিপ্রিন্টারে চোখ

পড়তেই দেখি খবর এসেছে লোকসভার অধিবেশনের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সদস্যদের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন—

নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামরত বাংলাদেশের জনগণ এবং ভারতবাসী আজ একই লক্ষ্যের, একই পথের পথিক ...

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, একই আদর্শ ও ত্যাগে অনুপ্রাণিত ভারত ও বাংলাদেশের সরকার এবং জনসাধারণ পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রসংহতি বজায় রাখা, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, সমান অধিকার এবং পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা-উপকারের ভিত্তিতে এক দৃঢ় মধুর সম্পর্ক গঠন করবে। এইভাবে একত্রে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে আমরা সৎ-প্রতিবেশী হয়ে বাস করার এমন এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরব যাতে এই অঞ্চলে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং প্রগতি চিরস্থায়ী হয়।

বাংলাদেশের প্রতি আমাদের শুভকামনা জানাই।

প্রথমে ফ্ল্যাশ, তার পরে বিশদ বিবরণ। সংবাদ সংস্থার টেলিপ্রিন্টারে খবরটা এল এই পর্যায়ে। ফ্ল্যাশ দেখেই ছোট্ট একটা নিউজ করে দেবুকে দিলাম খবরটা পড়তে। তখন তো আমাদের বুলেটিনের সময় ছিল না। কোনো একজন বিশিষ্ট শিল্পীর খেয়াল পরিবেশিত হচ্ছিল। পরবর্তী বুলেটিন দিল্লি থেকে, তাও আধ ঘণ্টা পরে। কিন্তু এতক্ষণ চেপে রাখব কী করে এই খবরটা? দেবু ছুটল স্টুডিয়োতে। শিল্পীর অনুষ্ঠান সাময়িক বিরতি ঘটিয়ে ভারতের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার খবরটা প্রচার করা হল। বুলেটিন শেষ হতেই ফোন করলাম বাংলাদেশ বেতারে। বন্ধু কামাল লোহানিকে জানালাম এই খবর। একটু থতমত খেয়ে কামাল হো-হো করে উল্লাসে ফেটে পড়ল। ওর সেই হাসিটা আজও কানে বাজছে।

যাই হোক, খবরটা প্রচারিত হবার সঙ্গেসঙ্গে সারা শহর তোলপাড়। উপেন তরফদার ছুটে এল। আমি আর ও গেলাম সার্কুলার রোডে, যেখানে থাকতেন বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে স্বাগত প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা হল অস্থায়ী উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ মজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ এবং অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলির।

সেদিনও রাতে পরিক্রমা লিখেছিলাম আমিই। আর সেই পরিক্রমার প্রথম লাইনটি ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার একটি পঙ্ক্তি—'এদেশ আমার গর্ব/এ মাটি আমার কাছে সোনা।'

যৌথ কমান্ড গঠন

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার পর গঠন করা হল ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর এক যৌথ কমান্ড। ইস্টার্ন কমান্ডের জি. ও. সি. ইন-সি জগজিৎ সিং অরোরা হলেন এই কমান্ডের প্রধান। এই যৌথ কমান্ডের নেতৃত্বে ইস্টার্ন কমান্ডের জওয়ানরা এবং মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা লড়াইকে নিয়ে গেলেন বাংলাদেশের গভীরে। এর পর থেকে প্রতিদিনের ইতিহাস জয়ের ইতিহাস। সর্বত্রই অভূতপূর্বভাবে অভিনন্দিত হলেন যৌথ বাহিনীর জওয়ান ও অফিসাররা।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কুচক্রীদের চক্রান্ত তখনও কিন্তু চলছে। পাকিস্তানি বাহিনীর ধারণা ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেসিডেন্ট নিকসন ভারতকে চিহ্নিত করতে চাইলেন আক্রমণকারী হিসাবে। কিন্তু মার্কিন জনমত প্রতিধ্বনিত হল সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির কণ্ঠে। তিনি বললেন : The war did not begin last week with military border crossings or last month with the escalation of artillery crossfire. This war began on the bloody night of March 25 with the brutal suppression by the Pakistan Army of the results of a free election.

তবু ভবি ভুলল না। প্রেসিডেন্ট নিকসন সপ্তম নৌবহরকে নির্দেশ দিলেন বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে যেতে।

ওদিকে দিনের পর দিন যৌথ কমান্ডের জয়ের ক্ষেত্র বিস্তৃত হচ্ছে। এই জয় কিন্তু সহজে আসেনি। বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করতে হানাদার বাহিনী 'পোড়ামাটি' নীতি অনুসরণ করে নদীবহুল ওই দেশটির বিভিন্ন সেতু ভেঙে রেখেছিল। চলতে চলতে সেইসব সেতু সারিয়ে নিতে হয়েছে জওয়ানদের। বাংলাদেশের বিরাট বিরাট নদী যে-বাধার সৃষ্টি করেছিল, তা অতিক্রম করা হয়েছে ছত্রী সেনাদের সাহায্যে। কাঁচা রাস্তার ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে সৈন্য ও সমরাস্ত্র বোঝাই ভারী ভারী যানবাহন।

যৌথ কমান্ডের জওয়ানরা সরাসরি সংঘর্ষে না গিয়ে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলায় পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যান্টনমেন্টগুলো অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের রসদে টান পড়ে। আত্মসমর্পণ ছাড়া তাদের সামনে গত্যন্তর ছিল না।

জেনোসাইড থেকে এলিটোসাইড

১৪ ডিসেম্বর সকালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী সাভারে পৌঁছে যায়। মুক্তিপ্রেমী মানুষের অকুণ্ঠ অভিনন্দনে অভিষিক্ত হন তাঁরা। এখন শুধু প্রতীক্ষা—কখন আসবে সেই নবজীবনের মুহূর্ত। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল মানেকশ আকাশবাণীর মাধ্যমে সতর্ক করে দিলেন পাকিস্তানি বাহিনীকে। বললেন—আমি জানতে পেরেছি যে বর্তমানে তোমরা বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে সমবেত হচ্ছ। তোমাদের আশা—হয়তো তোমরা পালাতে পারবে, বা তোমাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সমুদ্রপথে তোমাদের পালানোর পথ আমি রুদ্ধ করে দিয়েছি, সেইজন্য নৌবাহিনীকে আমি নিয়োগ করেছি।

আমার এই পরামর্শ শুনে যদি তোমরা আমার সৈন্যবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ না কর, বা পালাতে চেষ্টা কর, তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আত্মসমর্পণ করলে জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী তোমাদের প্রতি মর্যাদা সহকারে ব্যবহার করা হবে।

ভারতীয় বাহিনী চতুর্দিক দিয়ে তোমাদের ঘিরে ফেলেছে। তোমাদের বিমানবাহিনী এখন নিশ্চিহ্ন। সুতরাং তাদের কাছ থেকে যেমন কোনো সাহায্যলাভের আশা নেই, বাইরের কোনো বিমানবাহিনীর কাছ থেকে সাহায্যলাভের আশা নেই, বাইরের কোনো নৌবাহিনীর কাছ থেকে সাহায্যলাভও সেই রকম দুরাশা। চট্টগ্রাম, চালনা ও মঙ্গলা বন্দরগুলিও অবরুদ্ধ। সমুদ্রপথও তোমাদের কোনোরকম সাহায্য করতে পারবে না। তোমাদের ভাগ্যও এখন তোমাদের বিরুদ্ধে। মুক্তিবাহিনী ও অন্যান্য স্বাধীনতাসংগ্রামী সংগঠনগুলি তোমাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তাদের ওপর তোমরা যে-নিষ্ঠুর বর্বর অত্যাচার করেছ, তার প্রতিশোধ নিতে তারা দৃঢ়বদ্ধ। এখন তোমাদের একমাত্র পথ হল আগুয়ান ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করা। মিথ্যা জীবন হারিয়ে লাভ কী? তোমরা কি দেশে

ফিরে যেতে, স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হতে চাও না? তাহলে আর মিথ্যা দেরি কেন?

একজন সৈনিকের কাছে অস্ত্র তুলে দিতে লজ্জা নেই। আমি তোমাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে, আত্মসমর্পণ করলে তোমাদের সঙ্গে সৈনিকের মতোই ব্যবহার করা হবে। সময় দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আত্মসমর্পণ করো, অন্যথায় তোমাদের মৃত্যু নিশ্চিত।

ততক্ষণে এদিকে-ওদিকে বিচ্ছিন্নভাবে হানাদারদের এক-একটি দল আত্মসমর্পণ করতে লাগল। এই আত্মসমর্পণের মুখেও পাকিস্তানি স্বৈরতন্ত্র তার ঘাতক রূপটিকে ছাড়তে পারল না। এতদিন ধরে চলছিল জেনোসাইড, পরাজয়ের অব্যবহিত আগেই তারা শুরু করল এলিটোসাইড—বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা অভিযান।

প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা

১৫ ডিসেম্বর সারা দেশ অপেক্ষা করছে পাকিস্তানবাহিনীর আত্মসমর্পণের খবরটুকু জানবার জন্য। সকাল গেল, দুপুর গেল, সন্ধ্যা গেল—তবু সেই খবরটি পৌঁছোল না। ওই ১৫ ডিসেম্বর রাতের পরিক্রমায় লিখলাম—

... বাংলাদেশে আমার সংগ্রামী বন্ধুরা, আজ এই রাতে তোমাদের জানাই ভারতের কোটি কোটি মানুষের সংগ্রামী অভিনন্দন, লাখো লাখো সেলাম। কারণ আমি জানি এই রাত ভোর হবে, পুবের আকাশে উঠবে নতুন সূর্য, আর ওই সূর্যকে ছিনিয়ে আনছ তোমরা—আমার সংগ্রামী ভাইয়েরা। আমি জানি ঢাকা মুক্ত হয়েছে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে বিশ্বের কনিষ্ঠতম গণতন্ত্রের রাজধানীরূপে। ইতিহাসের এই পরম ও অনিবার্য সত্যকে আমি এখনও ঘোষণা করতে পারছি না। কিন্তু এ-ও জানি, এ-সত্যকে পৌঁছে দেবই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে—আজ নয়, কাল।

সূর্যাস্তে সূর্যোদয়

সেই কাল এল—এল ১৬ ডিসেম্বর। জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিলেন। জেনারেল নাগরা, ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং, ব্রিগেডিয়ার ক্লে

এবং টাইগার সিদ্দিকি ঢাকায় জেনারেল নিয়াজির সদর দপ্তরে গিয়ে চূড়ান্ত করলেন আত্মসমর্পণের পদ্ধতি প্রকরণ।

দুপুরে ইস্টার্ন কমান্ডের মেজর জেনারেল জেকব আত্মসমর্পণের দলিল নিয়ে ঢাকা রওনা হলেন।

এর কিছু পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা এয়ার-মার্শাল দেওয়ান, ভাইস-অ্যাডমিরাল কৃষ্ণান এবং মুক্তিবাহিনীর চিফ অব্ স্টাফ, গ্রুপ ক্যাপ্টেন খোন্দকারকে নিয়ে ঢাকায় পৌঁছোলেন।

বুড়িগঙ্গার তীর। শীতের আকাশ তখন সূর্যাস্তের রঙে রাঙা। ঘড়িতে তখন চারটে কুড়ি। ঢাকার রেসকোর্স ময়দান প্রত্যক্ষ করল এক ঐতিহাসিক দৃশ্য।

এগিয়ে এলেন বিজয়ী ও পরাজিত বাহিনীর নায়করা। স্বাক্ষরিত হল ইনস্ট্রুমেন্ট অব্ সারেন্ডার। সেই দলিলে স্বাক্ষর দিলেন পাকিস্তানি বাহিনীর জেনারেল নিয়াজি এবং যৌথ কমান্ডের জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

বুড়িগঙ্গার তীরে সূর্য তখন অস্ত যেতে চলেছে মুক্ত বাংলায় স্বাধীন বাংলায় নতুন করে উঠবে বলে। প্রায় ওই সময়েই দিল্লিতে লোকসভায় সদস্যাদের কান-ফাটানো করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি ঘোষণা করলেন—ঢাকা এখন একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজধানী। লোকসভা এবং সমগ্র জাতি এই ঐতিহাসিক ঘটনায় আনন্দিত হবেন। জয়োৎসবের এই শুভ মুহূর্তে আমরা বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই সে-দেশের সাহসী ও সংগ্রামী যুবকদের।

আমাদের লক্ষ্য ছিল সীমাবদ্ধ। তা হল সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে মুক্তিলাভ করতে বাংলাদেশকে ও তাঁদের মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করা এবং আমাদের দেশ আক্রমণে বাধা দেওয়া। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক মুহূর্তও বাংলাদেশে ভারতীয় সামরিক বাহিনী থাকবে না।

আমাদের আশা এই যে, নতুন জাতির এই সন্ধিক্ষণে এই নতুন জাতির জনক শেখ মুজিবর রহমান তাঁর ন্যায্য স্থান গ্রহণ করে বাংলাদেশকে শান্তি প্রগতি ও ঐশ্বর্যের পথে চালিত করবেন। এখন সময় এসেছে যখন তাঁরা সকলে একত্রে সোনার বাংলায় তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখস্বপ্ন দেখতে পারবেন। তাঁদের জন্য আমাদের শুভ কামনা রইল।

হুমায়ুন আজাদ তাঁর ১৬ ডিসেম্বরের স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন—'সন্ধ্যায় ইন্দিরার ভাষণ শুনে লাফিয়ে উঠলাম। ফিরে এসেছে আমার স্বাধীনতা, স্বদেশ, বর্ণমালা, কবিতা।'

কিন্তু আমি কী লিখব এই ১৬ ডিসেম্বরের রাতে? আমি তো ঢাকায় নেই, রয়েছি কলকাতায়। কলকাতা তখন আক্ষরিক অর্থেই আনন্দনগরী। কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি না বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের বিজয়দিবসের বিজয়োল্লাস। বিভিন্ন সূত্রে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে যেসব বিবরণ আসছে তাতেও তো মন ভরছে না। তবুও লিখতেই হবে। রাত দশটায় প্রচার করতেই হবে 'সংবাদ পরিক্রমা'। লিখলাম—অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণকে আমি ভোঁতা করে দিয়েছি, স্বৈরতন্ত্রের দুর্ভেদ্য দুর্গটা আমি ভেঙে-চুরে চুরমার করে দিয়েছি, প্রয়োজন হলে এক নদী রক্ত দেবার অঙ্গীকার ছিল, তাও পূরণ করেছি। আমি এক রণক্লান্ত সৈনিক—স্বাধীনতার সূর্যটাকে ছিনিয়ে আনবার পর মুক্ত, আমি স্বাধীন।...

সময় ও স্বপ্নের যৌথ শিল্প

সময় ও স্বপ্নের যৌথ শিল্প একাত্তরের সংবাদ পরিক্রমার নটে গাছটি এখানেই মুড়োল। কিন্তু শেষ হল না আকাশবাণীর কথা। সংবাদ পরিক্রমা লিখেছি আমি—তার কথাই বলা হল। কিন্তু আরও কত অনুষ্ঠান হয়েছে। কবিতা সিংহের 'বঙ্গ আমার জননী আমার', দিলীপ সেনগুপ্তের রেডিয়ো কার্টুন, সংগীত বিভাগ, নাটক বিভাগ, কথিকা বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, যুববাণী—সব বিভাগই তো সেদিন ছিল বাংলাদেশময়। সব বিভাগই সেদিন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সংগ্রামী সাথি। হয়তো আর কেউ কোনোদিন লিখবেন এইসব বিভাগের কথা, আকাশবাণীর সামগ্রিক অবদানের কথা। আমি আমার পরিক্রমার কথাই শুধু বলেছি। প্রায় প্রত্যেকদিন একটি করে পরিক্রমা—ভাবুন তো সংখ্যাটা কী বিরাট। আর এই বিরাটসংখ্যক পরিক্রমার বেশির ভাগটাই গেছে হারিয়ে। পুনরাবৃত্তির ভয়ে কপিও রাখিনি। তবে বলতে পারি, এই রচনায় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের যে-রূপরেখাটি অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে, তারই এক-একটি মুহূর্ত ছিল এই পরিক্রমার বিষয়বস্তু। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিক্রমার ভাষা বদলেছে। আঙ্গিকও বদলেছে, অপরিবর্তিত থেকেছে শুধু উচ্চারিত সত্য। এখান-সেখান থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সামান্য কিছু পরিক্রমা

ও তার খসড়া সংগ্রহ করতে পেরেছি। সংযোজনাপর্বে সন্নিবেশিত করেছি সেই পরিক্রমাগুলি। সবই প্রায় একাত্তরের মার্চ-এপ্রিল মাসের। আর কয়েকটি পেয়েছি একেবারে শেষ দিকের—ডিসেম্বর মাসের। মিলিয়ে পড়লে হয়তো দেখা যাবে পরিক্রমার এপার-ওপার কীভাবে এককণ্ঠ হয়ে কথা বলছে।

পরিক্রমাপাঠক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁর একটি স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন—"*সংবাদ পরিক্রমা*'র অধিকাংশ স্ক্রিপ্ট লিখতেন প্রণবেশ সেন। পূর্ব বাংলার নাড়ি-নক্ষত্রের সঙ্গে ওঁর গভীর নিবিড় পরিচয় ছিল, সেখানেই ছিল ওঁর আদিনিবাস। প্রণবেশের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভকাল কেটেছে পূর্ব বাংলার পাবনায় ওঁর নিজেদের বাড়িতে এবং হয়তো-বা আর কোথাও কোথাও। ওঁকে প্রশ্ন করে করে পূর্ব বাংলার মাটি ও মানুষ সম্পর্কে অনেক খবরাখবর প্রায়ই জেনে নিতাম ওঁর লেখা স্ক্রিপ্টের মহড়া দেবার ফাঁকে ফাঁকে।

"এমনিভাবেই একটু একটু করে অজানা পূর্ব বাংলাকে মনে মনে জেনেছি, কল্পনায় গড়ে তুলেছি পূর্ব বাংলার মানসী মূর্তি। তার পর, একদিন যখন সবিস্ময়ে দেখলাম পূর্ব বাংলার যে-মানুষগুলো মাতৃভাষার মানমর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে পিছপা হননি, তাঁরাই মাতৃভূমির মুক্তির জীবনপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে কী অবর্ণনীয় আত্মত্যাগ ও অনন্যসাধারণ শৌর্যের বিনিময়ে ছিনিয়ে নিলেন দেশের স্বাধীনতা, তখন গর্বে বুক ভরে উঠেছিল। স্বদেশের এত কাছে, সীমান্তের ওপারে আমারই মতন বাংলাদেশি মানুষেরা বন্ধনমুক্তির জন্য হাতিয়ার হাতে নিয়ে অকুতোভয়ে লড়াই করছিলেন যখন, তখন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আমার হৃদয়ের সবটুকু আবেগ কণ্ঠস্বরে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে লড়াই করার অসামর্থ্যকে ঢেকে দিতে চেয়েছিলাম। দীর্ঘ ন-মাসের অরুন্তুদ যন্ত্রণার অবসানে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ—আমার দ্বিতীয় স্বদেশ।"

জন্মভূমি ও স্বদেশ আবিষ্কার—এই-ই তো 'একাত্তরের সংবাদ পরিক্রমা'।

সং যো জ ন ১

আকাশবাণী সংবাদ পরিক্রমা/রাত ১০টা/৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

'এ দেশ আমার গর্ব, এ মাটি আমার কাছে সোনা'—এই কথা ঘোষণা করতে কত বার ভয়ে কেঁপেছি, দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছি। ভেবেছি, এ শুধু কথার ফানুস,

এর পেছনে সেই সত্য নেই, নিষ্ঠা নেই, যা কবিতার পঙ্‌ক্তিটিকে জীবন-সত্যে রূপায়িত করতে পারে।

বুকের মাঝখানটিতে কোথায় যেন একরাশ শ্যাওলা জমেছিল, দেখতে পাচ্ছিলাম না আমার নিজেকে কাক-চক্ষু-স্বচ্ছ সেই যে আমার হৃদয়কে, যা প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে, নিজেকে, বিশ্বমানবতার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মুক্তোর মতো দ্যুতিমান হয়ে ওঠে। ৬ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে ১০টা— কে জানত, আমার জন্যে, আপনার জন্যে, এদেশের প্রতিটি মানুষের জন্যে এত বড়ো একটা গর্ব ইতিহাসের পক্ষপুট থেকে বেরিয়ে আসবে প্রকাশ্য দিবালোকে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি ঘোষণা করলেন, ভুল হল মানব সভ্যতার ইতিহাস যেন শ্রীমতী গান্ধির কণ্ঠের মাধ্যমে জানিয়ে দিল: বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত স্বীকার করছে, বরণ করছে বিশ্বের কনিষ্ঠতম স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাকে। সেই মুহূর্তে চিৎকার করে আকাশ ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল, আমার ভয় ভীরুতা সংকোচ— মিথ্যা, আমার সব কিছু মেনে নেওয়ার, অন্যায়কে বরদাস্ত করবার প্রবণতা— মিথ্যা। সত্য—আমি আছি, আমি থাকব। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে, আমার জন্যে, তোমার জন্যে সকল মানুষের জন্যে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমি বেঁচে থাকব। অসংখ্য ধন্যবাদ, কোটি কোটি ধন্যবাদ আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি আমাদের সমস্ত রকমের অসম্মানের পর্দাটাকে ছিন্ন করে স্বাধীন সূর্যালোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কোটি কোটি হৃদয়ের ভাষাকে নিজের ঘোষণায় রূপ দিয়েছেন।

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এক হিসেবে স্বীকৃতির ঐতিহ্য। ভারত স্বীকার করেছে মানুষই অমৃতের পুত্র; ভারত স্বীকার করেছে প্রতিটি মানুষের অধিকারকে; ভারত স্বীকার করেছে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সত্তায় ফুটে ওঠার পুষ্পিত হওয়ার অধিকারকে। বাংলাদেশের মানুষকে তাঁদের মুক্তিসংগ্রামকে স্বাধীনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকারকে স্বীকার করে আমরা প্রমাণ করেছি আমরা ঐতিহ্যচ্যুত ছিন্নমূল নই। আমরা দূর থেকে মানবিক মুক্তির কথার বেলুন ওড়াই না। আমরা সমৃদ্ধির স্বর্গে বাস করে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কান্নার সুর নিয়ে বেহালা বাজাই না। আমরা গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে জড়িয়ে গণহত্যাকে প্রশ্রয় দিই না। আমরা মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামসাথি হই, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করি।

আমরা আমাদের স্বাধীনতা কুড়িয়ে পাইনি, অর্জন করেছি, শত শহিদের রক্তের বিনিময়ে তাকে জয় করেছি। আমরা জানি স্বাধীনতা মানে, বৃহত্তর কঠিন সংগ্রাম, স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা, স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানিয়ে আমরা প্রমাণ করেছি—আমাদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় আমরা কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেব না। যে-আমেরিকা, কিউবা-সোভিয়েট সহযোগিতাকে নিজেদের সীমান্তের বিপদ ভেবে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নেয়, যে-আমেরিকা, গণতন্ত্র বাঁচাবার নাম করে ভিয়েতনামে সৈন্য পাঠায়, সেই আমেরিকা যখন পাকিস্তানের বর্বর আক্রমণের প্রকৃত তথ্য জেনেও আক্রান্তকে দোযারোপ করে, কিংবা যে-চীন আন্তর্জাতিক মুক্তিসংগ্রামের নেতা সেজে ঘরের পাশে কাম্বোডিয়ার প্রিন্স নরোদম সিহানুককে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়ে তার সরকারকে স্বীকৃতি জানায়, দেশে দেশে বিপ্লবের বাণী রপ্তানি করে, সেই চীনই যখন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মহান মুক্তিসংগ্রামকে ব্যঙ্গ করে, লক্ষ লক্ষ শহিদের প্রাণদানকে ঠাট্টা করে, ইয়াহিয়ার জঙ্গিশাহির সঙ্গে হাত মেলায়, তখন বলতে ইচ্ছে করে—ভাগ্যিস গোটা বিশ্ব আমেরিকা হয়নি, চীন হয়নি। তাই আশা জাগে মানব সভ্যতা হয়তো শেষপর্যন্ত অবিকৃতই থেকে যাবে।

শুনেছি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার খবরে ক্ষিপ্ত হয়ে চীন বলেছে ভারত সম্প্রসারণবাদী, আমেরিকা বলেছে, ভারতকে দেয় সাহায্যের মোটা অংশ কেটে দিচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই, সবিনয়ে বলছি : ঠিকই বলেছেন, আমরা সম্প্রসারণবাদী, তবে আমাদের লোভ সাম্রাজ্যের নয়, মানুষের মুক্তির সাম্রাজ্যের।

মাননীয় প্রেসিডেন্ট নিকসন, আপনাকেও বলছি, যদি ভেবে থাকেন আপনার সাহায্য দিয়ে আপনি আমাদের স্বাধীনতাকে ক্রয় করবেন, তবে ভুল করেছেন। লিঙ্কন জেফারসনের দেশকে যদি আজ বোঝাতে হয়, টাকা দিয়ে জঙ্গিশাহিকে কেনা গেলেও স্বাধীনতাকে কেনা যায় না, তবে তার চেয়ে লজ্জার আর কী থাকতে পারে। আমরা আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই, ভয় দেখিয়ে, লজেন্স দিয়ে কিছুদিন খোকাকে বশ করা গেলেও, সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন সে সঙ্গিনধারী, স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী হয়ে ওঠে, ভয়ের বিরুদ্ধে লড়াই-ই তার ধর্ম হয়। বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের সাড়ে

সাত কোটি মানুষের তেজোদৃপ্ত সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিয়ে আমরা নিজেকে, নিজের শক্তিকে জেনেছি। তাই আজ গলা ফাটিয়ে, এ-কথা বলবার যোগ্যতা অর্জন করেছি, শত্রুরা সব শোনো: এ দেশ আমার গর্ব, এ মাটি আমার কাছে সোনা।

স ং যো জ ন ২

আকাশবাণী সংবাদ পরিক্রমা/রাত ১০টা/১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১

বাংলাদেশে আমার সংগ্রামী বন্ধুরা—আজ এই রাতে তোমাদের জানাই কোটি কোটি মানুষের সংগ্রামী অভিনন্দন, লাখো লাখো সেলাম। কারণ, আমি জানি—এই রাত ভোর হবে— পুবের আকাশে উঠবে নতুন সূর্য। আর সেই সূর্যকে ছিনিয়ে আনছ তোমরা—আমার সংগ্রামী ভাইরা। আমি জানি —ঢাকা মুক্ত হয়েছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে বিশ্বের কনিষ্ঠতম গণতন্ত্রের রাজধানীরূপে—ইতিহাসের এই পরম অনিবার্য সত্যকে আমি এখনও ঘোষণা করতে পারছি না, কিন্তু এও জানি, এই সত্যকে পৌঁছে দেবই—পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে—আজ নয়, কাল।

আমার সংগ্রামী বন্ধুরা, রণক্ষেত্রে তোমরা লড়ে চলেছ,—আঘাতের পর আঘাত হানছ পৃথিবীর ঘৃণ্যতম, কুৎসিত স্বৈরতন্ত্রের দুর্গে। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ, আজ তাকিয়ে রয়েছে তোমাদের দিকে,— তোমাদের সাফল্য প্রত্যাশায়। এই রাতে, এই শীতে কাঁপন-লাগা রাতে এই মুহূর্তে তোমরা কী করছ জানি না। হয়তো ঢাকায় প্রবেশ করছ, হয়তো শত্রুকে চরম আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ। আমরা রণাঙ্গনে নেই,—তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমাদের সমস্ত মন পড়ে রয়েছে তোমাদের দিকে। আজ, এক আশ্চর্য কোজাগরি স্বাধীনতা-সূর্যের প্রত্যাশায়, আজ আমি সারারাত দেশ-বিদেশের রেডিয়ো-র 'নব' ঘুরিয়ে যাব। মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের পবিত্রতম মুহূর্তটি কখন আসে কখন এল—তা জানবার জন্য।

মুক্তি-পাগল ভাইরা আমার—তোমাদের লড়াই কঠিন লড়াই,— অত্যন্ত কঠিন লড়াই। কারণ, তোমরা ধ্বংসের জন্য লড়ছ না,—লড়ছ সৃষ্টির জন্য। তোমরা হত্যা করবার জন্য লড়ছ না,—লড়ছ হত্যাকারীর শাণিত অস্ত্রটাকে ভোঁতা করে দেবার জন্য। তোমরা কারও স্বাধীনতা গ্রাস করবার জন্য লড়ছ না,—তোমরা লড়ছ অপহৃত স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে

আনবার জন্য। এ-লড়াই একা তোমাদেরই লড়াই নয়, এ-লড়াই বিশ্বের প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের, প্রতিটি শান্তিকামী মানুষের লড়াই। নাদির শা, হিটলার কিংবা আজকের শত্রু ইয়াহিয়া খানের লড়াই এ নয়,—এ হল মুক্তির লড়াই, মানবিকতার লড়াই। যদিও এই মুহূর্তে তোমাদের হাতের অস্ত্রগুলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ,—শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করতে নির্ভুল লক্ষ্যে ধাবিত,—তবুও বলব বন্ধু,—এ-লড়াইয়ে তোমার হাতিয়ার, তোমার সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র,—তোমার রাইফেল নয়, মর্টার নয়, শুভ্র মানবিক চেতনা।

সংগ্রামী বন্ধুরা আমার,—তোমাদের বজ্রকঠিন আঘাতে, শত্রুর ব্যূহ ভেঙে চৌচির হয়ে পড়েছে,—তোমরা ঢাকায় প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছ। কিন্তু কোন ঢাকা? আমি মনে করিয়ে দেব বন্ধু,—তোমরা প্রবেশ করতে চলেছ, সালাম-বরকত-রফিক-আজাদের এবং তার পরে আরও লক্ষ লক্ষ নাম জানা, নাম না-জানা মানুষের বুকের রক্তে পবিত্র হয়ে-ওঠা ঢাকায়। আজ মনে রেখো, কেন ওরা শহিদ হয়েছিল, কেন ওরা রক্ত দিয়েছিল? ওরা চেয়েছিল বাংলাকে সোনার বাংলা করতে,— শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে। তোমাদের ওপর দায়িত্ব, ওদের রক্তের দাম শোধ করবার,—ওদের বাংলা, বঙ্গবন্ধু মুজিবের বাংলাকে ফিরিয়ে আনবার, মুক্ত করবার। তাই বলছিলাম, শত্রু নিধন, তোমাদের কর্তব্য, কিন্তু মানুষ হত্যা নয়। একটি নিরপরাধ মানুষ, এদেশি হোক, বিদেশি হোক, তার গায়ে যেন আঘাত না লাগে। তোমরা ইয়াহিয়াবাহিনী নও,—মুক্তিবাহিনী। অত্যাচার, লুণ্ঠন, নির্যাতন জুলুম করতে নয়,—এসব থেকে মানুষকে মুক্ত করতেই তোমরা অস্ত্র ধরেছ। যারা অপরাধ করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে,—তাদেরও বিনা বিচারে হত্যা করবে না, সমর্পণ করবে তোমার কর্তৃপক্ষের কাছে। বিনা বিচারে হত্যা, বিচারের ভান করে হত্যা—এসব স্বৈরতন্ত্রে সাজে—তোমাদের নয়।

বন্ধুরা আমার,—তোমরা যখন শত্রুকে শেষ আঘাত হানছ,—সেই সময় জঙ্গিচক্রের দোসররা নতুন অজুহাত তৈরি করছে,—সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তিসংগ্রামকে বানচাল করতে। সেই যারা গণতন্ত্রকে ধর্ষিত হতে দেখে মুখ বুজে ছিল, সেই যারা দশ লক্ষ মানুষকে মরতে দেখে বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, যারা এক কোটি মানুষকে দেশ থেকে

বিতাড়িত করতে দেখেও পাশ ফিরে শুয়েছিল,—সেই তাদেরই অনেকে আজ অজুহাত সৃষ্টি করে সুযোগমতো ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু এ সুযোগ আমরা তাদের দেব না। বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় বাহিনীর অধ্যক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিটি বিদেশি নাগরিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত রাখা হবে। মনে রাখবে বন্ধুরা,—এ তোমাদেরই দায়িত্ব,—তোমাদেরই রণকৌশলের অন্তর্ভুক্ত।

ভাইরা আমার,—আজ পরম গৌরবের মুহূর্ত সমাগত,—সমাগত কঠিনতম দায়িত্ব পালনের মুহূর্ত। কঠিন সময়, মনুষ্যত্বের পরিচয়। বাংলার মানুষ, ভারতের মানুষ, সে-পরিচয় উজ্জ্বল করে তুলতে কখনো ব্যর্থ হয়নি,—ব্যর্থ হবে না, —ব্যর্থ হতে পারে না। এই প্রত্যয় আবার ঘোষণা করছি এই রাতে,—নতুন ভোরের প্রত্যাশায়।

স ং যো জ ন ৩

আকাশবাণী সংবাদ পরিক্রমা/রাত ১০টা/১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণকে আমি ভোঁতা করে দিয়েছি, স্বৈরতন্ত্রের দুর্ভেদ্য দুর্গটা আমি ভেঙেচুরে চুরমার করে দিয়েছি, প্রয়োজন হলে এক নদী রক্ত দেবার অঙ্গীকার ছিল, তা-ও পূরণ করেছি। আমি এক রণক্লান্ত সৈনিক—স্বাধীনতার সূর্যটাকে ছিনিয়ে আনবার পর মুক্ত, আমি স্বাধীন। আমি মানসচক্ষে ঢাকার বুকে দাঁড়িয়ে ছবি দেখছি—শহিদ-মিনারটা পশুশক্তির দুঃসহ স্পর্ধার আঘাতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, কিন্তু পলাশের কুঁড়িতে দেখো : সেই '৫২-র লাল আজও রয়ে গেছে অম্লান। আমি ছবি দেখছি—ছোট্ট ছেলে আজাদের বুকের 'রক্তে' ভেজা শার্টটা আজও কী করে যেন পতাকা হয়ে হাতে হাতে উড়ছে। আমি ছবি দেখছি পল্টনের ময়দানের এখানে-ওখানে, এখনও ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মৃত মানুষের হাড়। ভালো করে তাকাও, দেখবে—আবার পল্টনের ময়দানে জনসমুদ্রের জোয়ার এসেছে, লক্ষ লক্ষ মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের ঔদ্ধত্যকে চূর্ণ করে মানুষের মহিমাকে বড়ো করে তুলেছে। আমি ছবি দেখছি নির্বাচনোত্তর বিজয়োল্লাসের, আমি ছবি দেখছি—৭ মার্চে ইতিহাসের কম্বু-কণ্ঠ ঘোষণা। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। অনেক পথ হেঁটেছি আমি, অনেক পথ; অনেক সংগ্রামের যন্ত্রণাকে বুকে

তুলে নিয়েছি আমি, অনেক যন্ত্রণা। আজ আমি রণক্লান্ত সৈনিক এক। ইন্দিরা-বঙ্গবন্ধুর ছবির সামনে দাঁড়াই, দর্পণে ছায়া পড়ে। চমকে উঠি। কে এই দর্শক? আমি, না তুমি? তুমি, না আমি? আশ্চর্য আবিষ্কার: আমি তোর জন্ম-সহোদর।

আমি তোর জন্ম-সহোদর সংগ্রামে শান্তিতে হাসিতে কান্নায় রবীন্দ্র-নজরুলে এবং অ-আ-ক—খ বর্ণমালার বর্ণাঢ্য পতাকার নীচে—আমি তোর জন্ম-সহোদর। ঘরের দাওয়ায় লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ দেখার আকুল আকাঙ্ক্ষায়, পিরের দরগায় মঙ্গলার্থীর প্রদীপ জ্বালানোয় তুমি আছ, তাই আমি আছি, তাই তুমি আছ—এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার, তোমার আমার সকল মানুষের জন্য।

মানুষের জীবন, বিন্দু থেকে বৃত্তে উত্তরণ। এক আশ্চর্য বৃত্ত সম্পূর্ণ হল ঢাকার সেই রেসকোর্স ময়দানে। ৭ই মার্চ এই রেসকোর্সে শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন : 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব'। বছর ঘুরতে পারেনি। সেই রেসকোর্স ময়দানে ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজি লিখেছেন জেনারেল অরোরাকে : 'আমি ও আমার সৈন্যবাহিনী একসঙ্গে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করছি।' কাঁধ থেকে সামরিক চিহ্ন খুলে নিলেন জেনারেল নিয়াজি। জেনারেল অরোরার কপালে কপাল ছোঁয়ালেন। আত্মসমর্পণ পর্ব শেষ হল। বুড়িগঙ্গার তীরে তখন সূর্য ডুবছে নব অরুণোদয়ের অঙ্গীকার নিয়ে। সংগ্রাম শেষ হল।

আমার সংগ্রাম ছিল তোমার জন্য ; তোমার সংগ্রাম, তা-ও আমার জন্য। কেননা দুই সংগ্রামের একই প্রাণবিন্দু—স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। ৩৬৩ বছরের পুরোনো নগরী ঢাকা আজ সদ্যোজাত রাষ্ট্রের মুক্ত রাজধানী,—একাল ও সেকালকে মিলিয়ে যে-চিরকালের মানবিকতা, তারই প্রতিষ্ঠাভূমি। তোমার সংগ্রাম শেষ, তাই আমারও সংগ্রাম শেষ হল। সুতরাং আর যুদ্ধ নয়,—এবার এ-পৃথিবীকে যুদ্ধমুক্ত করার লড়াই।

পূর্ব খণ্ডে তোমার আমার লড়াই শেষ হল। আমি তাই ঘোষণা করেছি—একতরফাভাবে ঘোষণা করেছি: পশ্চিম খণ্ডেও লড়াই বন্ধ হোক, হোক যুদ্ধবিরতি। আমার লড়াই ভূখণ্ড অধিকারের লড়াই নয়, আমার লড়াই

অপরের স্বাধীনতা অপহরণের লড়াই নয়, আমার লড়াই নয় সাম্রাজ্যবিস্তারের। পূর্ব খণ্ডে মানুষের বাঁচার লড়াইয়ে আমি শামিল হয়েছিলাম, আমি চেয়েছিলাম মানবিক মূল্যবোধকে, দরকার হলে নিজের জীবন দিয়েও রক্ষা করতে। শত্রু তাই আমাকে ববদাস্ত করতে পারেনি, আক্রমণ করেছিল। পশ্চিম খণ্ডে আমাকে তাই নামতে হয়েছিল প্রতিরোধসংগ্রামে। পূর্ব খণ্ডে সংগ্রাম শেষে তাই পশ্চিম খণ্ডে লড়াইয়ের আর কোনো দরকার রইল না। দরকার রইল না অপ্রয়োজনীয় অহেতুক রক্তপাতের। তাই, আর লড়াই নয়।

আমি স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের সংগ্রামী, আমি এ-যুগের শান্তিকামী বিশ্বমানবতার এক ক্ষুদ্র অংশ। আমার সঙ্গে তাই বিরোধ নেই পশ্চিম পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষের, যারা আমারই মতো স্বপ্ন দেখে স্বাধীনতার—গণতন্ত্রের। কাজেই, আজ যুদ্ধবিরতি।

আজ যুদ্ধবিরতি,—কিন্তু সেই সঙ্গে আর এক লড়াইয়ের সূত্রপাত। এ-লড়াইয়েও আমি তুমি একই কাতারে দাঁড়িয়ে লড়ব, লড়ব সমৃদ্ধির জন্য, শান্তির জন্য। লড়ব আমার ভারতের জন্য—লড়ব তোমার সোনার বাংলার জন্য।

বেতারের শ্রোতা

বেতার একটি গণসংযোগ মাধ্যম। গণসংযোগ কথাটি ইংরাজি mass communication-এর বাংলা হিসাবে চালু হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় কোনো ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে নয়, একই সঙ্গে অনেক মানুষের সংযোগ স্থাপনই বেতারের উদ্দিষ্ট। বেতারে যিনি কথা বলেন, গান করেন কিংবা অন্য কোনো অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন তাঁকে আমরা communicator বা সংযোগকারী বলতে পারি। যাঁরা ওইসব অনুষ্ঠান শোনেন তাঁদের বলা হয় communicattee বা বেতারের ক্ষেত্রে শ্রোতা। এই শ্রোতাদের কথা ভেবেই বেতারের অনুষ্ঠান তৈরি করতে হয়। এই যে শ্রোতা, এটা কিন্তু একটা গোলমেলে ব্যাপার, কারণ শ্রোতা কোনো একজন নন—যাঁরা শুনবেন তাঁরাই। অর্থাৎ একটা সমষ্টি। আমাদের মতো একটা বিরাট দেশে শ্রোতাদের সংখ্যা যেমন বিরাট তেমনি তাদের বৈচিত্র্যও। সংস্কৃতি, শিক্ষা, ভাষা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক মানমর্যাদা, পরিবেশ—সমস্ত দিক থেকেই এদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এমনকী কোনো কিছু শুনে বোঝার ক্ষমতার ক্ষেত্রেও রয়েছে বিরাট পার্থক্য। এমনকী এটাও বলা যায় যে আমাদের শ্রোতাদের বেশির ভাগই তাদের নিজস্ব চৌহদ্দির বাইরে খুব বেশি কিছু জানেন না। কাজেই গড় শ্রোতা—এইরকম একটা ধারণা বেতার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে গড়ে তোলা খুবই কঠিন। আরও একটা দিক ভাববার—যাঁরা communicator, সংযোগকারী, তাঁরা প্রায়শই নিজেদের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। কাজেই বেতারের ক্ষেত্রে সংযোগকারী ও শ্রোতার মধ্যে যে দূরত্ব রয়েছে তা কমিয়ে আনার জন্য একটু বিশেষ প্রয়াস রাখতেই হয়। অর্থাৎ সংযোগকারীকে যার সঙ্গে সংযোগ করা হচ্ছে, অর্থাৎ শ্রোতার কাছাকাছি পৌছতে হয়। তাছাড়া এটাও মান্য যে শ্রোতাদের রুচিও একেক রকম। কেউ

নাটক ভালোবাসেন, কেউ গান ভালোবাসেন, কেউ মার্গ সংগীত পছন্দ করেন, কেউ-বা লোকসংগীত, আবার কেউ বা ভক্তিগীতি। এই রুচির কথা মনে রেখেই বেতারে নানা ধরনের অনুষ্ঠান রাখতে হয়। তবে সংবাদের মতো একটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রায় সকলেরই কৌতূহল থাকে। সবারই জানতে ইচ্ছে করে দেশের কোথায় কী ঘটছে আর সেই সব ঘটনার প্রভাব তাদের জীবনেই বা কতটুকু পড়বে? বেতারের আবশ্যিক উপকরণ হল কথা। কিন্তু কথার মধ্যেও তো—কথ্য ভাষা হলেও নানারকম তারতম্য ঘটে যায়। এই সংবাদ এর জন্য, আর ওই সংবাদ ওর জন্য এইরকম বিভাজনও সম্ভব নয়। কাজেই এমন একটা ভাষা তৈরি করে নিতে হয় যা একেবারে শিক্ষিত ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে নিরক্ষর ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই বুঝতে পারে। ভাষাই তো বেতারের প্রধান উপকরণ। কাজেই ভাষা নিয়ে ভাবনাটা খুবই জরুরি। বিশেষজ্ঞরা বলেন ভাষা যতক্ষণ মুদ্রিত থাকে ততক্ষণ তো চোখে দেখার ভাষা। কিন্তু যখন তা উচ্চারিত হয় তখনই তো কানে শোনার ভাষা হয়ে ওঠে। কণ্ঠস্বরের আকর্ষণ, নানা ধরনের যতি চিহ্নের দক্ষ উচ্চারণ, শব্দ বিন্যাসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তুলে ধরা এবং শব্দের ছন্দকে স্পন্দিত করা—এইসব করতে পারলেই ভাষা কানে শোনার ভাষা হয়ে ওঠে, জীবন্ত হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, বেতারে গড় শ্রোতা বলে কিছু নেই। তবুও রুচিগত, পছন্দগত ফারাককে মনে রাখতেই হয়। তুলনা করা যেতে পারে একটি সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে। সাময়িক পত্রিকায় নানারকম বিভাগ থাকে—গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা, অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা, সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা, খেলাধুলা—এমনি নানারকম বিভাগ। যাঁর যেমন রুচি, তিনি তাঁর পছন্দ অনুযায়ী বিভাগগুলি পড়ে নিতে পারেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যদি আমরা বেতার অনুষ্ঠানগুলির দিকে তাকাই তবে দেখব বেতার অনুষ্ঠানও অনেকটা সাময়িক পত্রিকার মতো। নানান বিভাগ রয়েছে তাতে। কেউ সব বিভাগই শুনতে পারেন, কেউ তাঁর রুচি অনুযায়ী। শ্রোতাদের এই চাহিদার কথা মনে রেখে এবং বেতারের আবশ্যিক শর্ত পূরণ করেই বেতারের অনুষ্ঠান তৈরি করা যেতে পারে।

এই জন্যই বেতার হয়ে ওঠে সব মানুষের সব সময়ের সঙ্গী।

নির্বাচিত সংবাদ পরিক্রমা

১

অতি প্রত্যূষে ঘুম ভাঙত। মা গান করতেন, মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে।

বাবা উপনিষদের শ্লোক আওড়াতেন। যে-প্রভাতটি আসত, ধীরে ধীরে চোখ মেলত বরিশালের বুকে, সেটি অপরূপ সূর্যচেতনায় রাঙা। বাড়িতে কাজ করত আলি মামুদ। অনেক গল্প শোনাত, গ্রামজীবনের ছবি আঁকত। নিসর্গ পাঠও এই আলি মামুদের কাছে, গাছের নাম, লতার নাম, ওদের প্রকৃতি। বাইরে বাগানে ঘাস কাটত ফকির। চোখে জলের ছল-ছলানি দেখে বলত. কিছু ভাববেন না খোকাবাবু, কয়েক দিনের মধ্যেই আবার ঘাস হবে। কচি সুন্দর নরম ঘাস। আমার ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ, হরিৎ মদের মতো গেলাসে গেলাসে পান করি। ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই, কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার শরীরে সুস্বাদু অন্ধকার থেকে নেমে। বাড়িতে আসত প্রহ্লাদ। সে মাটির গর্ভ থেকে ছিনিয়ে আনত শস্যসম্ভার। সোনার ধান। দেখাত সে, ওই শস্যের ভারে অবনত শ্যামল ধান্যক্ষেত্র, আলেয়ার মত ঐ ধানগুলো নড়ে শূন্যে কি রকম অবাধ আকাশ হয়ে যায়। সন্ধ্যায় মোতির মা গল্প শোনাত, পরনকথা, সেইসব পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের কথা যারা চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে। আসত মুনিরুদ্দি রাজমিস্ত্রি, ইমারতের পর ইমারত তৈরি করত, তৈরি করত মন্দির-মসজিদ। গল্প বলত লাখুটিয়া কিংবা কাশীপুর জঙ্গলে শিকারের গল্প, শিকারের গল্প শুনতেন পিতামহীর কাছে, চোখ থাকত সর্বানন্দ ভবনের দেওয়ালে-টাঙানো কাকার শিকারের ফসল হরিণের সিং, বাঘের মাথায়। 'এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক, হিম নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।'

গল্প শুনতেন ঠাকুমার কাছেও। পূর্বপুরুষদের গল্প। অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী সেই সব পূর্বপুরুষেরা। কাকে নাকি জ্যোৎস্নার রাতে পরিরা উড়িয়ে নিয়ে যেত ধানক্ষেতের উপর দিয়ে। কীর্তিনাশা পদ্মায়, সলিলসমাধি পেল গ্রাম গাউপাড়া। বরিশালে চলে এলেন। এই কাহিনি হারানো দিনের, পুরোনো কাহিনি শুনতেন, কিন্তু "কী যে হ'ল তার, কোথায় সে নিয়ে গেছে

সঙ্গে করে সেই নদী খেত মাঠ ঘাস। এই ঘাস সীতারাম রাজারাম রামনাথ রায়, ইহাদের ঘোড়া আজো অন্ধকারে এই ঘাস ভেঙ্গে চলে যায়।''

হাঁটতেন খুব। হাঁটবার নেশা ছিল। 'কী এক ইশারা যেন, মনে রেখে একা একা শহরের পথ থেকে পথে, অনেক হেঁটেছি আমি'—বরিশালের উপকণ্ঠে, কখনো শ্মশানের ধারে, কখনো লাসকাটা ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন:

লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমোয় এবার।
এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি।
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মত ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার ;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

ইজিচেয়ারে বসে কবিতা লিখেছেন, সামনে কৃষ্ণচূড়ার গাছে লাল আগুন জ্বলছে। গাছের তলায় সবুজ ঘাসে নৃত্যপরায়ণ ঘাসফড়িং। বোন লিখেছেন, দাদার কবিতা লেখার কথা। একটা বিড়াল কখন থেকে ঘোরাঘুরি করছে, ও আসছে যাচ্ছে, অন্ধকারের মতো নরম পায়ে, লাফালাফি করছে, আলোছায়ার চঞ্চলতার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়ে। ঘাসের বুকে আঁচড় দিচ্ছে, মাটির বুকে, কখনো-বা ছুটে গিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের গায়েই নখের জোর পরীক্ষা করে নিচ্ছে। কবিতা লিখলেন :

হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে :
তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনলো সে
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

অতীত, অলৌকিকতায় নির্বাসিত, আগামী অস্পষ্টতায় মোড়া, আর বর্তমান রক্তাক্ত হিংস্রতায়, শঠতায়, বঞ্চনায়, আদর্শহীনতায়, 'ব্যাঘ্রযুগে শুধু মৃত হরিণীর মাংস পাওয়া যায়, শতাব্দীর শবদেহ, শ্মশানের ভস্ম বহ্নি জ্বলে।' জীবনানন্দ দাশ, এই বিমূঢ় যুগের কবি, যেখানে বিড়ালের থাবায় লুফে-আনা অন্ধকার মুঠো মুঠো ছড়ানো। বরিশালে চেনাজানা লাসকাটা ঘর, ভিজে মেঘের দুপুর, চিলের ডাক, বেতফল, ঝরাপাতা, নষ্টশসা, পচা চালকুমড়ার ছাঁচ, হেমন্তের সন্ধ্যা ধীরে ধীরে হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বন্ধ্যাযুগের প্রতীক। কিন্তু কবি পথ খুঁজেছেন—ইতিহাসে, ইতিহাস থেকে সমাজ

চেতনায়, তার পর উত্তরণ প্রত্যাশার ঘাটে। অধীর আগ্রহে বলেছেন:

তবুও কোথায় সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা। নবীনতা শুভ্র মানবিকতার ভোর?

প্রত্যয়ের দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন—আমরা তো তিমিরবিনাশী। বলেছেন—'এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।' 'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে'; অসুস্থ পৃথিবীর রোগমুক্তি ঘটবে, বরিশালের আবহাওয়া ফিরে আসবে, বরিশালের দিনগুলোর মানেই তো ভালো থাকা, বাংলায় থাকা। তাই ৬ই ফাল্গুনে কবির জন্মদিনের কবিতা—

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হ'য়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হবো. কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারা দিন কেটে যাবে কল্‌মীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে-ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

১৯.১২.১৯৭১

২

আরও একটি স্বাধীনতা দিবস অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ১৯৪৭ সাল থেকে প্রতিবছর একটি করে স্বাধীনতা দিবস এসেছে—চলেও গেছে। কিন্তু এবারের স্বাধীনতাদিবসটি ছিল ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন বর্ণের। কেননা এই দিনটিতে আমরা চেয়েছিলাম পঁচিশ বছর আগেকার সেই বিধিনির্দিষ্ট শুভ দিনটিকে ফিরে পেতে—আমরা চেয়েছিলাম, সেই নবজাতকের কান্না শুনতে, যে-কান্না হয়ে ওঠার, গড়ে ওঠার, বড়ো হওয়ার—যে-কান্না অন্ধকারের বুকে আলোর সন্ধানী।

—যা যায়, তা হয়তো পুরোপুরি ফিরে আসে না। তবু আমরা কাল মধ্যরাত্রিতে ভারতের এবং প্রদেশগুলির রাজধানীতে—জনপ্রতিনিধি সভাগুলিতে সেই সৃষ্টি-যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করেছি। পঁচিশ বছর বয়সটাই

এমনি। মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি পেয়ে যায়, অথচ নানা বাধা চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। এই যন্ত্রণা—এই ভারত-যন্ত্রণাকেই ছুঁতে চেয়েছি আমরা—শপথ নিতে চেয়েছি, সমস্ত বাধা ছিঁড়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার।

না নেই,—কোনো নজির নেই, কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না—আধুনিক বা প্রাচীন কোনো ইতিহাসে মিলবে না। পঁচিশ বছর আগেকার এই দিনটির মতো আর কোনো দিন। সপ্তসিন্ধু অতিক্রান্ত মহাশক্তিধর একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নতিস্বীকার করল এমন একটা নিরস্ত্র জাতির কাছে, যার আত্মবিশ্বাস আর মরে মরে মৃত্যুকে জয় করবার দুর্জয় সাহস ছাড়া কোনো হাতিয়ার ছিল না। জনতার আত্মিক-শক্তি যে কত বড়ো শক্তি, সারা বিশ্বের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে সেদিন দেখেছে—দেখেছে, একটা জাতি শতাব্দীর পুঞ্জীভূত শোষণের বোঝা দূরে ছুঁড়ে ফেলে, সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ থেকে বেরিয়ে এসেছে। একেবারে নতুন হয়ে—নতুন কথা বলতে, নতুন পথ দেখাতে। সেই দিন—সেই আশ্চর্য দিনটি ছিল আমাদের স্বাধীনতাদিবস।

এই স্বাধীনতার পঁচিশ বছর কেটে গেল। রজত জয়ন্তী বর্ষে দাঁড়িয়ে আমরা হিসাব করছি, কী চেয়েছিলাম—কী পেয়েছি। দেখেছি, জমার অঙ্কটা শূন্য নয়—গর্ব করার মতো অনেক কিছুই আছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্ত দিক থেকেই। এই পঁচিশ বছরে, আমরা অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছি। আজ আর পৃথিবীর কারোরই সাধ্য নেই আমাদের অস্বীকার করে, উপেক্ষা করে। তবুও বলব, আলোর নীচে এখনও অন্ধকার রয়েছে, এখনও সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা যায়নি, এখনও সবার চোখের জল মুছে ফেলা যায়নি। তাই তো সংগ্রামের শেষ হল না। দেশ জুড়ে আজ নতুন সংগ্রাম—অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া, স্বাধীনতা কখনো পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না—তাই সংগ্রাম চলছে চলবেই। প্রথম যেদিন মানুষ দাসত্ব বরণ করেছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু সেই দিন থেকেই। এ-সংগ্রাম ততদিন পর্যন্ত শেষ হবে না, যতদিন না শেষ মানুষটির মানসিক এবং আর্থিক শৃঙ্খল খসে পড়ছে।

আমরা তো বিশ্বাস করি, স্বাধীনতা টুকরো টুকরো করে পাবার জিনিস নয়—একলা পাবার সামগ্রী নয়। স্বাধীনতা অখণ্ড অবিভাজ্য। তাই তো আমরা বার বার গিয়ে দাঁড়িয়েছি, বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পাশে। অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, রোডেশিয়া কিংবা ল্যাটিন আমেরিকা, অথবা

ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ যেখানেই মুক্তিসংগ্রাম, সে-সংগ্রামের আমরাও শরিক। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম তো শুধু আমাদের একারই ছিল না—সে সংগ্রাম ছিল বিশ্ব-মানবতার সপক্ষে।

আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি রাষ্ট্রের মৈত্রী বন্ধনে। পারমাণবিক যুগে মানুষ আজ গভীর সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ বিশ্বের প্রতি প্রান্তের মানুষ ধ্বংসের নয়, শান্তির আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌বুদ্ধ ; ভাবতে ভালো লাগে, আমরাও সেই আকাঙ্ক্ষায় শামিল—আমরাও চেষ্টা করছি শান্তির এই আদর্শকে ফলবতী করতে।

পঁচিশ বছর আগেকার এই দিনটিতে জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, ভবিষ্যৎ সহজ হবার নয়। বিশ্রামের অবকাশ থাকবে না—নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে আমাদের অঙ্গীকার পূরণ করতে পারি। পঁচিশ বছর পর আমরা আবার শপথ নিলাম স্বাধীনতাব কাছে, আমাদের অঙ্গীকার পালনের। আর এই শপথ রূপায়ণে আমাদের শক্তি জোগাবে পঁচিশ বছর বয়সের চেতনা: এ-দেশ আমার গর্ব, এ-মাটি আমার কাছে সোনা।

১৫. ৮. ১৯৭২

৩

আজ পঁচিশে মার্চ—আর কিছুক্ষণ পরেই এই দিনটি পা রাখবে, ছাব্বিশে মার্চের সিঁড়িতে। দু-বছর আগে ঠিক এমনি-এক মুহূর্তে, এই উপমহাদেশের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় লেখা শুরু হয়েছিল। আমাদের চোখের সামনে সেই ইতিহাসের এক-একটি লাইন লেখা হয়েছে—আমরা দেখেছি—মানুষের বর্বরতার, নারকীয় নৃশংসতার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মানবিক স্বাধীনতার এক আশ্চর্য সূর্যোদয়। কী ঘটেছিল সেই পঁচিশে মার্চ রাতে? শহিদ কাদ্‌রীর 'নিষিদ্ধ জার্নালে' লেখা রয়েছে :

ভোরের আলো এসে পড়েছে
ধ্বংসস্তূপের উপর,
রেস্তোরা থেকে যে-ছেলেটা রোজ
প্রাতরাশ সাজিয়ে দিতো
আমার টেবিলে—

তে রাস্তার মোড়ে তাকে দেখলাম
শুয়ে আছে
রক্তাপ্লুত-শার্ট পরে
প্রতিরোধের চিহ্ন নিয়ে বিবর্ণ
রাজধানী দাঁড়িয়ে রয়েছে।
তার বিশাল-করিডর, শূন্য।
শহর ছেড়ে চলে যাবে সবাই,
এবং চলে যাচ্ছে দলে দলেও,—
কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপ স্পর্শ করে
আমরা কয়েকজন আজীবন
রয়ে যাব বিদীর্ণ-স্বদেশে।
স্বজনের লাশের আশেপাশে
তার দেখা পাবো বলে,
দানবের মতো খাকি-ট্রাকের
অনুর্বর-উল্লাস উপেক্ষা করে,
বিধ্বস্ত-ব্যারিকেডের
পাশ ঘেঁষে
বেরিয়েছি, ২৭-শে মার্চের সকালে,
কান্নাকে কেন্দ্রীভূত করে
পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলায়—
যে-শিলা অন্তিম-প্রতিজ্ঞায় অন্তত
প্রাথমিক-অস্ত্র হ'তে জানে।

একাত্তরের এপ্রিলের একটি দিনের ছবি এঁকেছেন, ফজল সাহাবুদ্দীন:

মাথার ওপরে ওড়ে খুনী এরোপ্লেন,
কুস্টিয়ায় বোমা ফেলে,
বোমা পড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জুড়ে,
নবী নগরের
মেঘনায় গাঙ-চিলে।
এল. এম. জি. স্টেন্ আর মর্টারের
ভয়ংকর শব্দ ধেয়ে আসে অহরহ।
বাঙলাদেশ, মিছিলের মতো

বার বার কেঁপে ওঠে।
নির্মম বুলেট-বিদ্ধ, বেয়নেট
ছিন্নভিন্ন
আমরা সবাই নিমজ্জিত প্রেত-লোক—
কখন উঠবে বেজে মৃত্যুঘণ্টা
অকস্মাৎ, কেউ
আমরা এখন জানি না তা।

আরেকজন কবি লিখেছিলেন—পঁচিশে মার্চের কথা নয়—ছাব্বিশে মার্চের পর থেকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেব কথা:

মধ্য-দুপুরে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে
একটা তন্ময়-বালক
কাঁচ, লোহা, টুকরো ইট,
বিদীর্ণ কড়িকাঠ,
একফালি টিন,
ছেঁড়া-চট, জং-ধরা পেরেক
জড়ো করলো, এক নিপুণ-ঐন্দ্রজালিকের মতো
এবং অসতর্ক-হাতে, কার্ফু
শুরু হওয়ার আগেই।
প্রায়-অন্যমনস্কভাবে তৈরি করলো
কয়েকটি অক্ষর—
'স্বাধীনতা'—।

শুনেছি শব্দের শক্তি নাকি অপরিসীম—কিন্তু পঁচিশে মার্চের রাতের অন্ধকারে যে-নরক তার শকুন-পাখা মেলেছিল বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে—তার বর্ণনা কি কোনো শব্দে ধরা পড়ে? জিজ্ঞেস করো সেই পিতাকে—যিনি নিজের চোখের সামনে পুত্রের কলজেটা ছিঁড়ে আনতে দেখেছেন সঙিনের খোঁচায়; জিজ্ঞেস করো সেই মাকে, যিনি তার একমাত্র কন্যাকে দেখেছেন, তাঁরই সামনে একদল ক্ষুধিত নেকড়ের শিকার হতে ; জিজ্ঞেস করো সেই পুত্রকে, যে-তার পিতা-মাতাকে মরতে দেখেছে, শক্ত বুটের তলায় পিষ্ট হয়ে ; জিজ্ঞেস করো সেই নবজাত-পুত্রের জননীকে, যিনি তার শিশুর মাথার খুলিতে পাকিস্তানের পতাকা পুঁততে দেখেছেন;

জিজ্ঞেস করো সেই ছেলেটিকে, যে এক হাতে তার মাকে এবং কাঁধে তার বৃদ্ধ অশীতিপর পিতাকে তুলে, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে পালিয়ে বেড়িয়েছে—হয়তো ওদেরই চোখের জলে, বুকের স্পন্দনে লেখা রয়েছে আসল ইতিহাস- লেখা রয়েছে—একটি মৌন ঘোষণা—'আজ শহিদ স্মরণ বলেই কাল বাংলাদেশে স্বাধীনতা দিবস।'

২৫.৩.১৯৭৩

৪

মানুষ মানুষ মানুষ—কত মানুষ যে দেখছি অহরহ তবুও মন ভরে না। বার বার ছুটে যাই—চেনা-অচেনা কতজনের সঙ্গে মিশে যাই—তার পর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকি। কিন্তু তারও কি জো আছে? সময়ের পলি অনেক কিছু ঢেকে দেয়। যাকে কিছুদিন আগেও খুব আপনার বলে মনে হয়েছে—আজ তাকে কেমন আবছা আবছা দেখায়—ভালোভাবে, স্পষ্ট করে মনে পড়তে চায় না। তা না হলে কেন সেদিন হরিদাস বাউলের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মনে করতে পারলাম না। একটু খুলে বলি।

নদিয়া জেলার সীমান্তবর্তী একটি অখ্যাত গ্রাম থেকে এসেছিলেন নরহরি দাস। দেখা করে বলেছিলেন 'চিনতে পারেন?' না, পারিনি। আমার অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'সেই যে আমাদের গ্রামে গিয়েছিলেন—হরিদাস বাউলের গান শুনেছিলেন?' পাশ কাটাতে চেয়ে বলেছি—'ও হ্যাঁ, কেমন আছেন? কবে এলেন? আচ্ছা আবার দেখা হবে।' এক বারও জিজ্ঞেস করিনি হরিদাসের কথা। ও নিজেই বলেছে, 'হরিদাস তো মারা গেছে। বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় একটা কামানের গোলা পড়ল, আর মাটিতেই ওর গোর হয়ে গেল।'

তিনি কথা শেষ করে চলে গেছেন, কিন্তু হরিদাস বাউলের নামটা নিয়ে যাননি। দিন দশেক হল, নামটা মনের মধ্যে ঘুরছে—কিন্তু কিছুতেই মানুষটাকে স্পষ্ট করে তুলতে পারছি না। হঠাৎ কী ভেবে আজ পুরনো পরিক্রমার ফাইল নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ওকে দেখতে পেলাম। অনেকদিন আগে লিখেছিলাম ওর কথা—বাংলাদেশ নামটা তখনও উচ্চারিত হয়নি।

পরিক্রমার পাতায় লেখা রয়েছে—'সেদিন সকালেও এমনি বৃষ্টি হয়েছিল সীমান্তের ওই গ্রামটায়। যে-বাড়ির অতিথি তাদেরই দাওয়ায় বসে বসে বৃষ্টি দেখছিলুম। আকাশ উপুড়-করা বৃষ্টি। দাওয়ার আর একপাশে ছিল আর এক জন—এক বাউল। বৃষ্টি দেখে আশ্রয় নিয়েছে। ঝিমুচ্ছে আর মাঝে মাঝে টুং টাং সুর তুলছে একতারাটায়—হয়তো বৃষ্টির সুর। কী যেন মনে হল, কাছে গিয়ে বললেম—কী বাউল শোনাবে না কি একটা গান? চোখ পিট পিট চেয়ে দেখল—নিস্পৃহ নিরাসক্ত সে-দৃষ্টি কোনো পাত্তাই দিল না আমাকে। কেমন যেন খারাপ লাগল। মুখটা ফিরিয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি—হঠাৎ একতারাটা সরব হয়ে উঠল—বাউল গান ধরল—

কথা কয়রে
দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনমভর মেলে না
খুঁজি তারে আসমান-জমিন
আমারে চিনি নে আমি
এ কি বিষম ভুলে ভ্রমি
আমি কোন জন সে কোন জনা।

রাম কি রহিম সে কোন জন
মাটি কি লবণ জল কি হুতাশন
শুধাইলে তার অন্বেষণ
সূর্য দেখে কেউ বলে না।

হাতের কাছে হয় না খবর
কি দেখতে চাও দিল্লি-লাহোর
সিরাজ সাঁই কয় লালনরে তোর
গঙ্গায় মনের ভ্রম গেল না॥

গান শেষ হল। বাউলের দিকে হেসে তাকালাম। বাউল শুধাল—কেমন শুনলেন বাবু—আমার গুরুর গান তোমার গুরু? কে সে? বাউল বলে, লালন সাঁই গো—লালন সাঁইই আমার গুরু। প্রশ্ন করি, লালন তো মুসলমান কিন্তু তোমায় তো হিন্দু বলে মনে হচ্ছে। বাউল হেসে বলে—ওই তো আমার গুরুর ধারা—-হিন্দুরা তারে কয় হিন্দু আর মুসলমানেরা কয়

মুসলমান। আর লালন নিজে কী কয় জানেন বাবু? একতারাটি আবার টুং টাং করে উঠল—বাউল গাইল—

মুনশি মৌলবি কাছে
জনমভ'র বেড়ালাম খুঁজে
শুধালেম মূল খবর যেচে
তবু মনের ঘোর তো গেল না।
লালন কয় লালন কোন জনা—
তা তো লালনের ঠিক হোল না।—

গান থামিয়ে বলে বাউল, জেতের বিচার আপনারা করুন বাবু, আপনারা ভদ্দরলোক। আমরা বাউল, আমাদের কি জাত আছে—লালন কয় জাত হাতে পেলে, পুড়াতাম আগুন দিয়ে। হঠাৎ কী ভেবে থেমে যায় বাউল, বৃষ্টিও তখন ধরে এসেছে। বাউল দাওয়া থেকে নামতে নামতে বলে—কাল সকালে থাকবেন বাবু, আপনারে এক জায়গায় নিয়ে যাব।

পরের দিন ভোর-রাত্রেই বেরিয়ে পড়ি দু-জনে। অনেকটা পথ হেঁটে পৌঁছোই গিয়ে এক মজা নদীর তীরে। বাউল বলে, নদীটার ওপার হোল পাকিস্তান। কয়েক কোশ হাঁটলেই লালনের আশ্রম। চমকে বলি—সে কি বাউল, তুমি কি পাকিস্তান যাবে? তোমার পাসপোর্ট-ভিসা আছে? বাউল হেসে বলেন—কর্তা আপনিও যেমন—লালন সাঁইকে বাঁধবে কেডা। হেঁয়ালি বুঝতে পারিনে। কেমন যেন বিড়ম্বিত বোধ করি। হঠাৎ বাউলের একতারা আর কণ্ঠ গেয়ে ওঠে—

ভক্তর দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে
তার কাছে জাতের বিচার নাই।

একটু এগোতেই মজা নদীর ওপার থেকে আরেক জন বাউল বেরিয়ে আসে। এপারের বাউলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে ওঠে—

এক চাঁদে হয় জগৎ আলো
এক বীজে সব জন্ম হলো
ফকির লালন কয় মিছে কল
কেন করিস সদাই।

গান শেষ করে আমার সঙ্গী বাউল বলে—জানেন বাবু ও আমারই মতো লালন ফকিরেরই শিষ্য।

পুবের আকাশে তখন নতুন সূর্য উঠছে—মাঝখানের মরা নদীর বুকে ভোরের দূর্বাদল চকচক করে উঠছে—আমি নিজেকে চিনতে পেলাম।—পুরোনো পরিক্রমায় হরিদাস বাউলের এই ছবি আঁকা।

আজ মনে হচ্ছে হরিদাস হারিয়ে যায়নি—বেঁচে আছে সেই চিরকালের সত্যে—আত্মানং বিদ্ধি—নিজেকে জানো ওর মুখেও তো শুনেছি—'না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আশমানে।' শুনেছি—

আপনি আপনার মনের না জান ঠিকানা
পরের অন্তর সে যে সমুদ্দুর, কি সে যাবে চেনা?

৮.৬.১৯৭৩

৫

অমিতাভ চৌধুরীর শারদীয় ছড়ায় পড়েছি—

কি হইল কি হইল
রাজস্থানে গুড়ুম গুড়ুম
তৈরি হোল শৈল।
নিদ্রা ছাড়ি পাকিস্তান
অ্যামেরিকায় কৈল
হুম ভী এ্যাটম ফাটাউঙ্গা
দাউ কিঞ্চিৎ তৈল।

এ ছড়ার রচনাকাল অনুমান করতে অসুবিধা নেই, অন্তত মাস দেড়েক আগে। অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কিসিঞ্জারের ভারত সফরের সঠিক তারিখ ঘোষিত হয়নি, ফোর্ড-স্বরণ সিং, কিসিঞ্জার-স্বরণ সিং বৈঠক হয়নি। ভারত সম্পর্কে আমেরিকা ইদানীং যেসব ভালো ভালো কথা বলছে তার অনেকগুলি তখনও অনুচ্চারিত। সুতরাং হাল ছাড়েনি পাকিস্তান—তার আশা ছিল পরের ধনে পোদ্দারির আকাঙ্ক্ষা এবারেও হয়তো তৃপ্ত হবে। অর্থাৎ আমেরিকার কাছ থেকে মিলবে কিঞ্চিৎ তৈল। অতএব ততদিন আমেরিকার প্রতি তাঁর ছিল প্রার্থনার সুর। কিন্তু এই মাস

খানেকের মধ্যে গোটা চেহারাটাই বদলে গেছে। ইরানের শাহ্ ভারত সফরে এসে এমন সব কথা বলে গেলেন অনুমান করতে পারি, যা পাকিস্তানের কাছে অত্যন্ত বে-দরদি বলে মনে হয়েছে। এদিকে ড. কিসিঞ্জারও আসছেন এ-মাসের শেষভাগে। পাকিস্তানের অবস্থাটা পদাবলির খণ্ডিতা নায়িকার মতো—আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া। এ-অবস্থায় নায়িকাদের দশা শাস্ত্রমতে যা যা হয়ে থাকে পাকিস্তানেরও তা-ই হচ্ছে। কখনো ক্ষোভ, কখনো ঈর্ষা, কখনো রাগ।

নিউইয়র্ক টাইম্‌স-এর সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর যে-সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে তাতে এই ক্ষোভ, ঈর্ষা ও রাগের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। প্রথমে দেখা যাক ক্ষোভ— মিঃ ভুট্টো বলেছেন, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে আগ্রহী হয়েই আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নিচ্ছে না। দ্বিতীয়ত ঈর্ষা—মিঃ ভুট্টো বলেছেন পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে আমরা ভারতের কিছু পিছনে থাকলেও কম অগ্রসর নই, আমেরিকাই মদত দিয়ে ভারতকে পারমাণবিক বিস্ফোরণে সাহায্য করেছে। আর তৃতীয়ত রাগ—মিঃ ভুট্টো জানিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকা যদি অস্ত্রশস্ত্র না দেয় তবে হাম ভী অ্যাটম ফাটাউঙ্গা।

কিন্তু ঠাট্টা থাক। কাজের কথায় আসি। ভারত যখন শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, পাকিস্তান সেদিন তাকে বর্ণনা করেছিল পারমাণবিক ব্ল্যাকমেল হিসাবে। কিন্তু আজ জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে—মিঃ ভুট্টো নিউইয়র্ক টাইমসকে যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো আমেরিকাকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা ছাড়া আর কী? মিঃ ভুট্টো বলেছেন, গতানুগতিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁদের যে-চাহিদা রয়েছে আমেরিকা যদি তা পূরণ করে দেয় তবে তিনি পারমাণবিক কর্মসূচিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হবেন না। কয়েক দিন আগে মিঃ ভুট্টো নিজেই বলেছিলেন পাকিস্তান-সেনাবাহিনী এখনকার মতো আর কখনো এত শক্তিশালী ছিল না, তবু তাঁর আর কত অস্ত্রশস্ত্র দরকার? নাকি তিনি মেতে উঠেছেন ভিন্ন উদ্দেশ্যের সেই ভিক্ষাবৃত্তিতে যেখানে—

যত পাই তত পেয়ে পেয়ে তত চেয়ে চেয়ে
পাওয়া মোর চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায়।

অছিলা দেখিয়েছেন—সেই পুরনো অছিলা। পাকিস্তানের নিরাপত্তার

প্রয়োজন। কিন্তু এই অছিলাও তো ধোপে টেকে না। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্বের কথা পাকিস্তান তো সবসময়ই বলে থাকে। ভারতের সঙ্গেও তারা স্বাক্ষর করেছে সিমলা চুক্তিতে, যে-চুক্তির মূল কথা বিরোধ মীমাংসায় শক্তিপ্রয়োগ পরিহার। আর এই চুক্তি অনুযায়ী দু-দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে গতকাল থেকে দু-দেশের মধ্যে ডাক ও তার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং যদি প্রশ্ন তুলি, পাকিস্তান ভয় পাচ্ছে কাকে—তবে কি খুব অন্যায় হবে? আফগানিস্তানের সঙ্গে তাদের বিরোধ রয়েছে বটে কিন্তু সে-বিরোধ আফগানিস্তান শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নিতে যে আগ্রহী তারও প্রমাণ মিলেছে গতকাল। আফগানিস্তানে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী পাক বিমানকর্মীদের ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা থেকে। তা হলে পাকিস্তান এত নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে কেন?

মজার কথা আরও আছে। সকলেরই জানা কয়েক দিন আগে পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব এনেছেন, দক্ষিণ এশিয়াকে পারমাণবিক শক্তিমুক্ত এলাকায় পরিণত করতে। অথচ সেই পাকিস্তান আজ আমেরিকাকে হুমকি দিচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ না করলে সে নিজেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে। দুই প্রস্তাবে কী আশমান-জমিন ফারাক। এরই ফলে রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানি প্রস্তাবে চীন ছাড়া আর কাউকেই সাড়া দিতে দেখা যায়নি।

আসলে পাকিস্তান সরকার আজ চর্যাপদের হরিণীর মতো নিজেই নিজের বৈরী হয়ে পড়েছে। কিছুতেই পারছে না সুস্থ স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতে। অথচ দেখুন পাকিস্তানের জনগণ কী চান। গতকাল দীর্ঘ তিন বছর পর আবার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ডাক ও তার যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ইতিমধ্যেই দু-দেশের বহু মানুষ এগিয়ে এসেছেন তাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের কুশলবার্তা নিতে এবং দিতে। এইটেই তো স্বাভাবিক ; শত্রুতা নয়, বন্ধুত্ব। পাকিস্তান সরকার যদি ভাবতে পারতেন দু-দেশের সাধারণ মানুষ কী চান, তবে দেখা যেত পাকিস্তান সরকার অনায়াসেই বিরোধের পথ ছেড়ে আসতে পেরেছেন শান্তির উজ্জ্বল সরণীতে। ভারতের সঙ্গে কার সম্পর্ক স্বাভাবিক হল, কে ভারতের বন্ধু হল—এ নিয়ে অন্তত তাদের নার্ভাস হবার কোনো কারণই থাকত না।

১৬.১০.১৯৭৪

৬

ঢাকের চামড়া টনটন করছে—কাঠিগুলো চনমনে; প্রস্তুত কাঁসর-ঘন্টাও। এই রাত কেটে গেলে ষষ্ঠীর সোনালি ভোরে এরা বেজে উঠবে। যে-কথাটি শিউলি সুবাস, আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, আর সাদা চুলের মাথা-দোলানো কাশের বন বলবার চেষ্টা করছিল গত কয়েক দিন ধরে, শোনা যাবে সেই কথাটি, পুজো এসে গেছে।

সেই কবে ষোড়শ শতকে,—এখন ওপার-বাংলার রাজশাহি জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ দুর্গাপুজোর প্রচলন করলেন, তার পর থেকে ঋতুচক্রের আবর্তনে শরতের ডাক শোনা গেলে, প্রতি বছর পুজোর সুর বেজে ওঠে। ইতিহাসে পড়েছি, রাজা কংসনারায়ণ সেই সময়ে পুজোর জন্যে খরচ করেছিলেন ৯ লক্ষ টাকা। আজকের হিসেবে ..., সুধী শ্রোতৃমণ্ডলীর কেউ যদি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত থাকেন, তবে তাঁকে অনুরোধ করব, কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আপনার রেডিয়ো-সেটটা অফ করে দিন—কেননা বর্তমান লেখক, কারো অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণ হতে চান না। যাই হোক, সবলচিত্ত ব্যক্তিদের জানাই, ষোড়শ শতকের সেই ৯ লক্ষ টাকা আজকের হিসাবে দাঁড়ায়, তা প্রায় ৬/৭ কোটি টাকার মতো—তা-ও, যখন বাঙালির গোলা-ভরা ধান, পুকুর-ভরা মাছ, গোয়াল-ভরা গরু ইত্যাদি সব ব্যাপার। আজকাল তা ভাবাও যায় না। নাই-বা গেল—কিন্তু জেরটা আজও রয়েছে। হয়তো সেরকম নয়, তবুও চেষ্টা চলে জাঁকজমকের। এদিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে—ঘরের পুজো, বাইরের পুজো হয়েছে—আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরেকটি মাত্রা—উৎসবের।

কিন্তু কীসের পুজো, কীসের উৎসব? একটু লক্ষ করলে দেখবেন, আমাদের ফসলের কাল ও পুজোর কাল, কোনো এক অলিখিত নিয়মে যেন মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। আমাদের ফসলের মরশুমের সূচনা শরৎকালে—শেষ বসন্তে। পুজোরও তাই। শরতে দুর্গাপুজো—বসন্তে বাসন্তী, অন্নপূর্ণা। মাঝখানে, লক্ষ্মী, কালী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী পুজো। আর সকলেই জানেন, প্রধান প্রধান পুজোগুলোর প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে যোগ রয়েছে ফসলের, শস্যের। দুর্গাপুজোর কথাই ধরুন। আগামীকাল তো বোধন। এই বোধনকালে, দেবীর প্রতীক হল বিল্বশাখা—অর্থাৎ গাছ দিয়ে শুরু। তার পর তো নবপত্রিকা পুজো। নবপত্রিকা একটি কলাগাছের সঙ্গে

কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, মানকচু, অশোক ও ধান একত্রে গুচ্ছাকারে বেঁধে, শস্যবধূরূপে পরিকল্পিত। আবার বিভিন্ন শস্যের সঙ্গে বিভিন্ন দেবীর যোগ রয়েছে। যেমন কলার অধিষ্ঠাত্রী ব্রাহ্মণী, কচুর দেবী কালিকা, হরিদ্রার দেবী দুর্গা, ধানের দেবী লক্ষ্মী প্রভৃতি। সবমিলিয়ে নবপত্রিকার মাধ্যমে দুর্গাদেবীর শস্যদেবীত্বের রূপটি সামগ্রিকতায় বিধৃত। আমাদের এই বাংলা কৃষিপ্রধান—সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে দুর্গোৎসব বাংলার ও বাঙালির জাতীয় উৎসব—আর যেহেতু এই উৎসব শস্যঋতুর অর্থাৎ শরৎকালের শুরুতে—সেই হেতু শারদোৎসব। এই চুয়াত্তরে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, যখন লঙ্গরখানাগুলিতে হাজার হাজার মানুষের ভীড়—তখন যদি পুজো করতেই হয়, তবে তা শস্যদেবীরই।

আরেক দিক থেকেও বিষয়টি ভাবা যেতে পারে। চালচিত্র সমেত সমগ্র দেবীমূর্তিটি ভাবুন। দেবাদিদেব মহাদেব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, অসুর, সিংহ, সাপ, পেঁচা, ময়ূর, ধানের শিষ—সব কিছুই সেখানে মিলেছে। নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, প্রদেশভেদে, দেবীপুজোর প্রাধান্যে ভেদ রয়েছে। এমনকী, অসুর, সাপ, সিংহ—এসবও আমাদের কোনো কোনো অঞ্চলে পূজিত। আসলে, দুর্গাপুজোর ধারণার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, একটা সমন্বয়ের সুর। আজকের বহু চলতি ভাষায় যাকে বলি 'সংহতি'—'ভাগবত সংহতি'। যে-মুহূর্তে দেশে বিভেদপ্রবণ, স্বার্থান্বেষী শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে, সে-সময়ে যদি কোনো প্রার্থনা জানাতে হয়, তবে তা সংহতির।

আগামী চারদিন আমরা আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাব, গানে, সুরে চারদিক ভরে যাবে, বেহিসেবি উল্লাস আমাদের গ্রাস করতে চাইবে—কিন্তু এই আনন্দস্রোতে, আমরা যদি ভুলে যাই সেসব নিরন্ন মানুষের কথা, আমরা যদি মনে না রাখি সংহতির আদর্শের কথা, আমরা যদি সবাইকে মিলিয়ে নিতে না পারি আমাদের উৎসবে—তবে তো আমাদের উৎসবে, পুজোয় ফাঁক থেকে যাবে। দেবতার পুজোর সমাপ্তিও কিন্তু মানবলোকে—এই সত্য যেন আমরা ভুলে না যাই।

২০.১০.১৯৭৪

৭

ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, বোঝা যায় না, চেনা যায় না, কেমন যেন হয়ে যায়—এই পুজোর ক-দিন—এই কলকাতা। এত অভাব—এত অনটন—এত দারিদ্র্য—এত বৈষম্য—যন্ত্রণা—অমানুষতা—ঐশ্বর্যের অশালীন আস্ফালন, এ সবকিছু কোন এক নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে—এই ক-দিনের—এই পুজোর ক-দিনের কলকাতা কেমন যেন টসটসে আঙুরের মতো নিটোল চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসে সুন্দরী মোহময়ী বর্ণালী বিচিত্রা কলকাতা, আমাদের চেনা-অচেনা কোন এক সমুদ্র মন্থন করে। সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি—অবাস্তব-অলৌকিক কলকাতাকে।

আজ তো আকাশে মেঘ ছিল, আকাশ-ঝাঁপানো বৃষ্টিতেও ছিল আষাঢ়ে মেজাজ। তবু এই যে অষ্টমীর রাত এই কলকাতায়, বলতে পারেন এর কোনো আভাস ছিল—পঞ্চমীতে ? নির্ধনের সেই চিরপরিচিত প্রায় অলঙ্ঘনীয় বেড়াটা কোন এক বেপরোয়া হাসির প্রচণ্ড দমকে ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। ট্রামের শব্দ, বাসের শব্দ, রিকশার বেলোয়ারি আওয়াজ, হকারের চিৎকার, এর ডাক, ওর সাড়া। হাত থেকে পড়ে যাওয়া পাতলা কাচের গ্লাসের ভেঙে যাওয়ার শব্দের মতো হাসির তরঙ্গে ও মাইকে—'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই ছায়ায়', সে মাইকে—'দিল তেরা মস্তানা'—আবার ওদিকের কোনো মাইকে সানাইয়ের সুর—সব মিলেমিশে একাকার হয়ে—কী? তা কেউ জানে না—শুধু জানি—আজ কোনো হিসেব নেই কোনো বাধা নেই—কোনো সংকোচ নেই—শুধু এক আশ্চর্য প্রাণবন্যায় ভেসে যাওয়া।

তাহলে ওরা কোথায় গেল? ওই যে ওই ছেলেটি ওই তো নিদারুণ হতাশায় দিনের পর দিন মাথা কুটে হিংসার ক্রীতদাস হয়েছে. ওই যে-লোকটি পথ হাঁটছে—ওকেই তো দেখেছি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের দীর্ঘ সারিতে সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগোতে, কিংবা ওই মেয়েটি কালই তো ওকে দেখলাম প্রাণপণ চেষ্টায় পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করতে, আর ওই যে অপুষ্টির বিজ্ঞাপনে-দেখা ছোট্ট ছেলেটি, ওকেও তো দেখেছি এক মুঠো অন্নের প্রত্যাশায় মানবী অন্নপূর্ণাদের দুয়ারে দুয়ারে বেঁকে-যাওয়া দুমড়ে-যাওয়া থালাটা নিয়ে ঘুরতে। কিন্তু আজ ওরা কোথায় গেল এই অষ্টমীর

রাতে? ভিড়ের দিকে তাকাই অবাক হয়ে দেখি ওরাও আছে কিন্তু কে যেন ওদের জল-ভরা চোখের পাতা দুটোয় আনন্দের কাজল মেখে দিয়েছে। পুজো একলার, কিন্তু উৎসব সকলের। পুজোয় আত্ম-উপলব্ধি কিন্তু উৎসবে আত্মবিস্তার। সবাই আজ নিজেকে দেখছে অন্যের চোখে। এই আনন্দের ভিড় থেকে নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে নিন, দেখুন তো কাউকে পৃথক করে দেখতে চিনতে পারেন কি না? ওই যে মানুষটি হাসছেন, আপনি জানেন ওর গ্রাম কোথায়? এই ছোট্ট ছেলেটির অজস্র প্রশ্ন ওর মাকে বিব্রত করছে, আপনি জানেন ওর ধর্ম কী? কিংবা ওই যে বিদেশিনি মহিলা—এদেশি সাজপোশাকে সজ্জিতা হয়ে—লোকারণ্যে মিশে গেছেন—ওকেও কি পৃথক বলে ভাববার উপায় আছে? না, আজকের কলকাতায় ব্যক্তিগত কোনো কিছু নেই—কোনো প্রশ্ন নেই, না ধর্মের, না বিত্তের। আজ সকলের সঙ্গে মেলা, সকলের সঙ্গে মেশা—শুধু গান, শুধু আলো, শুধু হাসি।

আজ এই অষ্টমীর রাতে বেরিয়ে পড়েছেন সবাই ঘর ছেড়ে—সর্বত্র এক আশ্চর্য গতিময় ছন্দ। সবাই চলেছেন। কিন্তু কোথায়? পুজোমণ্ডপে? কী দেখতে? দেবী মূর্তি, শাস্ত্রীয় মূর্তি তো আজ আর চোখেই পড়ে না—ধ্যান নয়, আপন মনের মাধুরী মিশায়ে মূর্তি তৈরি করছি। তাতেও অতৃপ্তি। বৈচিত্র্য চাই উপাদানে রঙের দৃষ্টিভঙ্গিতে। মণ্ডপে ভক্তি-শ্রদ্ধার স্থান নিয়েছে শিল্পীর মন।

আসলে পুজোর কলকাতাকে মনে হয় এক শিল্পী, যে জেনে গেছে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দই উৎস, সব কিছুই ওই আনন্দ থেকে। আর ওই শিল্পী তার বিরাট ক্যানভাসে এঁকে চলেছেন—সেই আনন্দের ছবি—এখানে এখনও অন্ধকার—আর এক পোচ রং চড়াও—অন্ধকারটাকে ফিকে করে দাও আলোর ইঙ্গিত এনে দাও, ওখানে দুঃখের দুর্বিষহ বিকৃতি। রং খোঁজো নূতন রং, তার পরে এদিকে একটা টান দাও—ওদিকে আর একটা—দুঃখটাকে রঙিন করে দাও—ওই যে ছোট্ট মেয়েটা—ওর সর্বাঙ্গে খরা আর বন্যার চাবুকের দাগ—চোখ দুটো জলে টস টস করছে— কেমন যেন বেমানান—তুলি চলল—চোখে জল মুখে হাসি। এমনি করেই আঁকা চলে শিল্পীর। তার পর দশমীর বিসর্জন হয়। শিল্পী তুলিগুলো ধুয়ে মুছে তুলে রাখেন আগামী বছর আবার বসা যাবে

বলে। এমনি করেই চলছে বছরের পর বছর, শিল্পী কলকাতা কিছুতেই আর তার সেল্ফ পোর্ট্রেট আঁকা শেষ করতে পারছে না।

সে বার বার আঁকছে আর মুছছে। কোন হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান। তখন কোনো প্রশ্নও নেই তার ক্লান্তিবিহীন ফুল ফোটাবার খেলায়।

২৩.১০.১৯৭৪

৮

কলকাতা এক আশ্চর্য মহানগরী। তুলনায় মনে পড়ে যায় মোনালিসার হাসি। দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু কতকাল যে কেটে গেল তবুও সেই হাসির দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে মন গুনগুনিয়ে ওঠে—'বোঝা গেল না গেল না।' ধরা যাক এর আয়তনটার কথা। মূল মহানগরীর আয়তন তিরিশ বর্গ মাইল আর জনসংখ্যা একত্রিশ লক্ষ। যেই না এই হিসেব দেওয়া, ঠিক জানি আরও পাঁচ-শো বর্গমাইল এলাকার বাহান্ন লক্ষ মানুষ এককণ্ঠ হয়ে প্রতিবাদ জানাবেন, কেন? আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি? সি.এম.ডি.-র ধারাপাত খুলে ওঁরা দেখিয়ে দেবেন, কলকাতা তিরিশ বর্গ মাইলের সীমা অনেক আগেই অতিক্রম করে এখন বৃহত্তর কলকাতা নাম নিয়ে নিজেকে পাঁচ-শো ত্রিশ বর্গ মাইল এলাকায় প্রসারিত করেছে, আর তার গণ্ডির মধ্যে বাসা বেঁধেছে তিরাশি লক্ষ মানুষ। কে জানে এই হিসেবই কলকাতার শেষ হিসেব কি না—কলকাতার কোনো শেষ আছে কি না। কলকাতার যেমন শেষ নেই, তেমনি শেষ নেই এই মহানগরীর মানুষগুলোর দুঃখদুর্দশার। তাকানো যাক বস্তিগুলোর দিকে—তাকানো যাক মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর দিকে। ভাবতে অবাক লাগে এত চাপ চাপ অন্ধকার একটা শহরে জমে কী করে? অবাক লাগে ভাবতে, ওই আকাশ-ছোঁয়া বাড়িগুলো, প্রাসাদগুলো কত বৈভবেরই না সাক্ষ্য বহন করছে। এত বৈপরীত্য 'কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'—এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কলকাতার কথা লিখতে বসে হঠাৎ দেখবেন কলকাতাকে ছোঁয়া যাচ্ছে না। এক একটা মুহূর্তে শহরটা কেমন যেন অলৌকিক হয়ে পড়ে।

এই সেদিন গিয়েছিলাম গড়চা ফার্স্ট লেন এবং ডোভার লেনের মাঝখানটায় যে মৌচাক গড়ে উঠেছে সেখানটায়। ওই মৌচাকে অবশ্য মৌমাছি নেই—মধুও নেই। আছে এক দঙ্গল মানুষ শ'পাঁচেক খুপরিবদ্ধ পরিবার—সরকারি কর্মচারীদের কোয়ার্টার্স। ছোটোবেলায় দেশলাই বাক্সের ওপর দেশলাই বাক্স বসিয়ে বাড়ি তৈরির খেলা ছিল। এই বাড়িগুলোও তেমনি—এক-একটা দশতলা উঁচু। সেভেন্থ ফ্লোরে একটি ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি কলকাতাকে। সেই কলকাতা স্কাইস্ক্রেপারের কলকাতা। ছোটো বাড়িগুলো, বস্তিগুলো কোন তলায় তলিয়ে যে চোখেই পড়ে না। যেদিকে চাই গগনস্পর্শী স্পর্ধা নিয়ে কলকাতা দাঁড়িয়ে। সবিস্ময়ে দেখছি। হঠাৎ একটি ঝোড়ো হাওয়া এল—বাড়িটার কোমরের কাছে পড়ে-থাকা গাছগুলো—বেশির ভাগই নারকেল গাছ—সদ্যস্নাতা তরুণীর চুলের মতো ওদের ডালপালা ছড়িয়ে দিলে হাওয়ায। তার পর এক খণ্ড মেঘ—বাড়তে বাড়তে প্রকাণ্ড এক দৈত্যের চেহারা নিয়ে অত বড়ো নীল আকাশটাকে যেন গপ করে গিলে খেয়ে ফেলল। বিকেলের পড়ন্ত আলোর শবদেহের ওপর চোখ অন্ধ-করা বৃষ্টি নামল। একটু আগে যে-বাড়িগুলোর উচ্চতা মনের ফিতেয় মাপবার চেষ্টা করছিলাম সেগুলো গেল হারিয়ে। সামনে পড়ে রইল এক তেপান্তরের মাঠ আর তার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি বাড়ির চোখ-টানা আলো যেন হয়ে পড়ল আলেয়ার হাতছানি। এক মুহূর্তে হারিয়ে গেল সেই কলকাতা—যাকে আমরা প্রত্যেক দিন প্রতি মুহূর্তে দেখছি।

এই ওর আশ্চর্য খেলা—এই আছে এই নেই। আমাদের এই আকাশবাণী ভবনের উলটো দিকেই তো বিধানসভা ভবন—তারই বেড়ার গা ধরে কয়েকটি কৃষ্ণচূড়া গাছ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের চোখ-জ্বালা দুপুরে খোলা জানালা দিয়ে চোখ পড়েছে কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোর দিকে। চোখ ফেরাতে পারিনি। প্রিয়জনের চিতাগ্নিশিখার দিকে যেমন এক রাশ শূন্যতা নিয়ে অনিমেষ তাকিয়ে থাকি, তেমনি করেই দেখেছি গাছগুলোর মাথায় আগুনের প্লাবনের দিকে। ঘরের ভেতর টেলিপ্রিন্টারে গরম গরম খবর,—ইন্টারনাল চ্যানেলে স্টুডিয়ো থেকে সরাসরি আসা সুরেলা কণ্ঠ, সহকর্মীদের আনাগোনা—সব মুছে গিয়ে জানালা জুড়ে শুধু সেই আগুনের তাণ্ডব। এত ব্যস্ত শহর কলকাতা যেন আটকে গেছে ওই ফ্রেমে। অলৌকিক নয় তো কী?

অলৌকিক তো এই নগরীতে বেঁচেবর্তে পথ চলাও। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মিনিবাস, লরি, টেম্পো-প্রাইভেট মায় ঠেলাগাড়ি পর্যন্ত—বেপরোয়া উল্লাসে আপনাকে চাপা দিতে উদ্যত। হিসেব করে চলতে হয় জীবনটাকে বাঁচাতে। তবুও কোনো একদিন কোনো মুহূর্তে এই পথ চলতেও হিসেব ভুল হয়ে যায়। হঠাৎ যখন কোনো ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো জড়িয়ে ধরে প্রথমে একটু অচেনা অচেনা ভাব, তার পর একটু চেনা চেনা হয়তো এদিক-ওদিক তাকালেও চোখে পড়বে না। নাই-বা পড়ল, কিন্তু ততক্ষণে থমকে দাঁড়িয়েছি, উন্মনা হয়ে পড়েছি। আর ওই ফুলের গন্ধ—নিজেকে কেমন যেন মানুষ মানুষ বলে ভাবতে পেরেছি ওই যান্ত্রিক ভিড়ে। প্রাত্যহিকতার সমস্ত গ্লানি ঝরে পড়ছে একটি নিমেষেই।

ঝরে পড়ে বয়সের ভারও। কালকের কথা ভাবুন না। একটা বই-এ মজে গিয়েছি—রাত সাড়ে ১২টা যে কখন পার হয়ে গিয়েছে বুঝতে পারিনি। যখন খেয়াল হল, বিছানায় শুয়ে বেড সুইচটা টিপে আলো নিভিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ জ্যোৎস্না জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছে আমার বুকে, মুখের ওপর। আশ্চর্য জোছনা! তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই রাত অনেকদিন আগেকার একটি রাত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের একটি মফস্সল শহর। একটি বাড়ির তেতলার চিলেকুঠিতে এক ষোলো-সতেরো বছরের কবিতা-পড়া ছেলে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। ঘর-ভরতি জোছনা। যেই ঘুম আসছে অমনি দমকা হাওয়া তার ঘুমটাকে উড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। চোখ মেলেছে—আবার সেই দমকা হাওয়া আর তার সঙ্গে সামনের বাড়ির বাগানের কামিনী ফুলের গন্ধ। একটা কবিতার লাইনে ওর ঘুমটা আটকে গেছে—

ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না
তাই তো জেগে রই—

অনেকদিন আগের সেই কম বয়সের কবিতার রাতকে কালকের জোছনা কেমন যেন বেমালুম তুলে এনে বললে 'কী, চিনতে পারো?'—চিনেছি রাতটাকে এবং এই কলকাতাকে। এটা শুধু একটা মহানগরী নয়—একটা কবিতা, যা কোনোদিন পুরোনো হয় না।

২৮.৬.১৯৭৫

৯

এখন রাত দশটা। আর ঠিক দু-ঘন্টা পরে ইংরেজি নিয়মে ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে চৌঠা নভেম্বর মুছে গিয়ে আসবে পাঁচই নভেম্বর। একটি নূতন দিন—একটি অবিস্মরণীয় দিন— কেননা এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—এমন একজন মানুষকে—যিনি অনেকদিন আগে আমাদের চোখের আড়াল হলেও—মনের আড়াল হননি। কেননা, আজ যে-ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আমরা সার্থকতাকে খুঁজছি, কে অস্বীকার করবে তার অনেকটাই যে তিনি ও তাঁর কালের মানুষ তৈরি করে দিয়েছিলেন।

যদিও আমাদের বিদ্রোহী কবি তাঁর অপরূপ সৃষ্টিকাহিনির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন :

চীর গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত-জননী কাঁদি',
প্রতাপ শিবাজী দানিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীষ বাঁধি'।
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মান্দার মালা, মানব মাখালো ধূলি।
নিখিল-চিত্ত-রঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি'—
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী!'—

এবং তাঁর মৃত্যুকে দেখেছিলেন ইন্দ্রপতন রূপে। তবু আজ আমাদের কাছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এমন এক রূপকথা যা আমাদের চিত্ত শৈশবকে উর্বর করে, সৃষ্টিশীল করে এবং তার পর যা হতে চাই—তা হতে না পেরে যন্ত্রণায় মাথা কুটতে বাধ্য করে। আসলে তিনি সেই নূতন ফসলের আশ্চর্য সম্ভাবনাপূর্ণ বীজ যাকে ঘিরে আমাদের অপরিসীম প্রত্যাশা।

প্রত্যাশা, কিন্তু কীসের? চিত্তরঞ্জনেই চিত্ত উত্তর পায়—আজকের সমস্যার—আজকের উত্তর—"জাতীয়তাবাদ হোল এমন একটা কর্মসূত্র, যার মাধ্যমে জাতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু সেই আত্মপ্রকাশে অন্য জাতির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বা অন্যের প্রতি বিরোধিতা থাকবে না। বরং সেই আত্মপ্রকাশ অন্য জাতির আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির সহায়ক হবে। বিভিন্নতা একতার মতোই বাস্তব। সমগ্র বিশ্বে বিরোধের মাঝে মহান মিলন তখনই সম্ভব হবে যখন প্রতিটি জাতির নিজের রাস্তায় চলবার এবং আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির পথ সুগম হবে। আমি বলতে চাই প্রতিটি

জাতীয়তার মধ্যে আছে মহান একতার ধারা। কিন্তু কোনো জাতিরই আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিশ্বমানবতার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন খুঁজে না পায়।''

আরও একটু স্পষ্ট করা যাক ভাবনাটা—তাঁর কথাতেই—''বুঝিলাম বাঙালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, বাঙালী, বাঙালী। বাঙালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, বুঝিলাম বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হইবে। বিশ্ব বিধাতার যে অনন্ত-সৃষ্টি, বাঙালী সেই সৃষ্টি—স্রোতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্রে বাঙালীর একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার বাঙলা সেই রূপের মূর্ত্তি। আমার বাঙলা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন জানিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন, সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত। তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর, আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।''

কিন্তু বাঙলার এই ভাবমূর্তিকে আবার কী করে রূপ দিতে পারি? তাঁর উত্তর—''আবার পল্লিগ্রামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও সঞ্জীবিত করিতে হইবে, অস্বাস্থ্যতা দূর করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে। পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে, বনজঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং চাষাকে কম সুদে তাহার আবশ্যকীয় টাকা ধার দিবার জন্য, গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদের উপকারের জন্য, তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ছোটোখাটো ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু কাজ করিবে কে? রাজ সরকার না আমরা? আমাদেরই করিতে হইবে। এই আমাদের কাজ। আর এই কাজে সকলকে ডাকিতে হইবে। ডাকো ডাকো সবাইকে ডাকো।

''প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে? ওঠ জাগ আপনার কল্যাণকে জাগাও। বলো এসো ভাই, তুমি মুসলমান হও, খ্রিস্টিয়ান হও, শূদ্র হও, চণ্ডাল হও, তোমাকে আলিঙ্গন করি—এ যে আমার কাজ, এ যে তোমার কাজ, এ যে মায়ের কাজ।''

আগামীকালের দিকে চেয়ে ভাবছি—দেশবন্ধুকে মনে রেখে ভালোবেসে—আমরা হয়তো দেশকে ভালোবাসার মন্ত্রও পেয়ে যেতে পারি।

৪.১১.১৯৭৫

১০

আরও একটি ছাব্বিশে মার্চ এল। একটি দেশের, বাংলাদেশের নবজন্মের শুভক্ষণের স্মৃতি বহন করে। আর এই জন্ম-যন্ত্রণার নিখুঁত প্রতিবেদন তুলে ধরতে গিয়ে 'নিউজ উইক' পত্রিকার টনি ক্লিফটন সেই একাত্তরে লিখেছিলেন, "যেকেউ ক্যাম্পে বা হাসপাতালে গেলে বিশ্বাস করবে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যেকোনো অত্যাচার করতে সক্ষম। আমি, গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, এমন বহু শিশুকে দেখেছি। চাবুকের পর চাবুক মেরে পিঠ একেবারে রক্তাক্ত করে দেওয়া হয়েছে, তা-ও দেখেছি। চোখের সামানে নিজেদের ছেলেমেয়েদের নিহত হতে দেখে, ধর্ষিতা লাঞ্ছিতা হতে দেখে একেবারে মূক হয়ে গেছে, এমন বহু মানুষকেও আমি দেখেছি। আমার কোনো সন্দেহ নেই, পূর্ব পাকিস্তানে শত শত *মাইলাই* ও *লিডিসেস* সংঘটিত হয়েছে।" একাত্তরের তিরিশে মার্চ 'নিউইয়র্ক টাইমস' লিখেছে, প্রথম আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই গোটা বাংলাদেশে অন্তত তিন লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে। এত রক্ত মধ্যযুগ দেখেনি কখনো। কিন্তু গণহত্যা, অত্যাচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণই নয় ছাব্বিশ মার্চের শেষ কথা। কারণ এই দিনই ঘরে ঘরে গড়ে উঠল প্রতিরোধের দুর্গ—যার যা আছে, তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অস্ত্রহীন ও শঙ্কাহীন সাড়ে সাত কোটি মানুষ, ইয়াহিয়া খানের সর্বাধুনিক সমরযন্ত্রের বিরুদ্ধে। অভ্যুদয় ঘটল, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের! গোটা পৃথিবী, এক মহান সংগ্রামের সাক্ষী হল।

সংগ্রাম চলল এগিয়ে। প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল স্বৈরাচারী বাহিনী। তাদের আক্রমণে গ্রামের পর গ্রাম পুড়ল, পদ্মা-মেঘনার জল লাল হল, আর সে-রক্তবন্যায় ভেসে গেল সীমান্তের বেড়া। ওপার থেকে এপারে চলে এলেন এক কোটি নিঃস্ব রিক্ত মানুষ, কিন্তু মুখে তাদের বিজয়-মন্ত্র 'জয় বাংলা'। সেই অভূতপূর্ব শরণার্থী-প্রবাহের দিকে তাকিয়ে একজন জার্মান সাংবাদিককে লিখতে হল, ভারতের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়ার এ-এক অভিনব আক্রমণ। আর এ-আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের

অস্ত্র রাইফেল-মেশিনগান নয়, একে প্রতিরোধ করতে হয় সেবা দিয়ে, শুশ্রূষা দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে। কিন্তু তাতে যথেষ্ট হল না। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে বিকৃত করতে, বিভ্রান্ত করতে ইয়াহিয়ার জঙ্গিবাহিনী সর্বাত্মক লড়াই ঘোষণা করল ভারতের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তিসংগ্রাম, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংগ্রাম আর আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার লড়াই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। দ্বি-জাতিতত্ত্বের অনিবার্য মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যে-প্রগতিশীল বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটল, তারই পাশে দাঁড়িয়ে আমরা এক মহান সংগ্রামের শরিক হলাম।

এই সংগ্রাম কি ছিল শুধু বাংলাদেশের, শুধু ভারতের? না। বিশ্বের প্রতিটি শক্তিশালী ও স্বাধীনতাকামী দেশ স্বাধীনতার, মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার এই সংগ্রামকে সমর্থন জানালেও আমাদের চোখের সামনে নয়া উপনিবেশবাদের অলংকৃত-মুখোশ খুলে পড়ল। আমরা দেখলাম, যারা অহরহ গণতন্ত্রের জন্য চোখের জল ফেলে, তারাই, যারা গণতন্ত্রকে ধর্ষণ করেছে, ঐতিহাসিক নির্বাচনের রায়কে পদদলিত করেছে, সেই স্বৈরাচারের দুর্গকে বাঁচাতে তাদের নৌবহরকে পাঠাল। আমরা দেখলাম, যারা মানুষের শোষণমুক্তির কথা বলে, যারা সাম্যের কথা বলে, তারাই নৈতিক সমর্থন জানাল তাদের, যাদের পিছনে নৈতিকতার কোনো চিহ্ন নেই।

যে-সংগ্রাম ছিল সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির সংগ্রাম, যে-সংগ্রাম ছিল ভারতের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার সংগ্রাম, সে-সংগ্রাম হয়ে উঠল নয়া-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। অনেকেই ভেবেছিল, এই উপমহাদেশে বুঝি একটা ভিয়েতনাম সৃষ্টি হতে চলেছে। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ যৌথ-কমান্ডের ঝটিতি বিজয় সেই আশঙ্কাকে চূর্ণ করে, উড্ডীন করেছে মুক্ত মানবিকতার বিজয়বৈজয়ন্তী।

কাজেই যে দিক থেকেই বিচার করা যাক, একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ একটি ঐতিহাসিক দিন। একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনটিতে আমরা শ্রদ্ধা জানাব সেইসব শহিদদের, সেই বীর সংগ্রামীদের, যাদের বুকের রক্তে স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ উজ্জ্বলতর হয়েছে। সতর্ক ও সচেতন থাকব সেইসব নাগিনিদের সম্পর্কে, যারা এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাদের হিংস্র ছোবল মারতে উদ্যত, যারা মানুষের মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকারকে প্রতি

পদে নস্যাৎ করবার চেষ্টা করছে। কখনো ডলার পাঠিয়ে, কখনো সৈন্য পাঠিয়ে, কখনো বা তথাকথিত বিপ্লব রপ্তানি করে। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার এই দিনটি বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে নিজেকে উন্মোচিত করেছে, স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখার শপথ হিসাবে।

২৬.৩.১৯৭৬

১১

একটু হাসবেন। হাসুন না একটু। যেমন খুশি তেমনি করেই হাসুন, তবু একটু হাসুন। ভাবছেন এ আবার কী অনুরোধ! কথা নেই বার্তা নেই, হাসতে বলা? বিশ্বাস করুন, হাসাটা খুব দরকার, বিশেষ করে আজকের এই গোমড়ামুখো দিনগুলোতে। কেন? আচ্ছা তার আগে বলুন তো, হাসবেন না, সিরিয়াসলি বলছি, বলুন তো 'হাসা' কাকে বলে? মানে হাসা ব্যাপারটা কী? রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হই। "একটা কিছু ভালো লাগিবার বিষয় যেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, অমনি আমাদের গলার ভিতর দিয়া একটা অদ্ভুত প্রকারের শব্দ বাহির হইতে লাগিল এবং আমাদের মুখের সমস্ত মাংসপেশি বিকৃত হইয়া সম্মুখের দন্তপঙ্‌ক্তি বাহির হইয়া পড়িল।"—এই যে ব্যাপারটা ঘটে গেল, একেই বলা হয়ে থাকে হাসি। জানেন নিশ্চয়ই হাসি নানারকম। শব্দের দিক থেকে কোনো হাসি একেবারে হা হা করা হাসি, কোনো হাসি হো হো করা, কোনো হাসি আবার ফিক করে। হাসির কারণও হয় আবার নানারকম, কখনো আমরা চোখের সামনে নানারকম কিছু ঘটতে দেখে হাসি, কখনো মনে মনে কিছু ভেবে নিয়ে হাসি। কখনো সুখে হাসি, আনন্দে হাসি, কখনো-বা আবার চোখের জল হাসিতে, আবার হাসি চোখের জলের রূপ নিয়েও ঝরে পড়ে। এই চোখের জলের কথা যখন উঠলই, তখন আর একটা কথা সেরে নিই। আচ্ছা বলুন তো, আপনি কতবার কেঁদেছেন। উত্তরটা দেয়া হয়তো খুব একটা কঠিন হবে না ; আমাদের কান্নাগুলোর কিছু কিছু হিসেব থেকেই যায় স্মৃতির পাতায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সে-হিসেব মানবেন না। ওঁরা বলবেন, চোখের পাতা যত বার পড়ে, ততবার আমাদের টিয়ার গ্ল্যান্ড থেকে জল বেরিয়ে আসে—এটিই কান্না। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখিয়েছেন একটা মানুষের গড় আয়ুষ্কাল যা, তার

মধ্যে প্রতি ৬ সেকেন্ডে এক বার করে চোখের পাতা পড়ার হিসেবে একজন মানুষ মোট পঁচিশ কোটি বার কাঁদে। 'কান্না-হাসি' এই শব্দ যুগলই বলে দিচ্ছে যে—এ-দুয়ের মাঝখানে রয়েছে সরু একটু সুতোর ব্যবধান। এদিক টানলেই হাসি, ওধার টানলেই কান্না। তবুও এত নৈকট্য সত্ত্বেও আমরা কতবার হাসি—এর কোনো হিসেব যদ্দূর জানি, কোনো বিজ্ঞানী দিতে পারেননি। কারণ হাসির উৎস তো কোনো গ্ল্যান্ড নয়, ওটা অনেকটা মনস্তাত্ত্বিক মনের খেলা। তাই হাসির মধ্যে একটা সৃজনশীলতা আছে।

এই হাসিটা, এটা কিন্তু মানুষের দুর্লভ ক্ষমতা। বলতে চাইছি এটা পুরোপুরি একটা মানবিক ব্যাপার। মনুষ্যেতর কোনো প্রাণীর হাসি আছে কি না, হাসি পায় কি না, তা ঠিক জানা যায়নি। তবে অবশ্য সম্বুদ্ধের সেই গণ্ডারের কথা আলাদা। জানেন তো সেই গল্পটা, সেই যে দাড়ির খোঁচাতে গণ্ডারের গলার নরম অংশে সুড়সুড়ি লাগায় গণ্ডারটা তার শিকার ধরার পবিত্র কর্তব্য ভুলে হাসতে হাসতে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু থাক সে-কথা, সে তো অন্য প্রসঙ্গ ; আমরা বরং আমাদের হাসির কথাতেই আসি। যা বলছিলাম, এটা আমাদের একচেটিয়া ব্যাপার। তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু আমরা হাসি কেন? এ নিয়ে কিন্তু অনেক পণ্ডিতের অনেক মত। তবে বার্গসঁ মনে করেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাসির উৎস, মানুষের জীবনের অসংগতি। আমাদের রবীন্দ্রনাথও অনেকটা এই ধারণাই পোষণ করেন। মানুষের পক্ষে যা স্বাভাবিক, তা না ঘটে মানুষ যদি অসংগত কিছু করে বসে, তবেই আমরা হেসে ফেলি। আবার এই হেসে-ফেলা ব্যাপারটারও একটা মজা আছে। ব্যের্গসঁ মনে করেন, এটা একটি সামাজিক ব্যাপার। কেননা আমাদের হাসিটা প্রায়ই দেখা যাবে, ওটা শুধু একলার ব্যাপার নয়, সবাইকে মিলিয়ে নিয়েই আমরা হাসি। মনস্তাত্ত্বিকেরা নাকি লক্ষ করেছেন, একা একজন কোনো একটা হাসির ছবি দেখলে যতটা হাসবেন, ঘর-ভরতি লোকের সঙ্গে মিলে সেই ছবিটা দেখলে তিনি আরও বেশি হাসবেন। আসলে 'হাসি' ব্যাপারটা কিছুটা সংক্রামক তো বটেই।

আচ্ছা, এই যে হাসি নিয়ে এত সাতকাহন বলছি, বলতে পারেন সেই হাসিটা দিয়ে কোন মহাকাজটা আমাদের উদ্ধার হয়? বিজ্ঞানীরা বলেন, সত্যিই তাই, হাসি খুবই জরুরি ব্যাপার। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু বাড়তি শক্তি থাকে, হাসিতে সেই শক্তির প্রকাশ ঘটে, আর তাতে

ফুসফুসটা উপকৃত হয়। বিজ্ঞানীরা মানুষের জীবনে আরও দুটো বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন—টেনশন এবং ইলাস্টিসিটি। টেনশন তো জানেন সবাই উত্তেজনা, আর ইলাস্টিসিটি কথাটার অর্থ, একটু হালকা করে বলি, খেলিয়ে নেবার ক্ষমতা। মানুষের দেহে যদি এ দুটোর অভাব হয়, তবে নাকি নানারকম অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হাসি ওই অসুস্থতা নিবারক। ওই টেনশনকে বাড়তি শক্তিতে সে হালকা হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয়।

একটা জিনিস লক্ষ করেছেন কি? আজকাল আমরা, যাকে বলে দিল খুলে হাসা, তা ঠিক হাসতে পারি না। কী করেই বা পারব? চারিদিকে সব ইয়া ইয়া গুরুগম্ভীর সমস্যা মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। এরমধ্যে হাসি পায়? আর মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কেমন যেন একটা শৈথিল্য এসেছে। বিশেষ করে আর্থিক কারণে মানুষ আজকাল অনেকটা একা একা হয়ে পড়েছে। আর তাই আমাদের সাহিত্যে বলুন, সিনেমায় বলুন, নাটকে বলুন, কোথাও কিন্তু হাসির দেখা তেমন একটা মিলছে না। অন্যদিক থেকেও সমাজবিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে ভাবতে পারেন। যেদিন থেকে মানুষ হাসতে পারছে না, কম হাসছে, একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেই সময় থেকে সমাজজীবনে মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুনখারাপি, প্রভৃতি অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাসি নেই। মানুষের সুস্থতাও তাই কমে যাচ্ছে। যদি তাই হয়, তবে মানুষকে সুস্থ করে তুলতে হলে আবার দরকার হাসার। এই ভাবনা থেকেই হয়তো মাদ্রাজে সম্প্রতি একটা ক্লাব খোলা হয়েছে যার নাম হল হিউমার ক্লাব। সেই ক্লাবের সদস্যরা প্রতি মাসের চতুর্থ রবিবার নিজেদের মধ্যে হাসির কথা বলবেন, হাসির কথা শুনবেন, আর হেসে হেসে জীবনের প্রাত্যহিক গ্লানি থেকে, দৈন্য থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করবেন। তাই বলছিলাম, হাসুন, প্রাণভরে হাসুন, হা হা করে, হো হো করে, হি হি করে, কিংবা ফিক করে, যেমন করে খুশি হাসুন। একজন উর্দু কবিও বলেছেন,

দিন্ গুজরে উম্র কে ইনসান হাসতে বোলতে।
জাঁ ভি নিকলে তো মেরি জাঁ হাসতে বোলতে॥

জীবনটাকে হেসে খেলে কাটিয়ে দেওয়াই ভালো, সকলের হাসিমুখ যেদিন আর দেখতে পাব না, সেদিন যেন আমার হাসিমুখটি সবাই দেখতে পায়।

১.৪.১৯৭৯

১২

এই কলকাতাটাকে নিয়ে আর পারি না—কখন যে কোন মুর্তি ধারণ করবে। এতদিন হয়ে গেল তবুও বোঝা গেল না। এই কালকের কথাই ধরুন না, সারাদিন মেঘে মেঘে মুখ কালো—বিকেলে ঝড়বৃষ্টি—একেবারে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। সন্ধ্যায় আকাশ গুরুগুরু, বাতাস হিমহিম। কিন্তু রাত্রে? তা তখন ১১টা সাড়ে ১১টা হবে। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি, অমনি খোলা জানালা দিয়ে একরাশ জ্যোৎস্না গায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। হঠাৎ মনে হল, কলকাতাটা কলকাতা নেই, এটা কালিদাসের দেখা উজ্জয়িনী কিংবা সুপ্রাচীন ভারতের আর কোনো শহরও হতে পারে। আসলে ভাবনাটা কিন্তু কলকাতাকে নিয়ে নয়—ওই চাঁদটাকে ঘিরেই। কেমন যেন অলৌকিক লাগছিল। চাঁদ তো আকাশে অনেক বার তার দেখনদার হাসি ছড়িয়েছে—ভবিষ্যতে আরও ছড়াবে। তবু কালকের চাঁদ, যা আজ আর কিছুক্ষণ পরেই পূর্ণতা লাভ করবে—তা কেমন যেন নতুন নতুন লাগছিল। কারণ খুঁজতে গিয়ে বুদ্ধ-পূর্ণিমা—কথাটা মনে হল। জানেন তো, চাঁদ-টাঁদ দেখলে মনটা মাঝে মাঝে আলগা হয়ে পড়ে। আর সেইসব আলগা মুহূর্তে এমন কিছু কিছু কথা মনে আসে বা বলা যায় যা অন্যসময় বলা অসম্ভব। আর বোধ হয় তাই ওই চাঁদটাকে লক্ষ করে বলে ফেললুম 'দেখ হে বাপু, আমি সেই আশৈশব শুনে-আসা হিন্দু, কিন্তু তোমার ওই মায়ায় আজ বৌদ্ধ ধর্মের ছোঁয়া। কাজেই তোমার রূপে আজ আর আমি ভুলছি না।' সাম্প্রদায়িক যুক্তিটাকে তারিফ করতে করতে চোখ বুজলুম। কিন্তু চাঁদের আলো কি শরীরে খোঁচা দেয়? ঠিক বলতে পারব না। তবে একটু পরে কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে চোখ খুলতেই দেখি বিধর্মী চাঁদটা আগের মতোই আমার গা জড়িয়ে। সাম্প্রদায়িক যুক্তিটা ওকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। মনে মনে ভাবলুম, জানলাটা বন্ধ করে দিই, তার পর ভাবলুম থাকগে, কী দরকার! আমার তো আর জাত যাবে না। হয়তো আমাকে ছুঁয়ে ওর জাতটাই মারা পড়বে। দেমাকি চাঁদটা আমার ভাবনাটাকে গ্রাহ্য না করে কিছু না বলে আগের মতোই হাসতে লাগল।

চাঁদের বুকে মানুষের পা পড়েছে, কল্পনার মুখেও লাগাম। তবু ওই চাঁদটাকে দেখতে দেখতে যার দ্যুতিতে ওর দ্যুতি, অন্তত আজ তার কথা মনে পড়তে লাগল। কত রাজাই তো দেখেছে এই ভারতবর্ষ। কিন্তু এমন

রাজা আর কে কবে দেখেছে? রাজারাজড়াদের যা থাকে, যা পাবার জন্য রাজারাজড়ায় লড়াই বাঁধে তার সবই ছিল তার। কিন্তু সে-সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তপস্যায় বসলেন তিনি। যাঁর জন্মদিনের গন্ধ আজ চাঁদের গায়ে। কিন্তু কেন এই তপস্যা? ব্রহ্মাস্ত্র চাইতে? শতঘ্নী বাণ চাইতে? না। তিনি তেমন কিছু চাইলেন না, শুধু চাইলেন মুক্তি—তা-ও নিজের জন্য নয়, তাঁর তপস্যা—'সকল মানুষের দুঃখ মোচনের সংকল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ, কেউ ছিল কি অনার্য? তিনি তাঁর সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম, মূর্খতম মানুষের জন্যেও। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা।' মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে যে-মানুষ নিজেকে অশ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল সেই মানুষটাকে তিনি ফিরিয়ে দিলেন তাঁর শ্রদ্ধাবোধ। বললেন, "সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে।" তাহলে তাঁর সাধনা ছিল আমারই জন্যে। বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তার পটভূমিতে কৃতজ্ঞতাবোধটা রূপ নিল প্রার্থনার—

ভগবান বুদ্ধ তুমি
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রেই তব জন্মভূমি।
ভরসা হারালো যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস,
তোমারই করুণাবিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ,
আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি। আর যারা
ক্ষীণের নির্ভর ধ্বংস করে, রচে দুর্ভাগ্যের কারা
দুর্বলের মুক্তি রুধি, বসো তাহাদেরই দুর্গদ্বারে
তপের আসন পাতি, প্রমোদ বিহ্বল অহংকারে
পড়ুক সত্যের দৃষ্টি; তাদের নিঃসীম অসম্মান
তব পুণ্য আলোকেতে লভুক নিঃশেষ অবসান।

চাঁদটা তখনও আমার দেহকে স্পর্শ করে রয়েছে। আর আমার দেহটাকে মনে হচ্ছে, অশ্রদ্ধা, অসম্মান, ভেদবুদ্ধির শবদেহ। বুদ্ধ-পূর্ণিমার এ-এক আশ্চর্য শবসাধনা।

১২.৫.১৯৭৬

১৩

সময়টা কেমন গোলমেলে। মেজাজটা বুঝে ওঠা ভার। মিলতে চায় না কোনো হিসেবই। কথা আর কাজ, সাধ আর সাধ্য, স্বপ্ন আর বাস্তব—প্রত্যেকের মাঝখানে হাইফেনগুলো দীর্ঘ হতে হতে এমন একটা প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে যেখান থেকে এপার-ওপার দেখা যায় না। আর তাতেই কি না জানি না, প্রত্যেকেরই মন কেমন যেন সুরে বাজে না।

এই ক-দিন আগে আসছিলাম অফিসে। পথে অনেক মানুষের ভিড়। সবাই কাছাকাছি, প্রায় লাগালাগিও। তবুও কাউকে দেখছি, কাউকে দেখেও দেখছি না। আবার কাউকে একেবারেই দেখছি না। দৃষ্টিটা একটা ছোট্ট সীমায় ঘুরপাক খায়। হঠাৎ সামনে পড়লেন এক বন্ধু। চোখ পড়তেই হেসে প্রশ্ন করলেন—এই যে! কেমন আছেন। উত্তরে 'এই চলছে কোনোরকম' বলতে গিয়েই দেখি প্রশ্নকর্তা কিছুটা এগিয়ে গেছেন। আমার পাও থমকে থাকেনি। দায়সারা ওই সংলাপ আঁচড় কাটল ভাবনার বুকে। কী দরকার ছিল বন্ধুটির ওই প্রশ্নের, আমার ওই 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি'-উত্তরের। কারোই তো সময় নেই দাঁড়াবার। ভাবনাটাকে চায়ের পেয়ালায় চিনি নাড়ার মতো নাড়তে চাড়তে গিয়ে হঠাৎ মনে হল—আমরা বুঝি মরে গেছি। প্রত্যাশার অভাব—তাই তো মৃত্যু—হৃদয়ের মৃত্যু—সমবেদনার মৃত্যু—ভালোবাসার মৃত্যু।

কেন জানি মনে হয় ওই 'হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যাওয়া মৃত্যু'র চেয়ে এই মৃত্যু আরও সাংঘাতিক। প্রথম মৃত্যুটা তো নিজের। কিন্তু নিহত হৃদয়ের হাতে শিকার হয় আর পাঁচজন। অথচ মানুষ হিসেবে আমাদের বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্তই হল, মানুষের জন্য এবং মানুষের মধ্যে বাঁচা। সেই কোন আদ্যিকালে কারা যেন বলতেন, আমরা এক থেকেই বহু হয়েছি—তাই খণ্ডাংশের মধ্যে রয়েছে 'এক' হবার আকুতি। আর ওই আকুতিটারই বাস্তব প্রকাশ নাকি মানুষের সমাজ জীবন। সমাজ তো তাই—যেখানে সবাই সমানভাবে মিলবে। ব্যাপারটা কিন্তু তা ঘটল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরই কেউ কেউ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে যারা পিছিয়ে পড়ে রইল তাদের দিকে না তাকানোয় সমাজে বৈষম্যের সৃষ্টি হল। অসুস্থতা দেখা দিল। আর এই বৈষম্যময় সমাজেরই বড়ো অসুখ সহানুভূতি ও সমবেদনার অবক্ষয়। সেই যে জীবনানন্দ লিখেছিলেন:

যদিও পথ আছে, তবু কোলাহলে শূন্য আলিঙ্গনে
নায়ক, সাধক, রাষ্ট্র, সমাজ, ক্লান্ত হয়ে পড়ে
প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মত
কি এক বিরাট অবক্ষয়ের মানব সাগরে।

সব আছে। হাত-পা-চোখ-কান-মুখ। শুধু হৃদয়টিই খোয়া গেছে। আর ওই হৃদয়ের 'না থাকা'র মানে—যে-সাড়ার জন্য মানুষের এতো কান্না, সেই সাড়াই না-জাগা।

ঘুমায়ে রয়েছ তুমি ক্লান্ত হয়ে তাই,
আজ এই জ্যোৎস্নায় কাহারে জানাই
আমার এ বিস্ময় বিস্ময়ের ঠাঁই
নক্ষত্রের থেকে এলো? তুমি জেগে নাই।

সেই যে সে প্রেম—যাকে নিয়ে আমরা এত খেলি, হাসি, কাঁদি, ঘর সাজাই, মহল বানাই—তাও কি চিরদিন থাকে? কখনো কি ক্ষয়ে যায় না? কখনো কি মনে হয় না—'পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে।'—তারও আত্মসমর্পণ আছে, শেষ আছে।

একদিন এক রাত ক'রেছি প্রেমের সাথে খেলা
এক রাত এক দিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা,
সবাই চলিয়া যায়—সকলের যেতে হয় বলে
তাহারো ফুরালো রাত তাড়াতাড়ি পড়ে গেল বেলা
প্রেমেরও যে।

তাহলে কি সবটাই হতাশা? বাঁচা মানে কি নিজেরই শবদেহ বয়ে নিয়ে বেড়ানো? বোধ হয় না।

আরো এক আলো আছে, দেহে তার বিকেল বেলার ধূসরতা,
চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির।

ওই স্থির আলোই আমাদের কাঙ্ক্ষিত। আজকাল তো আমরা কত কিছু শিখছি, কত কিছু জানছি। কিন্তু প্রায়ই দেখছি সেই শেখায় শেখায়, জানায় জানায় বিরোধ বাঁধছে, সংঘর্ষ ঘটছে। আমরা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি, টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছি। অথচ যাকে আমরা জ্ঞান বলি, তা কিন্তু খণ্ডিত নয়, বিচ্ছিন্ন নয়! বরং বলব, তার মূল সুরটি মিলিয়ে নেওয়ার, সমন্বয়ের। এই সমন্বয়ের সুরটি হয়তো আজ আমরা শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু একদিন পাব। আর ওই পাওয়ার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে এক নূতন মূল্যবোধ।

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন—
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে? অনেক ঘুমের ঘোরে
ভরিবে কি মন সেদিন তোমার!
তোমার আকাশ—আলো জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল?
আমার বুকের 'পরে, সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল
তুমি কি চেয়েছিলে শুধু তাই! শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে!
আমি চলে যাব,—তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেই দিন, পৃথিবীর 'পরে ;—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!

তাহলে তো আশ্রয় আছে! আশ্রয় থাকা মানেই তো ভালোবাসা থাকা, হৃদয়ের বেঁচে থাকা। যাকে যেমনভাবে জানি, যাকে যেমনভাবে চিনি—তাকে ঠিক জানি, ঠিক চিনি, ঠিক বুঝি—এমন একটা বিশ্বাস যদি আমরা সবাই পেয়ে যাই, তবে আমরা সবাই বেঁচে যাব। দেবেন কেউ—সেই বিশ্বাস ফিরিয়ে—যেখানে 'ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়ীটার ভাঙা দরজাটা' মিলে যায়, সহাবস্থান ঘটে।

১৯.৩.১৯৮০

১৪

মহাযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ। কোনো আশা নেই, ভরসা নেই, নেই বিশ্বাস। এতদিন ধরে সযত্নে লালিত মূল্যবোধগুলো খোলামকুচির মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে—একমাত্র সত্য শুধু ভয় আর ঘৃণা। এই যে অদ্ভুত সময়—মানুষের হৃদয় যখন শিয়াল-কুকুরের খাদ্য, সেই সময়ে প্রকাশ ঘটল জাঁ পল সার্ত্র্-এর—সেই সার্ত্র্-এর, যিনি নিজের অস্তিত্বের বাইরে আর কিছু দেখতে পেলেন না। বললেন,—কবচকুণ্ডলহীন কর্ণের কথা। তাঁর উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে ফুটে উঠল সেই অন্য-নিরপেক্ষ মানুষের কথা, যে বলে : "I exist, that is all, and I find it sickening"—আমি আছি, আর এই থাকাটা তো সুস্থ নয়। এই তো তাঁর কালের মানুষের সংজ্ঞা। ব্যাখ্যা চাই?

সার্ত্র্ বললেন, Man can count on no one but himself.—মানুষ নিজের উপর ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর করতে পারে না, সে নিঃসঙ্গ, এই দুনিয়ায় সে পরিত্যক্ত, নিজের জন্য সে যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছে তা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য নেই তার। নিজের জন্য যে ভাগ্য সে তৈরি করেছে তা ছাড়া আর কোনো নিয়তিও নেই তার। ঈশ্বর বেপাত্তা। তার নামে যেসব নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে চৌচির। একের অস্তিত্ব শুধু অন্যের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে। এই হল আধুনিক মানুষ। অসহায়, নৈরাশ্য পীড়িত, বর্মহীন।

সার্ত্র্-র এই দর্শন গোটা পৃথিবীকে চমকে দিল, প্রভাবিত করল। লিখতে লাগলেন একের পর এক প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প আর নাটক। আর সবকিছুরই কেন্দ্রবিন্দুতে সেই সর্বরিক্ত মানুষ। 'Nausea'-য় দেখা মিলল আতঙ্ক ও ত্রুটিবিচ্যুতিতে ভরা এই আধুনিক দুনিয়া, 'রোড টু ফ্রিডম'-এ দেখলাম নৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত রূপ, 'দ্য আনবোরিড ডেড' নাটকে নাৎসি অত্যাচারে জর্জরিত মানুষের যন্ত্রণা, 'দ্য রেসপেকটফুল প্রস্টিটিউট'-এ মানুষের এক গোষ্ঠীর উপর আরেক গোষ্ঠীর আধিপত্য, মার্কিন বর্ণবৈষম্যবাদ—এমনি করে একের পর এক তাঁর লেখায় এই ফাঁপা দুনিয়ার এক একটা দিক নির্মমভাবে ফুটে উঠতে লাগল।

কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হলেন। কেউ কেউ তাঁর সাহিত্যে অশ্লীলতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তাঁর দর্শনকে বর্ণনা করা হল 'নীতিজ্ঞানহীন' বলে। ১৯৪৮ সালে ভ্যাটিক্যানের নিষিদ্ধ গ্রন্থের তালিকায় তাঁর বইগুলোকে ঠাঁই দেওয়া হল।

কিন্তু থামলেন না সার্ত্র্। ছোটোখাটো, টাকওয়ালা, বিবর্ণ, চশমা-পরা জাঁ পল সার্ত্র্, যাঁর আত্মজীবনীর প্রথম অধ্যায়ের নাম 'ওয়ার্ডস', সেই সার্ত্র্ থামলেন না। লিখলেন, লিখতেই থাকলেন। বললেন, 'what else can I do?' আর কিছুই তো করবার নেই, তাই লেখা। অথচ একদিন—'For a long while I treated my pen as a sword'-অনেকদিন আমি আমার কলমকে তরবারি ভেবেছি ; কিন্তু—'Now I realise how helpless we are'-এখন বুঝতে পারছি আমরা কত অসহায়। তাতে কিছু যায় আসে না—'I am writing. I shall write books' -আমি লিখছি, আমি লিখব। লিখলেন। সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়তে লড়তেই লিখলেন।

বিচিত্র জীবন এই মানুষটার। জন্মেছিলেন ১৯০৫-এর ৫ জুন। প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু ভস্মাবশেষে পা রেখেছিলেন। দর্শন পড়াতেন একসময়। জার্মানিতে ছিলেনও কিছুদিন। সেই সময়ে পরিচয় হুর্সেল এবং হাইডেগারের সঙ্গে। ১৯৩৫-এ নাৎসি-ইজম্-এর অভ্যুত্থান ঘটল—মেনে নিতে পারলেন না তিনি। ফিরে এলেন প্যারিসে। লিখলেন—'ইমাজিনেশন, দ্য ওয়াল'। '৩৯-এ জার্মানদের বন্দি শিবিরে কাটাতে হল ন-মাস। সঙ্গী বন্দিদের মনোবল তেজি রাখতে নাটক লিখলেন। '৪১এ মুক্তি পেয়ে প্যারিসে ফিরে এসে যোগ দিলেন প্রতিরোধ আন্দোলনে।

'৪৩-এ বের হল 'বিইইং অ্যান্ড নন বিইইং'। রাজনীতিতে বামমার্গী ছিলেন সব সময়েই, কিন্তু বাঁধা পড়েননি কোন তত্ত্বের শিকলে—ওই অস্তিত্বের তত্ত্ব ছাড়া। গল্প-উপন্যাস-নাটক ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। লিখেছেন বোদলেয়রকে নিয়ে, এবং বড়ো রচনায় হাত দিয়েছিলেন ফ্লবেয়ারকে নিয়ে। শেষ করতে পারেননি। সার্ত্র্ চেয়েছিলেন মানুষকে নির্যাতন ও বৈষম্য থেকে মুক্তির পথ দেখাতে। কিন্তু যাঁদের জন্য এই পথ দেখানো, তাঁরা তাঁকে সমসময়ই ঠিক বুঝেছেন একথা বলা যাবে না। ১৯৬৪ সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—ওই পুরস্কার গ্রহণ করলে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়াদের স্বীকৃতি দেওয়া হবে ভেবে। অথচ তার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল যাদের তিনি এড়িয়ে যেতেন সেই মধ্যবর্তী শ্রেণির উপর। তাঁর অর্ধশতাব্দীর সঙ্গী নাট্যকার সাইমন দ্য বভোয়ার বলেছিলেন—সার্ত্র্-র সবকিছু ছিল সাধাবণ মানুষের জন্য অথচ সাধারণ মানুষই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে।

যে চোখদুটো দিয়ে সার্ত্র্ এই দুনিয়াকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন, এবং প্রবঞ্চনা, ভান ও শোষণকে উন্মোচিত করেছেন, শেষ বয়সে সেই চোখ দু-টিই গেল প্রায় অন্ধ হয়ে। আশৈশব শব্দকেই ব্রহ্ম বলে জানতেন যিনি, ১৯৭৫ সালে এক সাক্ষাৎকারে বললেন "আমি লাইনগুলো এবং এক শব্দ থেকে আর এক শব্দের মাঝখানে যে-ফাঁক সেগুলো দেখতে পাই, কিন্তু শব্দগুলোকে আলাদা করে চিনতে পারিনে। আমি আর পড়তেও পারছিনে, লিখতেও পারছিনে,—এ নিয়ে আমার তো কিছু করবার নেই। সুতরাং দুঃখিত হওয়ারও কোনো কারণ নেই। আমি যা আমি শুধু তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারি। চেষ্টা করতে পারি নিজের সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবায়িত করতে।"

সার্ত্র্ শেষ দিন পর্যন্তই ছিলেন অস্তিত্ববাদী। তাঁকে কেউ প্রশংসা করেছেন, কেউ নিন্দা করেছেন, কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারেননি যে, তাঁর ও তাঁর পরের কালের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। মঙ্গলবার সার্ত্র্ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর শূন্যতা ফরাসি সাহিত্যের কূল ছাপিয়ে গেছে।

১৬.৪.১৯৮০

১৫

এক বার দু-বার নয়, অনেক বারই গেছি, অনেক বারই দেখেছি। দেখেছি গ্রীষ্মে, দেখেছি শরতে, এবং সেই শীতেও—যখন সে বর্জনীয়া, উপেক্ষিতা। কিন্তু বর্ষায় দেখা এই প্রথম। আর সে-দেখাও ওই ভরা শ্রাবণের মেঘের মতো, গোটা মন-জোড়া।

কী হবে গিয়ে? স্যাঁতসেতে বর্ষায় তো ঘরবন্দি বিরক্তি—এমনিতর সব ভাবনা স্তব্ধ হয়ে, পরিশোধিত হয়ে, জমে জমে কালিম্পংয়ে মেঘ হয়, পাহাড় হয়, প্রপাত হয়, ফুল হয়, নাম-না-জানা পাখির ডাক হয়। একটু-দূরে আকাশ-উজানে গাড়ি হাঁকিয়ে যদি মানসাং-এ পৌঁছোনো যায়, তবে তো কথাই নেই, মন মেঘের সঙ্গী হয়ে ডানা মেলে দেয় ভেজা আকাশের বুকে। কিংবা ডেলরে মাথা ভিজোনো পাহাড়শৃঙ্গের একেবারে কানায় দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকলেই অতল গহ্বরে পড়ে যাব—এমনতরো আশঙ্কাকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে, দুই পাহাড়ের ফাঁকে কোনো এক অদৃশ্য শিল্পীর মেঘ আর নীল রং নিয়ে ছবি আঁকা আর মোছার খেলা, দু-চোখ ভরে দেখতে দেখতে মনে হয়—এ তো কোনো শহর নয়, এ তো কোনো পাহাড় নয়, এ এক অদেখা অজানা শিল্পীর বিস্তীর্ণ ক্যানভাস-ছড়ানো স্টুডিয়ো-চত্বর। আর সেই চত্বরে অনেকের ভিড়েও একটু একলা হলে, আগে এক শিল্পীর কথা মনে পড়ে যায়। প্রায় বছর চল্লিশ আগে, শারীরিক জীর্ণতার পটভূমিতেও সৃষ্টির প্রথম বিস্ময় চোখে নিয়ে যে-কথাগুলো সেই শিল্পী মৃদুমন্দ স্বরে উচ্চারণ করেছিলেন, আজও তা ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের গায়ে শির শির করে নেমে-আসা ঝরনার তলে, মেঘের খেলায়, ফুলের ভাষায় কান পাতলে শোনা যায়, সেই কথাগুলোই গুনগুনিয়ে উঠেছে—

মাঝখানে আমি আছি
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে
নিঃশব্দ করতালি।
আমার আনন্দে আজ—
একাকার ধ্বনি আর রঙ
জানে তা কি, এ কালিম্পং।

খুশি, খুশি খুশি। সবতাতেই খুশি। ওই যে মেঘের পর্দা সরিয়ে, সূর্য মুখ বাড়িয়ে পাহাড়ে সোনা-রং ছড়ালো, তাতেও ওই খুশি। ওই যে অরণ্য নিশ্চল সবুজ বন্যা হয়ে সর্বপ্লাবী হোল, তাতেও ওই খুশি। ওই যে মেঘগুলো পরম কৌতুকে নিজেদের বার বার ভাঙল-গড়ল, জল ছাড়ল কিংবা কিছুই না করে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল জানালায় টপকিয়ে তাও ওই খুশির প্রকাশ। কিংবা নির্জন নিরাসক্ত পাহাড়চুড়োয় একাকিত্বের গভীরে অশ্রুত বাণীর আনাগোনা, কিংবা গিরিশির থেকে পাগলা ঘোড়ার সওয়ার হয়ে শ্রাবণের দূতের ছুটে আসা, বা ওই যে ফুলগুলোর বিচিত্র বর্ণোল্লাসে ফেটে ফেটে পড়া, তাতেও তো ওই খুশি। বাধ্যবাধ্যকতাহীন খুশি। শুধু ভালো লাগা—ভালোবাসায় জেগে ওঠা। সেখানে চাওয়া নেই, প্রত্যাশা নেই, আছে শুধু পাওয়া। অজস্র অকৃপণ পাওয়া। এই তো সেই পটভূমি—যেখানে আনন্দ থেকে সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, সমস্ত কিছুই ওই আনন্দেরই অভিসারী। এই সেই পটভূমি, যেখানে ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।' এই সেই পটভূমি যেখানে সমস্ত সংকীর্ণ চিন্তা শুভ্র হিম রেখাঙ্কিত মহানিরুদ্দেশে ভেসে গিয়ে সবাইকে ডাক দিয়ে বলে : 'তোমরা সবাই শোনো! তোমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ।'

চেতনার এই যে বাণীরূপ এ কোন মুনি-ঋষির জানি না। শুধু জানি, যেই হোন তিনি, তিনি একজন জাত আর্টিস্ট বা শিল্পী। দেশ-কাল-সময়ের সীমা-পেরোনো শিল্পী। আর সেই শিল্পীর সান্নিধ্যে আমরা যারা প্রতি মুহূর্তে সময়ের কাছে, স্বার্থের কাছে বিক্রীত, তারাও কেমন যেন শিল্পী হয়ে যাই। যে-কথাগুলো সবসময়ে ভাবি, যে-ভাবনাগুলো সবসময়ে আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়, সেগুলো কেমন যেন হারিয়ে যায়। অন্য ভাবনা, অনেক বড়ো ভাবনা মনের মধ্যে কেমন যেন ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠতে থাকে। পোশাক-পরিচ্ছদে লাগে। দেহের পেশিতে পেশিতে অমিত শক্তির

নাচন লাগে। ওই যে, রাস্তাগুলো পাহাড়ের চড়াই-উতরাইয়ের গলাগলি ধরে ঝরনার জলের ছন্দ পায়ে মেখে এ-পাহাড় সে-পাহাড় ডিঙিয়েছে, যে রাস্তাগুলো দিয়ে চলতে চলতে তাকালে, হঠাৎ আকাশকে নদী বলে, নদীকে আকাশ বলে মনে হয়, সেই রাস্তাগুলো যা পাহাড় আর সমতলকে একই সুতোয় গেঁথে রেখেছে, সেই রাস্তাগুলো যারা তৈরি করেছে, শিল্পী—শিল্পী ছাড়া আর কী-ই বা তাদের বলা যায়। আর তাই, কেন যেন মনে হয়, গ্রীষ্মেই হোক, শরতে হোক, শীতে এমনকী এই বর্ষাতেও হিমালয় সেই বিচিত্র শিল্পকর্ম —যা মানবিক শিল্পকর্মের অফুরান উৎস। আর এই উৎসে দাঁড়িয়ে কেন যেন উচ্চারণ করতে ইচ্ছে করে চিরকালীন ভারতবর্ষের সেই প্রার্থনা: 'দাও, দাও আমাকে তোমার ধুলার মধ্যে, তৃণের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। দাও আমাকে রিক্ত করে, কাঙাল করে, তারপর দাও আমাকে রসে ভরে। চাই না ধন, চাই না মান, চাই না কারো চেয়ে কিছুমাত্র বড়ো হতে। তোমার যে-রস হাট-বাজারে কেনবার নয়, যা আপনার অন্তহীন প্রাচুর্যে আপনাকে আর ধরে রাখতে পারছে না, চারিদিকে ছড়াছড়ি যাচ্ছে, তোমার যে-রসে মাটির উপর ঘাস সবুজ হয়ে আছে, বনের মধ্যে ফুল সুন্দর হয়ে আছে, যে-রসে সকল দুঃখ, সকল বিরোধ, সকল কাড়াকাড়ির মধ্যে আজও মানুষের ঘরে ঘরে ভালোবাসার অজস্র অমৃত ধারা কিছুতেই শুকিয়ে যাচ্ছে না, ফুরিয়ে যাচ্ছে না, মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হয়ে উঠে, পিতা-মাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে, পুত্রে-কন্যায়, বন্ধু-বান্ধবে, নানা দিকে, নানা শাখায় বয়ে যাচ্ছে, সেই তোমার নিখিল রসের নিবিড় সমষ্টিরূপ যে অমৃতে; তারই একটু কণা আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একবার ছুঁইয়ে দাও।'

২০.৬.১৯৮০

১৬

কথা, কথা আর কথা। এদেশে অনেক কিছুর অভাব, অভাব নেই শুধু কথার। যেখানেই কান রাখবেন, শুনবেন শুধু ওই কথা, কথা আর কথা। বৈশাখী সব ঋণ শোধবার শ্রাবণের অক্লান্ত বর্ষণের মতো কথা, এবং কথা। যদিও কেউ কথা রাখে না, যদিও অধিকাংশ কথার অর্থ বহন করবার দায় কেউ নিতে চায় না, তবুও কথা, কথা আর কথা। নিশ্ছিদ্র সেই কথা। কোথাও

এতটুকু ফাঁক নেই, এতটুকু স্তব্ধতা নেই। সেই যে এক ভদ্রলোক সেলুনে গিয়েছিলেন। ক্ষৌরকারের কাছে মাথাটা সঁপে দেবার আগে বললেন—'দ্যাখো! চুল কাটবে কিন্তু কথা বলবে না।' কিন্তু কে কার কথা শোনে! একটু চুপচাপ থাকবার পর সেই ক্ষৌরকাব তার অদৃশ্য শ্রোতাকে লক্ষ্য করে কথা বলতে শুরু করল। ভদ্রলোক চটে গিয়ে নালিশ করলেন সেলুনের মালিকের কাছে। বিদগ্ধ মালিকটি জবাব দিলেন—'ভারতের সংবিধান অনেক কথার ভারই বহন করতে পারে।' ভদ্রলোক জবাবে বললেন, "আমার সংবিধান পারে না।" আসলে প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না-বলা মুহূর্তের দরকার। আর এই মুহূর্তটুকু পাওয়া। উঃ! সে কী কঠিন।

বাইবেল সাক্ষী, ঈশ্বর প্রথম যে-মানুষটাকে সৃষ্টি করেছিলেন তিনি একজন পুরুষ। দিব্যি ছিলেন এই পুরুষটি। ইডেনে—স্বর্গোদ্যানে মজাসে ঘুম লাগাতেন। ঈশ্বরেরও সুনিদ্রার অভাব ঘটেনি কোনোদিন। হঠাৎ কী খেয়াল হলো ঈশ্বরের, ওই নিদ্রিত পুরুষের বুকের পাঁজরার হাড় থেকে তৈরি করলেন একজন নারীকে। ব্যস! হয়ে গেল। নিদ্রা চুকল ওই পুরুষটির, সেইসঙ্গে ঈশ্বরেরও।

আমাদের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি দার্শনিক পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণান একবার বলেছিলেন—'ঈশ্বর খুব সুন্দর করে গড়েছিলেন মেয়েদের। কিন্তু ওদের কথা বলবার ক্ষমতা দিয়েই সব মাটি করেছেন।' লোকে বলে পুরুষেরা একটি কথা বললে, মেয়েরা নাকি দশটা কথা বলে। 'বসনা' শব্দটা গ্রিক, ল্যাটিন, জাপান, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ এবং সংস্কৃতে শুনেছি স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু না! এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশিদূর এগোনো ভালো না, বাড়ি ফিরবার দায় রয়েছে! তবে স্বীকার করতেই হবে যে, আজকাল শুধু মেয়েরা নয়, পুরুষেরাও সমানে কথা বলছে। আমরা সবাই এক-একটা কথার তুবড়ি। সবাই কথা বলছি। এত বেপরোয়া দুর্দান্তভাবে বলছি যে, কেউ শুনছে কি না বা শোনবার অপেক্ষায় কেউ আছে কি না তা-ও ভেবে দেখছি না। ফলে আমাদের চারপাশে কথার বুদ্‌বুদ্ উঠছে আর উঠছেই। 'চুপ-কথা'র সেই মুহূর্তগুলো, যা মানুষকে মহান করে, মানুষকে ভাবুক করে, সৃষ্টিশীল করে সেই মুহূর্তগুলো আমরা পাচ্ছি না। আর তাই কার্লাইল সাহেবকে নিস্তব্ধতার দর্শন আওড়াতে হয়েছে।

কিন্তু দর্শনের কথা থাক। আমরা কাজের কথা বলি। আর এই কাজের কথা মনে হতেই আর একটা কথা মনে পড়ছে। একটু লক্ষ করে দেখেছেন কি, আমরা যত বেশি কথা বলছি, কাজও তত কম করছি। কাজের সঙ্গে কথার কী যোগ আছে জানি না, তবে সেকেলে একটা প্রবাদ শুনেছি, কথা বেশি বললে না কি আয়ুক্ষয় হয়। ওই যে কার্লাইল সাহেবের কথা বলেছি, উনিও বলেছিলেন: 'একদিন চুপ করে থেকে দেখুন, পরের দিন আপনার চিন্তা-ভাবনা অনেক স্বচ্ছ হয়ে গেছে, কর্তব্য স্পষ্ট হয়েছে, কাজে উৎসাহ আসছে।' হলফ করে বলতে পারব না, হয়তো এই কারণেই মহাত্মা গান্ধি, আচার্য ভাবে—এঁরা মাঝে মাঝেই মৌন পালন করতেন। একটু অন্যভাবে বলতে পারি, কথার বাড়াবাড়ি কাজের ক্ষমতাকে খাটো করে, কাজের স্পৃহাকে কমিয়ে দেয়। সেই যে হ্যামলেট? 'To be or not to be' করতে করতেই তো তার জীবনটা শেষ হয়ে গেল।

বাস্তব জীবন থেকে দৃষ্টান্ত নেবার দরকার নেই, তাতে অনেকের চটবার আশঙ্কা থাকবে। আশ্রয় নিই সাহিত্যের। *শেষের কবিতা*'র কথা মনে আছে তো? লাবণ্যর ভালোবাসা পেয়েও তাকে যে বাঁধতে পারলেন না অমিত রায় সে তো তাঁর কথার তোড়েই। অথচ দেখুন শোভনলালকে। গোটা গ্রন্থে গোটা পাঁচেক সেনটেন্স আউড়ে নৈঃশব্দ্যের জালে ধরে ফেললেন লাবণ্যকে। লাবণ্য অমিতকে বলেছিলেন—'জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যারা উৎসবসভা সাজাবার হুকুম পেয়েছে কথা তাদের পক্ষে ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।' কথা মানুষের একটা বড়ো ক্ষমতা। কিন্তু একসেস অব কোয়ালিটি যেমন ট্রাজেডি-র কারণ হয়ে থাকে, অমিতের জীবনেও তাই ঘটেছে। বেচারা সুন্দর সুন্দর কথা খুঁজত, সুন্দর সুন্দর কথা বলত। আর তা থেকেই লাবণ্য বুঝে গেল—কথার মানুষ কাজের হয় না। আর তাইতেই অমিতকে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিতে হল মিলনতত্ত্বে নয়, মুক্তিতত্ত্বে।

কিন্তু অমিতের কথা থাক। কথার কথায় আসি। কথা মানুষ নিশ্চয়ই বলবে, কিন্তু মানুষের চুপ করে থাকাটাও দরকার। এইসব কারণেই স্পিনোজা একবার বলেছিলেন যে, মানুষের কথা বলা এবং কথা না বলার ক্ষমতার মধ্যে যদি একটা সামঞ্জস্য থাকত তবে পৃথিবীটা অনেক সুখের হত। কিয়েরকেগার্ড একবার বলেছিলেন, বর্তমান জীবন আর দুনিয়া দুই-ই অসুস্থ।

যদি আমি চিকিৎসক হতাম যদি আমার পরামর্শ চাওয়া হত তবে আমি নৈঃশব্দ্যের সৃষ্টি করতাম। মোট কথা হল, কথা বলা যেমন চাই, কথা না-বলাও তেমন চাই। ওই না-বলা মুহূর্তগুলো কাজের শক্তি জোগায়, কথাকেও সমৃদ্ধ করে। বেশি কথা বলে কথার শক্তি খাটো হচ্ছে, অস্পষ্টতা আসছে। বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হচ্ছে, ভাবনায় দৈন্য আসছে আর যেটুকু যা ভাবছি তা-ও অস্পষ্টতার জোয়ারে ভেসে গিয়ে কাজে প্রতিফলিত হতে পারছে না—বেশি কাজের জন্য কম কথা দরকার। লক্ষ করলে দেখা যাবে আজকের ট্র্যাজেডি, কথা মিলছে না কাজের সঙ্গে।

২২.৯.১৯৮০

১৭

যে-কালটাকে আমরা বলি রেনেসাঁস—নবজাগরণ, সেই কালটা আমাদের ভাবনার ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। এতদিন পর্যন্ত আমাদের ভাবনা ছিল ঈশ্বরকেন্দ্রিক। ওই নবজাগরণের কালে আমাদের ভাবনা হল মানবকেন্দ্রিক। ঈশ্বর যে একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেলেন তা ঠিক নয়, তবে ততদিনে জানাজানি হয়ে গেছে যে, বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তি জোরালো, আর জীবের মধ্য দিয়েই শিবকে পাওয়া সম্ভব। এ-ভাবনাকে একেবারে নতুন ভাবনা বলা যাবে না—ছিল, আমাদের দেশেই ছিল। কিন্তু মাঝখানে তা কুসংস্কার আর বিস্মৃতির পলিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ইংরেজরা আসবার পর, বিশেষ করে ওদের শিক্ষার সংস্পর্শে ওই ভাবনাটা আবার নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। তাই এ-কালটাকে বলা হয়েছে নবজাগরণের কাল। এই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগলক্ষণ, যাঁর মধ্যে—যাঁর কাজ ও ভাবনার মধ্যে সবচেয়ে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর যা কিছু করেছেন, যা কিছু ভেবেছেন তার প্রাণবিন্দু ওই একটাই—মানবভাবনা। শিক্ষার প্রসারের জন্য স্কুল স্থাপন, সংস্কৃত কলেজে সবাইয়ের প্রবেশাধিকারের স্বীকৃতি, মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন, পাঠ্যপুস্তক রচনা, পাঠ্য তালিকার পুনর্বিন্যাস—এসবের মূলে জ্ঞানের বিকেন্দ্রীকরণের স্পৃহাটাই ছিল বেশি। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞানই মানবিকতার স্ফুরণ ঘটাতে পারে। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ

রহিতকরণ, হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড স্থাপন—এ সব কিছুর মূলেও ওই মানুষেরই মঙ্গলকামনা। আর এই মঙ্গলকামনাতেই তিনি বাংলা গদ্যকে যেমন সত্যি সত্যি কাজের ও যোগাযোগের ভাষা হিসাবে গড়ে নিয়েছিলেন, তেমনি জীবনের শেষভাগে যাদের আমরা অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ বলি, সেই সাঁওতালদের মধ্যে তিনি কাল কাটিয়েছিলেন। এরও আগে, দুর্ভিক্ষের সময় আমরা দেখেছি, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই তাঁর সেবার অধিকারী হয়েছেন। মানুষকে ভালোবাসার এই ক্ষেত্রটিতে বিদ্যাসাগর কোনোদিন আপোশ করেননি। লড়েছেন সমস্ত রকমের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। আর তাই, তাঁর চরিত্রালোচনায় রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত—'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।'

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর বছর নব্বই অতিক্রান্ত হতে চলেছে। কিন্তু কেন যেন মনে হয়, তাঁর উত্তরাধিকারের দায় আমরা ঠিক বহন করতে পারছি না। বিশেষ করে, ওই মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রটিতে। আজ আমাদের চার পাশে তাকালেই আমরা দেখতে পাই এমন সব কিছু ঘটে চলেছে যা মানবিকতাবিরোধী। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, সমাজের এক শ্রেণির মানুষের উপর আর এক শ্রেণির মানুষের হামলা—এ সবই কিন্তু মানবিকতার আদর্শকে টুকরো টুকরো করেছে। যদি আমরা বিদ্যাসাগরের আদর্শকে আত্মস্থ করে এগিয়ে যেতে পারতাম তবে হয়তো এইসব বিভেদপ্রবণ শক্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারত না। আমরা বিদ্যাসাগরকে সকাল-সন্ধ্যা প্রণাম করি ; কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করি না।

বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষায় রাজ্য সরকার একটি পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন। এই সোমবার সেই পুরস্কার দেওয়া হল কথাসাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় ও শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদারকে। অন্নদাশঙ্কর রায় পুরস্কার গ্রহণ করে যে-ভাষণটি দিয়েছেন তাতে তিনি তাঁর জীবনচর্যার সঙ্গে আর্ট-এর সম্পর্ক নিরূপণ করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, আর্ট আপনাকে নিয়েই সম্পূর্ণ নয়। পার্বতীর যেমন পরমেশ্বর, বাক্যের যেমন অর্থ, আর্ট-এর তেমন সত্য। সত্যেরও তেমনি আর্ট। আর্ট হচ্ছে সেই আধার যা সত্যকে গ্রহণ করে, ধারণ করে। তিনি আর্ট-এর মাধ্যমে সত্যকেই তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন, সত্যানুসন্ধান করেছেন। শ্রীমতী লীলা মজুমদারও

মনে করেন, শিশুসাহিত্য বা যে-সাহিত্যই হোক না কেন, সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য সত্যতা।

শুধু আর্ট-এর ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই সত্যানুসন্ধানের স্পৃহা দরকার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গোটা জীবনই ছিল ওই মানবিক সত্যানুসন্ধান। ওইটিই পথ। এ ছাড়া অন্য যেকোনো পথ—তা মানুষকে টুকরো টুকরো করবে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবে, ছেঁড়া খোঁড়া ইতিহাসের জঞ্জালে রূপান্তরিত করবে। এই পরিণতি রোধেই আজ সবচেয়ে বেশি দরকার বিদ্যাসাগর অনুধ্যান।

২৯.৯.১৯৮০

১৮

সময়টা কেমন যেন সুবিধের নয়। ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডিটা ছাড়িয়ে জাতীয় জীবনের দিকে তাকালে এমন কতকগুলো প্রবণতা চোখে পড়বে যাতে মন খারাপ না হয়ে পারে না। এখানে প্রাদেশিকতার নির্লজ্জ আস্ফালন, ওখানে সাম্প্রদায়িকতার বর্বর মুখবিকার, সেখানে জাতি-বৈরিতার নিষ্ঠুর আত্মপ্রকাশ যেকোনো সুস্থ মানুষকে ব্যথিত করবে, পীড়িত করবে। সাম্প্রদায়িকতাই বলুন, প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতা—যার কথাই বলুন না কেন—এ সবের পরিণতি কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। মানুষ মানুষের হাতে মরছে। মানুষের ভালোবাসার ঘর মানুষের হাতেই পুড়ছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না, কাউকে কাছেও টানতে পারি না। অবিশ্বাস, সংশয়, বিদ্বেষ—এ সবই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আগল তুলছে। এটা ভাবতে আরও খারাপ লাগে যে, একই দেশের মানুষ কখনো ধর্মের নামে, কখনো প্রদেশের নামে, কখনো-বা বর্ণ অভিমানের নামে একে অপরকে আঘাত করছে। হয়তো এখনও ব্যাপারটা খুব একটা ছড়িয়ে পড়েনি, দেশের বৃহত্তর অংশকে হয়তো এইসব বিষ এখনও জর্জরিত করেনি, তবু মানতেই হবে একথা সময়ে রাশ না টানলে এইসব প্রবণতা দেশকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে—এ-অবস্থাটা কোনোমতেই বরদাস্ত করা যায় না—মেনে নেওয়া যায় না। আর তাই সবাই এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা খর্ব করার জন্য জাতীয় সংহতির শক্তিগুলিকে জোরদার করার কথা বলছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার কিছুদিন আগে জাতীয় সংহতি পর্ষদ পুনর্গঠন করেছেন, এইসব প্রবণতা রোধের উপায় উদ্ভাবন করতে। এই বুধবার পুনর্গঠিত এই জাতীয় সংহতি পর্ষদের প্রথম বৈঠকটি বসল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধি এই বৈঠকের উদ্‌বোধন করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, আঞ্চলিক টানাপোড়েন প্রভৃতির মধ্যে যে-অশনিসংকেত লুকিয়ে রয়েছে, তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন,—দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য।

এইসব বিভেদপ্রবণ ঘটনাবলি যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, একজন কিংবা একটি গোষ্ঠী এই ধরনের হাঙ্গামার সূচনা করছেন। তার পরই সে-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ছে। একথা বলবার অর্থ এই যে, আমরা সবাই প্রাদেশিক, আঞ্চলিক, বা সাম্প্রদায়িক নই। কিন্তু কিছু লোকের প্ররোচনার আমরা শিকার হয়ে পড়ছি। শিকার হয়ে পড়ছি এই কারণে যে, আমাদের পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিতটা শিথিল হয়ে পড়েছে। আমাদের সংশয়জর্জরিত মনের সুযোগ নিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ফয়দা ওঠাবার চেষ্টা করছে। যদি এটিই আসল চেহারা হয়, তবে মানতে হবে যে, দেশবাসীর মন থেকে ওই সংশয় অবিশ্বাস দূর করতে পারলে মুষ্টিমেয় ওইসব মানুষের কারসাজি বন্ধ করা সহজ হবে। এতদিন পর্যন্ত এ ধরনের সমস্যাকে আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে গণ্য করে তা মোকাবিলার চেষ্টা করা হত। এতে হাঙ্গামা হয়তো রোধ করা যেত, কিন্তু মানুষের মন থেকে ওই অবিশ্বাসী ভাবনাগুলো দূর করা যেত না। তাই প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এই সমস্যাটিকে শুধুমাত্র আইন ও শৃঙ্খলার দিক থেকে বিচার না করে অন্য দিকগুলোও বিচার করতে বলেছেন। বিচার করতে বলেছেন শিক্ষার দিক থেকে, কর্মসংস্থানের দিক থেকে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে। যে-মানুষ শিক্ষার আলো পায়নি, তাকে যে প্ররোচিত করা সহজ—এ-কথা স্বীকার করবেন সকলেই। যে-মানুষটি চাকুরি না পেয়ে হতাশায় ভুগছে তাকেও প্রলুব্ধ করা কঠিন নয়। কিংবা যে-মানুষটি সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে নিদারুণ বৈষম্যের শিকার হয়েছে, তাকেও অন্যের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়া কঠিন নয়। তাই এই সমস্যার সমাধানের স্থায়ী পথ নিহিত রয়েছে শিক্ষার প্রসারের মধ্যে, কর্মসংস্থানের সুযোগসৃষ্টির মধ্যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক

উন্নয়নের মধ্যে। তাই এসব সমস্যার সমাধানে চালাতে হবে দ্বিমুখী আক্রমণ। একদিকে যেমন কঠোর হস্তে আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, হাঙ্গামাকারীদের যেমন কোনোমতেই রেহাই দেওয়া চলবে না ; তেমনি যেসব মৌলিক প্রশ্নের সুযোগ নিয়ে এইসব হাঙ্গামা বাধানো হচ্ছে, তা দূর করতে হবে।

করাটা সহজ নয়, রাতারাতি হবারও নয়। তবু কাজটা করতেই হবে—দেশের স্বার্থে, আমাদের নিজেদের স্বার্থে। আমরা সবাই, সমস্যাগুলো সমাধানের যে চেষ্টা করছি—এমন একটা বিশ্বাস আমরা যদি কথায় এবং কাজে জাগিয়ে তুলতে পারি তবে কিন্তু অনেকটা কাজ হবে। আর একটা কথা, আমরা এই ভারতবর্ষের মানুষ বহু ভাষাভাষী। দেশটাও এত বিরাট যে, অনেকের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। দূর করতে হবে এই অন্তরায়। এদিক থেকেই নতুন করে ভাবতে হবে ত্রিভাষা-সূত্রের কথা। আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলি। হয়তো লক্ষ করে থাকবেন, বেশির ভাগ হাঙ্গামাই হয় ওই ধর্মকে কেন্দ্র করে। এটা যে হয়, তার কারণ ধর্ম কী সে-সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান আমাদের নেই। কোন ধর্ম কি বলছে তা-ও আমরা নিজেরা জানি না, পরের মুখে ঝাল খাই। এ-অবস্থাটাও বদলানো দরকার। প্রত্যেক ধর্মকে জানলেই, প্রত্যেক ধর্মকে মর্যাদা দিলেই ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া যায়—ধর্মকে অস্বীকার করে নয়। আরও একটা ব্যাপার আছে। সেটা হচ্ছে, কুৎসা, অপপ্রচার। আমরা দেখি—নানা মহল থেকে নানারকম কথা বলা হচ্ছে—প্রমাণ দেবার দায় বহন না করে। আমরা তা মেনে নিই। এটাও চলতে দেওয়া যায় না। অপপ্রচার বন্ধ করবার প্রচেষ্টা যেমন চালাতে হবে, তেমনি আমাদের দিক থেকেও দাবি ওঠা উচিত কথা বললেই শুধু চলবে না, চাই প্রমাণনির্ভর কথা। মোদ্দা কথা, দেশে আজ যে-সংশয়, অবিশ্বাস ও সন্দেহের পরিবেশ কোনো কোনো মহল থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা-ই আজ দূর করতে হবে। এ-কাজ আমার-আপনার সকলের কাজ। কারণ ভারত না বাঁচলে আমরা বাঁচব না, ভারত টুকরো টুকরো হলে আমরাও টুকরো টুকরো হব। আমাদের মনে রাখতে হবে যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, আত্মদান করেছেন, তাঁরা তা করেছিলেন দেশকে ভাঙবার জন্য নয়, গড়বার জন্য। ভবিষ্যৎ বংশধরদের

প্রতি প্রধানমন্ত্রী আমাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে আমরা কি একটি শক্তিশালী, সংহত, স্বনির্ভর দেশকে রেখে যাব না কি দুর্বল, বিপথগামী ভারতকে রেখে যাব?

১২.১১.১৯৮০

১৯

আমাদের এক বন্ধু গেছেন শিলং পাহাড়ে। ওর পণ যে-জায়গাটায় অমিত রায়ের সঙ্গে লাবণ্যর প্রথম দেখা হয়েছিল, সে-জায়গাটা ও খুঁজে বার করবেই। অনেক দিন হয়ে গেল ওর কোনো চিঠি পাইনি। জায়গাটা পেল কি না তাও তো জানি না। আজ সকালে বৃষ্টিভেজা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওই বন্ধুটি ও তার পণের কথা বার বার মনে পড়ছিল। আর সেইসঙ্গে আমার কল্পনাও কেমন যেন একটু পাখা মেলতে চাইছিল। ধরা যাক—বন্ধুটি একটা জায়গাকে মোটামুটি ধারণা করে নিয়েছে, উপরওয়ালার উপরেও যে-উপরওয়ালা আছেন তাঁরই কুকীর্তির স্থল হিসাবে। বন্ধুটি মাঝে মাঝে সেখানে যায়, "শেষের কবিতা" খুলে জায়গাটা মেলাবারও চেষ্টা করে, কিন্তু খুব-একটা কিছু মেলে না। একদিন বন্ধুটি সে-জায়গায় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখতে পেল, ভদ্রলোকটি সেখানটায় দাঁড়িয়ে আনমনে কী যেন ভাবছিলেন। এক দিন নয়, পর পর বেশ ক-দিন ভদ্রলোককে ঠিক ওই জায়গায় ওইভাবে দেখা গেল। হঠাৎ একদিন বন্ধুটির মনে হল ইনিই সেই অমিত রায় নয় তো? তারপরই ভাবল—না। তা কী করে হবে। অমিতের পরনে ছিল 'হাইল্যান্ডারি মোটা কম্বলের মোজা, পুরু সুকতলাওয়ালা মজবুত চামড়ার জুতো, খাকি নরফোক কোর্তা, হাঁটু পর্যন্ত হ্রস্ব অধোবাস, মাথায় শোলাটুপি।' কিন্তু এখন যিনি দাঁড়িয়ে তিনি তো একজন বৃদ্ধ। কিন্তু বন্ধুর ভাবনা তাকে ছাড়ল না। সে ভাবতে লাগল ১৩৩৬ সালে অমিত রায়ের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। সেদিন তার বয়স ছিল সাতাশ-আটাশ। এটা তো বাংলা ১৩৯১ সাল। অমিত রায় বেঁচে থাকলে তার বয়স এখন তিরাশি হত। ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বয়সও ওইরকম। বন্ধুটির মনের মধ্যে কেমন একটা ছটফটানি জেগে উঠল। সে আর থাকতে না পেরে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করে বসল—আচ্ছা আপনি কি অমিত রায়? এইখানে কি আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল অম্বুরি তামাকের হালকা ধোঁয়ার মতো কণ্ঠস্বর যার সেই লাবণ্যদেবীর সঙ্গে? সেই যে যাকে

দেখবার পর নিবারণ চক্রবর্তীর বকলমে আপনি লিখেছিলেন—'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।' ভদ্রলোকটি কেমন যেন ডিসপেপটিক্ ধরনের। উনি কোনো কিছুর জবাব না দিয়ে নিজের মাথাজোড়া টাকটা দেখিয়ে বললেন—'বুঝলে ছোকরা সব কিছুই মিথ্যে, সত্য এই টাকটা। অনেক কিছুই হবার কথা ছিল, কিন্তু কিছুই হয় না, হল না। সবটাই ব্যারেন।' কথাটা বলেই ভদ্রলোক পাইপে ধূম উদ্‌গিরণ করতে করতে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেলেন। আমার কল্পনাও ফিরে এল শিলং পাহাড় থেকে আমার ছোট্ট ঘরের চৌহদ্দিতে। একসময় অমিত রায়ের ভাবনাটা কেমন ফিকে হয়ে গেল। জেগে রইল ওই ব্যারেন শব্দটা—টাকের ছবিটা।

এই যে আমাদের সময়টা, সত্যি! এই সময়টা কেমন যেন অবয়বহীন। আগের কালটা কত সুখী ছিল। এ-কালটারও হবার কথা ছিল অনেক কিছু কিন্তু কিছুই হল না। বন্ধ্যা, অপুষ্পিত হয়ে রইল সময়টা। একজন ইংরেজ কবি এই সময়টাকে চিহ্নিত করে লিখেছিলেন—বাংলা করে পড়ছি, 'ভবিষ্যৎ নিখিল নাস্তি, চূর্ণিত অস্তিত্ব নিয়ে পড়ে আছি ভাঙাচোরা ছায়ার মতো, কাঁচের টুকরোর ঔজ্জ্বল্যে ভঙ্গুর চকচকে আমাদের আত্মপরিচিতি।' ইংরেজ সাহেব তো এই সময়টাকে চিহ্নিত করেছিলেন পোড়ো জমি, ফণীমনসার দেশ হিসাবে। ভারী সুন্দর উপমা দু-টি। যে-জমিতে একদিন ছিল সোনালি ফসলের হাতছানি আজ তা-ই বন্ধ্যা, পরিত্যক্ত। কিছুই না ফলার হাহাকার। কিংবা মনে মনে ভাবুন ক্যাক্‌টাসের ছবিটা। ওরও কী যেন হবার কথা ছিল, তা না হয়ে ভেঙেচুরে দুমড়ে গিয়ে ওর চেহারাটাও কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। আমাদের সময়টা তো এইরকম। মূলের সঙ্গে সংযোগ-হারা, বিশ্বাসহীন, ছন্নছাড়া, উগ্রব্যক্তিত্ববাদী। জীবনানন্দ লাশকাটা ঘর, নষ্ট শশা, বিচূর্ণ থাম, খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারিতে এ-যুগের ছবি দেখেছেন। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন :

হত্যাকারী ফণিমনসায়
আচ্ছন্ন এ তীর,
এয়োতির সিন্দূর এখানে
রক্ত হয়ে ঝরে।
জীবনের কানে কানে কঙ্কালেরা
চুপি চুপি কথা কয়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এ-যুগের বন্ধ্যাত্বের প্রতিভাস দেখেছিলেন হেমন্ত ঋতুতে, দেখেছিলেন ধূ ধূ মরুভূমিতে। লিখেছিলেন তিনি:

কোথায় লুকাবে? ধূ ধূ করে মরুভূমি ;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।

আর চোরাবালির প্রতীকে বিষ্ণু দে উপহার দিয়েছিলেন সেই অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তি দু-টি:

চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া?

না, উদ্ধৃতি দীর্ঘ করবার দরকার নেই। আমরা জানি এই বন্ধ্যা সময়টাকে নানা কবি নানা ভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু টাকের সঙ্গে তুলনা করতে, ওই শিলং পাহাড়ে কল্পনায় দেখা, হতে পারত অমিত রায় ছাড়া আর কাউকে, দেখিনি। টাক নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু সেসব কথাই হাসি, ঠাট্টা, মশকরা। সুকুমার রায় তো একবার টাকের ওপর ডাকটিকিট এঁটে দেবার কথা ভেবেছিলেন। অনেককে দেখেছি হেয়ার স্টাইল পালটে টাক ঢাকবার অক্লান্ত প্রয়াসে ব্যতিব্যস্ত থাকতে। আমাদের এক বন্ধু ছিলেন, মাথায় পূর্ণিমার চাঁদের মতো নিষ্কলঙ্ক একটি টাক নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। হঠাৎ সেদিন সেই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হল। চেনাই যায় না। নিজে যখন রহস্যটা ভাঙলেন তখন জানা গেল পরচুলা দিয়ে টাকের লজ্জা ঢেকেছেন তিনি। কিন্তু সত্যি কি টাক লজ্জার? টাকের তাৎপর্য কি শুধুমাত্র কেশহীনতায় ফুরিয়ে যায়? তা কিন্তু নয়। টাক আমাদের যুগের প্রতীক, আমাদের কালের অভিজ্ঞান। কথাটা কিন্তু আমার নয়, রীতিমতো চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের। ভেনিজুয়েলার দু-জন চিকিৎসাবিশেষজ্ঞ ফতোয়া দিয়েছেন যে, দু-হাজার সালের মধ্যে এই টাক এক মাথা, এক মাথা করে হাজার হাজার মাথায় ছড়িয়ে পড়বে। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই হয়ে পড়বেন টাকওয়ালা। দু-টি কারণ দেখিয়েছেন ওঁরা। একটি কারণ হল—চুল রাখার জন্য নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া ব্যবহারের ফলে চুলের বিলুপ্তি। এ যেন সেই 'যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিবে যায় বারে বারে।' আর দ্বিতীয় কারণটি হল পরিবেশের অবনতি এবং আধুনিক জীবনের

মানসিক চাপ। তাই বলছিলাম টাক হল সময়ের প্রতীক, যুগের প্রতীক। সেই যুগের, যার অনেক কিছু হবার কথা ছিল কিন্তু কিছুই হল না। যতই গলাবাজি করুন অমিত রায়, উড়ে বেড়াবার আকাশ আর ঘড়ায় তোলা জল নিয়ে, প্রকৃত সত্য হল কিন্তু Between the idea and the reality falls the shadow. Between the conception and the creation falls the shadow!—আমরা তো Hollowman, ফাঁপা মানুষ। তাই টাক আমাদের অলংকার। তাই হয়তো তিরাশি বছরের বৃদ্ধ অমিত রায় এতদিনে অকপটে স্বীকার করতে পারছেন সব মিথ্যে, সত্য এই টাকটা। বিশ্বাস করুন এই প্রথম আমি আমার টাকের জন্য গর্বিত বোধ করছি।

১৮.৭.১৯৮৪

২০

খেলা। দু-অক্ষরের এই শব্দটা আমাদের সবার প্রিয়। আমাদের এই বিপুলা পৃথিবীতে এমন একটা জায়গা হয়তো মিলবে না, যেখানে মানুষ আছে কিন্তু খেলা নেই। আর এই যে খেলা শব্দটা, ঠিক শব্দ নয়, খেলা বলতে আমরা যা বুঝি সে-ব্যাপারটা আমাদের সভ্যতার সমবয়স্ক। একটু পিছু ফিরে তাকানো যাক না, আর ওই পিছু ফিরে তাকাতে গেলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকব, হাজার দশেক বছর আগের এক মিশরীয় রমণীর কাছে। ওই মেয়েটির হাত থেকে একদিন কয়েকটা বীজ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। কিছুদিন পরে সেই মেয়েটি অবাক হয়ে দেখল—তার হাত থেকে পড়ে যাওয়া বীজ থেকে কিছু অঙ্কুর বেরিয়েছে। সে তার পরিচিত জনকে ওই ব্যাপারটা দেখাল। আর প্রায় সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সভ্যতার চেহারাটাও বদলে গেল। ওই ঘটনার আগে পর্যন্ত মানুষকে শিকার করে প্রাণ ধারণ করতে হত। নির্দিষ্ট আস্তানা তাদের ছিল না। জীবিকার সন্ধানে উদয়াস্ত বনের পশুপাখির পিছনে ছুটতে হত। যেই মানুষ জানল—বীজ থেকে অঙ্কুর হয় অমনি তার জীবনযাত্রার ধারাটা গেল বদলে। কৃষি তার আয়ত্তে এল। সে এখন সময় মেপে তার খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা করতে পারে। আর এটা যেই সম্ভব হল—মানুষ দেখল তার হাতে বেশ কিছু বাড়তি সময় থেকে যাচ্ছে। এখন তাকে সব সময় শিকারের পিছনে ছুটতে হচ্ছে না এবং খাওয়া-পরার

ভাবনা সবসময় ভাবতে হচ্ছে না। কিন্তু মুশকিল হল আর একটা, ওই যে বাড়তি সময়, ওটা সে ভরাবে কী দিয়ে? আবার দেখুন শিকারের সময় মানুষকে দৌড়-ঝাঁপ পাথর-ছোড়া, তির-মারা সব করতে হত। তাতে শিকার তো হতই—তার সঙ্গে মানুষের দেহের কলকবজাগুলো বেশ চালু থাকত। কিন্তু কৃষির সঙ্গে সঙ্গে তার যেমন কাজ কমল, তেমনি তাকে ভাবতে হল—বাড়তি সময় ভরাবার কথা, ভাবতে হল দেহের কলকবজায় যাতে জং না ধরে তার ব্যবস্থা করবার কথা। এ থেকেই মানুষ শিকার করতে গিয়ে যা যা করত তাকে সে রূপ দিল—খেলার। আমাদের খেলায় দৌড়োনো, লং জাম্প, হাই জাম্প, তির-ছোড়া, বর্শা-ছোড়া—এইসব খেলা। যাকে বলা যায় ফান্ডামেন্টাল খেলা—সেগুলোর উৎস কিন্তু শিকারজীবনে। যাকগে—খেলা তো আবিষ্কার হল। মানুষ খেলতে থাকল। আর এই খেলতে খেলতেই আর একটা মজার ঘটনা ঘটল। দেখা গেল খেলার আসরে খেলোয়াড় হিসেবে এবং দর্শক হিসেবেও মানুষের মিলবার একটা জায়গা পাওয়া গেল। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবে মিলেমিশে থাকবার যে-প্রবণতা আছে; খেলার আসরে তা পুষ্টি পেল। আর তা থেকেই খেলা মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল।

এই যে মানুষ জীবটা দারুণ মজার জীব। তার মনের থই পাওয়াও ভার। যে-মানুষ ঘর বাঁধে, সমাজ গড়ে, দেখা যাবে সেই মানুষই ঘর ভাঙছে, সমাজকে আঘাত করছে। এমনকী এও মনে হবে মানুষই মানুষের বড়ো শত্রু। তা না হলে পৃথিবীতে এত যুদ্ধ হবে কেন? কেন তৈরি হবে পারমাণবিক অস্ত্রের মতো মানুষ-মারা ভয়ংকর হাতিয়ার। আসলে মানুষের মধ্যেই অন্য মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তারের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সবাই চায়—সমস্ত শক্তি, সমস্ত সম্পদ, নিজের কুক্ষিগত করতে। আর তা থেকেই তো মানুষে মানুষে এত বিরোধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন মানুষ পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়ংকর বিপদ সম্পর্কে ধারণা করতে পারল, তখন তার মনে নতুন একটা ভাবনা দানা বাঁধল। ইউনেসকোর মুখবন্ধে একটা সুন্দর কথা আছে—তাতে বলা হয়েছে মানুষের মনে যুদ্ধের জন্ম। তাই যুদ্ধের যদি সমাপ্তি ঘটাতে হয়—মানুষের মনের মধ্যেই তা করতে হবে। আগেই বলেছি—মানুষের মনের মধ্যে যে প্রতিযোগিতার ভাব রয়েছে, নিজেকে বড়ো করে দেখাবার প্রবৃত্তি রয়েছে, খেলার মধ্যে তার

নিবৃত্তি ঘটে। খেলার মধ্যে মানুষ শত্রুতা ভুলে যায়। এক মানুষ আরেক মানুষের বন্ধু হয়। তাই বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ভাবলেন—খেলাকে শান্তির হাতিয়ার করা যাক। আর তাই দেখুন—খেলা ক্রমশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা হয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন গ্রিসে অলিম্পিকের সময় যুদ্ধ বন্ধ রাখা হত। তাই অনেকে ভাবেন—ওলিম্পিকস্ বিশ্বকাপ, অ্যাফ্রো-এশিয়ান গেমস্, কমনওয়েলথ গেমস্, এশিয়ান গেমস্ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি গড়ে তোলা যাবে। এটি তো আজ সবচেয়ে বেশি দরকার।

আসলে আমরা যদি জীবনের দিকে তাকাই তবে কিন্তু দেখব—সবারই পরিপূরক ভূমিকা। ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির সম্পর্ক তাই। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কও তাই। আর তাই আমরা যখন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলি, সেটা কিন্তু একটি বা দু-টি দেশের রাজনৈতিক কৌশল স্ট্র্যাটেজিমাত্র নয়। জীবনের মৌল সত্যকেই বোঝানো হয়। আবার খেলার আদর্শ কিন্তু এইটি—শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। আমরা খেলায় নামলুম। একপক্ষ আর একপক্ষকে হারাবার জন্যে প্রচণ্ড লড়াই করলুম। খেলার মাঠে ওই মুহূর্তে প্রতিপক্ষের চাইতে বড়ো শত্রু আর কেউ নেই। আর যেই খেলা ফুরোল অমনি কিন্তু শত্রু-মিত্রের ভেদ গেল ঘুচে। আমরা তখন সবাই বন্ধু। ভালো খেলার ছবিটা মনে রয়ে গেল। খেলার এই ব্যাপারটা আমরা যদি জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি, তবে আমরা দেখব আমাদের জীবন অনেক সহজ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। রোববার NIS-এর পূর্বাঞ্চল কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং—রাজনীতি ক্ষেত্রেও এই খেলোয়াড়ি মনোভাবের উপর জোর দিয়েছেন। এটা যদি আমরা পারি তাহলে আমরা দেখব, শুধু দেশেই নয়—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা কমে যাচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হল—আমরা খেলার তাৎক্ষণিক ফলাফল নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামাই। খেলার আদর্শের কথা বড়ো একটা মনে রাখি না। তাতেই খেলাও আজ আর খেলা থাকছে না। একটা পেশা হয়ে, একটা ব্যাবসা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খেলাকে এইসব প্রবণতা থেকে মুক্ত করতে না পারলে খেলা তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলবে।

১০.১.১৯৮৩

২১

একটা দেশের মানুষকে যদি জানতে হয়, বুঝতে হয় তবে সমাজতাত্ত্বিকেরা নজর দেন সেইসব মানুষের উৎসবের দিকে। কেননা পূজাপার্বণ আর উৎসবের মধ্যে মানুষ তার মনকে মেলে ধরে। মানুষের মনেরও তো অনেকরকম রং। প্রত্যেক দিনে জীবিকার জন্য যখন তাকে ব্যস্ত থাকতে হয় তখন তার মনের চেহারা একরকম। আর অন্য সময় আর একরকম। কিন্তু পূজাপার্বণ আর উৎসবের সূত্র ধরে তার মনের গভীরে যে-চিরকালের মানুষ তাকে ছোঁয়া যায়। উৎসবের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশেও তাই। বারো মাসে তেরো পার্বণের এই দেশে বাঙালির মনকে পুরোপুরি পাওয়া যায় ওই উৎসবে। আর আজকের দিনটি বাঙালির অন্যতম প্রধান উৎসবের দিন। একটা উৎসব নয়, নানারকম উৎসব মিলেমিশে রয়েছে এই দিনটিতে। এই শুক্রবার তো মকর সংক্রান্তির দিন। আর এই সংক্রান্তির দিন সবচেয়ে বড়ো অনুষ্ঠান গঙ্গা যেখানে সাগরে মিলেছে সেই সাগর দ্বীপে। হাজার হাজার মানুষ—প্রদেশের—শুধু প্রদেশের বলছি কেন—দেশেরও সীমা-পেরোনো মানুষ সেখানে সমবেত হয়ে কাক না-ডাকা ভোরে পুণ্যস্নান করলেন সাগরসংগমে। তার পর পুজো দিলেন কপিলমুনির আশ্রমে। সেই কোন আদ্যিকালে ভগীরথ গঙ্গার জল এনে সগর রাজার মৃত পুত্রদের প্রাণ দিয়েছিলেন সেই ঘটনার অনুষঙ্গে এই অনুষ্ঠান। আর এই অনুষ্ঠানটি কেন্দ্র করে মেলাও বসে সেখানে—বিরাট মেলা। আর সবাই সেই মেলায় মিলেমিশে একাকার। ভারতবর্ষ দেশটা বিরাট। এক প্রান্তের মানুষ আর এক প্রান্তের মানুষকে চেনে না, জানে না। তীর্থে সম্পন্ন হত এই মন জানাজানির পালা। কত দুঃখ-কষ্ট কত প্রত্যাশার বোঝা বহন করে মানুষ এসে একে অপরের বুকের দরজায় টোকা মারে। আর তাতেই জেনে যায় মানুষের সবচেয়ে বড়ো মুক্তি—মানুষেরই বুকে।

আজকের দিনটি পৌষপার্বণের দিন। মকর সংক্রান্তিতে যদি একটা সর্বভারতীয়ত্বের দিক থাকে তবে পৌষপার্বণ কিন্তু একেবারে বাঙালির নিজস্ব জিনিস। হৈমন্তী ফসল ঘরে তোলবার পর গ্রাম বাংলার মানুষের ঘরে যখন একটু স্বাচ্ছন্দ্য আসে, তখনই তাঁরা লক্ষ্মীর আসন পাতেন। পিঠে-পুলি খেয়ে শ্রমক্লান্ত জীবনে স্বাদ-বদল করেন। এবার তো বাঙলায় খেতে খেতে খরা। খাল বিল পুকুর শুকিয়ে কাঠ। লক্ষ্মী এসে যে বসবেন সে পদ্ম ফুটবে

কোথায়? জল না থাকলেও সে-পদ্ম ফোটে বাঙালির বুকের মধ্যে। তাই বাঙালির ঘরের দাওয়ায় লক্ষ্মীর পায়ের চিহ্ন আঁকা পড়ে। আলপনায় সুদিনের প্রার্থনা লতিয়ে ওঠে।

এই যে পৌষপার্বণের দিন, এটা কিন্তু আবার আমাদের রাঢ় অঞ্চলের টুসু উৎসবেরও দিন। অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি থেকে শুরু করে সারা পৌষ মাস ধরে ওই অঞ্চলের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে এই টুসু দেবীর পুজো হয়। আজ সেই টুসুর বিসর্জনের দিন। টুসু হলেন কৃষিলক্ষ্মী। টুসুর পুজো নাকি উর্বরতার শক্তির পুজো। আবার কেউ মনে করেন এটা হল আদিম শস্যোৎসবের স্মৃতিবাহী। গ্রামের মানুষেরা, বিশেষ করে কুমারীরা গানে গানে এই উৎসব মাতিয়ে দেন। একটা টুসু গান মনে পড়ছে:

এই বড় পোষ পরবে, রাখলি মা পরের ঘরে
ওমা পরের মা কি বেদনা বোঝে
অন্তরে পুড়ায়ে মারে।
আমার মন কেমন করে, মাগো আমার মন কেমন করে,
যেমন তাতাকড়ায় খই ফোটে।

আর একটা গানে আছে:

হামার টুসু সিনাই আলা
পইরতে দিব কি।
বাসাকায় আছে ছিঁড়া কাঁথা
লঠাই আন্যে দি।
গুন গুনায়েঁ আইস্‌লে ভমর
বইস্‌লে কন্‌ ফুলে।
লইতন ডালিম ফুল ফুট্যেছে
বইসবেক আস্যে ডালে।

এ আর কোথাও দেখা যায় না। দেবতাকে ঘরে আনা, দেবতাকে প্রিয় বলে ভাবা, প্রিয়কে দেবতা বলে জানা, দেবতা-মানুষে একাত্মতা—এই তো বাংলার ধর্ম—এই তো বাংলার উৎসব। আমাদের সাঁওতাল ভাইদের শাক্‌রাত উৎসবেরও দিন—এই মকর সংক্রান্তির দিন। এই দিন ওঁরা কলা গাছে বা পেঁপে গাছে তির মেরে শিকারের সূচনা করেন। এটা ওদের নতুন বৎসরেরও উৎসব। আজকের দিনটিতে ওরা যে যা পারে ভালোরকম

খায়-দায়। কোনো ভেদাভেদ রাখে না—ধনী-দরিদ্র মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কেননা এই শিকার উৎসবে ওদের দেবতা—''মঁড়েক তুরুক''ও মানুষের রূপ ধরে ওদের সঙ্গেই শিকারের উৎসবে মেতে ওঠেন। ওদের কাড়া-নাকাড়ায় মানুষ আর দেবতাদের সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

আজকের এই দিনটিতে বীরভূম জেলায় কেন্দুলিতে আদি কবি জয়দেবের তিরোধান তিথিতে মেলা বসেছে। জয়দেবের মেলা। আর এই জয়দেবের মেলা তো—বাউলেব মেলা। আর বাউল মাত্রই তো মনের মানুষকে খোঁজেন। সেই যে লালন গেয়েছেন:

এই মানুষে আছে রে
মন যারে বলে মানুষ রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন পারলাম
না রে চিনিতে।

আর একজন বাউল গেয়েছিলেন

ঘরে মানুষ বাইরে মানুষ, ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই মানুষ
আমি খুঁজে পাইনে মনের মানুষ হল কি জ্বালা।

তাই তো বলছিলাম বাংলার উৎসব, বাংলার পূজা-পার্বণ সব কিছু তো মানুষকে খোঁজে, মনের মানুষকে। সে-মানুষকে বিভেদে মেলে না, সে-মানুষকে দূর থেকে দেখা যায় না। দেখতে হয় সবাইকে মিলিয়ে নিজের বুকের গভীরে।

১৪.১.১৯৮৩

২২

আমাদের জাতীয় জীবনে দু-টি দিন—স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। একটি স্বাধীনতা দিবস, আরেকটি সাধারণতন্ত্র দিবস। স্বাধীনতা দিবসে বাস্তবায়িত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন আর সাধারণতন্ত্র দিবসে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের জাতির মূলমন্ত্র—সংবিধান। দুটো পৃথক দিন, ঘটনার দিক থেকেও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তবুও একটা মিল রয়েছে এ-দুটি দিনে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব আজ থেকে তিপ্পান্ন বৎসর আগে এই ছাব্বিশে জানুয়ারি আমাদের দেশে প্রথম উচ্চারিত

হলো পূর্ণ স্বরাজের দাবি। সেদিন এই দিনটিকে আমরা চিহ্নিত করেছিলাম স্বাধীনতা দিবস হিসেবে, কিন্তু দেশ স্বাধীন হল '৪৭-এর ১৫ই আগস্ট তারিখে। তবুও আমরা ভুলে যেতে পারলাম না ওই ছাব্বিশে জানুয়ারি তারিখটিকে—যে-তারিখটি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিরলস সংগ্রাম চালাবার শপথ নেবার দিন। স্বাধীনতার পর গণ-পরিষদে আমাদের জনপ্রতিনিধিরা যে-সংবিধান রচনা করলেন—বস্তুতপক্ষে যে-সংবিধান নিজেরাই তৈরি করে নিজেদের উপহার দিলাম, সেই সংবিধান চালু করবার পবিত্র দিন হিসেবে আমরা বেছে নিলাম ওই ছাব্বিশে জানুয়ারি তারিখটিকে। স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা অর্জনের দিন। আর সেই স্বাধীনতা নিয়ে আমরা কী করব—অর্থাৎ যে-স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি তা দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে কীভাবে আমরা ছড়িয়ে দেব—সেই স্বাধীনতাকে কীভাবে আমরা ফলবতী করব—সাধারণতন্ত্র দিবস হল সেই প্রশ্নের উত্তর দেবার দিন। এই দিনটিতে আমরা যে-সংবিধান রচনা করলুম তার লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা। এই তো আমাদের রাষ্ট্রের লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্য সামনে রেখেই গত তেত্রিশ বছর ধরে আমরা কাজ করে চলেছি আর এইজন্যই স্বাধীনতা দিবসের মতো সাধারণতন্ত্র দিবসও একটি অতি পবিত্র দিন। স্বাধীনতা দিবস ও সাধারণতন্ত্র দিবস এ দু-টি দিনই আমরা পালন করে থাকি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। দু-টি দিনেরই মূল সুরটি আনন্দের। তবুও একটু পার্থক্য রয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে কিছুটা আবেগ জড়ানো থাকে—কিছুটা উচ্ছ্বাস থাকে কিন্তু সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে থাকে দায়িত্বস্মরণ। আরও একদিক থেকে এ দু-টি দিন পরিপূরক। স্বাধীনতা দিবসে আমরা শপথ নিই মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষার আর সাধারণতন্ত্র দিবসের শপথ সংবিধান অনুযায়ী দেশকে গড়বার।

স্বাধীনতা দিবসের প্রধান অনুষ্ঠানটি হয় দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লায়। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী। আর সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রধান অনুষ্ঠানটি হল আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ, যাতে অভিবাদন গ্রহণ করেন আমাদের রাষ্ট্রপতি। এই যে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ তা যে শুধুমাত্র দিল্লিতেই হয় তা কিন্তু নয়। প্রত্যেক রাজ্যের রাজধানী, জেলাশহর ও মহকুমা শহরগুলিতেও এই কুচকাওয়াজ হয়ে থাকে। এই

কুচকাওয়াজের তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করা যাক। জাতীয় পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে থাকেন—দিল্লির মূল অনুষ্ঠানের কথা বলছি—রাষ্ট্রপতি। তার সামনে দিয়ে একের পর এক কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী দলগুলি এগিয়ে এসে রাষ্ট্রপতিকে অভিবাদন জানিয়ে চলে যান। এই যে কুচকাওয়াজ এতে অংশগ্রহণ করেন আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখা। এরা আমাদের স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী। তার পর আসেন পুলিশ, হোমগার্ডস, সিটিজেন ভলান্টিয়ারস ফোর্স প্রভৃতি অসামরিক বাহিনী, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যাদের দায়িত্ব। থাকে চলমান প্রদর্শনী, তাতে দেখানো হয় আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রয়াস ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কিছু ছবি। ওই কুচকাওয়াজে অংশ নেয় ছাত্র-ছাত্রীরাও—আমাদের আনন্দ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক। উপজাতি ভাইয়েরাও এগিয়ে আসেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—এই আদর্শটিকে ফুটিয়ে তুলতে। বিশদভাবে বলবার সুযোগ নেই—বলতে চাই এইটুকুই শুধু যে এই কুচকাওয়াজ আমাদের সর্বাত্মক সংহতির প্রতীক। আর এই সংহতি আসবে কী করে—ওই কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী দলগুলি বলে দেবে স্বাধীনতা রক্ষায় অতন্দ্র থেকে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিরলস থেকে, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বিকাশে আত্মস্থ থেকে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের আদর্শকে রূপায়িত করে। এক হিসেবে এইটেই কিন্তু সংবিধানে বর্ণিত সেই লক্ষ্য যা আমরা ভারতের জনগণ নিজেরাই নিজেদের সামনে রেখেছি। শপথ নিয়েছি দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য সমমর্যাদা ও সমসুযোগ এবং জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ সুনিশ্চিত করবার, আর তাই বলছিলাম—সাধারণতন্ত্র দিবস আমাদের দায়িত্ব স্মরণ করবার দিন। সাধারণতন্ত্র দিবস আমাদের কৃতজ্ঞ হবারও দিন। সেইসব মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হবার, আমরা স্বাধীনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াব বলে যাঁরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন—যাঁরা অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের শিকার হয়েছিলেন। এঁরা তো স্বপ্ন দেখতেন—এক ঐক্যবদ্ধ কর্মিষ্ঠ ভারতের। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেই আমরা এঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে পারি। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সাফল্যের নূতনতর শীর্ষে।

২৬.১.১৯৮৩

২৩

যদি কেউ আমায় প্রশ্ন করেন এমন একটি শব্দ উচ্চারণ কর যে-শব্দের ভিতর সংহত রয়েছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গারের প্রচণ্ডতা—তবে আমি বলব সেই শব্দটি হল গোল। যদি কেউ বলেন এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করতে যে-শব্দ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডটা দেহের খাঁচা থেকে ছিট্‌কে বাইরে আসতে চায়, তবে আমি বলব সেই শব্দটা হল গোল। যদি কেউ আমায় বলতে বলেন এমন একটা শব্দের কথা যার মধ্যে হাজার হাজার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-হতাশা পোরা রয়েছে তবে আমি বলব সে-শব্দটাও ওই গোল। যদি কেউ বলেন যে এমন একটা শব্দ উচ্চারণ কর যে-শব্দটা তোমার ভাষা যাই হোক, ধর্ম যাই হোক, রীতিনীতি আচার আচরণ যাই হোক, দেশ মহাদেশ যাই হোক সবাই বোঝে তবে এবারেও আমি বলব সে শব্দটা ওই গোল। এ-এক আশ্চর্য শব্দ—এই গোল। আর এই শব্দটা যে খেলার প্রাণভোমরা তারই একটা বড়োমাপের আসর বসছে আমাদের এই কলকাতায় আগামীকাল থেকে—জওহরলাল নেহেরু আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা—লোকমুখে আজ যা শুধুই নেহেরু গোল্ড কাপ।

হ্যাঁ, এই সেদিন যিনি অলিম্পিক মেডেল পেলেন খেলাধূলোর প্রসারের জন্য সেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি ইডেনের সুসজ্জিত রঞ্জি স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন করবেন। যদিও নেহেরু গোল্ডকাপ প্রতিযোগিতার বয়স এই তিনে পড়ল। তবুও ফুটবল রসিকমাত্রেই জেনে গেছেন যে—এত উঁচুদরের ফুটবল প্রতিযোগিতা এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে আর নেই। অনেকদিন ধরে এবং অনেকদিক থেকে এই প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি চালাতে হয়, খরচাও পড়ে অনেক। কিন্তু এখন সে-প্রস্তুতি পর্ব শেষ, এখন শুধু প্রহর গোনা খেলা শুরুর। আমরা তো অহরহ আমাদের অনেক দোষের কথা বলি, অনেক দোষের কথা শুনি কিন্তু এটা প্রায় Challenge করে বলা চলে অন্য দেশের তুলনায় খেলার মাঠে আমরা অনেক বেশি শোভন, অনেক বেশি সুশৃঙ্খল। তাই এবারের প্রতিযোগিতাও সুন্দর সার্থক হবে—ইডেন ও সল্টলেক-এ শীতের দুপুর আগামী ক-দিন যে আরও রমণীয় হয়ে উঠবে তা আগাম বলে রাখতে পারি।

হ্যাঁ, সব দলই এসে গেছে। ভারত তো রয়েইছে। এসেছে আর্জেন্টিনা, রোমানিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বাকি ছিল চীন তারাও এসে পৌঁছেছে গতকাল। অতএব ছ-টি দেশের এবারের এই প্রতিযোগিতায় সবাই হাজির। এই মুহূর্তে কলকাতার যেখানেই কান পাতবেন শুনবেন খেলার কথা, খেলা কেমন হবে তার কথা।

যেসব দল এসে পৌঁছেছেন তাদের কোচ-ম্যানেজারদের যেসব বিবৃতি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে দেখছি যে অধিকাংশ দেশই ৮৬-র বিশ্বকাপে খেলবার প্রস্তুতি হিসাবে এই প্রতিযোগিতাকে বেছে নিয়েছেন। অর্থাৎ বিশ্বকাপে কোন দেশ কোন খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গঠন করবে তা-নিয়ে একটা selection trial হবে এই প্রতিযোগিতায়। তার মানে এই যে এই প্রতিযোগিতায় কোনো দেশের খেলোয়াড় ছেড়ে কথা বলবেন না। নিজেকে উজাড় করে দেবেন, নিজের সমস্ত দক্ষতা ও ক্রীড়াশৈলীকে উপস্থাপন করবেন বিশ্বকাপ দলে খেলবার গৌরব অর্জন করবার আকাঙ্ক্ষায়। তা ছাড়া সব দল মিলিয়ে অন্তত ডজন দেড়েক এমন সব খেলোয়াড় আছেন যারা এর আগেও বিশ্বকাপে খেলেছেন। সুতরাং খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত দিক থেকে বলা চলে যে, এ-প্রতিযোগিতায় এরা প্রত্যেকেই তাদের সেরা খেলা দেখাবার চেষ্টা করবেন। কারণ এটা তো ঠিক, প্রফেসনালিজম্ খেলোয়াড়দের আজকাল অনেক টাকা দিচ্ছে, খেলেই সে-টাকা আয় করতে হয়, ভালো না-খেলার অর্থ আয়ের পথ সংকুচিত হওয়া। এটা কেউ চান না, চাইবেন না।

দলগত দিক থেকেও এ-খেলায় স্টেক আছে অনেক। আমাদের কথা ছেড়ে দিন। আমরা, ভারতীয়রা আন্তর্জাতিক মান থেকে বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছি কিন্তু চেষ্টা করছি ওপরে উঠবার। কাজেই এ-প্রতিযোগিতায় আমাদের ভূমিকা অনেকটাই শিক্ষার্থীর। এবার আসা যাক চীনের কথায়। চীন আগের দু-টি নেহেরু গোল্ডকাপে খেলেছে—দু-বারই তারা রানার্স-আপ হয়েছে। বিশ্বকাপ এবং এশিয়া ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি ছাড়াও ওরা চাইবে যে দু-বার ওরা যে-সাফল্য অর্জন করতে পারেনি সেই সাফল্য অর্জন করতে।

এ-তো গেল এশিয়ার দুটো দলের কথা। ইয়োরোপের যে-তিনটি দল রয়েছে তা হল রোমানিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি। হাঙ্গেরি ইয়োরোপের

অন্যতম সেরা দল। বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় খেলা ছ-জন খেলোয়াড় আছে ওদের দলে। ওরা গতবারের নেহেরু কাপ বিজয়ী। অতএব এবারেও তারা চেষ্টা করবে তাদের পূর্ব গৌরব অটুট রাখতে। ইয়োরোপের আর একটি দল হল পোল্যান্ড। স্পেনের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালিস্ট। ওদের দলেও রয়েছেন ন-জন বিশ্বকাপার। কাজেই এটা ভাবতে কোনো অসুবিধেই হয় না যে—ওরা এবারকার নেহেরু কাপের সবচেয়ে বড়ো দাবিদার। এবার আসা যাক রোমানিয়ার কথায়। রোমানিয়া ইয়োরোপেব প্রথম আটটি দলের একটি। কাজেই ওরাও চাইবে এ-প্রতিযোগিতায় জোর লড়াই চালাতে। বাকি যে-দলটি রয়ে গেল সেটি হল দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা গতবারের বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় হেরে গেলেও তার আগের বারের প্রতিযোগিতায় বিশ্বকাপটি তারা তুলেছিল নিজের ঘরেই। ৮৬-তে তারা চাইবে তাদের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করতে। এবার তারা তাদের দেশের উঠতি সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে এসেছে। কাজেই কী ব্যক্তিগত, কী দেশগত সমস্ত দিক থেকেই এবারের নেহেরু গোল্ডকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সব দলের এবং সব খেলোয়াড়দের সেরা খেলাটি দেখবার আকাঙ্ক্ষায় আমরা উন্মুখ। কাজেই এ-খেলা যারা দেখবেন তারা শুধু বর্তমান কালের নয়, আগামী দিনেরও বেশ কয়েকজন সেরা খেলোয়াড়ের খেলা দেখবার সুযোগ পাবেন। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক আজ এই মুহূর্তে আমাদের খেলার জগতে নেহেরু কাপ ছাড়া কোনো কথা নেই, নেহেরু কাপ ছাড়া কোনো ভাবনা নেই, নেহেরু কাপ ছাড়া কোনো স্বপ্ন নেই।

১০.১.১৯৮৪

২৪

বাঙালিরা কবিতাপ্রেমী—এমন একটা কথা অনেকেই বলে থাকেন। সেইসঙ্গে এই কথাটাও যোগ করে থাকেন যে—বাঙালির কবিতাপ্রেম শুধু ওই বাংলা কবিতাকেই ঘিরে। অন্য প্রদেশের, অন্য ভাষার কবিরা কী কবিতা লিখছেন সে-সম্বন্ধে নাকি বাংলা কবিতা পাঠকদের তেমন কোনো আগ্রহ নেই। হয়তো হতেও পারে। অন্য ভাষার মূল কবিতা পড়বার জন্য বা সেই

ভাষার কাব্যবিবর্তনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রাখবার জন্য ওই ভাষা সম্পর্কে চর্চার যে-পরিশ্রমটা দরকার বাঙালি পাঠকরা সে-পরিশ্রম করতে নারাজ। তাই পাঠক হিসাবে বাঙালিদের ঘরকুনো বলে থাকেন কেউ কেউ। এ-অভিযোগ কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যে সে-কূটতর্কে যাচ্ছি না। তবে বলব যে পাঠক হিসাবে বাঙালিরা যদি ঘরকুনো হয়েও থাকেন তবুও কবিতাপ্রেমী অনেক বাঙালির কাছে উর্দু ভাষার কবি ফয়েজ আহম্মদ ফয়েজ এই নামটা কিন্তু অপরিচিত নয়। যদিও ফয়েজ দেশবিভাগের পরই পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন এবং সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে এমনকী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আমাদেব যোগাযোগটা খুব একটা নিবিড় নয়। তাদের অনেক সাংস্কৃতিক কর্মী আজও আমাদের কাছে অজানা। তবুও আমরা ফয়েজ আহম্মদ ফয়েজকে জানি নানাভাবে। কখনো তাঁকে জানি বিশ্বশান্তির একজন নিরলস সংগ্রামী হিসাবে, কখনো জানি তাকে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর একজন প্রবক্তা হিসেবে, কখনো জানি নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের সোচ্চার কণ্ঠ হিসাবে, কখনো-বা আমরা তাঁকে দেখেছি প্রগতিবাদী আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে। অধ্যাপনা করতেন অমৃতসরের একটা কলেজে। দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে গিয়ে নিজেকে তিনি যুক্ত করেন সাংবাদিকতার সঙ্গে, যুক্ত করেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে, লিপ্ত হন ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, জেল খাটতেও হয়েছিল তাঁকে। একসময় দেশ ছেড়ে বেইরুটে আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাঁকে। আফ্রো-এশীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ছিল অনেকটাই। এসব ক্ষেত্রে তাঁকে নিয়ে মাঝে মাঝে এ-পত্রিকায়, সে-পত্রিকায় নানারকম খবর বেরিয়েছে। তাতে তাঁর নামটা আমাদের কাছে অপরিচিত নয়, কিন্তু ফয়েজ তাঁর জীবনে যা যা করেছেন, যা যা করতে চেয়েছেন তার হাতিয়ার ছিল তাঁর কবিতা। আর সে-কাব্যধারার সঙ্গে পুরোপুরি না হলেও আমরা অনেকেই কিন্তু কিছুটা পরিচিত।

একজন একবার বলেছিলেন—নারী, প্রেম, সুরা আর হতাশা উর্দু কবিদের এই চারটিই হল সবচাইতে প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র। হয়তো এইজন্যই কিনা জানি না উর্দু কবিতার একটা মোটা অংশই দারুণভাবে রোমান্টিক। ফয়েজের কবিতাতেও এই রোমান্টিকতা আছে বেশ সুন্দরভাবে। একবার তিনি লিখেছিলেন:

তেরা জমাল নিগাহোঁমে লেকে উঠা হুঁ
নিখর গয়ি হ্যায় কঁজা তেরে পয়েরযানকিসি,
নসিম তেরে শবিস্তান সে হোকে আই হ্যায়—
মেরে সহেরমে মহেক হ্যায় তেরে বদনকিসি।

একটু বাংলা করে বলি : সারারাত তোমার স্বপ্ন দেখে সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি চোখের তারায় তুমি ভরে রয়েছ, রোদ্দুর-ভরা সকালটা ঝলমল করে উঠল যখন, তখন তাকে মনে হল—তোমার পরিধেয় বস্ত্রের স্বচ্ছ মাধুর্যের মতো, হাওয়াটা ভারী ছিল তোমার দেহের মাদক গন্ধে, কারণ আমি তো জানি—এ-হাওয়া তোমার নিদ্রাশিথিল দেহবল্লরি ছুঁয়ে এসেছে।

আরেকবার লিখেছিলেন:

বুঝা যো রজ্‌নে জিন্দা তো দিল এ সমঝা
কি তেরি মাংগ সিতাঁরো সে ভর গয়ি হোগী।
চমক উঠা সলাসল্‌ তো হামনে জানা হ্যায়
হে সহের তেরে রুখপর নিখর গয়ি হোগী।

জেলের ছোট্ট একটা সেলে বন্দি রয়েছেন কবি। আলোর জন্য ছোট্ট একটা প্রদীপ। কবি বলছেন—আলো নিভে গেলে বুঝলাম রাত হয়েছে। ভাবলাম, তোমার শূন্য সিঁথি হয়তো ভরে গেছে তারার মুক্তোতে। তার অনেকক্ষণ পর আমার হাতঘড়িটা চিকচিক করে উঠল। বুঝলাম, সকাল হয়েছে। মনে হল, তোমার মুখটা হয়তো সকালের মিঠে রোদ্দুরেব মত রক্তিম হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এই রোমান্টিকতাতেই আটকে থাকেননি ফয়েজ। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সামাজিক ও জাগতিক চেতনাকে তিনি যুক্ত করেছেন—প্রিয়া, গোলাপ আর বুলবুলির গানের রোমান্টিকতার ঐতিহ্যের সঙ্গে। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কবিতা সহজ প্রেমের কবিতা হলেও তারই মধ্যে দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন সামাজিক অন্যায় ও বেদনাকে, প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে। আর তাতেই তার পুনরুজ্জীবিত গজল সম্পূর্ণ নতুন হয়ে উঠেছে। ফয়েজ একবার বলেছিলেন: হে প্রেয়সী, আগের মতো ভালোবাসা তুমি আর আমার কাছে চেয়ো না, একসময় তোমার জীবনেই নিজেকে আলোকিত ভাবতাম। ভাবতাম, তুমিই সব। কিন্তু

আজ ভাবনাটা বদলে গেছে। কারণ—আজ রক্তের রঙে রাঙা, খাদ্যাভাবে জর্জরিত, ক্ষতবিক্ষত জীবন পথে ঘাটে বাজারে সংগ্রামের আগ্নেয় চুল্লিতে জ্বলে-যাওয়া হাজার হাজার মানুষের জীবন্ত কঙ্কালের মিছিল, ওইদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি আমাকে এখনও অনেক কাজ করতে হবে। আর তাই:

আভিভি দিলখুশ হ্যায় তেরা হুস্ন মগর কেয়া কিসে
ঔরভি দুখ হ্যায় জমানেমে মুহব্বত কি সিবা
রহতে ঔরভি হ্যায় বসলকি রাহাতকি সিবা।
মুঝসে পহেলেসে মুহব্বত মেরে মেহবুব না মাংগ।

জানি, এখনও তোমার রূপযৌবন অটুট রয়েছে, কিন্তু আমি আর তোমার কাছে যেতে পারব না। তোমার প্রেমের দুঃখের চাইতেও অনেক বড়ো দুঃখ আমি দেখেছি। তোমার সাথে মিলনের পথ ছাড়াও অনেক পথ আছে। তাই আগের মতো ভালোবাসা আমার কাছে আর তুমি চেয়ো না।

একবার ফয়েজ আহম্মদ ফয়েজকে বলা হয়েছিল পাকিস্তানি সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণের। ফয়েজ তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন—পাকিস্তানি সংস্কৃতির শিকড় রয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে। আর সেই জন্যই তাঁর মৃত্যুর বেদনা আমাদেরও বিদ্ধ করে, যন্ত্রণা দেয়। আর সেইজন্যই আমাদের রাষ্ট্রপতি জৈল সিং ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধিকে শোকবার্তা পাঠাতে হয় এই উপমহাদেশের অন্যতম সেরা উর্দু কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

২১.১১.১৯৮৪

২৫

সকাল থেকেই মনটা খারাপ হয়ে আছে। সেই যে বেতারে খবরটা ভেসে এল, তার পর থেকেই। মানসিক প্রস্তুতি ছিল না একেবারেই। যাকে মৃত্যু বলি, এই-ই তার ধরনধারণ। যখনই আসে, যত নোটিশ দিয়েই আসুক, বড্ড অপ্রস্তুত করে ফেলে। আর সম্ভবত এই অপ্রস্তুত পটভূমিতে আঘাত করে বলেই, সেই সকাল থেকে বেতার শ্রুত খবরটা মগজের কোষে কোষে বারবার অনুরণন তুলছে—'কবি দিনেশ দাস আর নেই'—এই কথাটি।

সবার বয়স থাকে, কিন্তু কবিদের, এবং কবিতার কোনো বয়স নেই। যেদিন তার আবির্ভাব ঘটল, সেদিন থেকেই সে চিরকালের। দিনেশ দাশের

কবিতা, কবে থেকে এবং কবে পর্যন্ত পড়ছি—এরকম ভাবনা, প্রায় অহেতুক। তবু বলব আমাদের বয়স যখন অনেক অনেক কম, চোখ দুটো যখন হাজারো স্বপ্ন দেখবার অপেক্ষায়, বুকের ভেতর যখন পাহাড়ের চূড়োটার মুঠি চেপে ধরবার দুরন্ত সাহস, সেই সময় দিনেশ দাসের কাছ থেকে আমরা একটা আশ্চর্য কবিতা পেয়েছিলাম:

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো—
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু!
শেল আর বম হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শাণ দিও বন্ধু!
বাঁকানো চাঁদের শাদা ফালিটা
তুমি বুঝি খুব ভাল বাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে।

পুরো কবিতা কারুর মনে থাকে, কারুর থাকে না, কিন্তু বাংলা কবিতাপাঠক এমন কেউ কি আছেন যিনি 'এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে'—এই পঙ্‌ক্তিটি ভুলে গেছেন?

সেদিন আর এক কবির আর একটি কবিতার পঙ্‌ক্তিও আমাদের আলোড়িত করেছিল—সুকান্তর 'পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।' আজ ভাবতে ইচ্ছে করছে,—এই দু-টি কবির ওই দুই কবিতা-পঙ্‌ক্তি আরও কত কবির ভাবনাকেই না উসকে দিয়েছে। দিনেশ দাসকে তো বলাই হত 'কাস্তে কবি'। এটা খুব ভালো লাগে না। একজন কবিকে কোনো একটা কবিতার বা কবিতার পঙ্‌ক্তির পরিচয়ে আটকে রাখতে। 'কবি মানেই তো একটা বহমান নদী—সে এক কূল ভাঙবে এক কূল গড়বে, সে এ-গাঁয়ের পাশ দিয়ে, ও-শহরের বুক দিয়ে বয়ে যাবেই। আর তার প্রতিটি বাঁকে থাকবে অভাবনীয়ের দীপ্তি।' দিনেশ দাসের কবিতাতেও এমনি বাঁক আছে অনেক। আর তাই তাঁর মৃত্যুর সংবাদকে সামনে রেখে যখন তাঁর কবিতার পাতাগুলো ওলটাচ্ছি, তখনও তাঁকে কিন্তু বেশ নবীন ও সতেজ বলেই মনে হচ্ছে।

নীল আকাশের নীলগুলি সব নিংড়ে আনো
নতুন মেঘের সজল কালো মন ভোলানো নিংড়ে আনো।
হাজার কচি করুণ চোখে মেঘের কাজল বুলিয়ে দাও

ককিয়ে ওঠা কান্নাগুলি ভুলিয়ে দাও।
আজকে ছোট দোলনাখানি দুলিয়ে দাও—

এ-কবিতা কি পুরনো হবার? এবং যাঁরা এ-কবিতা পড়েছেন, তাঁদের মনে আছে, এ-কবিতার মূলে কিন্তু অবহেলিত উপেক্ষিত শিশুদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য মমত্ববোধ। অথচ প্রকাশটা দেখুন কেমন রোম্যান্টিক। একসময় রোম্যান্টিকতাকে গালাগালি বলে ভাবা হত, কিন্তু আজ অনেকেই ভাবতে চাইছেন যে, রোম্যান্টিকতাই মানুষকে, জীবনকে এগিয়ে দেয়। আসলে এটা এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই নিষ্ঠুর বাস্তবতা উপজীব্য হলেও দিনেশ দাসের কবিতা একটা আলাদা মাত্রা পেয়ে যায়। ধরা যাক এই কবিতাটি:

সোঁদরবন
আমার শ্যামল শিরায় ভাসিছে সারাক্ষণ
সোঁদরবন।
সোঁদরবনের আত্মা আমার রাত্রিদিন
খুঁজছে কোথায় ব্যাঘ্র-দিন
যেথা নখর
তীক্ষ্ণ থাবায় ভয়ংকর;
বর্ষাফলকে
পলকে পলকে
জীবন-মৃত্যু সম্মুখীন,
হারালো কোথায় ব্যাঘ্র-দিন? ...
সেই পুরাতন দিনগুলি আজ নির্বাসিত
শৃঙ্খলিত
দুর্বিপাকে
তাকিয়ে থাকে
ফাঁক পেলে তারা ছিঁড়বে রুগণ্ সভ্যতাকে
আফ্রিকাবই জাফরি-ফাঁকে
তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু এখানেই তিনি আটকে থাকেননি। তাঁর রোম্যান্টিকতা আকাশ থেকে খসে-পড়া কিছু নয়, তার ভিতটা রয়েছে নিষ্করুণ বাস্তবে, দেশের মাটিতে, দেশের মানুষে। যা কিছু লিখেছেন দিনেশ দাস, তার সব কিছুর মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটা স্বাদেশিক চেতনা। দেশকে ভালোবাসতেন,

ভালোবাসতেন দেশের মাটিকে। আর এই যে ভালোবাসা—এই ভালোবাসাই তাঁর কবিতার আদি এবং অন্ত। দিনেশ দাস একবার লিখেছিলেন:

যখন যা কিছু লিখি
খস্‌খস্‌ করে খড়ে হাওয়া বয় ঠিকই
তবু সবখানে তোমারই তো নাম লিখি।
যে-আগুন জ্বলে শিমুলের ডালে
টকটকে লাল কুঁড়ি
যে আগুন জমে আমের মুকুলে
কাঁচা সোনা গুঁড়িগুঁড়ি,
যে প্রবাহে আজ ডাকলো কোকিল
পলাশের ডালে একা
ভোরের হলুদ হাসির রেখায়
স্বচ্ছ মেঘের সোনালি লেখায়
খয়েরী চিলের পাখায় পাখায়
তোমারই তো নাম লেখা।
বারে বারে যেন ফিরে আসি এই বৃষ্টি-সবুজ কোলে,
খেলা করি যেন তোমার চোখের শিশিরেতে টলেটলে
শুধু মনে হয় মরণের লাখো কালো-আবলুশ নদী
পার হ'তে হয় যদি,
সাঁতারুর মতো ভাসব তোমার বুকে—
জীবনের জালে লাখো কোটি বার উঠে আসি আমি যদি
তোমার কোলেই ফিরবো নানান রূপে;
গাইবো আবার গান যে গানে তোমারই নাম।

কবিতাটির নাম বাংলা। দিনেশ দাস এই বাংলাতেই থাকবেন নদী হয়ে, ঘাস হয়ে, ধানের শীষ হয়ে হয়তো-বা আর কিছু হয়ে।

১৮.৩.১৯৮০

২৬

এখনও ১৪ই আগস্ট। কিন্তু আর ঠিক দু-ঘণ্টা পরেই ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে সরে যাবে এই দিনটি—আসবে আর একদিন—আজ এবং আগামীকালের ভারতবাসীর কাছে চিরনতুন আর একদিন—১৫ই আগস্ট

১৯৪৭ সালের এই দিনটিতে, ভারত যে-দিন স্বাধীন হল, সে-দিন আমরা জেনেছিলাম পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে শুধু আমরাই মুক্ত হইনি, মুক্ত হয়েছে বিশ্ব মানবতার এক বিরাট অংশ, সে-দিন আমরা বিশ্বাস করেছিলাম আমাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করবে বিশ্বের এ-প্রান্তে সে-প্রান্তে আর যাঁরা পরাধীন রয়েছেন তাঁদের মুক্তি। কেননা আমরা বিশ্বাস করেছি স্বাধীনতা এক এবং অবিভাজ্য। আর এই বোধ থেকেই আমরা যেমন আমাদের স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করেছি, তেমনি শ্রদ্ধা করেছি অন্যান্য দেশের স্বাধীনতাকে। সেজন্যই আমাদের নীতি হল প্রতিটি দেশের সঙ্গে বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কার্যকর করা। স্বাধীনতার উষালগ্ন থেকেই আমরা এই নীতি রূপায়িত করে চলেছি।

পুরোনো কথা থাক। একেবারে হাল আমলের কতকগুলি দৃষ্টান্ত নিই। গত সপ্তাহে জাকার্তায় আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাক্ষর করেছেন সমুদ্রতল সীমানা সংক্রান্ত চুক্তি। ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ক সুপ্রাচীন ঐতিহ্যগত, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই চুক্তিটিকে দু-দেশের মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌চিহ্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার কারণ এইটুকু যে আমরা আমাদের এই দুই দেশের বন্ধুত্বকে প্রসারিত করতে চেয়েছি ওই এলাকায়। খেয়াল আছে নিশ্চয়ই এখনও ক্যারাকাসে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সমুদ্রসীমানা ও আইন কী হবে তা নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রায় অন্তহীন কথা চালাচালি হচ্ছে, সে-সময়েই দু-টি উন্নয়নশীল দেশ ভারত ও ইন্দোনেশিয়া দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে ভারতের নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে ইন্দোনেশিয়ার সাবাং শহর পর্যন্ত ১৪৪ কিলোমিটার সমুদ্রপথ নিজেদের মধ্যে চিহ্নিত করে নিয়েছে। আমরা যে আমাদের প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধের অবকাশ রাখতে চাই না, এই চুক্তি তো তারই প্রমাণ।

সুধী শ্রোতৃবৃন্দকে আরও তিনটি ঘটনার প্রতি চোখ ফেরাতে বলব। ঠিক যেদিন জাকার্তায় সমুদ্রতল সীমানা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তার আগের দিন খবর এসেছে যে ভারত ও বর্মার এক হাজার ছ-শো কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তের শতকরা ৮০ ভাগের চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ হয়েছে। আশা করা যায় বাকি অংশটুকুর চিহ্নিতকরণের কাজও খুব শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ভারত ও বর্মার মধ্যে যে-সহমর্মিতা ও শুভেচ্ছা রয়েছে এটা তারই পরিণতি।

কয়েক সপ্তাহ আগে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে দু-দেশের জলসীমানা সংক্রান্ত চুক্তি। ঔপনিবেশিক আমল থেকেই এই সীমানা সম্পর্কে কিছু সংশয় ছিল, কিছু বিরোধ ছিল, কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিরোধের অবসান তো ঘটেছেই বরং দু-দেশের মধ্যে সমুদ্রসম্পদকে সদ্‌ব্যবহার করবার ও কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে সহযোগিতার এক বিস্তীর্ণ এলাকা তৈরি হয়েছে।

ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির কিছুদিন আগে স্বাক্ষরিত হয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমানা চিহ্নিতকরণ চুক্তি। পাকিস্তানি শাসকবর্গ যে-বিরোধকে সিকি শতককাল জিইয়ে রেখেছিলেন তার নিষ্পত্তি হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার মুস্তাক আমাদের ভাষায় 'চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে।'

কী করে এসব সম্ভব হল। এর উত্তর শুরুতেই বলা হয়েছে, আমরা যেমন চাই আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের অখণ্ডতা সুনিশ্চিত হোক, তেমনি আমরা চেয়েছি অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করতে। সেজন্যই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে বিলম্ব ঘটেনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাকিস্তান বা চীন সম্পর্কে এ-কথা বলা যাবে না। আমাদের দিক থেকে নিরলস চেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে আমাদের বিরোধ এখনও মিটে যায়নি। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি চীন বা পাকিস্তান যদি আমাদেরই মতো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে, অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করবার নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে তবে তাদেরও সঙ্গে আমাদেরও বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটবে। আজ তো পাকিস্তানেরও স্বাধীনতাদিবস। এই দিনটিতে তারাও কি উপলব্ধি করতে পারবে না স্বাধীনতার কোনো সীমা নেই? প্রতিটি দেশের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে তাঁরাও তাঁদের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে পারেন।

১৪.৮.১৯৮৬

২৭

রবীন্দ্রনাথের সেই অন্তঃপুরের সাধারণ মেয়ে মালতীর কথা মনে আছে তো? সেই 'পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু, নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প—।' রবীন্দ্রনাথেরও নানা কারণে ভালো

লাগেনি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি। সে-কথা জানিয়েও রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন, 'এ বই প্রবন্ধের আকারে লিখিলে মূল্য ইহার সামান্যই থাকিত, কিন্তু গল্পের মধ্য দিয়া যাহা বলিয়াছো, দেশে ও কালে ইহার ব্যাপ্তির বিরাম রহিবে না।' শরৎবাবু নিজেও একবার লিখেছিলেন, 'আমি শুধু গল্পলেখক তাছাড়া আর কিছুই নই।'

এই কথাগুলো এলোমেলোভাবে মনে এল শরৎবাবুর গল্প-উপন্যাসগুলো নিয়ে ভাবতে গিয়ে। শরৎবাবু একটা বিশেষ সময়ের কথা লিখেছেন—একটা বিশেষ সমাজের কথা লিখেছেন। তাঁর আগে যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন, বিজ্ঞ সমালোচকেরা বলেন, সেসব উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য—কল্পনার প্রাধান্য এবং সৌন্দর্যের সুষমা। কিন্তু শরৎবাবু ইয়োরোপীয় বিশ্লেষণ-ধারাকে প্রয়োগ করলেন সমাজ ও ব্যক্তি জীবনকে তুলে ধরতে। একে অনেকেই বলেছেন বৈপ্লবিক অভিনবত্ব। সেই অভিনবত্ব শরৎসাহিত্যকে সেদিন দারুণ জনপ্রিয় করে তুলেছিল। কিন্তু এই যে সেদিনের কথাটা বললাম, এই সেদিন কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের সেদিন। সেই সেদিন আর এই আজকের এদিন, এরমধ্যে কিন্তু অনেক ফারাক থেকে গেছে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার সমাজ আর আজকের সমাজ এক নয়। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের মানুষ আর আজকের মানুষ কিন্তু এক নয়। ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, বাক্‌রীতি এসব কিছুই অনেকটা বদলে গেছে। সেদিনকার গল্প-উপন্যাসে নায়ক-নায়িকারা যা বলেছেন, যা ভেবেছেন তা কিন্তু আজকালকার গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে মেলে না।। তাই বলছিলাম সেদিনের সঙ্গে এদিনের অনেক তফাত। আর ওই তফাত সত্ত্বেও শরৎবাবু কিন্তু সেদিনের মতো আজও জনপ্রিয়তার প্রথম সারি দখল করে আছেন। আজকের নব্য যুবক-যুবতীদেরও দেখছি, শরৎবাবুর কোনো গল্প-উপন্যাস পড়া শুরু করলে তা শেষ না করে ওঠে না। আর যাঁদের মাথায় চুলে পাক ধরেছে, তাঁদেরও দেখি আগের মতোই অভিনিবেশ সহকারে শরৎবাবু পড়তে। আশি বছর পেরোনো এক বৃদ্ধ আত্মীয়কে তো শরৎরচনা থেকে রীতিমতো মুখস্থ বলতে শুনেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল শরৎবাবু কী করে কাল-পেরোনো হলেন। এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে ওই মালতী, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎবাবুর উক্তিগুলো মনে পড়েছিল। শরৎবাবু গল্প বলতে পারতেন—চুটিয়ে গল্প বলতে পারতেন।

আর এই গল্প বলার ভঙ্গিটা কিন্তু একেবারে দেশজ। শরৎবাবু তাঁর রচনায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর সমাজের নিয়ন্ত্রণাধিকার, চারিত্রিক পার্থক্য ও আদর্শগত সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট জটিল অন্তর্বিপ্লব, সামাজিক বাধানিষেধের বিরুদ্ধে প্রেমের বিদ্রোহ, নারীর স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি নানারকম জটিল বিষয়ের উপস্থাপনা করেছেন। কিন্তু তাঁর ওই গল্প বলার গুণেই এসব বিষয় আর জটিল হয়ে থাকেনি, সহজ ব্যাপ্তিলাভ করেছে। তাঁর গল্প পড়তে আমাদের কখনো হোঁচট খেতে হয় না, সে-গল্প তরতর করে এগিয়ে চলে, যেমন চলত রূপকথার গল্পগুলো। এইখানটাতেই শরৎবাবুর জিৎ।

শরৎবাবু ভালো গল্পই শুধু লিখতেন না, গল্প লেখা শেখাতেনও। আমার হাতের কাছে একটা বই রয়েছে 'সাহিত্যিকের চিঠি'। এই বইটিতে মিনতি গঙ্গোপাধ্যায় সংকলন করেছেন বেশ কয়েকজন সাহিত্যিকের চিঠি। তার মধ্যে শরৎবাবুর লেখাও বেশ কয়েকটি চিঠি আছে। এইসব চিঠিতে গল্প লেখার ব্যাপারে শরৎবাবুর কিছু পরামর্শ রয়েছে। যেমন ধরুন একটি চিঠিতে লিখেছেন, "তোমাকে মোটামুটি একটা উপদেশ দিই। রচনায় 'অধ্যায়' ভাগ করিতে হয় এবং গ্রন্থকারের মুখে রচনার বিষয়টা চোদ্দ আনা না দিয়া পাত্র-পাত্রীর মুখে দিতে হয়। শুধু যেখানে তাহা পারা যায় না, সেইখানেই কেবল গ্রন্থকারের মুখের কথায় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। আর একটা কথা এই যে, বেশী খুঁটিনাটি লইয়া আপনাকে এবং পাঠকদের কাহাকেও দুঃখ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। অনেক জিনিস তাহাদের কল্পনার জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু কতটা গ্রন্থকার বলিবে এবং কতটা পাঠকেরা সম্পূর্ণ করিয়া লইবে এই জিনিসটা শিক্ষাসাপেক্ষ এবং বুদ্ধিসাপেক্ষও বটে।" আর একটা চিঠিতে লিখেছেন, "আরম্ভটা সকলের চেয়ে শক্ত। এইটার ওপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর করে। তার পর গল্প লিখিতে গিয়া যাহাকে 'প্লট' বলে তাহার প্রতি অতিরিক্ত মন দেবার দরকার নাই। যে-যে লোক তোমার বইয়ে থাকিবে, প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয় ... নইলে প্রথমেই গল্পের 'প্লট' লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না। যাহার হয় তাহার গল্প ব্যর্থ হইয়া যায়।" আর এক জায়গায় লিখেছেন, "যত ঘটনা ঘটে তার সবটুকুই তো লিখতে নেই, কতক পরিস্ফুট করে বলা; কতক ইঙ্গিতে সারা, কতক পাঠকদের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া।" এ-চিঠি সে-চিঠি থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এই যেসব বক্তব্য তুলে

ধরা হল তাতে কি বোঝা যায়, শরৎচন্দ্রের গল্পের ধারণা কী? মনে হয় শরৎবাবু, শরৎবাবুর উপন্যাস, গল্প আমাদের আরও অনেকদিন গল্প লেখা শেখাতে পারবে। আদর্শ গল্প উপন্যাসের মডেল হয়ে থাকবে। রূপকথার গল্পগুলো আজও আমাদের যেমন করে টানে, শরৎবাবুর গল্পগুলোও তেমন আমাদের মনের মধ্যে গল্প শোনার তাগিদটাকে বার বার জাগিয়ে দিয়ে যাবে। এইখানেই বোধহয় তিনি কালাতিক্রমী।

[তারিখের উল্লেখ নেই]

২৮

কেন বলতে পারব না, তবে মাঝে মাঝেই দেখেছি, কোনো কোনো কবিতার এক-একটা লাইন হঠাৎ মনের কোণে ট্র্যাফিক পুলিশের মতো এমনভাবে হাত উঁচিয়ে দাঁড়ায় যে, আর কিছু করবার থাকে না। ব্যস্তসমস্ত গাড়ির সওয়ারের, ট্র্যাফিক পুলিশের হাতের দিকে চোখ আটকে রাখার মতো কবিতার ওই লাইন বার বার গুনগুনিয়ে যাওয়া ছাড়া। এমনি একটি লাইনের পাল্লায় পড়েছি আজ ক-দিন ধরে। যা-ই ভাবছি, যা-ই লিখতে চাইছি, ঠিক তার আগে মনের জানালায় কড়া নেড়ে চলেছে ফণিভূষণ আচার্যের কবিতার পঙ্‌ক্তি : "অজস্র নির্বোধ লাশ বয়ে আমরা হেঁটে চলেছি হাজার মাইল বালি ভেঙ্গে।" আবার এই লাইনটির গুনগুনানি শেষ হতে না হতেই দেখছি আর একটি ছত্র আর্ত চিৎকারে খান খান করে ভেঙে পড়ে বলছে : "রানুদি আমরা সব একে একে ধসে যাচ্ছি পুরাতন মিনারের মতো।" কিংবা সেই নিদারুণ হতাশার দীর্ঘশ্বাস : "আমাদের চোখে কোন নীল হ্রদ নেই।"

কিন্তু কবিতা নিয়ে তো আজ লিখতে বসিনি। আজ লিখবার ইচ্ছে ছিল মানবিক সংহতি নিয়ে। ভেবেছিলাম যে-মানুষ ঘর বাঁধে, যে-মানুষ ঘর ভাঙে, যে-মানুষ কাছে আসে, যে-মানুষ হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দূরে সরে যায় তার কথাই লিখব। কিন্তু মাঝখান থেকে উঁকি দিল ওই কবিতার লাইনগুলো। বিরুদ্ধ ভাবনা কি? তা তো নয়। মূল্যবোধ ভেঙে যাওয়া, নূতন মূল্যবোধে গড়ে না-ওঠার বেদনাই তো এই কবিতা-পঙ্‌ক্তির জন্মদাত্রী। এবং আমিও সেই কথাই বলতে চাই—আমাদের এই চারপাশের দিকে চোখ রেখে কী দেখছি? একদিন যাকে বীভৎস, কুৎসিত, প্রগতিবিরুদ্ধ জেনে রুখে

দাঁড়িয়েছিলাম। বুকের রক্ত ঢেলে যে আদর্শ, উদার মানবিকতার যে-আদর্শকে বরণ করেছিলাম, আজ দেখছি সেই আদর্শই ভেঙেচুরে যাচ্ছে। যাকে ঘিরে আমার সত্তা পুষ্পিত হয়েছে, ধর্মান্ধতা, পাশবিকতার আঘাতে তাকেই চেষ্টা চলছে মেরে ফেলার— "প্রতিটি পথের মোড়ে মৃত্যু আসে নানা ছদ্মবেশে। সন্তানের শোণিতের দাগ বেড়াচ্ছেন বয়ে পথে, ইঁদারার কাছে কিংবা পুকুর ঘাটে, কত যে জননী।" কেমন অদ্ভুত লাগে যা গড়ি তাই ভাঙি। মানুষ কি কোনোদিন তার পূর্ণতাকে পাবে না? যে-পূর্ণতায় জাতিভেদ, ধর্মের ভেদ, বর্ণের ভেদ মুছে যায়—বেঁচে থাকে মানুষ—চিরকালের মানুষ। মনে পড়ছে সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের একটি কবিতা :

ওই ওই ওই যে খানিকটা দূরে নিশানের মতো ব্যগ্র একটা পলাশ
গাঢ় লাল হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছেন,
হ্যাঁ, ওটা পেরিয়ে ব'য়ে
এক ক্রোশ গেলেই পাবেন খেয়াঘাট। আপনি
নিশ্চিন্তপুর যাবেন ;—বলেই
সেই পথচারী আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হলো
ভেবে দ্রুত উল্টো দিকে হেঁটে
ক্রমশ বিদায়ে ছোট, আরও ছোট হয়ে আসা উত্তরের মতো
বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেলেন।
আমি এমন সহজে খেয়াঘাট নদীপার হয়েই যে
নিশ্চিন্তপুরের প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া যায়
জেনে হাঁটতে হাঁটতে আকাশের সুনীল উদারতার নীচে একা হাঁটতে হাঁটতে
খেয়াঘাটে এসে হায়! ভালবাসার মতো দৈব নৌকাগুলি সব
স্পষ্ট মাঝিহীন দেখে
হঠাৎ রাজ্যের ক্লান্তি
অট্টহাসে ঢেউ-এর দ্রুততা
আর থেকে থেকে ঊর্ধ্বে ব্যাকুল বৃত্তের ছলে ক্রমাগত শূন্য আঁকা
চিলের চিৎকারে
মনে হল কোনও প্রশ্ন সম্পূর্ণ উত্তর-ভরা পূর্ণতাকে কখনো পাবে না!

তাহলে? তাহলে কি আমাদের ভাণ্ডারে শুধুই হতাশা? মানুষ কি চিরদিনই বাঙালি-অবাঙালি, ভারতীয়-অভারতীয়, সাদা-কালো, হিন্দু-মুসলমান কি খ্রিস্টান হয়েই থাকবে? কোনোদিনই পুরো মানুষ হবে না?

একটা গল্প মনে পড়ছে—অনেকদিন আগে পড়া, একটু এদিক-ওদিক হয়ে যেতে পারে—তবু বলছি—একজনকে কতকগুলো টুকরো কাগজ দিয়ে বলা হয়েছে পৃথিবীর মানচিত্র তৈরি করতে। লোকটা এদিক-ওদিক দেখে টুকরোগুলোকে জড়ো করে করে একটা মানুষের মূর্তি করল, দেখল উলটোপিঠে পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা হয়ে গেছে। কাগজটার একপিঠে মানুষ আর একপিঠে মানচিত্র আঁকা ছিল। সত্য বোধ হয় এই-ই। মানুষকে পুরো মানুষ করে জানলে খণ্ড খণ্ড পৃথিবীটাও একটা ঐক্যে বাঁধা পড়ে। উলটো করেও দেখা চলে ব্যাপারটা—দেশের মাটিতেই তো বিশ্বময়ীর আঁচল পাতা। তাই স্বদেশের বুকেই উত্তর মেলে এবং বলতে হয়:

তোমার জন্যই
আমাকে গাইতে হবে গান আজও আগেকার মতো
করতে হবে জড়ো কবিতার জাগর ভগ্নাংশগুলো
যেমন প্লাবন চলে গেলে কৃষক কুড়িয়ে নেয় শস্যকণা তার
তোমার জন্যই
দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ঘরের চৌকাঠ ধরে এই অবেলায়।

কিংবা ওপার বাংলার কবি জিয়া হায়দারের মতো :

আমি তো থেকেই যাবো এখানে, কেবলি প্রতীক্ষায়,
ধু ধু প্রান্তরের বুকে কোনোদিন যদি
একখণ্ড সবুজ ঘাসের হাসি মায়ের আঁচল হয়ে যায়,
আকাশ ও রৌদ্র, যদি, অবশেষে সিক্ত করে নিজেরি সংসার।

[তারিখের উল্লেখ নেই]

২৯

কার্তিকের শালিধান যেমন বৃষ্টির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, বনবিড়াল ডাকলে কৃষক যেমন কোদালি মেঘের দিকে চেয়ে থাকে, আমরা তেমনি তোমার জন্য অধীর আগ্রহে ছিলাম। আমরা তোমার জন্য সহিষ্ণু প্রতীক্ষায় ছিলাম, ঘণ্টা যদি বছর হয়, তবে কয়েক বছর ধরে; বছর যদি যুগ হয়, তবে বহুযুগ ধরে, লালমোরগ যেমন করে সারাজীবন ভোরকে ডাকে, তেমনি করেই আমরা তোমাকে ডেকেছি ; তোমার অপেক্ষা করেছি হে স্বাধীনতা।

পলাশির আম্রপ্রান্তরে যে-সূর্যাস্ত ঘটেছিল, ৪৭-এ লালকেল্লার প্রাকারে যে-সূর্যোদয় ঘটল তার মাঝখানে যে-সময়টুকু থমকে দাঁড়ালো সেটা শ-দুই বছরের। তবু সেই সময়,—সীমাহীন যন্ত্রণার অনন্ত সেই কাল; তাই স্বাধীনতা, তোমার জন্য আমাদের অপেক্ষা। কারণ, স্বজন স্বস্তি-হারানো-শ্মশানের ভস্ম-অপমান-শয্যার মধ্য থেকেও আমরা তো জানতাম—

তুমি আস্‌লে, সুবাতাস বইবে
তুমি আস্‌লে সাহসী পুরুষেরা ফিরে আসবে
তুমি আস্‌লে জননীর পুত্ররা দীর্ঘদেহ হবে,
তুমি আস্‌লে সবৎসা গাভীগণ মধুময় হবে,
তুমি আস্‌লে, নিষ্পত্র বৃক্ষ মুকুলিত হবে,
তুমি আস্‌লে, শস্যের দানা পরিপূর্ণ হবে।

হে স্বাধীনতা তোমার জন্য, তোমার জন্যই হে স্বাধীনতা, আমার পূর্ব-প্রজন্মের মানুষেরা বুকের রক্তে চোখের জলে উর্বর করেছেন এ-দেশের মাটি। তোমার জন্যই হে স্বাধীনতা, আমার দেশের কত মানুষ ঘর ছাড়লেন, হলেন ঘরহারা, ঘর ফিরে পাবে বলে। তোমারই জন্য হে স্বাধীনতা, আমাদেরই পূর্বপুরুষরা শোষণে জর্জরিত হলেন—শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন চোখে এঁকে। তোমারই জন্য হে স্বাধীনতা, আমাদের বাপ-পিতেম'র পোড়ো ভিটেও অটল দুর্গের মতো বুকের গোপনে আশাকে বাঁচিয়ে রাখল। তোমারই আকাঙ্ক্ষায় ফলবতী হয়ে। হে স্বাধীনতা, তাঁরা, আমাদের দেশ অনুর্বর নয়, প্রতিটি দেশেরই রয়েছে নিজস্ব পুনর্জন্ম—এ-বিশ্বাস বুকে বেঁধেছিলেন।

হে স্বাধীনতা, সহজ ছিল না সে-সময়। অসময়, তীক্ষ্ণ বল্লমের ফলা বিঁধিয়ে দিতে চেয়েছে বুকে, হতাশা উঁচু শিরটাকে নোয়াতে চেয়েছে মাটিতে ; পরাজয় মুখ বার করে বিবর্ণ করতে চেয়েছে সত্তাকে, ঘুণপোকার মতো কুরে কুরে খেয়ে স্বপ্নকে জীর্ণ করতে চেয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা।

তবু তোমারই জন্য, হে স্বাধীনতা, ন্যাংটা ফকির তুলে নিয়েছেন পাঞ্চজন্য। সে শঙ্খস্বর ছড়িয়ে পড়েছে হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারিকা। তারই ডাকে তোমার সন্তানরা ক্ষুধার্ত যারা, তৃষ্ণার্ত যারা, তোমাকে মা ডাকতে লজ্জা পায় যারা, রাস্তা পার হতে ভয়ে যাদের বুক কাঁপে। মানুষকে যারা ভয় পেত, তারাই জীবনকে তুচ্ছ করে অন্ধকারকে আলোয় ঢাকতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সংগ্রামে তোমারই জন্য হে স্বাধীনতা।

আনন্দ-বেদনার, সুখ-দুঃখের, শৌর্য-সৌন্দর্যের আলিম্পনে। বড়ো বিচিত্ররূপিণী তুমি, হে স্বাধীনতা! তোমারই জন্য হে, স্বাধীনতা! তোমারই জন্য জীবন পায় মহত্ত্ব। মৃত্যু হয় মহিমান্বিত। একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে তুমি, তোমার সৌরভ ছড়িয়ে দাও দিগ্‌দিগন্তে। আমরা তুচ্ছতাকে অতিক্রান্ত করি, তাকে টপকে যাই, বিশ্বকে বুকে বাঁধি প্রগাঢ় আলিঙ্গনে। তোমারই জন্য, হে স্বাধীনতা, তোমারই জন্য। তোমাকে পেয়ে আমাদের হৃদয় সূর্যের আগুনে তুষারের মতো গলে যায়—ঝরনা হয়, নদী হয় ; সে-নদীতে খেলে যায় সবুজ সোনালি ঢেউ। ফসলের মাঠে ঝরে কৃষকের হাসি। মজুর-যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশি, অসম্ভবের টুঁটি চেপে ধরে তোমারই জন্য। হে স্বাধীনতা, দুরন্ত জীবন, পায়ে পায়ে হাঁটে অ্যান্টার্কটিকার তুষারমেরুতে তোমারই জন্য। হে স্বাধীনতা, অফুরন্ত যৌবন ছিন্নভিন্ন করে নীল আকাশের স্তব্ধ যবনিকা।

এক-একটি বছর যায়, এক-একটা বছর আসে, স্বাধীনতা। তোমার চির-বসন্ত যৌবন আমাকে গর্বিত করে, আমাকে উদ্‌বুদ্ধ করে, আমাকে অনুপ্রাণিত করে, মহত্ত্বের নব নব দিগন্তকে স্পর্শ করে, বড়ো কৃতজ্ঞ তোমার কাছে, হে স্বাধীনতা।

কিন্তু কী লিখছি আমি! কার কথা! স্বাধীনতা, তোমাকে অবয়ব দিতে গিয়ে যেসব শব্দের পর শব্দ সাজাই, তাতে দেখি, আমার দেশের সীমার বাইরেরও অনেকের মুখ। এক-একটি পঙ্‌ক্তিতে কখনো উচ্চারিত হন বাংলাদেশের আবু জাফর ওবায়েদুল্লা, শামসুর রাহমান, কখনো সোচ্চার হন আফ্রিকার লিওপোল সেন্‌ঘর, ডেভিড বিয়ফ্‌, আগস্টিন হো, কখনো আবার গুঞ্জন করে ওঠেন প্যালেস্তিনের দারভিল। কী এক আশ্চর্য সেতুবন্ধন তুমি, হে স্বাধীনতা। এদেশ-সেদেশকে একাল-সেকালকে বেঁধে রাখ অবিভাজ্য মানবতার বিনি সুতোর ডোরে। হে স্বাধীনতা, তুমিই উদ্ধার, তুমিই পরিত্রাণ।

[তারিখের উল্লেখ নেই]

৩০

কলকাতায় সব কিছু তাঁরই ইচ্ছেয় হয়। আমি যন্ত্র—তিনি যন্ত্রী। কোনো কিছুই নিজের থেকে করবার নেই ; সবই তিনি করিয়ে নেন। ধরুন, একদিন,

কী জানি কী পুণ্যবলে আপনি হঠাৎ কিছু বাড়তি সময় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, দেখা করে আসি অমুক বন্ধুটির সঙ্গে. অনেক দিন বলেছে, যাওয়া হয়ে ওঠেনি। পাপক্ষালন করতে, মনস্থির করে ফেললেন ওই বাড়তি সময়টুকু বন্ধু-সন্দর্শনেই সদ্ব্যবহার করবেন। বেরোলেন, বাসস্টপে দাঁড়ালেন, বাস এল,—'ঠাঁই নেই, ছোটো সে তরী'। ওঠা হল না। দ্বিতীয় বাসটির অপেক্ষায়, আরও কিছু সময় কাটল। সে-বাসটাও এল, কিন্তু না! এটাতেও ওঠা হল না। তার পরের বাসটা যখন এল ততক্ষণে মেজাজ তিরিক্ষি করে ঘড়ির দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল—'নাই, নাই, নাই যে বাকি সময় আমার'। শেষের প্রহর অপূর্ণ রেখেই ঘরে ফিরলেন।

কিংবা ধরুন, ভেবেছেন একটা সিনেমায় যাবেন। আপনি সময়ের দাস, সময় আপনার দাস নয়। তাই আগে থেকে প্ল্যান করে, মুড্ এনে, সিনেমায় যাওয়াও সম্ভব নয়। আজ ওই বাড়তি সময়ের মন-উড়ু করা তাগিদে, গিয়ে দাঁড়ালেন—আপনার পছন্দসই ছবি চলছে—এমন একটা হলের সামনে। গিয়ে দেখলেন, রেসে আপনি হেরে গেছেন। আপনার পৌঁছোবার আগেই ঝুলছে—House Full। এটা না পেলে ওটায় যাব ভেবে যে-হলে যাবেন, সেখানেও সেই একই ঘোষণা—'ঠাঁই নেই'। কী করবেন? বিধাতা আপনাকে লেট-লতিফের মর্যাদায় আসীন দেখতে চান। অবশ্য পকেটে রেস্ত কিছু বেশি থাকলে হলের আশে-পাশে প্রজাপতির মতো ফুরফুর করে উড়ে বেড়ানো ২/১টা টিকিট খপ করে ধরে ফেলে বিধাতার চক্রান্তকেও আপনি ব্যর্থ করে দিতে পারেন। কিন্তু ক-জনের পকেটেই-বা বাড়তি রেস্ত থাকে? অতএব বন্ধুর বাড়িও গেল, সিনেমাও গেল; আপনার ভাবনা কিন্তু গেল না। এবার ভাবলেন যাওয়া যাক খেলার মাঠে। যদি খেলাটা হয় দুই নামী টিমের খেলা, তবে তো কথাই নেই। টিকিটের সন্ধানে আপনাকে উঠতে হবে ময়দানের গাছগুলোর মগডালে পাখির মতো। ২/১টা টিকিট যদি তখনও থেকে থাকে, তবে সোনার মটর-দানার লোভ দেখিয়ে, তাদের ধরতে হবে। না! তাও সম্ভব নয়। আর খেলা যদি হয় ছোটো দলের ভালো খেলা—হয়তো টিকিট পেয়েও যাবেন, কিন্তু বলুন, গ্যালারিতে ৪/৫ জনের সঙ্গে বসে কি খেলা দেখা যায়? অতএব, না! খেলার মাঠও আপনার সময় কাটাবার সঙ্গী হতে পারল না।

দূর ছাই! কলকাতা নয়। বাড়তি সময়টুকু কাটিয়ে আসি কলকাতার বাইরে কোথাও গিয়ে। এবংবিধ ভাবনায় ভাবিত হয়ে আপনি পৌঁছে গেলেন শিয়ালদহ স্টেশনে। সেই শিয়ালদহ স্টেশনে, যেখানে প্রতিদিন শ-চার পাঁচেক ট্রেনের ছোটাছুটি করবার কথা ; সেই শিয়ালদায়। যে স্টেশন দিয়ে প্রত্যেক দিন লাখ ১০/১২ যাত্রীর চলাফেরা করবার কথা। যাকগে, ট্রেনটা তো অন্তত ঠিকমতো পাওয়া যাবে। কিন্তু গিয়ে দেখলেন বিধাতার সেই অপূর্ব রসিকতা। ছাদে পর্যন্ত ভিড়, কিন্তু ট্রেন-বাবাজির নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু। বিদ্যুৎ নেই, —কখন তিনি আসবেন, কেউ তা জানে না। কিছুক্ষণ থেকে, ঘামে জল হয়ে, যখন বেরিয়ে আসবার কথা ভাবছেন, তখনই হয়তো ট্রেনটা নড়ল। আর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেখলেন—আপনার ফেরার সময় হয়ে গেছে।

তাহলে কলকাতার বাইরে যাওয়ার আপনার সুবিধে হল না। এবার ভাবলেন, যাকগে। ঘর থেকে বেরোব না! রাত আঁধারই হোক, আর জ্যোৎস্নাই থাক, সবাই বনে গেলেও আমি ঘরেই থাকব। হাতের কাছে ২/১টা বই জমে আছে। হয়, তাই শেষ করব, আর না-হলে টি.ভি.-তে চোখ রাখব। কিন্তু তাও-বা হল কই? যেই-না টি.ভি.-র বাটন্ টেপা, নয়-তো বইয়ের পাতা ওলটানো—অমনি লাইট গেল নিভে। মনে পড়ল খুব ছোট্টবেলার কথা। একটু বেশিক্ষণ পড়াশুনো করলেই, দিদিমার সস্নেহে ভর্ৎসনা শুনতাম—'অত পড়িস্‌নে দাদা, ওইটুকু মাথায় কত আর ধরবে?' আজকালকার দিদিমারা এ-ধরনের কথা হয়তো বলেন না। তা মন্দ লাগে না, সেকেলে স্নেহময়ী দিদিমার ভূমিকায়, বিদ্যুৎসংস্থাকে ভাবতে।

অতএব পড়াশুনোও লাটে উঠল। এবার কী করবেন? কী করা যায়?—ভাবনার জন্য গিন্নির কাছে চা চাইলেন। জবাব এল—চিনি বাড়ন্ত। চিনির কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়বে আলুর কথা। তিনি ঠিক বাড়ন্ত না হলেও, তাঁকেও সমীহ করে চলতে হয়। একদিক থেকে মন্দ নয়। খাদ্যে সুগার কনটেন্ট বেশি থাকলে, কীসব জানি রোগ হয়। অতএব চা যখন নেই, তখন ভাবনার দৌড় বেশি দূর হতে পারে না। এবার ভাবলেন, অমুক অফিসে একটা কাজ আছে, কাজটা সেরে আসি। গিয়ে দেখলেন, ও-অফিসটা ঠিক আপনারই অফিসের মতো। ওটা কাজ করবার জায়গা নয়, শরীরটাকে স্লিম রাখতে, দুপুর-কাটাবার জায়গা। তাই যে-কাজ এক দিনে

হবার, সে-কাজ হতে সময় লাগে, ভাগ্যে থাকলে—এক বছর। তা না হলে তো, কথাই নেই। অতএব, ওই বাড়তি সময়টুকু কাজে ভরবেন, তারও উপায় নেই। তা হলে কী করা যায়? এ-বন্ধু সে-বন্ধু, ও-দাদা সে-দাদার খোঁজখবর নেওয়া হয়নি অনেক দিন। ভাবলেন, একটু টেলিফোন করা যাক। তার পরে কী হল? বলতে হবে? আপনি অবাক হয়ে দেখবেন, আপনার বাড়তি সময়ের, আর একটুও অবশিষ্ট নেই। পুরো সময় কেটে গেছে আপনার ঈপ্সিত নাম্বারগুলো না পেতে পেতে। আর ভাগ্যে যদি থাকে,—ধরুন, আপনি রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রহিম, করিম—এঁদের ফোন করবেন। ডায়াল করলেন রামের নম্বর, পেয়ে গেলেন সীতাকে, ডায়েল করলেন সীতার নম্বর হয়তো মিলে গেল করিমকে। আর তাও যদি না হয়? তবে শুনুন — শব্দকল্পদ্রুম।

কিন্তু থাকগে এই ফুল্লরার বারোমাস্যা। কিন্তু ফুল্লরার বারোমাস্যা তো দুঃখের কাহিনি। কিন্তু এই যে অভিজ্ঞতা এটা কি দুঃখের? ভালোই তো নিজের ইচ্ছেকে ঘুম পাড়িয়ে সব কিছু তাঁরই ইচ্ছেয় হয়ে যাওয়া! এই তো সুখে থাকা।

[তারিখের উল্লেখ নেই]

৩১

১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর। গুজরাটের পোরবন্দর, পুরোনো নাম কৃষ্ণসখার নামে, সুদামাপুরী। সেদিন কৃষ্ণা দ্বাদশী রাতের আকাশে নতুন কোন নক্ষত্র জ্বলজ্বল করে উঠেছিল কি না জানি না, কোন দৈববাণী শোনা গিয়েছিল কি না কিংবা ত্রাণকর্তার আবির্ভাবমুহূর্তের ঝড়-ঝঞ্ঝা ছিল কি না তাও জানা নেই। শুধু জেনেছি, বহু দিন পরে জেনেছি, সেদিন ভারতের কোটি কোটি সাধারণ পরিবারের মতো পোরবন্দরের একটি পরিবারে সদ্যোজাত এক শিশু কেঁদে উঠেছিল একটু আলোর জন্য। যতদিন বেঁচে ছিলেন তিনি, সে-কান্না তাঁর থামেনি। বলে দেবার দরকার নেই এই আলোকাভিসারী মানুষটি আমাদের বাপুজি, আমাদের গান্ধীজি।

অনেক বছর তো হল, বহু স্মৃতি ইতিমধ্যে ধূসর তবুও গান্ধীজি আজও বেঁচে রয়েছেন আমাদের মধ্যে। আমাদের সুপ্ত বিবেকের মতো সবসময়

হয়তো তাকে দেখিনি। সহজিয়া পথে চলবার প্রলোভনের শিকার হয়ে হয়তো সবসময় তাঁকে মানিও না ; তবুও যখন দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াই— আত্মসমীক্ষার দর্পণে নিজের ক্ষতবিক্ষত মুখটাকে দেখি তখনই বুকের গভীর থেকে শান্তির প্রলেপের মতো তার বাণী মৃদু স্বরে বলে, 'দেখেছ, কী করেছ নিজেকে।'

কত কী তো করেছি আমরা। বড়ো বড়ো কলকারখানা করেছি, মহাকাশে পাড়ি দিয়েছি, খেতে সোনার ফসল থরে থরে সাজিয়েছি। আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকা তৈরি করেছি। তবুও তো মানুষ সুখী নয়। একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, একে অপরকে আঘাত করছে। আজও দেশে অসাম্য, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বুভুক্ষা। কেন এমন হল? হয়তো গান্ধীজি পালটা প্রশ্ন করবেন নৈতিক মূল্যবোধ কোথায়? কাজের ভেতর মানুষের প্রতি প্রেমের প্রকাশ কোথায়? হয়তো বলবেন অপরের চোখের জল তোমার চোখে জল আনবে না কেন? উত্তর খুঁজে পাই না। মনে পড়ে যায় গান্ধীজি বলেছিলেন লক্ষ্যের মতো পথটাকেও ভালো হতে হবে। আমরা পথের কথা ততটা ভাবিনি। আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে চেয়েছি, উন্নতির সর্টকাট খুঁজেছি, ত্যাগের পথে যাইনি, ভোগ করেছি ভোগের মধ্য দিয়েই, হয়তো এইটেই আমাদের অসুখ।

শুধু আমাদেরই বা বলছি কেন গোটা দুনিয়ারই তো এই হাল। ধনী রাষ্ট্র আরও ধনী হচ্ছে, গরিব রাষ্ট্রগুলো আরও গরিব। উন্নয়ন প্রয়াসে টাকা মেলে না, টাকা মেলে সমরাস্ত্রের সন্ধানে। শান্তির পরিধি ছড়ায় না, বাড়ে উত্তেজনার পরিধি। মানুষ নিজেকে টুকরো টুকরো করছে, মানুষ মানবিক ঐক্যের কথা বলছে আর নিজেকে ভাঙছে। যুদ্ধ-শেষের জন্য যুদ্ধের আগুন জ্বালানো হচ্ছে এখানে-সেখানে। প্রেমহীন বিজ্ঞান মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এখানেও তো গান্ধীজিকেই অস্বীকৃতি। এই ভারতভূমিতে একদিন মানুষকে অভিহিত করা হয়েছিল অমৃতের পুত্র বলে। অনেককাল পেরিয়ে সেই বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছিল বাপুজির কণ্ঠে। যখন তিনি বলেছিলেন, গোটা দুনিয়াই তো আমার পরিধি। সব মানুষ তো আমার ভাই। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে-অক্লান্ত সংগ্রাম তিনি করেছিলেন তার মূলেও তো ছিল এই অবিচলিত বিশ্বাস যে ভারতের মুক্তি মানবমুক্তিরই সোপান। জাতীয়তাবাদের কথাও বলতেন গান্ধীজি—বলতেন "আমাদের

জাতীয়তাবাদ তো অন্যের ধ্বংসের কারণ হতে পারে না কারণ আমরা অন্যাকে যেমন শোষণ করতে চাই না, তেমনি অন্যে আমাদের শোষণ করবে এটাও আমরা হতে দেব না।'' তিনি তো বিশ্বাস করতেন বসুধাই কুটুম্ব—সবাই আমাদের আত্মীয়। হয়তো তাকেই আমরা বলতে পারি প্রকৃত বিশ্বনাগরিক তবু তার পা ছিল স্বদেশি শক্ত মাটিতে। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও দেশের মাটিকে প্রণাম করেছেন তাতে বিশ্বময়ীর আঁচলপাতা জেনে। গান্ধীজি বলতেন আন্তর্জাতিকতাবাদী হব কী করে যদি জাতীয়তাবাদী না হই। জাতীয়তাবাদে দোষ নেই, দোষ সংকীর্ণতাবাদে, বিচ্ছিন্নতাবাদে আত্মপরায়ণতাবাদে। বলতেন তিনি, আমার ঘরের চারপাশে দেয়াল উঠুক, আমার জানালাগুলো বন্ধ থাক এ আমি চাইনে। আমি চাই বিশ্বের সমস্ত দেশের সংস্কৃতির হাওয়া আমার ঘরে খেলে বেড়াক, কিন্তু সে-হাওয়ায় আমি ভেসে যাব না। ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে সমস্ত দিক থেকে এসে মহৎ চিন্তাধারা আমাদের স্পর্শ করুক। গান্ধীজি ছিলেন সেই সংস্কৃতিমান, বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচাকেই যিনি সংস্কৃতি বলে জানতেন।

জাতিগতভাবে আজ আমরা যে-নীতি অনুসরণ করে চলেছি সে-নীতি গান্ধীজিরই নীতি গান্ধীজিরই আদর্শ। সহজ নয় সে আদর্শের অনুসরণ। আত্মশুদ্ধি ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। সবাই হয়তো পারি না তাই বিকৃতি ঢোকে। তাতেও কিন্তু গান্ধীজি ফুরিয়ে যান না, হারিয়ে যান না, মিথ্যে হয়ে যান না কারণ 'মৃত্যুর মধ্যেও জীবন বেঁচে থাকে, অসত্যের মধ্যেও সত্য জেগে থাকে, অন্ধকারের মধ্যেও আলো থাকে'—কথাটা গান্ধীজিরই।

[তারিখের উল্লেখ নেই]

৩২

একজন ইন্দ্রনাথকে খুঁজছি—খুঁজছি আমাদের এই শহর কলকাতাটার জন্য।

কলকাতার বড়ো অসুখ। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে বেচারি। কখনো দম বন্ধ হয়ে আসে। কখনো কোনো ফোড়নের গন্ধে মানুষ যেমন একটানা হাঁচতে থাকে তেমনি ওরও কাশতে কাশতে গলা দিয়ে রক্ত বের হবার উপক্রম হয়। কখনো বুক ধড়ফড় করে কখনো-বা পায়ের ব্যথায় একেবারে চলৎশক্তিহীন

হয়ে পড়ে। ডাক্তারবাবুরা ওকে অনেকবার দেখেছেন কিন্তু কিছুতেই একমত হয়ে বলতে পারছেন না ওর ঠিক কী রোগ হয়েছে। কেউ বলছেন কলকাতার হাঁপানি হয়েছে, কেউ বলছেন যক্ষ্মা, কারো মতে বাত, আবার কারো কারো ধারণা এ-রোগ ক্যান্সার না হয়ে যায় না। এক-একজন চিকিৎসক এক-একরকমের দাওয়াই বাৎলান কিন্তু কোনো কাজই হয় না। কেউ বলেন বাতাস দূষিত হয়ে পড়ছে আর তা থেকেই ওর..., বলছেন কলকাতা শহরে যত আবর্জনা জমে তা নাকি আর কোনো শহরে নয়। আর আবর্জনাই তো রোগের বাসা। কাজেই আবর্জনা দূর করতে না পারলে কলকাতার রোগ সারবে না। আবার কেউ কেউ বলেন কলকাতায় রাস্তা কম মানুষ বেশি, যানবাহন বেশি, তাই নড়াচড়ার সুযোগ সংকুচিত হওয়ায় কলকাতার বাত ধরেছে। বাতে চলৎশক্তি নষ্ট হয়েছে। তাই বাত সারাতে হলে রাস্তাঘাট চওড়া করতে হবে, ফুটপাত বাড়াতে হবে। আবার কেউ কেউ মনে করেন কলকাতার এখানে সেখানে যদি আমরা গাছের পর গাছ লাগাতে পারি তবে ওই গাছ কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নিয়ে অক্সিজেন ছাড়বে। আর সেই অক্সিজেন শুঁকতে শুঁকতে কলকাতা সুস্থ হয়ে উঠবে। আবার কেউ কেউ ফতোয়া দিয়েছেন যে কলকাতার বয়স যাই হোক না কেন, মহাকালের কলকাতাকেও তেমনি সাজগোজ করাও স্বপ্ন দেখাও ; দেখবে ওর মন খারাপ করাটা কেটে গেছে। আবার কেউ কেউ আছেন যারা দেখাতে চান কলকাতা যতটা নিপীড়িত হয়েছে, যতটা শোষিত হয়েছে তেমনটি আর কোনো শহর নয়। কাজেই কলকাতা ভুগবেই।

এসব মতামত থেকে আমরা সবাই বুঝে গেছি কলকাতা সত্যিই অসুস্থ। তার জন্য কিছু করা দরকার। কী করা হবে? কমিটি গঠন করা হল, সভা হল, সেমিনার হল, দিস্তার পর দিস্তা কাগজে প্রস্তাব লেখা হল, প্রস্তাবের পর প্রস্তাব সাজিয়ে ইয়া বড়ো ফাইল তৈরি করা হল। সেই ফাইল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মী নিয়োগ করা হল, সেই কর্মীর ওপর নজর রাখবার জন্য আরও কর্মী নিয়োগ করা হল। এখান থেকে সেখান থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে কিছু টাকাপয়সা জোগাড় করা হল, পরিকল্পনা-কর্মী নিয়োগ করা হল। কিছু কিছু কাজও হল। সে-কাজের লম্বা ফিরিস্তি বের হল কিন্তু কলকাতার অসুখ তবু সারল না। ছোটবেলায় শোনা লোকগাথার মত কেউ যদি প্রশ্ন করেন, কেন রে অসুখ সারলি না? তবে

দেখি তার এক জবাবের অনুষঙ্গে হাজার জবাব লাইন লাগায়। তবুও কলকাতার অসুখ কিন্তু সারে না।

কলকাতার এই অসুখ সারানোর কথা ভাবতে গিয়েই ইন্দ্রের কথা মনে পড়ল। আর সেই থেকেই ইন্দ্রনাথকে খুঁজছি। মনে আছে তো, শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথ, ছিনাথ বহুরূপীর কাণ্ডকারখানায় সবাই ভয় পেয়ে দারুণ হই চই করছেন। পিসেমশাই চিৎকার করছেন শরকি লাও, বন্দুক লাও। শরৎবাবু, মনে আছে নিশ্চয়ই, এর সঙ্গে ছোট্ট একটি মন্তব্য জুড়ে দিয়েছিলেন। লাও তো বটে কিন্তু আনে কে? আমাদের কলকাতাকে ঘিরে এমনি একটা ব্যাপার চলছে। কেউ বলছেন এটা করো, কেউ বলছেন ওটা। শরৎবাবুর মতো একটা ছোট্ট মন্তব্য জুড়ে দিতে ইচ্ছে করে 'কর তো বটে কিন্তু করে কে?' ছিনাথ বহুরূপীর সমস্যার সমাধান করেছিল ইন্দ্রনাথ। ডাকাবুকো ছেলেটা, কোনোরকম ভয়ডর বুকে না রেখে আলো তুলে প্রমাণ করেছিল যাকে নিয়ে এত ভয়, তা ভট্টাচায্যি মশাইয়ের মস্ত ভালুক নয়, ছোড়দা ও যতীনদার নেকড়ে বাঘ নয়, মেজদার দি রয়াল বেঙ্গল টাইগার নয়। নেহাৎই একটা বহুরূপী। আমাদের কলকাতার এমনি একজন ইন্দ্রনাথ দরকার। না, হয়তো আমাদের সান্ত্বনা খুঁজতে হবে সত্যেন্দ্রকবির পঙ্‌ক্তিতে—''দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালীর জয়।''

[তারিখের উল্লেখ নেই]

৩৩

পুজোর ছুটি যাঁরা ভোগ করছেন এবং যাঁরা পুজো উপলক্ষ্যে কলকাতা মহানগরীর হট্টমেলার আসর এড়িয়ে চলতে চাইছেন, তাঁরা মনে মনে একবার পুরোনো কলকাতায় ঘুরে আসতে পারেন। পুরোনো কলকাতা বলতে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগরের কলকাতাকে বোঝাচ্ছি না। আরও আগেকার কলকাতা,—পলাশির যুদ্ধের আমলের কলকাতা এবং রাজা রামমোহন রায়ের আমলের কলকাতাকে বোঝাতে চাইছি।

দক্ষিণে বেহালা-বড়শে, উত্তরে দক্ষিণেশ্বর। এরই মাঝে কালীক্ষেত্র। জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের তখন খুব বাড়বাড়ন্ত। হবে নাই-বা কেন? সাবর্ণ চৌধুরীদের পূর্বপুরুষরা তো জমিদারি পেয়েছিলেন খোদ আকবর বাদশার কাছ থেকে।

কালীঘাটের ভদ্রকালী কালিকা, কালীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সেকালের লোক বলত, চৌরঙ্গির বিশাল জঙ্গলের মধ্যে 'চৌরঙ্গিনাথ' বলে বাস করতেন বাতে পঙ্গু এক খোঁড়া সাধু। কালিকার মূর্তিখানি নাকি তিনিই মাটির তলায় আবিষ্কার করেছিলেন।

কলকাতা এখন বিরাট শহর। দুনিয়ার মানুষ এখন কলকাতাকে চেনে। সেকালে কিন্তু কেউ তেমন চিনত না। তিনখানা গ্রাম নিয়ে-গড়া কলকাতার প্রায় সবটাই ছিল বনজঙ্গল, এঁদো পচা ডোবা, পানা-পুকুর, খাল বিল, জলা। বড়ো রাস্তা বলতে একমাত্র ওই চৌরঙ্গির রাস্তাটাকেই বোঝাত। লালদিঘির দিকেও ছিল একটা ছোটো রাস্তা। লালদিঘির পশ্চিম পাড়ে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারি। গোটা গ্রামে ওই একমাত্র পাকা বাড়ি। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি চৌধুরী বাবুদের খাতা লিখতেন, আর ফাঁক পেলেই গান লিখতেন। তাঁরই নাতি-টাতি কেউ হবেন অ্যান্টনি কবিয়াল। ওপারে শালকে থেকে ব্যাপাবীরা মালপত্র নিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে আসতেন এপারে। তার পর রথ দেখা আর কলা-বেচার মতো বেচা কেনা শেষ করে গঙ্গাস্নান সেরে বাড়ি ফিরতেন।

নানান জাতের আর নানান পেশার লোক বাস করত সেই এঁদো কলকাতায়। বিভিন্ন পাড়ার নামের মধ্যেই খুঁজে পাবেন তাদের। যেমন—আহিরিটোলা, কলুটোলা, জেলেটোলা, কুমোরটুলি, শাঁখারিপাড়া, নিকাশিপাড়া, দর্জিপাড়া, মুচিপাড়া, তাঁতিবাগান, নাথবাগান। আবার ঝোপঝাড় বনবাদাড়ও যে মেলাই ছিল, তার পরিচয় পাচ্ছেন হরীতকীবাগান চালতাবাগান পেয়ারাবাগান প্রভৃতি নামের মধ্যে।

ইংরেজরা এসে ঝোপঝাড় কেটে নালা ডোবা বুজিয়ে, রাস্তাঘাট বানিয়ে শহর কলকাতার পত্তন করল। শুধু কি ইংরেজরাই এল? এল পর্তুগিজরা, ফরাসিরা, ওলন্দাজরা এবং আরও হরেকরকম জাত। ব্যাবসাবাণিজ্য খুব জমজমাট হয়ে উঠল। ব্যবসাবাণিজ্য যেমন ছিল তেমনি ছিল পূজা-পার্বণ, নাচগান, উৎসব-আনন্দ এবং ছুটিছাটা।

কনৌজের ভট্টনারায়ণের বংশের ঠাকুরেরাও বরাতের ফেরে একসময় কলকাতায় এসে ঘর বেঁধেছিলেন। ভালোই হয়েছিল, কারণ গোবিন্দপুর গ্রামে একঘরও ব্রাহ্মণ ছিল না। কুশারীরা পতিত পিরালি ব্রাহ্মণ হলেও, বামুন তো বটে! সবাই বলত 'ঠাকুরমশাই'। নীলমণি আর দর্পনারায়ণ নামে

দুই ঠাকুর, ইংরাজদের সঙ্গে মিলে মিশে কারবার করতে করতে মোটা টাকার মালিক হলেন। সেই টাকা দিয়ে ভূসম্পত্তি করে রীতিমতো জমিদার হয়ে উঠলেন।

দর্পনারায়ণের দর্প, নীলমণির সইল না! নীলমণি ঠাকুর কিছু টাকা আর গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনকে নিয়ে, পাথুরিয়াঘাটা থেকে উঠে এলেন জোড়াসাঁকো অঞ্চলে। জোড়াসাঁকো নামটা অবশ্য পরে হয়েছিল, আগে ওটা মেছোবাজার এলাকার মধ্যেই ছিল।

নীলমণি ঠাকুরের বংশে যখন দ্বারকানাথ এলেন, তখন অষ্টাদশ শতাব্দী প্রায় শেষ। দ্বারকানাথ ঠাকুর, বংশের জন্য নিয়ে এলেন বিপুল পরিমাণ ধনসম্পত্তি। বিরাট মান-মর্যাদা। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধনবান বলে ইংরেজ, বাঙালি প্রভৃতি সকলের কাছেই তাঁর নামডাক। তাঁর বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ির জলসায় নেমন্তন্ন পাবার জন্য মেমসাহেবরা পর্যন্ত আকুপাকু করত। নাচ-গান খানাপিনার ইলাহি আয়োজন। এক হাত দিয়ে টাকা আসত, আর এক হাত দিয়ে তা চলে যেত। ব্যয়-অপব্যয় দুইই হত। বিলেতে ছুটে যান ভ্রমণের নেশায়, নতুনকে জানবার আনন্দে, আর ব্যাবসাবাণিজ্যের সুবিধা আদায়ের জন্য। দরাজ দিল দেখে সবাই তাঁকে বলত 'প্রিন্স'। সেকালের অন্যান্য জমিদার বাড়ির মতো ঠাকুর বাড়িতেও বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে দ্বারকানাথের ভারি ভাব। রামমোহন আবার পৌত্তলিকতা বিসর্জন দিয়ে বসে আছেন। তা রাজা থাকুন নিজের ধর্ম নিয়ে, তাতে প্রিন্সের কিছু এসে যায় না। বন্ধুত্বের খাতিরে ধর্মকে তো আর পরিত্যাগ করা যায় না! ধর্মের জন্য বন্ধুত্বকেই বা ছাড়তে হবে কেন!

প্রিন্সের বাড়িতে দুর্গাপূজা, রাজাকে তো নেমন্তন্ন করতেই হবে. হোন না রাজা ব্রাহ্ম।

দ্বারকানাথের অল্পবয়স্ক ছেলে দেবেন্দ্রনাথ গেছে রাজা রামমোহনের মানিকতলার বাড়িতে পুজোর নেমন্তন্ন করতে ঠাকুরদার হয়ে। মুখ কাচুমাচু করে ভয়ে ভয়ে বলল রাজাকে, 'আজ্ঞে, রামমণি ঠাকুরের বাড়িতে আপনার দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ।'

রাজা তার উত্তরে বলে উঠলেন, 'আমাকে পূজার নিমন্ত্রণ? আর লোক পেলে না? জান না, আমি পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করি।'

রামমোহন ভারি ভালোবাসতেন বন্ধু দ্বারকানাথের ছেলেটিকে, কিছু মিষ্টিমুখ করিয়ে আদরে গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুমি কিছু মনে কোরো না। আমি ভাবছিলাম, পুতুল পূজার বিরুদ্ধে যে আমি এত প্রতিবাদ করছি, তাকেই কিনা লোকে দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ করতে আসে। যাক, বলছ যখন, তখন আমি না-যাই, আমার ছেলে রাধাপ্রসাদ যাবে। তার এত বাছবিচার নেই।'

মানিকতলার সেই বাড়িটাতে এখন, উত্তর কলকাতার পুলিশের বসতি। সেই কলকাতাও নেই, কলকাতার জীবনে সেই চমক-জাগানো মানুষগুলিও নেই। কলকাতার আয়তন এখন বিরাট, আকৃতি বিশাল, কিন্তু চিত্তাকাশ সীমিত। এখন উৎসব আর হুল্লোড়ে কোনো তফাত নেই। এখন কলকাতার কোনো অবসর নেই, ছুটি নেই, আরাম নেই।

[তারিখের উল্লেখ নেই]

৩৪

যেমন জীবন তেমনি খেলা। জীবন যেমন বদলায় তেমনি বদলায় খেলাও। আজ থেকে ১০০ বছর আগের মানুষের জীবন যেমন ভিন্ন চালে বাঁধা ছিল তেমনি তার খেলাও। সামাজিক অর্থনৈতিক টানাপোড়েন যেমন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি খেলাকেও। তাই মানুষের জীবনের দিকে তাকালে যেমন একটা আবিষ্কারের আনন্দ মেলে—তেমনি খেলার দিকে তাকালেও। খেলাটা এককালে ছিল শুধুই খেলা—আনন্দই ছিল তার একমাত্র শর্ত। কিন্তু আজকের খেলায় আনন্দর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থ, পেশা। তার ফলে খেলার চরিত্র যেমন বদলেছে তেমনি বদলেছে তার প্রকরণ। আমাদের দেশে ফুটবল খেলার বয়স তো শতবর্ষ পার হল। আর এই শতবর্ষে খেলার ধরনধারণও কিন্তু বদলেছে বাইরের দেশেও। বরং বলি বাইরের দেশ থেকে আমরা এই পরিবর্তিত ধারণাগুলো পেয়েছি। জানেন সবাই ১৮৬২ সাল থেকে ফুটবল খেলায় নিয়মকানুন চালু হয়। সেদিন সে-খেলায় দলবিন্যাস ছিল এ-রকম—এক জন গোলকিপার, এক জন ফুলব্যাক, দু-জন হাফব্যাক এবং সাত জন বা আট জন ফরওয়ার্ড। হাফ্‌ব্যাক-রাও সে-সময় আক্রমণ ধারাকেই সাহায্য করতেন বেশি। তার মানে সেদিনকার ধারা ছিল পুরোপুরি আক্রমণাত্মক খেলা—আর তাই সে খেলায় গোল হত সংখ্যায় অনেক

বেশি। ১৮৭০ সালে স্কট্‌ল্যান্ড একটা নূতন পদ্ধতি চালু করল। দু-জন ব্যাক ঠিক তাদের সামনে দু-জন হাফব্যাক এবং ছ-জন ফরওয়ার্ড। এর ফলে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করবার চেষ্টা করা হল। এই পদ্ধতির জবাব দিতে গিয়ে ১৮৮০ সাল নাগাদ স্কট্‌ল্যান্ডের আধিপত্য খর্ব করতে ইংল্যান্ড এক নূতন পদ্ধতি অনুসরণ করল—যাকে বলা হল Two three five system—অর্থাৎ এক জন রাইট হাফ— এক জন সেন্টার হাফ আর এক জন লেফ্‌ট্‌ হাফ আর পাঁচজন ফরওয়ার্ড। আবার এই পাঁচ ফরওয়ার্ডকেও ভাগ করা হল—এক জন লেফ্‌ট আউট, এক জন লেফ্‌ট ইন, এক জন সেন্টার ফরওয়ার্ড, এক জন রাইট ইন, আর এক জন রাইট আউট এই হিসেবে। আমরা এই ষাট-এর দশক পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে খেলা দেখে এসেছি। এ খেলায় দলীয় দক্ষতার চেয়ে ব্যক্তিগত দক্ষতার মূল্য বেশি স্বীকৃত ছিল। খেলায় যখন প্রচুর টাকা আসতে আরম্ভ করেছে Professionalism যখন তুঙ্গে উঠেছে তখন ফুটবল তত বেশি প্রতিরক্ষামুখী হয়েছে। এবং তাতে খেলায় গোলের সংখ্যা কমতে আরম্ভ করেছে। ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ জিতল চার-তিন-তিন পদ্ধতিতে। এর আগে ১৯৫৮ সালে ব্রাজিল চার-দুই-চার পদ্ধতিতে খেলতে শুরু করেছে। ইটালি এক পদ্ধতি চালু করে ওই ১৯৬৬ সালে। তাকে বলা হলো Catenaccio। এই system-এ গোলকিপারের সামনে থাকবে এক জন ব্যাক—তাকে বলা হলো sweeper। তার সামনের সারিতে রইলেন চার জন ব্যাক, তার সামনের সারিতে তিন জন এবং তার সামনের সারিতে দুই জন। তার মানে প্রতিরক্ষাটাকে Man to Man-system-এ ঘিরে রাখা। এই যে বিন্যাসগুলোর কথা বললাম—এতে কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষণীয় হয়ে উঠল যে আগেকার দিনের Positional rigidity আর থাকল না। আজকে আমরা যে-খেলা দেখছি এই জওহরলাল নেহেরু ট্রফিতে—তাকে বলা হচ্ছে Total Football অর্থাৎ আজকের দিনে দরকার মতো সব খেলোয়াড় সব জায়গায় খেলতে পারেন এবং ফুটবল আজ আর একার খেলা নয়—ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের চেয়ে দলগত নৈপুণ্য-ই অনেক বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে।

[তারিখের উল্লেখ নেই]

৩৫

এক একটা শব্দ আছে, দেখতে শুনতে নিরীহ, কিন্তু বুকের ভেতর হাজারো হাতির শক্তি। এমনি একটি শব্দ—ছোটো সরল কেমন সলজ্জ, ভীতু-ভীতু দেখতে,—বাঁচা শব্দটা। অথচ দেখুন, আমাদের যা কিছু তা ওই একটি শব্দকে ঘিরেই—বাঁচা। দু-অক্ষরের এই ছোট্ট শব্দটা যেন হারকিউলিসের মতো কাঁধে বহন করে নিয়ে চলেছে আমাদের সভ্যতাকে। কী প্রচণ্ড শক্তিই না ধরে এই শব্দটি!

আচ্ছা, একটা জিনিস লক্ষ করেছেন কি?—মানুষের জীবনে যে-বিষয়গুলি সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে, সবচেয়ে তুফান তোলে, সেইসব শব্দ কিন্তু উচ্চারণে এবং বানানে সবচেয়ে ছোটো এবং সরল, সহজ। যেমন ধরুন, প্রেম, পুণ্য, প্রীতি, ভালোবাসা, জন্ম, মৃত্যু, হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যা, ঈর্ষা—এইসব। এবং নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, এই যে শব্দগুলো এদের প্রত্যেকটিই কিন্তু ব্যক্তিগত এমনকী কখনো কখনো সমষ্টিগত ক্ষেত্রে, আমাদের জীবনকে আমূল পালটে দেয়। এমনকী এইসব শব্দের কোনো কোনোটার অতি প্রাধান্য কিংবা অবক্ষয়ে মানুষের ইতিহাসেও ওঠা-নামা এসেছে। কিন্তু না থাক, আমরা বাঁচা শব্দটার কথাতেই ফিরে যাই। এই যে একটু আগে বললাম, প্রেম, প্রীতি, পাপ, পুণ্য, বিরহ, মিলন, হিংসা, দ্বেষ—এই যে এই ধরনের প্রচণ্ড শক্তিধর শব্দগুলো, এই শব্দগুলোই কিন্তু ওই বাঁচা শব্দটার মধ্যে মিলে যায়। এক এক সময়ে মনে হয় সেই মানুষ নামক জীবটা বড়ো অদ্ভুত ধরনের। সব জীব যেখানে স্বভাবের দিক থেকে একমুখীন, তখন এই মানুষ নামক জীবটার মন বোঝা ভার। তার পথ চলা আঁকাবাঁকা। ওই বাঁচা শব্দটা মনে রেখেই বলছি, মানুষের প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, মায়া, মমতা ওই বাঁচার জন্য। আবার মানুষের হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যা—তা-ও ওই বাঁচার জন্য। ঝড়ের মতোই সর্বগ্রাসী, সর্বশক্তিমান এই বাঁচা শব্দটি। আলো, অন্ধকার, পোড়োবাড়ি, ঝোড়োহাওয়া—সবকিছু মিলে যায় ওই বাঁচা শব্দটার মধ্যে। বাঁচার জন্য আমরা কষ্ট পাই, কষ্ট পেয়েও আমরা বাঁচি। এই যে বাঁচার ইচ্ছেটা এটা কিন্তু এক দিন, দু-দিনের জন্য নয় অনন্তকাল ধরে আমরা বাঁচতে চাই, বাঁচবার চেষ্টা করি। তাই অমৃত খুঁজি—সাগর সেঁচে অমৃত তুলি। দেহটা যদি না বাঁচে, তবু আমরা বাঁচতে চাই স্মৃতিতে। বাঁচতে

চাই সাহিত্যে, কবিতায়, শিল্পকলায়, দর্শনে। আমাদের সবকিছুই এই বাঁচার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই যে গাছ দেখছি, ফুল দেখছি, পাখি দেখছি—এইসব কিছুই আমি বাঁচছি বলেই আছে। তাই বলছিলাম, এই বাঁচাটাই বোধ হয় মানুষের জীবনের প্রথম ও শেষ কথা।

আচ্ছা, আমরা কতদিন বাঁচতে পারি? পঞ্চাশ, ষাট— বড়োজোর এই। তারপরে যে বাঁচাটা, অনেককাল আগে কোনোকিছু কিনলে যেমন ফাউ মিলত, সেইরকম—ওটা জের টানা। ওটাকে আমরা ঠিক হিসেবের মধ্যে ধরি না। তবু আমাদের এই পৃথিবীতে একটা জায়গা আছে যেখানে মানুষ অনেক অনেক দিন ধরে বাঁচে। জায়গাটা দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল থেকে ১৬৫ কিলোমিটার দূরে একটি গ্রাম, নাম তার YONGDONG। কোরিয়ান ভাষা জানি না, বলতে পারব না এই শব্দটার অর্থের সঙ্গে যাকে বলি যৌবন, তার কোনো যোগ আছে কি না। তবে সংবাদসংস্থার পরিবেশিত খবর থেকে জানি যে, সেখানে যাদের বয়স তিরিশ, চল্লিশ তারা বাচ্চা। সত্তরে পৌঁছোনোর পর ওরা মধ্যবয়স্ক আর নব্বইয়ের কোঠায় পৌঁছলে ওরা নাকি বার্ধক্যের দরজায় কড়া নাড়ে। সে-গ্রামে ষোলো-শো ঘর আছে। আর ঘরে-ঘরেই নব্বই পেরোনো মানুষ। নব্বই পেরোনো মানে কিন্তু বুড়ো থুরথুরে নয়, দৃষ্টিহীনতায় কানামাছি খেলা নয়। লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুকঠুক করে হাঁটা নয়। ওদের শরীরে জরা নেই। এক-শো পেরোনো বৃদ্ধা KIM-CHIL-SUN, এখনও ঘড়ির কাঁটা ঠিক দেখতে পান। সুঁচে সুতো পরাতেও অসুবিধে হয় না, সত্যি দিব্যি আছেন। সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিলেন কী করে বাঁচছেন এতদিন? বুড়ি চটপট জবাব দিয়েছিলেন—"আরে, বাঁচার জন্য কি কষ্ট করতে হয়? ভালো খাও, খেতে কাজ করো, আর বিষয় বাসনা থেকে মনকে মুক্ত রাখো—এইতো জীবন, আদর্শ জীবন।" ভারতীয় দর্শনেও এমনি কথাই শুনেছি। পরের ধনে লোভ কোরো না, ভোগ করো ত্যাগের ভিতর দিয়ে, সবাইকে আপন বলে জানো, মন দাও সকলের হিতচিন্তায়।

সাংবাদিকরা এসব ভাববাদী উত্তরে খুশি হয়নি। তাঁরা বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজেছেন— এত দীর্ঘদিন বাঁচার। উত্তরও পেয়েছেন তার—ওই গ্রামটির পরিবেশ নাকি দূষণমুক্ত। পলিউশনের ভাগ নাকি খুব কম। গ্রামের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে একটা নদী CHANGSU-CHUN, ওরা বলে দীর্ঘায়ুর নদী, যৌবনের নদী—কাকচক্ষু জল, আর তাই, ওদের জীবন ওই জলের মতোই

সুস্থ, স্বচ্ছ। বাইরের ঘাত প্রতিঘাত থেকেও ওঁরা নিজেদের কেমন করে যেন বাঁচিয়ে রেখেছেন। কোনো অবসন্নতা ক্লান্তি নেই ওদের জীবনে। তবে একটা সলজ্জ যন্ত্রণা আছে। পৌত্র, প্রপৌত্রদের কাঁধে ভর দিয়ে আর কতদিন বাঁচি। তবু ওদের বাঁচতে ভালো লাগে, বড়ো ভালো লাগে। কারণ, বাঁচা, একা বাঁচা নয় সবার সঙ্গে মিলেমিশে বাঁচার চেয়ে ভালো তো আর কিছুই নয়।

[তারিখের উল্লেখ নেই]

বানান প্রয়োগ ও উচ্চারণের রূপরেখা

শব্দেই জব্দ, শব্দেই স্তব্ধ! যেকোনো শব্দের সঠিক অর্থ, বানান, সঠিক প্রয়োগ ও উচ্চারণ নিয়ে অনেক সময় কাজের মাঝে থমকে যেতে হয়। এই সংকটে অভিধানের কোনো বিকল্প নেই। তবুও সম্প্রচারের ভাষা নিয়ে নানা আলোচনার মাঝে সম্প্রচারকদের হাতের কাছে একটি নমুনাপত্র থাকলে বোধহয় মন্দ হয় না। তাই অভিধানমুখী আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে এই রূপরেখাটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন *সুভাষ ভট্টাচার্য*।

ভ্রমপ্রবণ শব্দাবলি—যেসব শব্দের বানানে ভুলের সম্ভাবনা থাকে

অকস্মাৎ (স্মা নয়)
অকালপক্ব (ক্ক নয়)
অক্ষি (ক্ষী নয়)
অগণিত, অগণ্য (কিন্তু অগুনতি)
অগস্ত্য (স্ত নয়)
অগ্ন্যুৎপাত (কিন্তু অগ্ন্যুদ্‌গার বা অগ্ন্যুদ্গার)
অগ্রস্রিয়মাণ (অগ্রসরমাণ নয়)
অঘ্রান (ণ নয়, কিন্তু অগ্রহায়ণ)
অঙ্ক (অংক নয়)
অঙ্কুর (ং নয়)
অঙ্গন (ণ নয়, কিন্তু প্রাঙ্গণ)
অচিন্তনীয় (ন্ত্য নয়)
অচিন্ত্য
অচ্যুত (ৎ নয়)
অঞ্জলি (লী নয়)
অতীন্দ্রিয়
অতীব (অতি + ইব)
অতীশ (তি নয়)
অত্যধিক (কিন্তু অত্যাধুনিক)
অদিতি
অদ্ভুত (দ্ভূ নয়)
অদ্যাপি (দ্য নয়)
অদ্যাবধি (দ্য নয়)
অধস্তন (অধঃস্তন নয়)
অধীত
অধ্যবসায় (অধ্যা নয়)
অধ্যুষিত (অধ্যূ নয়)
অনটন (অনাটন নয়)
অনভ্যাস (কিন্তু অনভ্যস্ত)
অনাদায়ি (দায়ী নয়)
অনাদি (দী নয়)
অনাবাদি (বাদী নয়)
অনামি (নামী নয়)
অনামিকা (মীকা নয়)
অনাহূত (হুত নয়)
অনিচ্ছাসত্ত্বেও (ত্বে নয়)
অনিন্দ্য (ন্দ নয়)
অনিশ (অবিরত; কিন্তু অনীশ = নাস্তিক)
অনীক
অনীকিনী
অনীহা
অনুপুঙ্খ (ঙ্ক্ষ নয়)
অনুমত্যনুসারে (মত্যা নয়)
অনুষঙ্গ
অনুসন্ধিৎসা
অনূর্ধ্ব (র্দ্ধ নয়)
অনূঢ়া (ড়া নয়)
অনূদিত (কিন্তু অনুবাদ)

অন্তঃসত্ত্বা
অন্তঃস্থ (ভিতরের/কিন্তু অন্তস্থ = শেষের)
অন্তরিক্ষ বা অন্তরীক্ষ
অন্তর্দ্বন্দ্ব
অন্তর্জ্বালা (র্জালা নয়)
অন্তর্মুখী (কিন্তু অন্তর্মুখিতা)
অন্তস্তল (অন্তঃস্তল নয়)
অন্ত্যজ
অন্ত্যেষ্টি
অপরিণামদর্শী (কিন্তু দর্শিতা)
অপরিষ্কার (স্কার নয়)
অপাঙ্‌ক্তেয় (ং নয়)
অবগুণ্ঠন (গুণ্ঠন নয়)
অবিমৃশ্যকারিতা (মৃষ্য নয়)
অভাগি (গী নয়)
অভাগিনি (গিনী নয়)
অভিমুখী (কিন্তু মুখিতা)
অভিলাষ (কিন্তু অভিলষিত)
অভীক
অভীপ্সা
অভীপ্সিত
অভীষ্ট
অভ্যন্তরীণ (কিংবা আভ্যন্তর বা আভ্যন্তরিক। কিন্তু আভ্যন্তরীণ নয়)
অমাবস্যা (আমা নয়)
অম্বুজ (স্বু নয়)
অম্বুবাচি (কিংবা বাচী)
অরণি
অরণ্যানি
অর্ঘ (মূল্য; পূজার উপকরণ)
অর্ঘ্য (নৈবেদ্য)
অলঙ্ঘ্য (কিন্তু অলঙ্ঘনীয়)
অলক্ষুনে
অলক্ষ্য
অল্পবয়সি (বয়সী নয়)
অশ্ম (প্রস্তর)
অসচ্ছল (স্বচ্ছল নয়)
অসমীচীন
অস্বাচ্ছন্দ্য
আইনজীবী
আংটা (ঙ নয়)
আংটি (ঙ নয়)
আঁতাঁত (আঁতাত নয়)
আঁতুড় (র নয়)
আকাঙ্ক্ষা (আকাংক্ষা নয়, আকাঙ্খা নয়)
আগমনি (মনী নয়)
আগামীকাল
আঘ্রাণ (ঘ্রাণ নেওয়া)
আতঙ্ক (আতংক নয়)
আদরিণী
আদ্যক্ষর (আদি + অক্ষর)
আদ্যন্ত
আদ্যাক্ষর (আদ্য + অক্ষর)
আদ্যোপান্ত
আধো-আধো (আধ-আধ নয়)
আনুষঙ্গিক (স নয়)
আন্দাজি (জী নয়)
আপশোশ (কিংবা আপশোস)
আপোশ
আবিষ্কার
আভাস (ইঙ্গিত, আবহাওয়ার পূর্বাভাস)

আভাষ (ভূমিকা)
আভ্যন্তর (কিংবা আভ্যন্তরিক)
আমলকী
আমিষাশী
আয়ুষ্মতী
আয়েশ, আয়েশি
আর্থনীতিক, তবে অর্থনৈতিকও
বহুলপ্রচলিত
আর্থ্রাইটিস (আর্থা-নয়)
আশকারা (আস্কারা নয়)
আশঙ্কা (আশংকা নয়)
আশাবরি
আশিস
আশীর্বাদি
আষ্টেপৃষ্ঠে
আস্পদ
আস্পর্ধা
আহ্নিক
আহ্লাদি (দী নয়)
ইউরোপ (কিংবা ইয়োরোপ)
ইগল (ঈ নয়)
ইজ্জত (ৎ নয়)
ইতস্তত (ইতস্ততঃ নয়)
ইয়ারকি (ইয়ার্কি নয়)
ইরানি
ঈপ্সা, ঈপ্সিত
ঈর্ষা
ঈশানী
ঈষদূন
উচিত (উচিৎ নয়)
উচ্চাকাঙ্ক্ষা
উচ্চৈঃস্বরে (উচ্চকণ্ঠে বাংলামতে
চলবে)

উচ্ছল, উচ্ছলতা
উচ্ছ্বসিত
উড়নচণ্ডী
উতরাই, উতরানো (উৎ নয়)
উৎসর্গিত (কিন্তু উৎসর্গীকৃত)
উত্ত্যক্ত (উত্যক্ত নয়)
উদ্গিরণ (কিন্তু উদ্গীর্ণ)
উপনিষদ (—ষদ্,
—ষৎ সংস্কৃতে)
উপযোগিতা (কিন্তু উপযোগী)
উপরিউক্ত (সংস্কৃতে উপর্যুক্ত)
উপলক্ষ্য (উপলক্ষ নয়)
উষা (কিংবা ঊষা)
একদেশদর্শী
(কিন্তু একদেশদর্শিতা)
একাকিতা, একাকিত্ব
(কিন্তু একাকী)
এক্ষণ (কিন্তু এক্ষুনি)
এসরাজ (এস্রাজ নয়)
ঐকতান (ঐক্যতান নয়)
ঐকমত্য (ঐক্যমত নয়)
ওতপ্রোত (ওতঃ নয়)
ওয়েস্টমিনস্টার
(মিনিস্টার নয়)
কখনও কিংবা কখনো
কঙ্কণ (ন নয়)
কজ্জল (জ্ব নয়)
কটূক্তি (কটু + উক্তি)
কণিকা
কনক (কণক নয়)
কনীনিকা (চোখের মণি)
কবজি (কব্জি নয়)

কবজা (কব্জা নয়)
করবী
কর্ণাটক (কর্নাটক নয়)
কল্যাণ
কাকি, কাকিমা
কাকী (স্ত্রী কাক)
কাঙ্ক্ষণীয়
কাচ (কাঁচ নয়)
কাবেরী
কারিগরি
কালবৈশাখী
কালবোশেখি
কালি (লেখার কালি)
কালী (দেবী)
কাশি (শ্লেষ্মা)
কাশী (বারাণসী)
কাহিনি
কিংকর, কিঙ্কর
কিঞ্চিৎ (ত নয়)
কিম্ভূত (কিন্তু অদ্ভুত)
কিরণময় (কিরণ্ময় নয়)
কিরীট, কিরীটী
(কিন্তু কিরীটিনী)
কিষ্কিন্ধা, কিষ্কিন্ধ্যা
কুৎসিত
কুতূহলী
কুলীন, কৌলীন্য
কুশীলব
কুসীদজীবী
কুহরন (ণ নয়)
কৃচ্ছ্র (কৃচ্ছতা নয়)
কৃচ্ছ্রসাধন
কৃতাঞ্জলি (লী নয়)
কৃত্তিবাসি (সী নয়)
কৃষাণ (কিন্তু কিষান)
কোজাগরী (বা কোজাগরি)
কোশ, কোষ
কোশাগার, কোষাগার
কোশাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ
ক্রীড়নক
ক্ষালন, দোষক্ষালন
(স্খালন নয়)
ক্ষিতি (কিন্তু ক্ষিতীশ)
ক্ষীয়মাণ (ন নয়)
ক্ষুৎকাতর, ক্ষুৎপিপাসা
(ক্ষুদ্ নয়)
ক্ষুর (razor, কিন্তু খুর (পায়ের
খুর)
খই (খৈ নয়)
খণ্ডন (ন্ড নয়, ণ নয়)
খাঁক, খাঁই (প্রবল আকাঙ্ক্ষা)
খাক (ছাই)
খ্যাঁকশেয়াল (খেঁক নয়)
খ্রিস্ট, খ্রিস্টাব্দ
গঙ্গা (গংগা নয়)
গণক
গণনা
গণেশ
গণ্ডগ্রাম
গণ্ডমূর্খ
গণ্ডূষ
গনতকার (ণ নয়)
গয়লানি (নী নয়)
গরীয়সী

গাভি (ভী নয়)
গির্জা (গী নয়)
গিরি, কিন্তু গিরীন্দ্র, গিরীশ
গিরিগুহা
গুণন
গুণনীয়ক
গুণিতক
গুনিন
গোয়ালিনি
গোরু (গরু নয়)
গোষ্ঠী (কিন্তু গুষ্টি)
গোষ্পদ (গোস্পদ নয়)
গ্রহাণুপুঞ্জ
গ্রান্ট (grant)
গ্রীবা
গ্রীষ্ম
ঘণ্টা (ঘন্টা নয়)
ঘটনাবলি (বলী নয়)
ঘনীভবন, ঘনীভূত
ঘুণ, ঘুণপোকা
ঘুস (উৎকোচ)
ঘুসি (ষি নয়)
ঘূর্ণন
ঘেঁষাঘেঁষি
ঘোঁতঘোঁত (ৎ নয়)
ঘ্রাণ
চক্ষুলজ্জা
চক্ষুষ্মান
চণ্ডাল
চতুরালি
চতুষ্পাঠী
চাষি
চিন্ময় (ণ্ম নয়)
চীন
চুপিসারে (সাড়ে নয়)
ছোঁড়া (ছেলে)
ছোড়া (নিক্ষেপ করা)
ছ্যাঁকছেঁকে
ছ্যাতলা (ৎ নয়)
জটাজূট
জড়োসড়ো
জবড়জং
জাগরী
জাগরূক
জাজ্বল্যমান
জাত্যভিমান (জাত্যা নয়)
জাদু, জাদুঘর (যাদু নয়)
জানকী
জাহ্নবী
জিগীষা
জিশু, জিশুখ্রিস্ট
জীবাণু
জীবাশ্ম
জীবী, কিন্তু জীবিত, জীবিকা
জীমূতবাহন
জ্যাঠা (কিন্তু জেঠু)
জ্যালজেলে (জ্যালজ্যালে নয়)
জ্যোতিষ্মান
ঝরনা (ঝরণা নয়, ঝর্ণা নয়)
ঝান্ডা (ণ্ডা নয়)
টিপ্পনী
ঠ্যাঙা (ঠাঙ্গা নয়, ঠেঙা নয়)
ঠ্যাঙাড়ে

তক্ষশিলা (শীলা নয়,
অনুরূপভাবে বিক্রমশিলা)
তড়িৎ
তড়িদ্দ্বার
তত্ত্ব
তদারকি
তদ্রূপ
তরঙ্গিণী
তরণি, তরণী
তস্কর, তেজস্কর
(কিন্তু দুষ্কর, পুষ্কর, নিষ্কর)
তিতিক্ষা, তির, তিরন্দাজ,
তিরন্দাজি (কিন্তু নদীর
তীর)
তেলুগু ভাষা (তেলেগু নয়)
ত্র্যহস্পর্শ
থই, থইথই
থ্যাঁতলানো (থ্যাঁৎ নয়)
দক্ষিণায়ন
দক্ষিণী
দধীচি
দন্ত্যধ্বনি, দন্ত্যবর্ণ
দপ্তর, দফতর
দরদি
দশমিক
দশর্মী
দামিনী
দারিদ্র, দারিদ্র্য
দাশরথি
দিক্‌চক্রবাল
দিগ্‌গজ
দিগ্‌দর্শন যন্ত্র
দিগ্‌দিগন্ত
দিগ্‌বিদিক
দিঘি
দিনেন্দ্র, দিনেশ (সূর্য)
দীনেশ, দীনেন্দ্র (ঈশ্বর)
দীপাবলি
দীর্ঘজীবী
দুঃখী (কিন্তু দুখি)
দুরাকাঙ্ক্ষা
দুর্গা (দূর্গা নয়)
দুর্দশাগ্রস্ত (গ্রস্থ নয়)
দুর্নীতিগ্রস্ত (গ্রস্থ নয়)
দুষ্কৃতকারী, দুষ্কৃতী (দুর্বৃত্ত)
দুষ্কৃতি (কুকাজ)
দূরবিন
দেশি (কিন্তু দেশীয়)
দ্বন্দ্ব
দ্যূত (পাশা)
ধক, ধক ধক (ধ্বক নয়)
ধ্বনি,
ধরণী, ধরণি
ধরন, ধরনধারণ
ধরনা (ধর্ণা নয়)
ধস্তাধস্তি (ধ্বস্তাধ্বস্তি নয়)
ধানখেত (ক্ষেত নয়)
ধান্দা, ধান্দাবাজ (ধান্ধা নয়)
ধাষ্টামি, ধাষ্টামো, ধ্যাষ্টামো
(ধাস্টা নয়, ধ্যাস্টা নয়)
ধুলা, ধুলো (ধূ নয়)
ধূলি (ধু নয়)
ধ্বজা
ধ্বস্ত

ধ্রুপদি (দী নয়)
নগরায়ণ
নজরবন্দি (ন্দী নয়)
নথি (নথী নয়)
ননদিনি
নভশ্চর (নভোচর নয়)
নভোনীল
নভোমন্ডল
নমশূদ্র (নমঃ নয়)
নমস্কার
নাতনি, নাতিনি
নাথবতী
নাপতিনি, নাপতেনি
নামাবলি
নিংড়ানো (নিঙড়ানো নয়)
নিকটবর্তী (কিন্তু নিকটবর্তিতা)
নিবন্ধীকরণ
নিমীলিত
নিয়মাবলি
নিরীক্ষণ
নিরীক্ষা
নির্মীয়মাণ
নিশ্ছিদ্র
নিষ্ক্রমণ
নিষ্ক্রিয়
নীচ, নীচতা, নীচু, নীচে
নীতীশ
নীরক্ত
নীরন্ধ্র
নীলাদ্রি (দ্রী নয়)
নীহারিকা (নিহা নয়)
নূপুর
নৈঃশব্দ্য
নৈর্ব্যক্তিক
ন্যাতপ্যাত (কিন্তু ন্যাতপেতে)
ন্যাস (কিন্তু ন্যস্ত)
ন্যুব্জ
ন্যূন
পইতে
পক্বাশয় (পক্কা নয়)
পক্ষপাতী (কিন্তু পক্ষপাতিতা, পক্ষপাতিত্ব)
পঞ্চভুজ (ভূজ নয়)
পঞ্জি, পঞ্জিকা
পঞ্জীকরণ
পড়ো-পড়ো
পণ্ডিতম্মন্য
পতঞ্জলি
পথিকৃৎ
পদাবলি (লী নয়)
পনেরো (র নয়)
পরভাষা
পরভৃৎ (কাক)
পরভৃত (কোকিল)
পরিক্ষিৎ, পরীক্ষিৎ (মহাভারতের ব্যক্তিনাম)
পরিপাটি
পরিবেশ
পরিবেশন (পরিবেষণ অপ্র)
পরিষ্কার, পরিষ্কৃত
পরিস্ফুট, পরিস্ফুটন
পরিস্রুত
পরীক্ষিত
পরোপজীবী

পল্লি
পশমি
পশ্চাৎপদ, পশ্চাৎমুখী
(কিন্তু পশ্চাদ্‌গামী, পশ্চাদ্‌বর্তী)
পসারিনি
পাকস্থলী
পাকিস্তানি
পাঞ্চালী
পাটিগণিত, পাটীগণিত
পাণি (বীণাপাণি, চক্রপাণি)
পাপোশ (পোষ নয়)
পারমাণবিক
পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্ত্য
পিপীলিকা
পিয়াসি
পুঙ্খানুপুঙ্খ (ঙক্ষ নয়)
পুঞ্জীভূত
পুণ্য (পূ নয়, পুন্য নয়)
পুত্তলি, পুত্তলিকা
পুনর্নির্মাণ
পুনর্মুদ্রণ
পুনর্মূষিকো ভব
পুবালি
পুরবি (পূরবী নয়)
পুরাতনী
পূজনীয়াসু
পূজনীয়েষু
পূজারিনি
পূর্বসূরি
পূর্বাহ্ণ
পৃথক্‌কৃত
পৃথ্বীশ
পৌনঃপুনিক
পৌরোহিত্য
প্যাতপ্যাত (কিন্তু প্যাতপেতে)
প্যারাশুট
প্যারিমোহন (প্যারী নয়)
প্রগল্‌ভ
প্রজ্বলন, প্রজ্বলিত (প্রজ্জ্ব নয়)
প্রণালী (প্রণালি নয়)
প্রণিধান
প্রতীকী (কিন্তু প্রতীকিতা)
প্রত্যভিবাদন (প্রত্যা নয়)
প্রত্যুৎপন্নমতি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব
প্রত্যুদ্‌গমন
প্রদায়ী (তু. জীবনদায়ী)
প্রবাহিণী
প্রমাণিত (কিন্তু প্রমাণীকৃত)
প্রসূন
প্রস্তূয়মান
প্রস্ফুরণ
প্রাগিতিহাস, প্রাগৈতিহাসিক
প্রাঙ্গণ (কিন্তু অঙ্গন)
প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃপ্রণাম,
প্রাতঃস্নান, প্রাতঃস্মরণীয়
(কিন্তু প্রাতর্ভ্রমণ)
প্রাতরাশ (প্রাতঃরাশ নয়)
প্রোজ্জ্বল (কিন্তু প্রজ্বলন)
ফণীভূষণ
ফণীমনসা
ফরমায়েশ, ফরমায়েশি
ফরমাশ
ফরাসি (—সী নয়)
ফলপ্রসূ

ফলাকাঙ্ক্ষা
ফারসি (ফার্সি নয়)
ফাল্গুনি (অর্জুন)
ফাল্গুনী (ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা)
ফুরসত (ৎ নয়)
ফুলশয্যা (ফুল দিয়ে সাজানো বিছানা)
ফুলসজ্জা (ফুলের সাজ)
ফুল্‌স্‌ক্যাপ (ফুলস্কেপ নয়)
ফৌজি
ফ্যাশিবাদ (ফ্যাসি নয়)
ফ্যাকাশে (ফেকাশে নয়)
বইকী, বই কী
বইঠা
বউ (বৌ নয়)
বউদি, বউমা
বংশোদ্ভূত
বকশিশ
বক্ষ্যমাণ
বজ্রমুষ্টি
বনমালী
বন্দি, বন্দিদশা, বন্দিনি
বন্দ্যোপাধ্যায় (বন্দো নয়)
বর্গি (মারাঠা দস্যু)
বর্গীকরণ
বর্ণালি
বর্ষপঞ্জি
বহিষ্কার
বহুব্রীহি
বহ্ন্যুৎসব
বাক্‌চাতুরী
বাক্‌পটু

বাক্‌প্রতিমা
বাক্‌শক্তি
বাক্‌সিদ্ধ
বাক্‌স্বাধীনতা
বাগ্‌জাল
বাগ্‌দত্তা
বাগ্‌ধারা
বাগবিতণ্ডা
বাগ্‌রোধ (বাক্ নয়)
বাগীশ্বর
বাঙ্‌নিষ্পত্তি
বারাঙ্গনা
বারাণসী
বাল্মীকি
বাষ্প
বিদুষী (দূ নয়)
বিদূষক
বিদেশি, বিদেশিনি (কিন্তু বিদেশীয়)
বিদগ্ধজন
বিদ্রুপ (দ্রূ নয়)
বিধ্বংসী
বিধ্বস্ত
বিবাগি
বিভুঁই
বিমা (বীমা নয়)
বিভীষণ
বিভীষিকা
বিশ্বসনীয়
বিস্ময়
বীতশোক
বীতশ্রদ্ধ

বীথি, বীথিকা
বুদ্ধিজীবী
বৃহত্ত্ব (ত্ব নয়)
বেআইনি
বেনারসি
বৈদূর্যমণি
ব্যথা (ব্যাথা নয়)
ব্যবসায় বা ব্যাবসা
ব্যভিচার, ব্যভিচারী (ব্যা নয়)
ব্যস্ত (ব্যা নয়)
ব্যাবসায়িক (ব্য নয়)
ব্যাবহারিক (ব্য নয়)
ব্যুৎপত্তি, ব্যুৎপন্ন
ব্রততি, ব্রততী
ভগবদ্গীতা
ভগিনী, ভগ্নী
ভণ্ড
ভস্মসাৎ (স্যাৎ নয়)
ভাগীরথী
ভারিক্কি
ভারিভুরি
ভারী
ভীমরতি
ভূতুড়ে (ভু নয়)
ভৌগোলিক
ভ্রান্তিমান
ভ্রু, ভ্রূ
ভ্রুকুটি, ভ্রূকুটি
ভ্রুক্ষেপ, ভ্রূক্ষেপ
ভ্রূণ
মই
মকশো
মক্ষীরানি
মজলিশ, মজলিশি
মঞ্জরি
মণীন্দ্র
মণীশ
মণ্ডূক
মৎস্য, কিন্তু মৎসী
মধুসূদন
মধ্যবয়সি
মধ্যাহ্ন (কিন্তু পূর্বাহ্ণ, পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ)
মনঃপূত
মনীষা, মনীষী
মন্ত্রিত্ব (কিন্তু মন্ত্রীগিরি, মন্ত্রীসভা)
ময়ূখ
ময়ূর, ময়ূরপঙ্খি
মর্ত (পৃথিবী), মর্ত্য (পৃথিবী সংক্রান্ত)
মহত্ত্ব (মহত্ব নয়)
মাণিক্য (কিন্তু মানিক)
মাতাঙ্গিনী (কিন্তু মাতঙ্গী)
মিতব্যয়, মিতব্যয়ী (ব্যায় নয়)
মুখ্যমন্ত্রী (কিন্তু মুখ্যমন্ত্রিত্ব)
মুরারি (রী নয়)
মুহুর্মুহু
মূকাভিনয়
মৃন্ময় (মৃণ্ময় নয়)
মৌসুমি
যক্ষ্মা
যাজ্ঞবল্ক্য
যুধ্যমান (যুদ্ধমান নয়)

যুবতি, যুবতী
যূথী
যূপকাষ্ঠ
যোগসাজশ
রংচং, রংচঙে
রঙ্গিনী
রজকিনি (নী নয়)
রজোগুণ
রঞ্জিত
রণজিৎ
রণপা
রথী (কিন্তু সারথি)
রপ্তানি, রফতানি
রাখি (খী নয়)
রাজরানি (নী নয়)
রাবীন্দ্রিক
রাশভারি
রুগ্ণ
রুগি (কিন্তু রোগী)
লক্ষ (লাখ)
লক্ষ করা (কিন্তু জীবনের লক্ষ্য,
লক্ষ্যভেদ)
লব্জ
লাবণি, লাবণ্য
ল্যাগব্যাগ (কিন্তু ল্যাগবেগে)
শংকর
শঙ্কা (শংকা নয়)
শনাক্ত (সনাক্ত নয়)
শরিক, শরিকি
শরীরী
শশীভূষণ
শারীরিক
শিবানী
শিরশ্ছেদ
শিরোনাম
শিহরন (ণ নয়)
শীততাপনিয়ন্ত্রিত
শীতাংশু
শীতোষ্ণ
শীলাদিত্য (শিলাদিত্য নয়)
শুচিস্মিতা
শুদ্ধশীল
শুদ্ধোদন
শুভাশিস
শুশ্রূষা
শ্বেতাঙ্গিনী, শ্বেতাঙ্গী
শ্মশান
শ্মশ্রু
শ্মশ্রুধারী
শ্রদ্ধাঞ্জলি
শ্রেণি
ষট্‌চক্র
ষট্‌ত্রিংশ
ষট্‌পদী
ষড়ঋতু, ষড়্‌ঋতু
ষড়্‌জ
ষড়যন্ত্র
ষড়্‌রিপু, ষড়রিপু
ষণ্ণবতি
ষণ্মাস, ষাণ্মাসিক
ষষ্টি (ষাট)
ষষ্ঠী
ষাণ্মাসিক
সংকলন

সংকল্প
সংকীর্ণ
সংকেত
সংগঠন
সংগত, সংগতি
সংগীত
সংগম
সংঘটন
সংবৎসর (সম্বৎসর নয়)
সংস্কৃতিমান (বান নয়)
সখী
সখ্য (সখ্যতা নয়)
সঙ্গিন (সংকটজনক)
সদসৎ
সনাতনী
সন্ধে, সন্ধ্যে
সন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসী
সমভিব্যাহার
সমীচীন
সমুজ্জ্বল
সবকারি
সাঙ্গোপাঙ্গ
সামান্তরিক
সারথি (সারথী নয়)
সুকৃতি (সৎ কাজ)
সুকৃতী (সৎকর্মকারী)
সুচরিতাসু
সুচরিতেষু
সুধী (সম্বোধনেও সুধী, সুধি হয় না)
সুষ্ঠু
সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম
সূচ্যগ্র (সূচ্যাগ্র নয়)
সেনানিবাস
সেনানী
সোহিনি
স্নেহাশিস
স্ফুরণ, কিন্তু স্ফূর্তি
স্বতঃস্ফূর্ত
স্বত্ব
স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্ভূ
স্বামীজি
স্বাস্থ্যোদ্ধার
স্লোগান (শ্লোগান নয়)
হইচই (হৈচৈ নয়)
হইহই (হৈহৈ নয়)
হতভম্ব (ভম্ভ নয়)
হতভাগি
হরীতকী (কিন্তু হরতুকি)
হিতাকাঙ্ক্ষী
হিন্দুস্থানি
হিরণ্ময়, হিরণ্ময়ী (হিরন্ময় নয়)
হিরণ্য
হীনমন্য, হীনম্মন্য
হৃৎকম্প
হৃৎপিণ্ড
হৃদ্‌যন্ত্র
হৃদ্‌রোগ
হৃষীকেশ
হেমাঙ্গিনী
হ্রসমান, ক্রমহ্রসমান (হ্রাসমান নয়)

যেসব প্রয়োগ বর্জনীয়

এক — অকারণ স্ত্রীলিঙ্গ বর্জনীয়। বিবরণী, মণ্ডলী, শতাব্দী, শতবার্ষিকী ভুল নয়, তবে এই বাহুল্য অনর্থক। সহচর বলতে গিয়ে সহচরী, নির্জল বলতে গিয়ে নির্জলা অপ্রয়োজনীয়।

দুই ক. বক্তব্য বলা যেতেই পারে, কিন্তু বক্তব্য রাখা কেন?

খ. অংশগ্রহণ না করে আমরা কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারি।

তিন — তাদেরকে, আমাদেরকে, কারুকে, কারুরকে। তার বদলে লিখুন তাদের, আমাদের, কাউকে

চার — ডবল বহুবচন বর্জনীয়—যেমন

অনেক লোকেরা (অনেক লোক)
বহু শ্রোতারা (বহু শ্রোতা)
সব পশুগুলি (সব পশু)

পাঁচ — গদ্যে 'সাথে' বর্জনীয়। লিখুন 'সঙ্গে'।

ছয় — কেন-কী—বা কেন-কি বাংলা ভাষায় খাপ খায় না। লিখুন কেননা বা কারণ।

সাত — হিন্দি-প্রভাবিত শব্দ বা শব্দবন্ধ এড়িয়ে চলাই উচিত।

ধামাকা, লাগু, দেখভাল, হাঙ্গামা (উৎসব অর্থে), মিলিজুলি (জোট) বর্জনীয়।

আট — blackout অর্থে বিশেষ্যে নিষ্প্রদীপ ভুল। লিখুন অপ্রদীপ। বিশেষণে নিষ্প্রদীপ (নিষ্প্রদীপ রাত্রি)।

নয় — আবশ্যকীয় ও আবশ্যকীয়তা বর্জনীয়। লিখুন আবশ্যক ও আবশ্যকতা।

মান্য বাংলা উচ্চারণের রূপরেখা

কতকগুলি দৃষ্টান্তশব্দ নিয়ে বাংলা উচ্চারণের প্রবণতাগুলি দেখানো হবে। পনেরো-ষোলোটি নিয়ম বুঝে নিলেই বাংলা উচ্চারণের হদিশ মিলবে।

এক আমল, কমল, সরল, গরল, নরম। উচ্চারণ যথাক্রমে (আ-মোল্, ক-মোল্, শ-রোল্, গ-রোল্, ন-রোম্। দ্বিতীয় সিলেবলে ও-ধ্বনি এল প্রথম সিলেবলের বিবৃত বা অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনির প্রভাবে। একই ভাবে বারণ (বা-রোন্), মরণ (ম-রোন্) হবে। এগুলোকে আ-মল্ ক-মল্ শ-রল্ গ-রল্ ন-রম্ বা-রন্ ম-রন্ উচ্চারণ করা উচিত নয়।

দুই সবল, অমল, অবল। উচ্চারণ শ-বল্, অ-মল্, অ-বল্।

এগুলো উপরের নিয়মে পড়ে না। এইসব শব্দে সহার্থক উপসর্গ স- এবং নঞর্থক উপসর্গ অ-রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সিলেবলে ও ধ্বনি আসবে না।

তিন মদিরা, মন্দির, কলিকাল, ঘটি। উচ্চারণ যথাক্রমে মো-দি-রা, মোন্-দির্, কো-লি-কাল্, ঘো-টি।

এখানে পরের সিলেবলে ই ধ্বনি থাকায় প্রথম সিলেবলের অ-ধ্বনি ও হয়ে গেল। পরে উ-ধ্বনি থাকলেও তাই। এইভাবেই সমুদ্র, কলুষিত শব্দে শো-মুদ্-দ্রো আর কো-লু-শি-তো উচ্চারণ হবে।

চার অটুট, অবিনীত, অচির, সচিত্র। অ-টুট্, অ-বি-নি-তো, অ-চি-রো, স-চিৎ-ত্রো। এখানে উপরের দ্বিতীয় সূত্রের মতো নঞর্থক বা সহার্থক উপসর্গ থাকায় ও উচ্চারণ এল না।

পাঁচ গণ্য, ভব্য, নব্য, সভ্য, কল্য। গোন্-নো, ভোব্-বো, নোব্-বো, শোব্-ভো, কোল্-লো। এখানে দুটো কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমত, পরে য-ফলা থাকায় আগের অ ওকারান্ত হল। দ্বিতীয়ত, য-ফলা থাকা সত্ত্বেও উচ্চারণ য-ফলা না হয়ে ব্যঞ্জনটির ডবল উচ্চারণ হল।

ছয় ভঙ্গ, বন্ধ, পোক্ত, মস্ত। ভং-গো, বন্-ধো, পোক্-তো, মস্-তো, শেষে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে তার উচ্চারণ ও-কারান্ত হচ্ছে।

সাত গ্রস্ত, গ্রহ, প্রথা, দ্রব। গ্রোস্-তো, গ্রো-হো, প্রো থা, দ্রো-বো। র-ফলায় নিহিত (inherent) অ ধ্বনি থাকলে উচ্চারণ ওকারান্ত হবে। গ্রস্-তো বা গ্র-হো উচ্চারণ একেবারেই ভুল।

আট বিশ্রাম, প্রশ্ন, অশ্লীল। বিস্-স্রাম, প্রোস্-নো, অস্লিল্। বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মে তালব্য-শ-এর সঙ্গে র-ফলা বা ল-ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণে দন্ত্য-স আসে। সম্প্রতি প্রোশ্নো, অশ্লিল্, উচ্চারণের ঝোঁক দেখা গেলেও তা একান্তই অনুচিত।

নয় সহ্য, বাহ্য, গ্রাহ্য, আহ্বান, বিহ্বল। শোজ্-ঝো, বাজ্-ঝো, গ্রাজ্-ঝো, আও্ভান্, বিউ্ভল্। মান্য চলিত বাংলার (standard colloquial) এই উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে। আও্ভান্-কে আহোবান্ বা আহোভান্ বলা এবং বিউ্ভল্-কে বিহোভল্ বলা মারাত্মক ভুল।

দশ পদ্ম, বিস্ময়, স্মরণ। মান্য উচ্চারণে ম্-ধ্বনি বা অনুনাসিকতা আসে না। স্বাভাবিক উচ্চারণ পদ্-দো, বিশ্-শয়্, শ-রোন্। তবে বেতার-দূরদর্শনের ঘোষক ও আবৃত্তিকারগণ পদ্-দোঁ, বিশ্-শঁয়্ এবং শঁ-রোন্ বলেন। এই উচ্চারণ বানান-প্রভাবিত (spelling pronunciation) এবং ফরমাল। Standard colloquial বা মান্য কথা উচ্চারণে অপ্রয়োজনীয়।

এগারো একাশি, একাত্তর, একান্ন, লেজ। মান্য উচ্চারণ অ্যা-কা-শি, অ্যা-কাৎ-তোর্, অ্যা-কান্-নো, ল্যাজ্। সম্প্রতি বানানের প্রভাবে এ-কা-শি, এ-কাৎ-তোর্, এ-কান্-নো এবং লেজ শোনা যাচ্ছে। এও ফরমাল এবং ঘোষক আবৃত্তিকার ও গায়কদের মুখেই বেশি শোনা যায়। এগুলো ভুল। এ-উচ্চারণ বানান-প্রভাবিত। বহু লোকের মুখে শোনা গেলেও এসব উচ্চারণ বর্জনীয়।

বারো কৃত্য, ভৃত্য, সত্য। কৃৎ-তো, ভ্রিৎ-তো, শোৎ-তো য-ফলা-ওয়ালা ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়ে যাওয়াই এসব শব্দের বৈশিষ্ট্য।

তেরো অতঃপর, বহিঃপ্রকাশ। অ-তোপ্-পর্, বো-হিপ্-প্রো-কাশ্। বিসর্গের পরের ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হবে। বিসর্গ উচ্চারিত হবে না।

চোদ্দ গীত, গীতবিতান, জল, জলকষ্ট, রূপ, রূপবাণী। লক্ষ করতে হবে যে, গিৎ কিন্তু গি-তো-বি-তান্ ; জল্ কিন্তু জ-লো-কশ্-টো ; রূপ্ কিন্তু রু-পো-বা-নি। সমাসবদ্ধ হলে পূর্বপদের ব্যঞ্জনান্ত শব্দের স্বরান্ত উচ্চারণ হয়। কিন্তু দুটি শব্দের সংযোগ যদি বাংলা মতে হয় কিংবা দ্বিতীয় শব্দটি যদি অসংস্কৃত শব্দ হয়, তবে প্রথম শব্দটির স্বরান্ত উচ্চারণ হবে না—মনখারাপ (মোন্-খা-রাপ্), পথচলতি (পথ্-চোল্-তি), শতকরা (শৎ-ক-রা), জলচল (জল্-চল্)।

পনেরো ভেজাল, বেচারা। ভ্যা-জাল্, ব্যা-চা-রা। এটাই স্বাভাবিক মান্য উচ্চারণ। কিন্তু পরিশীলিত ও ফরমাল উচ্চারণে ভে-জাল্, বে-চা-রা শোনা যায়। আবৃত্তি বা গানে এটা চলতেও পারে, কিন্তু শিষ্ট কথোপকথনের ভ্যা-জাল্ ও ব্যা-চা-রা।

ষোলো কবিতা পাঠে বা আবৃত্তিতে ও গানে এসব নিয়মের ব্যতিক্রম হতেই পারে।

বাংলায় শব্দের প্রান্তিক বর্ণ সচরাচর ব্যঞ্জনান্ত বা হসন্ত উচ্চারিত হয়—ফল, ম্লান, মন, ফুল, জল, পথ, সব। কবিতায় বা গানে ক্ষেত্রবিশেষে ফ-লো, ম্লা-নো, মো-নো, ফু-লো হতেই পারে।

সতেরো পথ, মন, জল, ফুল, কুল, স্নান, নবীন, ব্যবহার। এইরকম বহু শব্দের শেষ বর্ণ ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয়। পথ্, মোন্, জল্, ফুল্, কুল্, স্নান্, নো-বিন্, ব্যা-বো-হার্। কিন্তু অনেক শব্দের শেষ বর্ণ স্বরান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন যত, কত, শত, গ্রহ, নত, পূত, গ্রথিত, শক্ত, যক্ষ, লক্ষ, মস্ত।

লক্ষ করব যে, ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের ত উচ্চারণ হয়। ৎ নয়। দ্বিতীয়ত শেষে যুক্তবর্ণ থাকলে স্বরান্ত উচ্চারণ (শক্ত = শক্-তো) হয়। তৃতীয়ত, শেষে হ থাকলে অকারান্ত উচ্চারণ হয়, গ্রহ (গ্রোহো)।

আঠারো ব্যস্ত, ব্যবহার, ব্যসন (বিলাসব্যসন) যথাক্রমে ব্যাস্-তো, ব্যা-বো-হার্, ব্যা-শোন্। কিন্তু ব্যতীত, ব্যথিত, ব্যতিক্রম এর উচ্চারণ বে-তি-তো, বে-থি-তো, বে-তিক্-ক্রোম্। ব্যাতিতো নয়, ব্যাথিতো নয়, ব্যাতিক্ক্রোম্ নয়।

যেসব বানান বা শব্দের প্রয়োগ এড়িয়ে চলতে হবে

অনুসূয়া, অপাংক্তেয়, অবিমৃষ্যকারিতা, আবশ্যকীয়, আমাবস্যা, আভ্যন্তরীণ, ইংগিত, উচিৎ, উৎকর্যতা, কার্যকরী (লিখুন কার্যকারী), কামাক্ষা, কিম্বা, কৃচ্ছ্রতা, দোষস্খালন ও পাপস্খালন (লিখুন ক্ষালন), গড্ডালিকা, গাভী, ছুঁৎমার্গ (লিখুন ছুঁতমার্গ), যোগাড়, যোগান (লিখুন জোগাড়, জোগান), বীজাণু, পৌরহিত্য, ভৌগলিক, ওতঃপ্রোত, আশীষ, বিদূষী, সখ্যতা, স্বাধীনোত্তর, শুদ্ধাশুদ্ধি, বুচিবান, স্বর্গীয় (মৃত অর্থে লিখুন স্বর্গত বা প্রয়াত), কিরণ্ময়ী, অনুমত্যানুসারে (লিখুন অনুমত্যনুসারে), দুরস্থ, কেতাদুরস্থ (লিখুন দুরস্ত), অভাবগ্রস্থ (—গ্রস্ত)

তথাকথিত অশুদ্ধ

(এগুলি প্রচলনসিদ্ধ শব্দ)

অশ্রুজল, অর্থনৈতিক, প্রাগৈতিহাসিক, সচল, আন্তর্জাতিক, নির্ভরতা, অপ্রতুলতা, উপরোক্ত, মর্মান্তিক, ভাসমান, সাবধানী, সাবধানতা, মতিচ্ছন্ন, নিশ্চয়তা, তোষামোদ, সততা, আয়ত্তাধীন, সার্বজনীন, বিদ্যুতায়ন, অপ্রতুলতা, ইতিপূর্বে, ইতিমধ্যে

যেসব বিকল্পের যে-কোনোটি ব্যবহার করা যেতে পারে

পাঠক্রম/পাঠ্যক্রম
অর্থনৈতিক/আর্থনীতিক
দারিদ্র/দারিদ্র্য
কোশ/কোষ
কোশাগার/কোষাগার
কোশাধ্যক্ষ/কোষাধ্যক্ষ
যুবতি/যুবতী
ব্যাংক/ব্যাঙ্ক
আপস/আপোশ
নালি/ নালী
অন্তরিক্ষ/অন্তরীক্ষ

যে শব্দগুলির তফাত বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে

অকিঞ্চন (দরিদ্র)
আকিঞ্চন (দারিদ্র)

অকুল (হীন বংশ)
অকূল (সমুদ্র)

অঘ্রান (অগ্রহায়ণ)
আঘ্রাণ (ঘ্রাণ নেওয়া)

অচ্ছদ (অনাবৃত)
অচ্ছোদ (স্বচ্ছ সরোবর)

অণু (ক্ষুদ্র)
অনু (পশ্চাৎ)

অদিন (অশুভ দিন)
অদীন (ধনী)

অধরোষ্ঠ (অধর ও ওষ্ঠ)
অধরোষ্ঠ্য (ঠোঁট সম্বন্ধীয়)

অনিল (বায়ু)
অনীল (নীল নয়)

অনিশ (অবিরত)
অনীশ (নাস্তিক)

অনুপ (উপমাহীন)
অনূপ (জলাশয়)

অনুভব (উপলব্ধি)
অনুভাব (বোধ)

অন্ত (শেষ)
অন্ত্য (শেষের)

অন্তঃস্থ (মাঝের)
অন্তস্থ (শেষের)

অন্যভৃৎ (কাক)
অন্যভৃত (কোকিল)

অপচয় (বাজে খরচ)
অবচয় (চয়ন)

অপসরণ (সরে যাওয়া)
অপসারণ (সরিয়ে দেওয়া)

অপসৃত (সরে গেছে এমন)
অবসৃত (অবসরপ্রাপ্ত)

অবদান (সুকৃতি)
অবধান (জানা)

অবলা (নারী)
অবোলা (যে কথা বলতে পারে না)

অবিকৃত (বিকৃত নয়)
অবিক্রিত (বিক্রি করা হয়নি)

অবিরাম (বিরামহীন)
অভিরাম (সুন্দর)

অবিহিত (অনৈতিক, অশাস্ত্রীয়)
অভিহিত (নামধারী)

অভিক (কামুক)
অভীক (নির্ভীক)

অমর্ত (স্বর্গ)
অমর্ত্য (স্বর্গীয়)

অর্ঘ (মূল্য)
অর্ঘ্য (পূজার উপচার)

আকার (চেহারা: বিরাট আকার)
আকৃতি (shape: গোলাকৃতি)

আঁশ (তন্তু)
আঁষ (আমিষ)

আত্ম (স্বীয়)
আত্ত (প্রাপ্ত)

আপণ (দোকান)
আপন (নিজের)

আবরণ (ঢাকনা)
আভরণ (অলংকার)

আভাষ (ভাষণ)
আভাস (ইঙ্গিত)

আভাষিত (ব্যক্ত)
আভাসিত (উদ্ভাসিত)

আহুতি (যজ্ঞে অর্পণ)
আহূতি (আহ্বান)

উদ্দেশ (সন্ধান, খোঁজ)
উদ্দেশ্য (মতলব)

উদ্ধত (অবিনীত)
উদ্যত (উদ্‌গ্রীব)

উপাদান (উপকরণ)
উপাধান (বালিশ)

উপান্ত (প্রান্ত)
উপান্ত্য (প্রান্তবর্তী)

উহ্য (বহনযোগ্য)
ঊহ্য (অনুক্ত; অদৃশ্য)

ওষধি (যে-গাছ ফল পাকলেই মরে যায়)
ঔষধি (ভেষজ গাছ)

ওষ্ঠ (উপরঠোঁট)
ওষ্ঠ্য (ঠোঁট সম্বন্ধীয়)

কটি (কোমর)
কোটি (একশো লক্ষ)

কণ্ঠি (বৈষ্ণবদের মালা)
কণ্ঠী (কণ্ঠস্বরযুক্ত)

কপাল (ললাট)
কপোল (গণ্ড)

কমল (পদ্ম)
কোমল (নরম)

কর্তৃত্ব (কর্তার ভাব)
কর্ত্রীত্ব (কর্ত্রীর ভাব)

কষায় (কটু)
কাষায় (গৈরিক)

কাশি (কাশ রোগ)
কাশী (কালীধাম)

কাকি (কাকিমা)
কাকী (স্ত্রী-কাক)

কালি (লেখার কালি)
কালী (দেবী কালী)

কি (প্রশ্নসূচক অব্যয়)
কী (প্রশ্নসূচক সর্বনাম)

কুজন (দুর্জন)
কূজন (পাখির ডাক)

কুট (দুর্গ; পাহাড়)
কূট (কুটিল)

কুল (বংশ)
কূল (তীর)

চতুষ্পদ (চারপেয়ে)
চতুষ্পাদ (চারটি অঙ্গযুক্ত)

চিৎ (মন)
চিত (উপুড়ের বিপরীত ভঙ্গি)

চূত (আম)
চ্যুত (বহির্গত, বিচ্যুত)

চৈত্ত (চিত্ত বিষয়ক)
চৈত্য (বৌদ্ধ বিহার)

ছোঁড়া (বালক)
ছোড়া (নিক্ষেপ করা)

জড় (অচেতন)
জড়ো (একত্রিত)

জনি (নারী; জন্ম)
জনী (মা)

জমক (আড়ম্বর)
যমক (অর্থালংকারবিশেষ)

জাল (নকল; মাছ ধরার জাল)
জ্বাল (আগুনে সিদ্ধ করা)

জুজুৎসু (জাপানি মল্লযুদ্ধ)
যুযুৎসু (যুদ্ধের জন্য উৎসুক)

যতি (ছেদ)
যতী (সংযমী)

টিকা (প্রতিষেধক)
টীকা (ব্যাখ্যা)

তড়িৎ (বিদ্যুৎ)
তরিত (পারে উপনীত)
ত্বরিত (দ্রুত)

তরণ (পার হওয়া)
ত্বরণ (বেগবৃদ্ধি)

তরা (পার হওয়া)
ত্বরা (দ্রুততা)

তাড়ক (তাড়নাকারী)
তারক (ত্রাণকারী)

তাদৃশ (সেইরকম)
ত্বাদৃশ (তোমার মতো)

তির (বাণ)
তীর (কূল)

তুরি (মাকু)
তূরী (শিঙা)

তুণ্ড (পাখির ঠোঁট)
তুন্দ (ভুঁড়ি)

তুষ (ধানের খোসা)
তুস (পশমি চাদর)

ত্যজমান (ত্যাগকারী)
ত্যজ্যমান (পরিত্যক্ত)

দড়ি (রজ্জু)
দরি (গুহা)

দন্ত (দাঁত)
দন্ত্য (দাঁত সম্বন্ধীয়)

দশাশ্ব (দশ ঘোড়া)
দশাস্য (দশ মুখ যার, রাবণ)

দাঁড়া (দণ্ড)
দাড়া (কাঁকড়ার দাড়া, হুল)

দিন (দিবস)
দীন (দরিদ্র)

দিননাথ (সূর্য)
দীননাথ (দরিদ্রের ত্রাতা)

দিনেন্দ্র (সূর্য)
দীনেন্দ্র (দরিদ্রের ত্রাতা)

দীপ (প্রদীপ)
দ্বিপ (হাতি)
দ্বীপ (জলবেষ্টিত ভূখণ্ড)

দুরন্বয় (বাক্যে পদক্রমের ত্রুটি)
দূরান্বয় (দূরের সঙ্গে সম্পর্ক)

দুবস্ত (পরিপাটি)
দূরস্থ (দূরের)

দুষ্কৃতি ([illegible]জ)
দুষ্কৃতী (দুর্বৃত্ত)

দূত (চর)
দ্যূত (পাশা)

দৈন (দৈনিক)
দৈন্য (দীনতা)

দার (পত্নী)
দ্বার (দরজা)

দ্রোণি (কলসি)
দ্রৌণি (দ্রোণের পুত্র)

ধনি (সুন্দরী)
ধনী (ধনবান)
ধ্বনি (শব্দ)

ধন্না (ধরনা)
ধন্বা (ধনুকধারী)

ধুনি (আগুনের পাত্র)
ধুনী (নদী)

ধেয় (গ্রাহ্য)
ধ্যেয় (অনুধাবনীয়: ধ্যানযোগ্য)

নিঃসরণ (বার হওয়া)
নিঃসারণ (বার করা)

নিদান (কারণ)
নিধান (ভাণ্ডার)

নিবৃত্ত (ক্ষান্ত)
নির্বৃত্ত (সম্পন্ন)

নিবৃত্তি (নিষ্পত্তি)
নির্বৃত্তি (সম্পাদন)

নিরত (রত)
নীরত (বিরহ)

নিরস্ত (বিরত)
নিরস্ত্র (অস্ত্রহীন)

নিরাবরণ (আবরণহীন)
নিরাভরণ (অনলংকৃত)

নিরাশ (হতাশ)
নিরাস (নিক্ষেপণ)

নির্বপণ (পিণ্ডদান)
নির্বাপণ (আগুন নেভানো)

নির্বাত (বায়ুহীন)
নির্বাদ (নিন্দা)
নির্বাধ (বাধাহীন)

নিশিত (শানিত)
নিশীথ (গভীর রাত; রাত)

নিষধ (প্রাচীন ভারতের রাজ্যবিশেষ)
নিষাদ (ব্যাধ)

নীড় (পাখির বাসা)
নীর (জল)

নুন (লবণ)
ন্যূন (কম)

নেতৃত্ব (নেতার পদ)
নেত্রীত্ব (নেত্রীর পদ)

পক্ষ (দল, পাখা)
পক্ষ্ম (চোখের পাতার লোম)

পটল (সমূহ)
পটোল (সবজি ফলবিশেষ)

পরভৃৎ (কাক)
পরভৃত (কোকিল)

পরশ্ব (পরশু দিন)
পরস্ব (পরের জিনিস)

পরামর্শ (উপদেশ)
পরামর্ষ (সহনশীলতা)

পরাহ্ণ (অপরাহ্ণ, বিকেল)
পরান্ন (অন্যের অন্ন)

পরিচ্ছদ (পোশাক)
পরিচ্ছেদ (অধ্যায়)

পরিচ্ছন্ন (পরিষ্কার)
পরিচ্ছিন্ন (ছিন্ন)

পরিদেবন (বিলাপ)
পরিবেদন (বড়োর আগে ছোটো ভাইয়ের বিয়ে)

পরিষদ (সভা)
পারিষদ (সভার সদস্য)

পাঁজি (পঞ্জিকা)
পাজি (বদ, মন্দ)

পাঁতি (পঙ্‌ক্তি)
পাতি (সারি)

পাকস্থলী (পাকাশয়)
পাকস্থালী (রান্নার পাত্র)

পাণি (হাত)
পানি (জল)

পাবনি (পবনপুত্র)
পাবনী (পবিত্রকারিণী)

পার্থব (স্থূলতা)
পার্থিব (জাগতিক)

পাঁশ (ছাই)
পাশ (বন্ধন; পার্শ্ব)

পিঠ (দেহের পিছন দিক)
পীঠ (দেবতার অধিষ্ঠানক্ষেত্র)

পুঁতি (কাচের দানা)
পুঁথি/পুথি (বই)
পূতি (দুর্গন্ধ)

পুত (পুত্র)
পূত (পবিত্র)

প্রজ্বল (জ্বলন্ত)
প্রোজ্জ্বল (অতি উজ্জ্বল)

প্রতিক্ষণ (সর্বক্ষণ)
প্রতীক্ষণ (অপেক্ষা)

প্রতীক্ষমাণ (প্রতীক্ষাকারী)
প্রতীক্ষ্যমাণ (যার জন্য প্রতীক্ষা করা হচ্ছে)

প্রথিত (খ্যাত)
প্রোথিত (পোঁতা)

প্রভাষ (বিশেষভাবে বলা)
প্রভাস (দীপ্তি)

প্রভব (উৎপত্তিস্থান)
প্রভাব (প্রতিপত্তি)

প্রসাদন (সন্তোষ বিধান)
প্রসাধন (রূপচর্চা)

প্রস্ত (দফা)
প্রস্থ (বিস্তার)

প্রাশ (আহার)
প্রাস (যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ)

ফাল্গুনি (অর্জুন)
ফাল্গুনী (ফাল্গুনের পূর্ণিমা)

ফোঁড়ন (সেলাই: ফোঁড়)
ফোড়ন (ব্যঞ্জনের মশলা)

ফোঁড়া (ফোঁড় দেওয়া)
ফোড়া (স্ফোটক)

বঁধু (বন্ধু)
বধূ (স্ত্রী)

বদরি (কুল ফল)
বদরী (হিমালয়ের তীর্থবিশেষ)

বন্দ্য (বন্দনীয়)
বন্ধ (বদ্ধ)
বন্ধ্য (বাঁধার যোগ্য)

বন্দি (কয়েদি)
বন্দী (বন্দনাকারী)

বন্দিনি (কারারুদ্ধা)
বন্দিনী (বন্দনাকারিণী)

বরণ (অভ্যর্থনা)
বরন (বর্ণ)

বর্মি (ব্রহ্মদেশবাসী)
বর্মী (বর্মধারী)

বলি (দেবতার উদ্দেশে পশুহত্যা)
বলী (বলবান)

বসন (পরিচ্ছদ)
ব্যসন (পাপ, দোষ)

বাঁজা (বন্ধ্যা)
বাজা (আওয়াজ করা)

বাঁটা (ভাগ করা)
বাটা (পানের পাত্র; মাছবিশেষ)

বাঁধা (আটকানো)
বাধা (প্রতিবন্ধকতা)

বাঁধানো (শক্ত করে বাঁধাই করা)
বাধানো (ঘটানো)

বালি (বালুকা)
বালী (সুগ্রীবের অগ্রজ)

বিকৃত (বিকারগ্রস্ত)
বিক্রীত (বিক্রি হয়েছে যা)

বিচি (বীজ)
বীচি (ঢেউ)

বিতত (বিস্তীর্ণ)
বিতথ (মিথ্যা)

বৃত্ত (গোলাকৃতি ক্ষেত্র)
বৃত্য (বরণীয়)

বিদুর (ধৃতরাষ্ট্রের ভাই)
বিদূর (দূরবর্তী)

বিমর্শ (বিতর্ক)
বিমর্ষ (বিষণ্ণ)

বিশ (কুড়ি)
বিষ (দেহের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তু)
বিস (পদ্মের ডাঁটা)

বিসৃত (বিস্তৃত)
বিস্মৃত (ভুলে গেছে এমন)

বৃতি (আবরণ)
বৃত্তি (পেশা)

বেদি (যজ্ঞের উঁচু স্থান)
বেদী (বেত্তা)

ব্যঙ্গ (বিদ্রুপ)
ব্যঙ্গ্য (গূঢ়)

ব্রহ্মণ্য (ব্রহ্ম বিষয়ক)
ব্রাহ্মণ্য (ব্রাহ্মণ বিষয়ক)

ভগবৎ (ভগবান)
ভাগবত (ভগবান বিষয়ক)

ভরণ (ভরা, ভরতি করা)
ভরন (মিশ্র ধাতুবিশেষ)

ভাঁটা (বল; ইটের চুল্লি)
ভাটা (জোয়ারের বিপরীত)

ভাণ (ভণিতা)
ভান (ছল)

ভাদ্রপদ (ভাদ্র)
ভাদ্রপদা (নক্ষত্রবিশেষ)

ভারি (খুব)
ভারী (ওজনদার)

ভাষ (ভাষণ)
ভাস (দীপ্তি)

ভূপতিত (মাটিতে পড়ে গেছে এমন)
ভূপাতিত (মাটিতে ফেলা হয়েছে এমন)

ভেক (ব্যাং)
ভেখ (ছদ্মবেশ)

মত (মনোভাব)
মতো (সদৃশ)

মন্দর (পৌরাণিক পর্বতবিশেষ)
মন্দার (মাদার গাছ)

মর্ত (পৃথিবী)
মর্ত্য (পৃথিবী বিষয়ক)

মাড়ি (তাল-কাঁঠালের রস)
মাঢ়ী (দাঁতের গোড়ার মাংস)

মানুষি (মানুষের ভাব)
মানুষী (নারী)

মিলিত (একত্রিত)
মীলিত (মুদিত)

মুখপত্র (দলীয় পত্রিকা)
মুখপাত্র (প্রতিনিধি)

মেদ (চর্বি)
মেধ (যজ্ঞ)

যৎ (সংগীতের তালবিশেষ)
যত (যতটা; যে-পরিমাণ)

যোগরূঢ় (বিশেষার্থক শব্দ)
যোগারূঢ় (যোগাসনে বসে ধ্যানমগ্ন)

রঞ্জিত (রাঙানো)
রণজিৎ (রণজয়ী)

রশনা (কোমরের অলংকারবিশেষ)
রসনা (জিভ)

রশা (দড়ি)
রসা (পৃথিবী)

রাঁড়ি (বিধবা)
রাঢ়ি (রাঢ় অঞ্চলের)

রাশ (লাগাম)
রাস (রাস উৎসব)

রিক্‌থ (সম্পত্তি)
রিক্ত (দরিদ্র)

রিপু (শত্রু)
রিফু (ছুঁচসুতো দিয়ে সূক্ষ্ম মেরামত)

রুপা (রুপো)
রূপা (রূপবতী)

রোঁদ (টহল)
রোদ (রোদ্দুর)
রোধ (বাধা)

লক্ষণ (চিহ্ন)
লক্ষ্মণ (রামচন্দ্রের ভাই)

শংকর (শিব)
সংকর (মিশ্র)

শক্ত (দৃঢ়)
সক্ত (আসক্ত)

শমি (কাঁটা গাছবিশেষ)
শমী (সংযমী)

শয্যা (বিছানা)
সজ্জা (সাজ)

শরণ (আশ্রয়)
স্মরণ (স্মৃতি)

শর্ব (শিব)
সর্ব (সব)

শলা (শলাকা)
সলা (পরামর্শ)

শস্য (ধান, গম ইত্যাদি)
সস্য (ফলের শাঁস)

শারি (শালিক)
সারি (পঙ্‌ক্তি)

শান্ত (ধীরস্থির)
সান্ত (অন্তযুক্ত)
সান্ত্ব (প্রবোধ বাক্য)
স্বান্ত (মন)

শায়ক (বাণ)
সায়ক (খড়্গ)

শারদা (দুর্গা)
সারদা (সরস্বতী)

শিকড় (মূল)
শীকর (জলকণা)

শিরীষ (গাছবিশেষ)
সিরিশ (আঠা)

শীতাংশু (চাঁদ)
সিতাংশু (চাঁদ; সাদা রশ্মি)

শুক (শুক পাখি)
শূক (শূককীট)

শূর (বীর)
সুর (দেবতা; গানের সুর)
সূর (সূর্য)

শৌরি (কৃষ্ণ)
সৌরি (যম)

শ্বশ্রূ (শাশুড়ি)
শ্মশ্রু (দাড়ি)

শ্রুতি (শ্রবণ)
স্রুতি (ক্ষরণ)

ষষ্টি (ষাট)
ষষ্ঠী (ষষ্ঠী দেবী)

সখিত্ব (বন্ধুতা)
সখীত্ব (বান্ধবীর ভাব)

সজন (লোকজন সহ)
স্বজন (আত্মীয়)

সঞ্চলন (চলন)
সঞ্চালন (চালানো)

সত্ত্ব (অস্তিত্ব)
সত্য (ঠিক)
স্বত্ব (অধিকার)

সপক্ষ (পক্ষযুক্ত)
স্বপক্ষ (আত্মপক্ষ)

সমাসক্তি (বিশেষ আসক্তি)
সমাসোক্তি
(অর্থালংকারবিশেষ)

সম্মিলন (মিলন)
সম্মীলন (সম্যক খোলা)

সর্গ (পরিচ্ছেদ)
স্বর্গ (দেবলোক)

সর্জ (শাল গাছ)
সর্জ্য (ধুনো)

সলিল (জল)
সলীল (লীলাযুক্ত)

সাঁজা (দম্বল)
সাজা (শাস্তি; প্রসাধন)

সাক্ষর (অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন)
স্বাক্ষর (সই)

সাড় (চেতনা)
সার (শ্রেষ্ঠ অংশ)

সার্থ (অর্থযুক্ত)
স্বার্থ (নিজের লাভ)

সীমন্ত (সিঁথি)
সীমান্ত (শেষ প্রান্ত)

সুকৃতি (ভালো কাজ)
সুকৃতী (সৎকর্মকারী)

সূরি (পণ্ডিত)
সূরী (সূর্যপত্নী)

হাঁড়ি (রান্নার পাত্র)
হাড়ি (হিন্দু জাতিবিশেষ)

হুত (যজ্ঞাগ্নিতে সমর্পিত)
হূত (আহূত, ডাকা হয়েছে এমন)